আরবি সাহিত্যে ইসলামি ভাবধারা

ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ

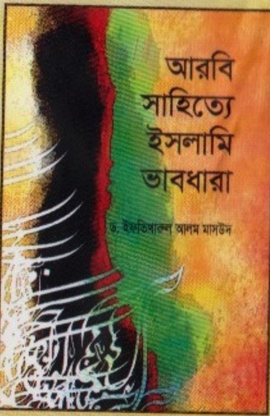

আরবী-ভাষার সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কারণ ইসলামের মূলভিত্তি পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে এই ভাষায়। কুরআনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাহিত্য না হলেও তার ভাষা সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ। ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (সা.) কবিতা পছন্দ করতেন এবং কবিতাচর্চাকে উৎসাহিত করেছেন। কুরআন নাজিল হওয়ার আগে থেকেই আরবী ভাষা ও সাহিত্য, বিশেষত কবিতা উৎকর্ষ লাভ করেছিল। তা সত্ত্বেও আরবী ভাষার অনেক অপূর্ণতা ছিল যা কুরআন পূর্ণ করেছে। আরবী ভাষার ওপর কুরআনের প্রভাব এতটাই মৌলিক ও সুদূরপ্রসারী হয়েছে যে, কুরআন-প্রভাবিত আরবী ভাষার বিশেষ প্রবণতা ও রূপকে 'কুরআনিক আরবী' নামে অভিহিত করেছেন অনেকে।

সাহিত্য যেহেতু জীবনের শৈল্পিকরূপ, আর ইসলাম যেহেতু সার্বিক জীবনব্যবস্থা, সেহেতু সাহিত্যকে, বিশেষত ইসলামের সূতিকাগার আরবের অর্থাৎ আরবী সাহিত্যকে, ইসলাম প্রভাবিত করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার রূপ কী, তা কতটা ব্যাপক ও গভীর তা আমাদের, বিশেষভাবে বাংলাভাষী মানুষের প্রায় অজানা। এই অনালোকিত ও অনালোচিত বিষয়টিকে পাঠকের সামনে উন্মোচিত করার প্রয়াস করেছেন ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ তার এই বইতে। বলাবাহুল্য, শিরোনামের বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এটি নয়, বরং প্রাসঙ্গিক কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে এর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল, গতিশীল ও সুখপাঠ্য, বক্তব্য বিষয়মুখি এবং তথ্যবহুল। এই গ্রন্থ পাঠে মাসউদের জ্ঞানের গভীরতা এবং গবেষণামুখী প্রবণতাকে সহজেই শনাক্ত করা যায়। গ্রন্থটি জ্ঞান পিপাসার পাশাপাশি আনন্দ পিপাসাও মেটাতে সক্ষম।

নাজিব ওয়াদুদ
কথাশিল্পী, অনুবাদক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আধুনিক তুরস্ক ও
মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আধুনিক তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস

(আধুনিক তুরস্ক, ইরাক, ইরান ও আফগানিস্তান)

ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক

জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন

www.pathagar.com

আধুনিক তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস
ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক

প্রকাশক : মোরশেদ আলম, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ। মোবাইল : ০১৬২২-১৫৭৪৪৪। গ্রন্থস্বত্ব : লেখক। প্রচ্ছদ : অস্ট্রিক আর্য্যু। বর্ণবিন্যাস : তুষার কম্পিউটার, ঢাকা-১১০০। মুদ্রণে : আল ফয়সাল প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা-১১০০। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

মূল্য : ৪৫০ টাকা
বারো মার্কিন ডলার

ADHUNIK TOROSKA O MADHAPRACHAR ITIHAS by Dr. Muhammad Inam ul Hoque. Published by Morshed Alam, Jatiya Grontha Prokashan, 67 Pyaridas Road, Banglabazar, Dhaka-1100. Bangladesh. Mobile : 01622-157444. Cover Design : Austrik Aarzu. Compose : Tushar Computer, Dhaka-1100. Date of publication : February 2018.

Price Tk. : 450.00 Only. US $ 12.00

ISBN 984-560-304-4

e-mail : jatiyagronthaprakashan93@gmail.com

ঘরে বসে জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন এর সকল বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/Jatiya
ফোনে অর্ডার করতে 015 1952 1971 হট লাইন 16297
www.porua.com.bd

www.pathagar.com

ভূমিকা

"আধুনিক তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস" গ্রন্থখানা এমন এক সময়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যখন এর রচয়িতা আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা মরহুম ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক আমাদের মাঝে আর নেই। তিনি ২০১৫ সালের ৬ই জুন পরলোক গমন করেন। তাঁর লিখে যাওয়া প্রায় সমাপ্ত বইখানা মুদ্রণের এই দুরুহ কাজ তাঁর বড় ছেলে এবং বই অনুরাগী হিসেবে আমার কাঁধেই বর্তিয়েছে যা আমি অত্যন্ত সাগ্রহে গ্রহণ করেছি। শেষ সময়ে বাবা যখন খুবই অসুস্থ তখনও এই বইখানা লেখার কাজে তাঁর আগ্রহের কোন কমতি ছিল না। মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে তাঁর গবেষণার আগ্রহ-ই এই বইটি লেখার কাজে তাঁকে আরও বেশি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তাঁর লিখিত "মধ্যপ্রাচ্য-অতীত ও বর্তমান" সুধী ও ছাত্র সমাজে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে।

আমি ইতিহাসের ছাত্র নই। ইতিহাস সম্পর্কে স্কুল পর্যায়ে যে স্বল্প জ্ঞান আহরণ করি তাঁকে পুঁজি করে এত উচ্চ পরিসরে উক্ত বই সম্পর্কে ধারণা দেয়ার স্পর্ধা আমার নেই। আমার এই জ্ঞানহীনতাকে আশা করি পাঠকশ্রেণি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। মূল রচয়িতার অবর্তমানে এ কাজে অসম্পূর্ণতা থাকাও অস্বাভাবিক নয় এবং এ ব্যাপারে সুচিন্তিত মতামত পেলে তা পরবর্তী সংস্করণে সংযুক্ত করার আশা রাখি।

জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন-এর স্বত্বাধিকারী জনাব মোরশেদ আলম এই পুস্তকখানার প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। আমার বাবার জীবদ্দশায় আমার স্নেহময়ী 'মা' মনোয়ারা বেগম মনু সর্বক্ষণ তাঁর পাশে থেকে বই লেখার কাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আজ বাবার অনুপস্থিতিতে আমার 'মা' এ মহতি উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন– ধন্যবাদ দিয়ে তাঁকে ছোট করতে চাই না। আমার একমাত্র ছোট ভাই নুরুল ফেরদৌস মুসান্না– যে আমাকে বাবার বিভিন্ন স্বপ্ন যা তিনি পূরণ করে যেতে পারেননি তা বাস্তবায়নে সর্বদা অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে– আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের যাঁরা আমাকে এ কাজে সাহস এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন– বিশেষ করে আমার স্ত্রী জেবুন্নেছা।

আশা করি এ পুস্তকখানা পাঠকদের অনুসন্ধিৎসু মনের কিছুটা খোরাক জোগাবে এবং বিগত দিনের ইতিহাস পর্যালোচনার সুযোগ পাবেন। যদি বইখানা পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়, তাহলে আমার এ উদ্যোগ স্বার্থক হবে বলে মনে করি।

নুরুল মুস্তাফা তারেক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়
বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য

আরবের বুকে, অতঃপর সমগ্র বিশ্বে ইসলামের উত্থান ও বিস্তৃতি মানবসমাজের ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ইতিহাসে চরম বিস্ময়কর একটি ঘটনা। আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষকগণ চিন্তা করে গলদঘর্ম হয়ে যান, কী করে হতদরিদ্র আবার চরম অসভ্য ও বর্বর একটি জাতি এত ক্ষিপ্রগতিতে তৎকালীন বিশ্বের প্রচণ্ড শক্তিধর দু' পরাশক্তি, রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যকে করতলগত করে একটি সুষম জাতিগঠনমূলক জীবনব্যাপ্ত দ্বারা মানুষকে সভ্যতার সর্বোচ্চ মার্গে উন্নীত করতে সক্ষম হল। কী করে ইসলাম নামীয় এই জীবনব্যবস্থা প্রাচ্য-প্রতিচ্যকে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে আধুনিককালের গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করে মানবসভ্যতাকে তার উৎকৃষ্টতম শিখরে উন্নীত করতে সক্ষম হল!

আরব দেশে হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) আবির্ভাব

৫৭০ খ্রিস্টাব্দে হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরবের মক্কা নগরীতে কোরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি একজন নবী হিসাবে ঐশী প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত নবী হিসাবে তিনি ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন, কিন্তু মক্কা তথা সমগ্র আরবের অত্যন্ত প্রভাবশালী কোরাইশ বংশ দ্বারা তিনি বাধাগ্রস্ত হন এবং ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হন এবং সে বছরই তিনি একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র সরকার গঠন করেন। ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি দিগ্বিজয়ের পতাকা নিয়ে আক্রমণাত্মক অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটান।

চলমান মধ্যপ্রাচ্য

যে রাষ্ট্রটির জন্ম ও অস্তিত্ব নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের তাবৎ অসন্তোষের মূল তার ঘটনাবলি ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইলি যুদ্ধ পর্যন্ত হয়। ঐ যুদ্ধের ফলে ইসরাইলের সীমান্ত পশ্চিমে সিনাই মরুভূমি অতিক্রম করে সুয়েজ খাল পর্যন্ত,

www.pathagar.com

পূর্বে সমগ্র জেরুজালেম দখল করে জর্ডান নদী বরাবর সীমানা বিস্তার লাভ করে। সিরিয়া সীমান্তে তারা গোলান পার্বত্য এলাকাসহ বেশ কিছু কৌশলগত এলাকা দখল করে। ইসরাইলের সীমান্তবর্তী আরব রাষ্ট্রবর্গ বেশ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। আলোচ্য এলাকার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মিসরই যেহেতু অগ্রগামী এবং অন্যান্য ইসরাইলি সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রগুলো যেহেতু মিসরের ওপরই অধিক ভরসা করেছিল তাই মিসরের ঘটনাবলি নিয়েই আমরা চলমান মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলি আলোচনার সূত্রপাত করি।

মিসর : ফিলিস্তিনবিষয়ক

জামাল আবদ আল-নাসের তখন মিসরের ক্ষমতাসীন এ যুদ্ধে স্বীয় পরাজয়ের গ্লানিতে ও সেনাধ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রেসিডেন্ট নাসের পদত্যাগ করেন। কিন্তু প্রবল জনমতের চাপে পড়ে তিনি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারে বাধ্য হন। ১৯৭০ সালে জামাল আবদ আল-নাসেরের মৃত্যুর পর আনোয়ার সাদাত মিসরের প্রেসিডেন্ট হন। আনোয়ার সাদাত ভিন্ন প্রকৃতির লোক। অল্প কিছুদিনের মধ্যে মিসরীয় সেনাবাহিনীকে তিনি বেশ চাঙ্গা করে তোলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৬৭ সালে আরব- ইসরাইলি যুদ্ধে ব্যবহৃত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের পরিবর্তে সোভিয়েত রাশিয়া মিসরকে নতুন অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করে। ১৯৭৩ সালে ইসরাইলের সাথে আরেকটি যুদ্ধে মিসরীয় বাহিনী ইসরাইলি প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে সিনাই মরুভূমিতে ঢুকে পড়ে এবং বেশ কিছু এলাকা দখল করে নেয়। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় তথায় অস্ত্রবিরতি হয়। আনোয়ার সাদাত ইসরাইলের সাথে আলোচনায় বসতে সম্মত হন। আলোচনার মাধ্যমে ইসরাইল সিনাই এলাকা ছেড়ে দিতে সম্মত হয় এবং জেনেভায় অনুষ্ঠিতব্য মধ্যপ্রাচ্য সম্মেলনে একটি আপসরফার সিদ্ধান্ত উভয়পক্ষ মেনে নেয়। সিরিয়া এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে।

প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ইসরাইলের সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করতে রাজি। তাঁর মতে ২৮ বছর পূর্বে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা হতেই মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান। এর অবসানকল্পে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করা উচিৎ। আসন্ন জেনেভা সম্মেলনে তিনি প্রতিনিধি দল প্রেরণের পক্ষপাতী। ইসরাইল কিংবা সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে এই শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর ১৯৬৭ সালে দখলকৃত আরব ভূমি থেকে ইসরাইলি সৈন্য প্রত্যাহার করার জন্য প্রেসিডেন্ট সাদাত প্রস্তাব দেন।

www.pathagar.com

তিনি জোর দিয়ে বলেন, একটি ফিরিস্তিন রাষ্ট্র গঠন করতেই হবে। জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর আর গাজা উপত্যকা এই ভূমি দু'টি একটি করিডোর দ্বারা সংযুক্ত করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব। তবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ও জর্ডানের সম্পর্ক কী হবে, তা নিয়ে একটি চুক্তি প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থার উপস্থিতি মেনে জেনেভায় মধ্যপ্রাচ্য সম্মেলনে ইসরাইলের অসম্মতি ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ১৯৫০-এর দশকে ফিলিস্তিনিদের মুক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা P.L.O. (Palestin Liberation Organization) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে ইয়াসির আরাফাত (১৯২৯-২০০৪) তাঁর ২০ জন সঙ্গী নিয়ে গোপন ফাতাহ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। যাহোক আইজ্যাক রবিন আশা প্রকাশ করেন যে ১৯৭৭ সালে মধ্যপ্রাচ্য প্রশ্নে অর্থবহ আপসরফার সম্ভাবনা হয়েছে। তাঁর মতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন করতে চাইলে তৎপূর্বে ইসরাইল ও জর্ডানের মধ্যে অবশ্যই চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে হবে।

এদিকে দক্ষিণ লেবাননে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (পিএলও) বেশ জোরদার হয়ে ওঠে। অচিরেই লেবাননি ডানপন্থী খ্রিস্টানদের সাথে ফিলিস্তিনিদের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। এই সংঘর্ষে সিরিয়া খ্রিস্টানদের পক্ষ অবলম্বন করে। উনিশ মাস স্থায়ী এই দাঙ্গায় ষাট হাজার লোক প্রাণ হারায়। ফিলিস্তিনিরা খ্রিস্টান প্রেসিডেন্ট সুলেমান ফ্রাঞ্জির পদত্যাগ দাবি করে। নৌবাহিনী সরকারি সেনাবাহিনীর খ্রিস্টান অংশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে মুসলমান প্রধানমন্ত্রী রশীদ ফারামী এর প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। লেবাননের এই গৃহযুদ্ধে খ্রিস্টানরা কোণঠাসা হয়ে পড়লে মিসরীয় সেনাবাহিনী তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। বেশ কয়েকবার যুদ্ধ বিরতি লংঘনের পর আরব লীগের মধ্যস্থতায় লেবাননে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন প্রেসিডেন্ট ইলিয়াস সার্কিজ ঘোষণা করেন যে লেবানন মুসলমান ও খ্রিস্টান উভয়েরই মাতৃভূমি। তিনি সশস্ত্র বাহিনী, নিরাপত্তা বাহিনী ও অর্থনীতি পুনর্গঠনসহ নয়া লেবানন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্ট সার্কিজ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সেলিম আল হোসের নাম ঘোষণা করেন। জনাব হোসের বয়স ৪৬। তিনি লেবাননের শিল্প ও উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান। চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী তিনি সুন্নি মুসলমান। আরব লীগের চার জাতি শাসন জানুয়ারি ১৯৭৭-এর মধ্যে সকল পক্ষকে ভারী অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়।

দামেস্কে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠকে জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর এবং গাজা এলাকা নিয়ে আপাতত স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অন্যদিকে আসন্ন জেনেভা সম্মেলনে পৃথক পৃথক প্রতিনিধি প্রেরণের স্থলে একটি মাত্র আরব প্রতিনিধিদল প্রেরণ সংক্রান্ত প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের প্রস্তাব সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদ কর্তৃক সমর্থিত হয়। মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিষ্পত্তির প্রারম্ভিক উপায় হিসেবে এ সিদ্ধান্ত এবং সর্বোপরি দু'দিন পূর্বেও যাদের মুখ দেখাদেখি প্রায় বন্ধ ছিল। বৃহত্তর স্বার্থে তাদের ঐকমত্যে পৌঁছান নিঃসন্দেহে একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। দুটো প্রস্তাবে এ সত্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আরবরা সংকট নিরসনে অধিকতর বাস্তব পন্থা অনুসরণে রাজি। তারা ইসরাইলকে অস্বীকার করার স্থলে পারস্পরিক স্বীকৃতির মাধ্যমেই অঞ্চলের শান্তিস্থিতি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। আরবদের বাস্তব অনুসরণে প্রেসিডেন্ট সাদাতের অবদান যে সমধিক তা অনস্বীকার্য। মধ্যপ্রাচ্যে বৃহৎ শক্তির ডিক্টেশনের প্রতিবাদে তিনিই প্রথম সোচ্চার হন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিরসনে স্বীয় ভূমিকা পালনের সুযোগও প্রদান করেন। তবে এর পেছনে মিসরের লাভালাভের প্রশ্ন জড়িত তাও অনস্বীকার্য। বিগত ছয়দিনের যুদ্ধে সবচেয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় মিসর। সিনাইয়ের মত বিশাল কৌশলগত এলাকা হাতছাড়া হওয়া মিসরের জন্য পীড়াদায়কতো বটেই তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঐ অঞ্চলে প্রাথমিকভাবে তেলের সন্ধান লাভ। এসব কারণে যেকোন উপায়ে ঐ এলাকা পুনরুদ্ধার করা প্রেসিডেন্ট সাদাতের জন্য এক নম্বরের বিষয়ে পরিণত হয় এবং এজন্য ইসরাইলকে স্বীকৃতি প্রদানেও তিনি পিছপা হননি। এটি অনস্বীকার্য যে, স্বল্প সময়ে এবং একবারেই মধ্যপ্রাচ্যে সংস্কারের ন্যায় বহু পুরাতন বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব (মন্ত্রী) ড. হেনরি কিসিঞ্জারের (স্বয়ং একজন ইহুদি) পর্যায়ক্রমিক শান্তি প্রচেষ্টা সম্ভবত সে কারণেই সাদাত কর্তৃক সমর্থিত হয় এবং তিনি ইসরাইলের সাথে সমঝোতা-ভিত্তিক সম্পর্কের মাধ্যমে সুয়েজের পূর্ব তীরস্থ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন।

প্রস্তাবিত ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়ের উদ্দেশ্যে আরব কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হবার কথা। সিরীয় প্রেসিডেন্ট হাফিজ-আল-আসাদের কায়রো আগমনের প্রাক্কালে মিসরীয় পত্রিকা আল-আহরাম এই তথ্য প্রকাশ করে। এ রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভেও সমর্থ বলে প্রতীয়মান হয়। বলাবাহুল্য, ইসরাইল ফিলিস্তিনি অধিকার স্বীকার করুক বা না করুক সে অবস্থায় অধিকৃত জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর এবং অধিকৃত গাজা উপত্যকা প্রত্যর্পণ ব্যতীত

www.pathagar.com

গত্যন্তর থাকবে না এবং জাতিসংঘে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি অধিকতর সহজ হবে।

অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউজ উইক' সাময়িকীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কুর্ট ওয়াল্ডাহেইম আশা প্রকাশ করেন যে, ১৯৭৭ সালে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের সামগ্রিক নিষ্পত্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তিনি বলেন, সকল পক্ষই জেনেভা সম্মেলন পুনরায় আহ্বান করার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী এবং জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে ও গাজা এলাকায় একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে আরব বিশ্বের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফিলিস্তিনিদের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্তকে তিনি বিজ্ঞজনোচিত বলে মনে করেন।

মিসর ও সিরিয়ার তরফ থেকে একটি যৌথ কমান্ড গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। উভয় দেশের প্রতিরক্ষা, কূটনীতি, তথ্য, বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক বিষয় এই যৌথ কমান্ডের আওতাধীন থাকার প্রস্তাব করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ-আল-আসাদ মিসর সফরে গিয়েছিলেন এবং তার সেই সফরকালেই মিসর ও সিরিয়ার মধ্যকার এই যৌথ কমান্ড গঠনের বিষয়টি স্বাক্ষরিত ও প্রকাশিত হয়। তার কিছুকাল পূর্বেও আরব বিশ্বের অন্যতম এ প্রধান দু'টি দেশ পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত হয়। লেবাননের গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের সম্পর্ক এতই তিক্ত হয়ে ওঠে যে প্রেসিডেন্ট আসাদ কায়রো শীর্ষ বৈঠক বর্জন করতেও দ্বিধা করেননি। পরিশেষে সৌদি আরবের বাদশাহ খালেদের রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদর্শিতা ও সফল মধ্যস্থতায় মিসর-সিরিয়ার বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটে। শুধু তাই নয়, এই বিবাদ নিষ্পত্তির ফলে লেবাননে গৃহযুদ্ধের অবসানও ত্বরান্বিত হয়। বলাবাহুল্য, মিসর, সিরিয়া সম্পর্কিত উন্নতি ও অবনতি ঐতিহাসিক। প্রেসিডেন্ট নাসেরের সময় মিসর-সিরিয়া একত্রীকরণের মধ্য দিয়েই একটি যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র রূপলাভ করেছিল। অবশ্য তার জীবদ্দশাতেই সে ফেডারেশন ভেঙে যায়। তথাপি মিসর দীর্ঘদিন "সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (United Arab Republic)" নামটি আঁকড়ে রাখে। পরবর্তীকালে সাদাতের আমলেও মিসর, লিবিয়া ও সুদান সমবায়ে লুজ ফেডারেশন বা কনফেডারেশন গঠনের কথা উঠেছিল, কিন্তু তা কার্যে পরিণত হয়নি।

১৯৭৬ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের আগমনের সাথে সাথে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়। ইসরাইল

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এটি মার্কিন ইহুদি সম্প্রদায় এবং মার্কিন সরকারের ওপর নির্ভর করে চলে। আরবদের বিরুদ্ধে একতরফাভাবে অস্ত্র প্রদানই ছিল প্রত্যেক মার্কিন সরকারের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য। কিন্তু জিমি কার্টার আসেন নতুন অভিব্যক্তি নিয়ে, ফিলিস্তিনিদের আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি পুনরুল্লেখ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক সাময়িকী 'টাইম' উল্লেখ করে এই প্রথম একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট— সেই অর্থপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করলেন। যৎসামান্য সীমান্ত অঞ্চল ব্যতীত সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল হতে ইসরাইলের অপসারণের কথা কার্টার উল্লেখ করেন। প্রচলিত আরব দাবি ছাড়িয়ে গিয়ে ফিলিস্তিনি আরব উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব করেন। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনও প্রেসিডেন্ট কার্টারের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে তার মতামত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্ট সাদাত জেনেভা সম্মেলনের প্রতি বৃহৎ শক্তিবর্গকে তাগাদা দিলে অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির ব্যাপারে একটি যুক্ত ইশতেহার ঘোষণা করে। তারা নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নম্বর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য পুনরায় তুলে ধরেন। উক্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে, অধিকৃত আরব এলাকা প্রত্যর্পণের পর শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করার অধিকার ইসরাইলের রয়েছে। যুক্ত ইশতেহারে ফিলিস্তিনিদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের কথাও পুনরুল্লেখ করা হয়। এই যুক্ত ইশতেহার মার্কিন ইহুদি প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অন্যান্য ইসরাইলি সমর্থক দলসমূহের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কার্টার এতে পিছপাও হন এবং যুক্ত ইশতেহার প্রত্যাহার করেন। মার্কিন ইহুদিদের শক্তি লক্ষ্য করে সাদাত তাঁর কর্মসূচি পুনর্বিবেচনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭৭ সালের ৯ই নভেম্বর তিনি ইসরাইল গমন করে ইহুদিদের সাথে সরাসরি আলোচনা করার প্রস্তাব দেন। পরবর্তী ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী মেনাচেস বেগিন তাঁকে এক আমন্ত্রণের মাধ্যমে এই প্রস্তাবে সাড়া দেন। প্রেসিডেন্ট সাদাত ইসরাইল সফর করেন এবং ২০শে নভেম্বর ইসরাইলি পার্লামেন্টে ভাষণ দেন। পরে বেগিনও মিসর সফর করেন এবং সাদাতের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকের ফলাফল অবশ্য অস্পষ্ট থেকে যায়। ইতোমধ্যে সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, আলজিরিয়া ও ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের এই একক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। কিন্তু সৌদি আরব ও জর্ডান এ ব্যাপারে সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

আনোয়ার সাদাত ইসরাইলি ও আরবদেরকে জেনেভা শান্তি সম্মেলনে বসাতে সক্ষম হলেও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আর কতদূর? কার্টার প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মতে সবকিছু সঠিক পন্থায় অগ্রসর হলেও মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার নিষ্পত্তির পথ বন্ধুর ও সুদূর- পরাহত। জেনেভায় ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে নীতিনির্ধারণের সমস্যা অতি দ্রুত সমাধান করা গেলেও, একটি সামগ্রিক আরব-ইসরাইলি চুক্তির দ্বার এখনও পূর্ববৎ রুদ্ধ। বিশেষত মৌলিক দুটো প্রশ্নে এখনও উভয়পক্ষ অনড়। প্রথমটি হল আরবদের দাবি ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত আরব এলাকা হতে ইহুদি সৈন্যাপসারণ। অপরদিকে ইহুদি নেতৃবৃন্দ মিসরীয় সিনাইয়ের কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ এলাকা থেকে সৈন্যাপসারণে রাজি। কিন্তু সিরিয়ার গোলান উচ্চ-ভূমি অথবা জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর হতে সম্পূর্ণ সৈন্য প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত নয়। দ্বিতীয়ত আরব দাবি অনুযায়ী জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকা নিয়ে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। এ ধরনের প্রস্তাব ইসরাইল সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তাদের মতে এটি হবে সমস্ত গোলযোগের কেন্দ্রস্থল এবং ইহুদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি বিরাট হুমকি। তাই সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদ এবং ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার নেতৃবৃন্দ সাদাতের এই শান্তি প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেন। তারা মনে করেন এ প্রচেষ্টায় জেনেভায় আলোচনা আরম্ভ হলে মিসর ইসরাইলের সাথে সামগ্রিক নিষ্পত্তির পরিবর্তে এটি পৃথক সমঝোতায় আসতে বাধ্য হবে।

লেবানন

মার্চ মাসে (১৯৭৮) সংঘটিত ঘটনাবলি পুনরায় প্রমাণ করে যে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি এখনও সুদূরপরাহত। ১৯৭৮ সালের ২৯শে মার্চ ইসরাইলি বাহিনী দক্ষিণ লেবাননে অবস্থিত ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু শিবিরে হানা দেয়। অতিপ্রত্যুষে পরিচালিত এ হামলাকে স্মরণাতীতকালের সবচাইতে বড় হামলা বলে অভিহিত করা হয়। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের সমস্ত ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু গ্রামসমূহ এই অতর্কিত হামলার শিকার হয়। জলেস্থলে অন্তরীক্ষে প্রায় ২৫,০০০ ইসরাইলি সৈন্য এই সম্প্রসারণবাদী হামলায় অংশগ্রহণ করে। অতর্কিত আক্রমণের ফলে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইসরাইলিরা লেবানন সীমান্তের ৬ মাইলের মধ্যে নিরপেক্ষ এলাকা তৈরি করে। বিমান হতে বোমার আঘাতে উদ্বাস্তু শিবিরগুলো গুঁড়িয়ে দেয়া হয়।

অতর্কিত আক্রমণে সাধারণ-ফিলিস্তিনিরা দিশেহারা হয়ে পড়লেও পি.এল.ও. (Palestine Liberation Organization) বাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রতিরোধ যুদ্ধের মুখে হাজার হাজার উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনি লেবাননের রাজধানী বৈরুত অভিমুখে পাড়ি জমায়। এই হামলার বিরুদ্ধে যখন ফিলিস্তিনি

www.pathagar.com

প্রতিরোধ যুদ্ধের শুরু তখনই প্রস্তাব আসে দক্ষিণ লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের।

ইসরাইলের সম্প্রসারণবাদী আক্রমণে ফিলিস্তিনিরা শুধু উৎখাত হয়নি, সে সঙ্গে লাঞ্ছিত হয়েছে লেবাননের সার্বভৌমত্ব। লাঞ্ছিত লেবাননের বুক এখনও শান্তিরক্ষী বাহিনীর পদভরে কম্পিত। দীর্ঘ ২০ মাসের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর লেবাননে এমনিতে ৩০ হাজার মিসরীয় শান্তিরক্ষী বাহিনী রয়েছে। এদের আনয়ন করেছে আরব লীগ। পুনরায় জাতিসংঘের প্রায় ৪০০০ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন হয়েছে। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিহীন পরিস্থিতির দায়ভার জোর করে লেবাননের ওপর চাপানো হয়েছে।

ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী লেবানন নামের ছোট্ট দেশটি কার? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক কারণে দেখা দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের মাত্র ৪০১৫ বর্গমাইল আয়তনের এ দেশটিকে এক সময় মধ্যপ্রাচ্যের স্বর্গ বলে অভিহিত করা হত। সে সময় মধ্যপ্রাচ্যের অনেকেই স্বস্তির অন্বেষায় ঘুরে আসত লেবানন।

১৯৭০ সালের পূর্ব পর্যন্ত দেশটির পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত ছিল। সত্তরের দশকের সূত্রপাত থেকেই শুরু হয় এদেশের অশান্ত পরিস্থিতি। জাতিগত বিরোধকে কেন্দ্র করে সূত্রপাত ঘটে অশান্তির। ১৯৪৩ সালের কনভেনশন অনুযায়ী খ্রিস্টানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধা ছিল তাদেরই বেশি। সে সুবাদে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাদের প্রতিপত্তি স্বাভাবিকভাবেই ছিল অধিক। ১৯৭০ এ খ্রিস্টানদের সংখ্যালঘিষ্টতা সাংবিধানিক এই পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে।

১৯৭৬ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় লেবাননের জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ মুসলমান। অন্যদিকে খ্রিস্টান জনসংখ্যার হার মাত্র ৪১ শতাংশ, বাকি ৩ শতাংশ দুরদি সম্প্রদায়ভুক্ত। অতএব মুসলমানরা জনসংখ্যার হারে সমধিক দাবি করলে শুরু হয় গণ্ডগোল। ফলে ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত ১৯ মাসের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা সংঘটিত হয়। আর্থিক ক্ষতি এবং ব্যাপক প্রাণহানি ছাড়াও লুণ্ঠিত হয় লেবাননের সার্বভৌমত্ব। এর পর হতে বার বার এ দেশটির সার্বভৌমত্ব লুণ্ঠিত হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল দেশগুলোর সার্বভৌমত্বের রক্ষাকবচ জাতিসংঘ পর্যন্ত লেবাননের সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ জন্যই প্রশ্ন উঠেছে লেবানন দেশটি কার? লেবানন কি লেবাননবাসীর অথবা মধ্যপ্রাচ্য শান্তিরক্ষী বাহিনীর নাকি ইসরাইলের তাঁবেদার লেবাননের দক্ষিণপন্থী ফালাঙ্গী খ্রিস্টান বাহিনীর?

www.pathagar.com

ইসরাইলের এবারের আক্রমণ দীর্ঘদিনের চিন্তাপ্রসূত। ১৯৭২ সালেই এ ধরনের একটি পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু মিসর ও সিরিয়ার দরুন এটি সম্ভব হয়নি। এ দুটো রাষ্ট্রই ইসরাইলের যেকোন ধরনের সৈন্য পরিচালনার বিপক্ষে ছিল। কিন্তুপ্রেসিডেন্ট সাদাতের একতরফা শান্তি প্রস্তাবের ফলে আরব ঐক্যে যে ফাটল ধরে তারই সূত্র ধরে এ আক্রমণ পরিচালনা করা হয় বলে অনেকের ধারণা। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, সাদাতের শান্তি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আসাদ ফিলিস্তিনিদের উৎসাহ জোগালেও সিরিয়ার ইহুদি আক্রমণের মুখে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চুপ থাকেন।

ইসরাইলি পক্ষ থেকে বলা হয় অতি সম্প্রতি তেল আরবে সংঘটিত ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে নিহত ইহুদিদের আত্মার শান্তির জন্যই এ আক্রমণ। আরও বলা হয় লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের ফিলিস্তিনি শিবির হতেই আক্রমণ চালানো হয়। তাই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্যই এ আক্রমণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসরাইলের বহুদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার মোক্ষম উপায় হিসাবে তেলআবিবের ঘটনাকে বেছে নেয়া হয়। ইসরাইলের লেবানন আক্রমণের মূল লক্ষ্য হল ফিলিস্তিনিদেরকে তাদের সর্বশেষ এলাকা থেকেও উৎখাত করা। যাহোক, এবারের যুদ্ধ আরেকটি বিষয় প্রমাণ করেছে যে, ফিলিস্তিনিরাও লড়তে জানে। দক্ষিণ লেবাননের লিতানী নদী বরাবর অগ্রসর হলেও ইসরাইলকে এর জন্য প্রচুর খেসারত দিতে হয়েছে। প্রতিটি ইঞ্চি এলাকা দখল করতে তারা প্রচণ্ড ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। শুধু তাই নয় বর্তমান অবস্থানেও তারা প্রচুর ফিলিস্তিনি আক্রমণের সম্মুখীন। তাই প্রথমত নিশ্চয়তা ছাড়া এ এলাকা ছেড়ে দেবে না বলে ঘোষণা দিলেও ইসরাইল এখন জাতিসংঘের আহ্বানের ছত্রছায়ায় সৈন্যাপসরণে সম্মত হয়েছে।

বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার খবর অনুযায়ী দক্ষিণ লেবাননের পূর্বতন প্রাপ্ত আবকূপের ১২ কি.মি. প্রশস্ত অঞ্চলের ৭টি অবস্থান হতে ইসরাইলি বাহিনী সরে গিয়েছে (১১.৪.'৭৮)। জাতিসংঘ বাহিনীর নরওয়ের ইউনিট আরকূপে অবস্থান গ্রহণ করেছে। মধ্যাঞ্চল হতেও তারা সরে যাবে বলে খবরে প্রকাশ। আশা করা যাচ্ছে যে, অতি শিগগিরই ইসরাইলি বাহিনী সমগ্র দক্ষিণ লেবানন ত্যাগ করবে।

এদিকে লেবাননে নতুন করে দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। বৈরুতে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের খণ্ড যুদ্ধ মোকাবিলার জন্য আরব শান্তিরক্ষী বাহিনী রাজপথে ট্যাংক ব্যবহার করে। দাঙ্গায় মাত্র ৪ দিনে ১৭ ব্যক্তি প্রাণ হারায়। দক্ষিণ-পূর্ব

www.pathagar.com

বৈরুতে সংঘর্ষে লিপ্ত দু'সম্প্রদায়ের অবস্থানের মাঝামাঝি স্থানে আরব বাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। বিবিসি জানায় দাঙ্গা উপদ্রুত কয়েকটি এলাকার ঘরবাড়িতে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। সংঘর্ষ অবসানের জন্য উভয়পক্ষের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করার তাগিদ দিয়েছিল। যুদ্ধবিরতি না হলে সহসাই পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

লেবাননে বড় রকমের একটি যুদ্ধ বাধবার সবকয়টি লক্ষণই নানাভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সম্প্রতি রাজধানী বৈরুত হতে দলে দলে লোক অপসারণের কাজ শুরু হয়। বৈরুতে স্থায়ী বসবাসকারী বহু আরব ও খ্রিস্টান শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। কূটনৈতিক মিশন হতেও লোক অপসারণ শুরু হয়। বৈরুত থেকে ইতোমধ্যেই সিরিয়া ও সোভিয়েত মিশনের লোকজনদের সরিয়ে নেয়া হয়। অস্ট্রেলিয়া বৈরুতে অবস্থানকারী তাদের সকল নাগরিককে অবিলম্বে লেবানন ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে। সিরিয়ার ভারী গোলন্দাজ বহর এবং অন্যান্য বাহিনী রাজধানী বৈরুতের দিকে অগ্রসর হয়। উত্তর সীমান্তে ইসরাইলি বাহিনীও সতর্ক অবস্থার মধ্যে থাকে।

লেবাননের এহেন পরিস্থিতি খ্রিস্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের নিজস্ব জমি ও অবস্থান দখলের সংঘাত বললে অবশ্যই ভুল হবে। বিষয়টির বহিরাঙ্গে এরকম একটি ছাপ দেয়া হয়েছে বটে, তবে এটি এখন আর গোপন নাই যে, লেবাননের খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে সীমান্তের পরপার হতে অস্ত্র ও পরামর্শ জোগাচ্ছে আরব স্বার্থের চরম শত্রু ইসরাইল। লেবাননের গৃহযুদ্ধও তাই আসলে সার্বিক মধ্যপ্রাচ্য সমস্যারই একটি প্রতিফলন। মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা থেকে একে কোন প্রকারেই ভিন্ন করে দেখা যায় না।

লেবাননের প্রেসিডেন্ট ইলিয়াস সার্কিজ ও সিরিয়ার হাফিজ আল আসাদের বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে লেবাননে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়। শিগগিরই আরব শান্তি বাহিনী হিসাবে সিরীয় সৈন্যদের স্থলে সৌদি ও ইরানি সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে।

আফগানিস্তান

বিগত ২৭শে এপ্রিল ১৯৭৮ আফগানিস্তানে সেনাবাহিনীর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। নাদির শাহের সর্বশেষ বংশধর প্রেসিডেন্ট

www.pathagar.com

দাউদের পতন হয় এবং সামরিক বাহিনীর সহায়তায় ক্ষমতায় বসেন নূর মোহাম্মদ তারাকী। দাউদ ১৯৭৩ সালের ১৭ জুলাই সেনা অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে তাঁর ভাই এবং ভগ্নিপতি বাদশাহ জহির শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। আফগানিস্তানকে রাজতন্ত্রের বদলে প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করেন। ক্ষমতায় আগমনের পর থেকে গত বছর পর্যন্ত তিনি ঘোষণার মাধ্যমেই আফগানিস্তানের শাসন পরিচালনা করেন। গত বছর তিনি আফগানিস্তানকে প্রথম প্রজাতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ঘোষণা করে সংবিধান চালু করেন।

প্রেসিডেন্ট দাউদের ক্ষমতারোহণ এবং ক্ষমতাচ্যুতির প্রক্রিয়া এক হলেও ঘটনা হয়েছে ভিন্নতর। দাউদ ক্ষমতায় এসেছিলেন বাদশাহ জহির শাহকে সরিয়ে এবং তাই ঐ অভ্যুত্থান ছিল রক্তপাতহীন, কিন্তু তাঁর প্রস্থান হয় রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে, যাতে তিনি স্বয়ং নিহত হন। কাবুলের রাস্তায় হাজার হাজার লোক নিহত হয়। মৃত্যু পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আত্মসমর্পণ করেননি।

১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে বাদশাহ জহির শাহকে উৎখাতের সময় দাউদ বলেছিলেন আধুনিক জগতে রাজতন্ত্র চলতে পারে না। জহির শাহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসাবে দীর্ঘ ১০ বছর (১৯৫৩-১৯৬৩) তিনি জহির শাহের অধীনে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেও তিনি প্রকাশ্যে রাজতন্ত্রের সমালোচনা করেন। এ কারণে প্রধানমন্ত্রীর পদ হতে তিনি পদচ্যুত হন। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থাতেই সেনাবাহিনীর সোভিয়েত-ঘেঁষা জেনারেলদের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। ১৯৭৩ সালে এদের সাহায্যেই তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করেন।

১৯৭৭ সালে প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান ঘোষণার মাধ্যমে দাউদও প্রেসিডেন্ট হিসাবে বৈধ ক্ষমতাবান পুরুষে আবির্ভূত হন। অতঃপর ১৯৭৮ সালের অভ্যুত্থানের সহযোগী সামরিক অফিসারদের সাথে তার মতান্তর শুরু হয়। এসব সামরিক অফিসার আরও অধিক সোভিয়েত-ঘেঁষা নীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী। অন্যদিকে দাউদ চাইতেন সবার নিকট হতে সমদূরত্বে অবস্থান করতে। নতুন ক্ষমতাবান বিপ্লবী কাউন্সিল ইতিমধ্যে নিজেদেরকে নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করে। তারা বিশ্বের সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষপাতী। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইসলাম, গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও দেশের অগ্রগতি হবে মৌলনীতি।

www.pathagar.com

দক্ষিণ ইয়েমেন : অক্টোবর ১৯৭৮

দক্ষিণ ইয়েমেনে সোভিয়েত, কিউবান এবং পূর্ব জার্মানির সৈন্য বাহিনীর উপস্থিতির জন্য আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। ইতিপূর্বে দক্ষিণ ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট রুবাইয়া আলী মস্কোপন্থী এক অভ্যুত্থানে আটক হন এবং দু'দিন পর তাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যা করা হয়। রুবাইয়া আলীকে উৎখাতের মধ্য দিয়ে এখন দক্ষিণ ইয়েমেনে ক্ষমতায় বসেন আলী নাসের। আলী নাসের মস্কোপন্থী। তাকে সাহায্য করেন মস্কোপন্থী কমিউনিটি নেতা ইসমাইল। নিহত প্রেসিডেন্ট রুবাইয়া আলী সাম্প্রতিক দিনগুলোতে কিছুটা নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট আলী নাসেরের সাহায্যে সোভিয়েত মহল বেশ তৎপর। দক্ষিণ ইয়েমেনের রাজধানী এডেন তেল রফতানির প্রধান বন্দর এবং আরব সাগরের প্রবেশপথ।

এই অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের দু'দিন পূর্বে দক্ষিণ ইয়েমেনের প্রেসিডেন্টের একজন বিশেষ দূত একটি ব্রিফকেস হাতে উত্তর ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আহমদ হোসেন আল-ঘাসমির সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। কিন্তু ব্রিফকেসে রক্ষিত বোমা বিস্ফোরণে প্রেসিডেন্ট ঘাসামি এবং দূত উভয়েই মারা যান। ব্রিফকেসের মধ্যে রক্ষিত বোমা সম্পর্কে দূত কিছুই জানতেন না বলে প্রকাশ। এই ষড়যন্ত্রে বিদেশি শক্তির হাতে রয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

ইরান : (১.১০.১৯৭৮)

শাহানশাহ্ রেজা শাহ পাহলভীর প্রশ্রয়ে ইরান সম্প্রতি খোলামেলা রাজনৈতিক বিতর্কের এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। দেশটিতে হয়ত একদলীয় শাসনই বহাল থেকে যাবে, তবে সরকারি দলের মধ্যকার বিভিন্ন উপদল এবং বাইরের ছোট ছোট দলগুলো সরকারকে সমালোচনা করার অধিক স্বাধীনতা পাবে। অবশ্য শাহের সমালোচনা করা যাবে না কিছুতেই।

অভিযোগ ওঠেছে ইরানের সিকিউরিটি ফোর্স এবং পুলিশ সাধারণ মানুষের ওপর কারণে-অকারণে অতি নির্দয় অত্যাচার ও নিপীড়ন চালায়। আইন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিত্তশালীদের স্বার্থে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। ইরানের রাজকীয় সরকার শিক্ষার নামে দেশে ও সমাজে পাশ্চাত্যের উগ্র আধুনিকতা আমদানি করেছে। মেয়েরা পর্দার বাইরে অনেকদূর চলে এসেছে। নগ্ননৃত্য দেহ প্রদর্শনী অনাচার ও ব্যভিচারে সারাদেশ আচ্ছন্ন। ইরানের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামের

www.pathagar.com

শিক্ষা ও আইনের বিশেষ কোন প্রতিফলন নেই, যদিও দেশের শতকরা ৯৮ জন লোক মুসলমান। ইরান তেলসমৃদ্ধ দেশ এবং তেলের সূত্রে প্রচুর অর্থের মালিক হওয়া সত্ত্বেও গত এক যুগের মধ্যে সাধারণ মানুষের অবস্থা ওপরের দিকে উঠল না। ইরানের মাথাপিছু আয় আড়াই হাজার ডলারের মত হলেও সাধারণ মানুষের একটি অংশ আজও প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলে মানবেতর জীবন যাপন করে।

কিছুদিন পূর্বে তেহরানের ৭৫ মাইল দূরবর্তী কোন শহরে শাহের বিরুদ্ধবাদী ওলামাগণ এক বিশাল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এই বিক্ষোভ মিছিল বন্যার মত করালগ্রাসী এবং সমুদ্র গর্জনের ন্যায় ভয়াবহ। শাহের সিকিউরিটি ফোর্স এ মিছিলের ওপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। মার্কিন সাময়িকী নিউজ উইকের সংবাদদাতা স্মিট গেথেন লেখেন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা স্তব্ধ হলেও কোয়েট বড় মসজিদে নামাজ পড়ার কার্পেটে রক্তের দাগ মুছে যায়নি। কোন মসজিদের ইমাম ৮১ বছরের বৃদ্ধ আয়াত উল্লাহ শরিয়ত মাদানী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, আমাদের দাবিদাওয়া যদি মেনে নেয়া না হয় তবে আমার যারা অনুসারী তাদেরকে শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তোলার আদেশ দিতেই হবে। আয়াত উল্লাহর দাবি; সংবিধান যে কোন ব্যক্তি, এমনকি শাহেরও উপরে। কেউ তার সুবিধামত কিছুটা সংবিধান, কিছুটা ব্যক্তিগত অভিরুচি ও খেয়ালখুশি অনুসরণ করবে তা হতে পারে না। দেশ চালাতে হবে শুধু সংবিধানেরই নির্দেশে।

শুধু কোন শহরে নয়, এ দাবি ইরানের আরও ৫০টি শহরেও ওঠে। একে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হয়ে গেছে। পাঁচ মাসব্যাপী এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সরকারি হিসাবেই মৃতের সংখ্যা ৪০ জন।

এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিক্ষোভকে কেন্দ্র করেই ইরানে রাজনীতির নতুন মোড় পরিবর্তন। গত জুন মাসে (১৯৭৮) পার্লামেন্টের সাতজন ডেপুটি একটি সরকারি বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেন। এমন ঘটনা এই প্রথম। শাহ্ এবং সাধারণভাবে মনে করেন, তিন বছর পূর্বে চালু করা একদলীয় ব্যবস্থায় এখন আর কাজ হচ্ছে না। তাই কিছু রদবদল আবশ্যক। সরকার স্পষ্ট বলেছে, আইন বদলাতে না হয় এমন গঠনমূলক সমালোচনা আদৃত হবে। রাজতন্ত্রের ভূমিকার ওপর অবাধ বিতর্ক চালাতে পারে—এমনটি কেউ আশা করে না, তবে রাজনৈতিক দলগুলো বিরোধী দল হিসাবে জনমত তুলে ধরার সুযোগ পাবে।

সরকারি বক্তব্যে এটি মনে করা হয় যে, অধিকাংশ রাজনৈতিক তৎপরতা রাস্তমিজ দলের কাঠামোর মধ্যেই চলতে থাকবে। তবে গ্রুপগুলো চাইলে তাদের

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দল হিসাবে কাজ করতে দেয়া হবে। এতকাল রাবার স্ট্যাম্পরূপে গণ্য পার্লামেন্ট এবং রাস্তমিজ জনমতের ব্যাপকতর প্রতিধ্বনি করুক শাহ্ এখন তাই চান। এরই আলোকে প্রধানমন্ত্রী ও রাস্তমিজ সেক্রেটারি জেনারেল জমশেন আমুজগাবসহ দলীয় নেতারা দলের প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলের জন্য একটি নতুন ভূমিকা অনুমোদন করেছেন। তাদেরকে সরকারের ব্যর্থতার সমালোচনা করবার এবং নিজেদের অফিস ও প্রাদেশিক শাখা খুলবার অধিকারও দেয়া হয়েছে।

কিছু সদস্য নতুন দল গঠন করার উদ্দেশ্যে রাস্তমিজ ছেড়েছেন। পার্লামেন্টে ডানপন্থী উপদলের নেতা মোহসিন পিজেশপুর বলেন, তিনি তাঁর ৩৭ বছর আগের দলটি পুনরুজ্জীবিত করবেন। পার্লামেন্টের ভেতর ও বাইরের আরো দুটো উপদলও রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা নেয়। একটি দল হবে পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দলগুলোর আদর্শে আর অপরটির লক্ষ্য আমূল সংস্কার। অবশ্য আগামী জুনের পার্লামেন্টের নির্বাচনের পূর্বে ইরানে বহুদলীয় ব্যবস্থা চালু হবে কিনা তা বলার সময় এখনও আসেনি। বহুদলীয় পদ্ধতির সম্ভাবনা নিয়ে এখন বিতর্ক চলছে। একমাত্র নিষিদ্ধ দল কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অপর বিরোধী উপদলগুলো পূর্ণাঙ্গ দলের মতোই কাজ করে যাচ্ছে। কমিউনিস্টদের হয়তো শুধু গ্রুপেই থেকে যেতে হবে। অন্যথায় রাস্তমিজের মধ্যে থেকে কাজ করতে হবে।

তথ্যমন্ত্রী দারিয়ুস হুমাউন গত সপ্তাহে সাংবাদিকদের জানান, একদলীয় ব্যবস্থার ছায়াতলে আমরা বিভিন্ন গ্রুপ ও শাখাকে অধিকতর সুযোগ দিতে চলেছি।

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি (Camp David Treaty)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিশ্রামাগার বা রেস্ট হাউসের নাম ক্যাম্প ডেভিড। এটি ওয়াশিংটন থেকে হেলিকপ্টারযোগে ৩৫ মিনিট দূরত্বে অবস্থিত। এই রেস্ট হাউসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কার্টারের মধ্যস্থতায় মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠক সম্প্রতি সমাপ্ত হয়। ইসরাইল জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর হতে সৈন্য প্রত্যাহার তথায় ইসরাইল জর্ডান ও ফিলিস্তিনিদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসন গঠন এবং তিন মাসের মধ্যে সিনাই প্রশ্নে মিসরের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদনে সম্মত হয়। বিগত ১৭ সেপ্টেম্বর (১৯৭৮)

www.pathagar.com

তারিখে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট সাদাত ও প্রধানমন্ত্রী বেগিন দলিল দুটোতে স্বাক্ষর দান করেন। চৌদ্দ দিনে দারুণ আশা ও হতাশার মধ্যে অব্যাহত আলোচনা শেষে সম্পাদিত দলিল দুটো ছিল 'মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাঠামো' এবং মধ্যপ্রাচ্যে মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের রূপরেখা। দলিল মোতাবেক জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে ইসরাইল, জর্ডান ফিলিস্তিনিদের যৌথ সার্বভৌমত্বের ব্যবস্থা করবে, তবে স্বায়ত্তশাসনের পাঁচ বছরের এই অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদে সেখানে বিশেষ কয়েকটি স্থানে সামান্য কিছু চুক্তি সম্পাদনের পর তিন থেকে নয় মাসের মধ্যে ইসরাইল মিসরের সিনাই হতে অধিকাংশ সৈন্য সরিয়ে নেবে। অতঃপর দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং দু'দেশের মধ্যে 'যুদ্ধ নয় শান্তি'র আস্থা ঘোষণা করা হবে। এর দু থেকে তিন বছরের মধ্যে ইসরাইল সিনাই হতে সর্বশেষ সৈন্য সরিয়ে নেবে।

সম্পাদিত নীল-নকশার ব্যাপারে মধ্যপ্রাচ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইসরাইলের জনগণ একে স্বাগত জানালেও কায়রো ও সৌদি বেতার বিনা মন্তব্যে এ খবর পরিবেশন করে। কায়রোর পথচারীদের একাংশকে উল্লসিত দেখা যায়, আবার পি.এল.ও এবং সিরিয়া এটি প্রত্যাখ্যান করে। পি.এল.ও মুখপত্র ঘোষণা করেন পি.এল.ও.কে ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি অসম্ভব। ক্যাম্প ডেভিড সমঝোতা দলিলে পি.এল.ও-র নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি। সমঝোতাকে পি.এল.ও. নিছক দ্বিপক্ষীয় ব্যাপার এবং অধিকৃত অঞ্চলে ইসরাইলের দখলদারি আরও পাঁচ বছর মেনে নেয়ার পরাজয় বলে উল্লেখ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সমঝোতাকে সাদাতের আত্মসমর্পণ বলে উল্লেখ করে। ইসরাইল সত্যিকারভাবে সৈন্য অপসারণ করবে কিনা সে ব্যাপারে মস্কো সন্দিগ্ধ। জর্দানের মতে, এ সমঝোতা শান্তির দ্বার উন্মোচিত করলেও আরবদের অনৈক্য আরও ঘনীভূত করবে। জেরুজালেম ও জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে আরব শহরগুলোর পৌর নেতৃবৃন্দ ক্যাম্প ডেভিড সমঝোতা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন। ফিলিস্তিনিদের অধিকারের এড়িয়ে যাওয়া পি.এল.ও.র প্রতি উপেক্ষা এবং স্বাধীনতার পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসনের টোপও পূর্ণ ইসরাইলি প্রত্যাহারের ব্যবস্থা না থাকায় সমঝোতাটি মিসর ইসরাইল রফায় পর্যবসিত হয়েছে বলে আরব পৌঢ় নেতৃবৃন্দ মনে করেন। অপরদিকে দামেস্ক সম্মেলনে যোগদানকারী সাদাতবিরোধী আরব দেশগুলো মিসরের সাথে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও কূটনীতির সম্পর্ক ছিন্ন করে। আলজিরিয়া লিবিয়া, সিরিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন ও

www.pathagar.com

পি.এল.ও.কে নিয়ে গঠিত বিরোধী আরব ফ্রন্ট ক্যাম্প ডেভিড শীর্ষ বৈঠকের ফলাফল নস্যাৎ করার সংকল্প ঘোষণা করে। এ জোটের ইশতেহারে আরব লীগের সদর দফতর কায়রো হতে অন্যকোন আরব দেশে স্থানান্তরের দাবি জানায়।

এদিকে ষোলটি আরব দেশ বাগদাদ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে সম্মতি প্রকাশ করে। এই বাগদাদ সম্মেলনের উদ্যোক্তা ইরাক। সিরিয়াসহ ইরাক, আলজিরিয়া, লিবিয়া ও দক্ষিণ ইয়েমেন আরব জাহানে রুশপন্থী হিসাবে খ্যাত। এই চারটি রাষ্ট্রই প্রধানত প্রেসিডেন্ট সাদাতের সরাসরি আলোচনার বিরোধী। অবশ্য খোদ ফিলিস্তিন মুক্তি সংক্রান্ত ক্যাম্প ডেভিড আলোচনার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করে। এদিকে সৌদি আরব এবং জর্দানও এবারের ক্যাম্প ডেভিডের আলোচনায় তেমন সন্তুষ্ট নয়। ইরাকের আহ্বানে বাগদাদে অনুষ্ঠিতব্য শীর্ষ বৈঠকে উপরোক্ত রুশপন্থী রাষ্ট্র কয়টি বাদেও যে ডজনখানেক রাষ্ট্র যোগ দিতে যাচ্ছে তাতে অনুমান করা চলে যে, যেসব মধ্যপন্থী আরব রাষ্ট্র এতকাল যাবৎ মার্কিন উদ্যোগে মিসর-ইসরাইল আলোচনায় কিছু একটা সফল প্রত্যাশা করছিল তারা হতাশ। সুতরাং বৈঠকে তাদের যোগদান যতটা না মিসর বা মার্কিন বিরোধিতা তার চাইতে অধিক এই হতাশার বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়া এ বৈঠকে তাদের যোগদানের অর্থ এটিও নয় যে মধ্যপন্থী এসব রাষ্ট্র রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তবে জর্ডান কিংবা সৌদি আরবের এবারের মনোভাবকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করবে। এমনিতেই সাদাতের মুখ রক্ষা করতে কার্টার প্রশাসন যথেষ্ট দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করে, কিন্তু তবুও যে পর্যায়ে এসে ক্যাম্প ডেভিডের ফলাফল স্তিমিত হচ্ছে এবং সাদাতের অবস্থা নাজুক ও তার বিরোধিতা জোরদার হচ্ছে সে পর্যায়টি গোটা মধ্যপ্রাচ্যের জন্য একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণ। এতে স্পষ্ট হয়ে গেছে, আরব জাহানের সমস্যা সমাধানের বিষয়টি এখন শুধু আমেরিকার ওপরই নির্ভরশীল নয় বরং আমেরিকা, মিসর, ইসরাইল, রাশিয়া, ফিলিস্তিনি সংস্থা, রুশ সামরিক গ্রুপ এবং মধ্যপন্থী আরব রাষ্ট্রবর্গ সবারই সম্মিলিত প্রয়াস যে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানের জন্য জরুরি তাই আরেকবার প্রমাণিত হয়ে গেল। তবে প্রত্যেকের প্রেক্ষাপট ভিন্ন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মিলের চাইতে গরমিল বেশি।

---

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
লেবানন

১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে সংঘটিত লেবাননের গৃহযুদ্ধ শান্ত হবার পর লেবাননে কিছুদিনের জন্য শান্তি বিরাজ করে। কিন্তু যতটুকু শান্তি লেবাননে এসেছিল, ১৯৮২ সালের জুন মাসে ইসরাইল কর্তৃক লেবাননে হামলা পরিচালনায় সমস্ত শান্তি বিনষ্ট হয়। ইসরাইলিগণ প্রকাশ্যে ফালান্দিদের পক্ষাবলম্বন করে এবং ফালান্দি অধ্যুষিত লেবানন বাহিনীর নেতা বশীর জামায়েল লেবাননের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ইহুদিরা তাঁকে অভিনন্দিত করে অভিষেক অনুষ্ঠানের নয়দিন পূর্বে বশীর জামায়েল নিহত হলে তাঁর ভ্রাতা আমিন জামায়েল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। লেবাননে ৩৮,০০০ হানাদার বাহিনীর উপস্থিতিতে ইসরাইল তথায় একটি শান্তিচুক্তি চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু লেবানন তা প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে দু'দেশ বিগত মে মাসে (১৯৮৩) যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষত দূত ফিলিপ হাবিবের মধ্যস্থতায় একটি সমঝোতায় উপনীত হয়। চুক্তি অনুসারে ইসরাইল-লেবানন সীমান্তে মালপত্র, উৎপন্নদ্রব্য ও লোকজন পারাপারের ব্যাপারে ভবিষ্যৎ আলোচনা চালাতে লেবানন সম্মত হয়। পরবর্তীকালে ইহুদিরা বেঁকে বসে এই শর্তে যে, পিএলও সিরীয়দেরকে একই সঙ্গে লেবানন হতে সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে। সমগ্র বেকা উপত্যকা এবং উভয় লেবাননের অধিকাংশ এলাকা সিরীয়দের দখলে ছিল। সিরীয়গণ সৈন্য প্রত্যাহারে অস্বীকৃতি জানালে ইহুদিরাও অস্বীকৃতি জানায়।

ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিন অভিযোগ করেন, যুদ্ধ বিরতি অনুযায়ী পি.এল.ও. যোদ্ধাগণ বৈরুত ত্যাগ করলেও আরও প্রায় ২,০০০ পি.এল.ও. যোদ্ধা বৈরুতে রয়েছে। কিন্তু ইহুদিরাও হাবিব চুক্তি লংঘন করে। চুক্তি ছিল পি.এল.ও. যোদ্ধাগণ বৈরুত ত্যাগ করলেও তাদের পরিবারবর্গ বৈরুতে অবস্থান করবে এবং ইহুদি বাহিনী তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে। কিন্তু তৎপরিবর্তে তারা ৮০,০০০ ফিলিস্তিনি পরিবারবর্গকে শাতিলা ও সারক নামক উদ্বাস্তু শিবিরে রুদ্ধ করে শিবিরদ্বয় খ্রিস্টান মিলিশিয়াদের নিকট হস্তান্তর

www.pathagar.com

করে। শুধু তাই নয়, রাতের অন্ধকারে তারা আলো জ্বালিয়ে খ্রিস্টানদেরকে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যেতে সংকেত দেয় (News wach 27 sept '83)। অতঃপর রাতের অন্ধকারে খ্রিস্টানরা ঐ শিবিরদ্বয়ের হাজার হাজার নিরস্ত্র অসহায় ফিলিস্তিনিদেরকে নির্বিকারে গুলি করে হত্যা করে। শিবিরের বাইরে তখন ট্যাংকে অবস্থানরত ইহুদিরা পৈশাচিক আনন্দে উন্মত্ত। অতঃপর স্বদেশিও বিদেশিকে ধিক্কার ও ঘৃণার মুখে ইহুদি বাহিনী বৈরুত ও সাউফ পর্বতমালা হতে দক্ষিণে আরও সুদৃঢ় অবস্থানে সৈন্য প্রত্যাহার করে। ইহুদিদের লেবাননি বাহিনী ঐ এলাকার নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে।

ইসরাইলিগণ কিছুটা দক্ষিণে সরে গেলেও লেবাননে আওয়ালী নদী বরাবর তাদের অবস্থান ঠিকই রাখে। অপরদিকে ইসরাইলি অবস্থানের মুখে পি.এল.ও. বৈরুত ছেড়ে গেলেও তারা আবার ফিরে আসতে আরম্ভ করে। এই পটভূমিতে পুনরায় (September '83) শিয়া দ্রুজ ও খ্রিস্টান ফালান্দিদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। তবে উভয় দলের কেউ ঠিকমত বলতে পারে না কখন সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। উভয়েই অপর পক্ষকে প্রথম আঘাত হানবার জন্য দায়ী করে। প্রাথমিক সংঘর্ষ আরম্ভ হয় জিম্মি আটকের মধ্য দিয়ে এবং শীঘ্রই সুক-আল-খাবর ও আয়তাত গ্রামদ্বয় পরিপূর্ণ যুদ্ধ ক্ষেত্রের রূপ নেয়। এমতাবস্থায় বৈরুত হতে ইসরাইলি সৈন্য প্রত্যাহারের কাজ তদারকির জন্য আগত মার্কিন, ফরাসি, ইতালিয়ান ও ব্রিটিশ সৈন্যগণ এক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। কারণ লেবাননের গৃহযুদ্ধে তাদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ নেই, কিন্তু যুদ্ধের গোলাগুলি হতে তারা নিরাপদ নয়। সংঘাতের এক পর্যায়ে দ্রুজদেরকে নিরস্ত্র করার জন্য মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ হতে দ্রুজ অবস্থানসমূহের ওপর গোলা নিক্ষেপ করা হয়। এদিকে সাউফে এবং আরও পূর্বে সুক-আল খাবরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দ্রুজ ও লেবাননি সেনাবাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলতে থাকে। অতঃপর মার্কিন দূত ম্যাকফারলেন ও সৌদি বিশেষদূত যুবরাজ বন্দর বিন সুলতানের মধ্যস্থতায় একটি যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয়। নয়া চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধ বিরতি তদারক করার জন্য লেবাননি সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি, খ্রিস্টান মিলিশিয়ার প্রতিনিধি, দ্রুজ নেতা ওয়ালিক জুমলাত, সাবেক প্রধানমন্ত্রী রশিদ কারামী ও সাবেক প্রেসিডেন্ট সুলেমান ফ্রানজিকে নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হবে এবং কমিটিতে বিদেশি পর্যবেক্ষকগণও থাকবেন। পরবর্তী পর্যায়ে লেবাননে ক্ষমতার এবং সকল বিদেশি সৈন্য প্রত্যাহার প্রশ্নও আলোচিত হবে বলে ঠিক করা হয়।

www.pathagar.com

এমনি এক সময়ে লেবাননে অবস্থানরত মার্কিন ও ফরাসি সৈন্যদের বসবাসস্থলে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রায় ২০০ মার্কিন ও ফরাসি সৈন্যকে হত্যা করা হয় (২৩শে অক্টোবর '৮৩)। শান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত মার্কিন নৌসেনা ও ফরাসি ছত্রীসেনারা বৈরুত বিমান বন্দরের নিকটবর্তী তাদের ভবনে ঘুমিয়ে ছিল। তখন কমান্ডোদের আত্মঘাতী স্কোয়াডের বিস্ফোরক ভর্তি দুটো ট্রাক নিরাপত্তা ব্যূহ ভেঙে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়। ফলে ভবন দুটো সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় এবং প্রায় ২০০ মার্কিন ও ফরাসি সৈন্য প্রাণ হারায়। ভিয়েতনাম যুদ্ধাবসানের পর এমন বিপুল সংখ্যক মার্কিন সৈন্য আর কোথাও নিহত হয়নি। বৈরুতে মার্কিন ঘাঁটির ওপর আক্রমণ এটিই প্রথম নয়। ইতিমধ্যে দ্রুজদের রকেট হামলায় ছয় জন মার্কিন নৌসেনা নিহত হয়। আরেকবার মার্কিন দূতাবাসে হামলায় একজন নিহত হয়।

এই বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করবে আন্তর্জাতিক ঝড় ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে পরিণতিতে লেবানন নামের দেশটির কোন অস্তিত্ব থাকবে কি? তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে পি.এল.ও.র বক্তব্য ভাল্লুকের আস্তানায় ঢুকলে কিছু আঁচড় খেতেই হবে। পর্যবেক্ষকদের ধারণা, লেবাননে মার্কিন ও অন্যান্য পশ্চিমা শক্তির সশস্ত্র উপস্থিতির প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রথমত প্রেসিডেন্ট জামায়েল সরকার ও সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা দ্বিতীয়তঃ সিরীয় ও ফিলিস্তিনিদের প্রভাব প্রতিরোধ এবং তৃতীয়ত ইহুদিদেরকে এ মর্মে আশ্বস্ত করা যে, লেবাননে তাদের স্বার্থ পরোক্ষভাবে হলেও রক্ষা করা হবে। অতএব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লেবাননে বিদ্যমান সংঘর্ষের এবং বিদেশি সৈন্য অবস্থিতির একটি কূটনৈতিক সমাধানের খোঁজ করে (Time, September '83) কমান্ডো হামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে পশ্চিমা শক্তির সশস্ত্র উপস্থিতির বিলোপ সাধন এবং বিদ্যমান দলগুলোর নিজেদের বাহুবলে ক্ষমতা দখল করে রাখার প্রবণতা হতে এই বিস্ফোরণের সূত্রপাত। আবার কারো মতে মার্কিন ও ফরাসি বাহিনীকে সমুদ্রে অবস্থানের দিকে ঠেলে দেবার জন্য এ বিস্ফোরণ।

যাহোক রাশিয়া কর্তৃক দক্ষিণ কোরীয় বিমান ধ্বংসের ঘটনা, মিয়ানমারে (বার্মায়) বোমা বিস্ফোরণে দক্ষিণ কোরীয় মন্ত্রীদের মৃত্যু এবং বৈরুতে পশ্চিমা সৈন্যদের ওপর কমান্ডো আক্রমণ এই তিন ঘটনাকে এক সূত্রে গেঁথে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদেশগুলো আরও শক্ত নীতি গ্রহণের পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করতে পারে। লেবানন থেকে পশ্চিমা শক্তিবর্গের পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে জামায়েল সরকারের পতন ঘটবে এবং সিরিয়ার আধিপত্য বৃদ্ধি পাবে। পরিণামে অত্র

www.pathagar.com

অঞ্চলে সোভিয়েত প্রভাব অবিসংবাদিত হবে, যা যুক্তরাষ্ট্র কখনও হজম করতে পারে না। লেবাননের গৃহবিবাদ সম্পর্কে সুক-আল-খাবরের একজন পাদ্রি ফাদার পলিকার্পোর বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "এ যুদ্ধে অন্তরে ঘৃণার সৃষ্টি করেছে। এ সবের উর্ধ্বে ওঠা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এই আত্মকলহ অতি পুরাতন, কিন্তু আমরা এক সময় শান্তিতে বসবাস করেছি। প্রতি ২০ বছর বা অনুরূপ সময় পরপর এরূপ ঘৃণার উদ্রেক হয়। তখন যুদ্ধ হয় এবং পুনরায় ঘৃণা প্রদর্শিত হয়। পূর্বের ন্যায় এই যুদ্ধও একদিন থেমে যাবে। (Time, September 1983)।

লেবাননে বিবদমান দলসমূহের খতিয়ান

১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ এক জরিপ চালায়। এতে দেখা যায় লেবাননে রয়েছে তিনটি সেনাবাহিনী, ২২টি আধা-সামরিক (মিলিশিয়া) বাহিনী এবং ৪০টির অধিক রাজনৈতিক দল। এদের প্রত্যেকটিই গোষ্ঠীগত ও ধর্মীয় সূত্রে আবদ্ধ। বর্তমানে এই বিধ্বস্ত দেশে ক্ষমতা আকাঙ্ক্ষীদের তালিকা করা দুরূহ ব্যাপার। তবে প্রধান প্রধান গ্রুপ নিম্নরূপ :

মেরোনাইট খ্রিস্টান : ১৯৩২ সালে পরিচালিত আদমশুমারি অনুযায়ী খ্রিস্টানগণ লেবাননে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে এ শুমারি অচল, কারণ মুসলমানদের জন্মহার অধিক বিধায় খ্রিস্টানগণ অনেক পূর্বেই সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বীকার করা হয় না বলেই লেবাননে বারবার গৃহবিবাদ বাধে, যা হোক, সেই পুরাতন শুমারি অনুযায়ী মেরোনাইট খ্রিস্টানগণ পার্লামেন্ট ও সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। প্রেসিডেন্ট আমিন জামায়েল একজন মেরোনাইট এবং সেনাবাহিনী প্রধান ইব্রাহিম তানাউসও একজন মেরোনাইট। জামায়েল সরকারের বিরোধীরা ২৪,০০০ সংখ্যাবিশিষ্ট লেবাননী সেনাবাহিনীকে মেরোনইট খ্রিস্টানদের স্বার্থসংরক্ষণকারী হিসাবে আখ্যায়িত করে। তদুপরি এই বাহিনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হতে ট্রেনিং ও অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে।

ফ্যালাঙ্কিগণ : এটি একটি ডানপন্থী রাজনৈতিক দল, যার মূলে রয়েছে মেরোনাইট সম্প্রদায়। ১৯৩০ সালের দিকে আমিন জামায়েলের পিতা এই ফ্যালাঙ্কিদল গঠন করেন। ফ্যালাঙ্কিদল সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল একটি মিলিশিয়া বাহিনীর অধিকারী, যাদেরকে লেবাননি বাহিনী বলা হয়। এদের নিকট ১০,০০০ নিয়মিত সৈন্য ও ১৫,০০০ রিজার্ভ সৈন্য রয়েছে বলে দাবি করা হয়।

www.pathagar.com

দ্রুজ : এটি একটি ইসলামী ধর্মীয় সম্প্রদায়–শিয়া উপদল। ২,৫০,০০০ সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্রুজগণ প্রধানত বৈরুতের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত সাউফ পাহাড় ও এ্যানি পর্বতমালায় বাস করে। লেবাননে একদা অতি শক্তিশালী দ্রুজগণ বিগত যুগগুলোতে আরও অধিক সংখ্যার অধিকারী মেরোনাইটদের নিকট প্রভাব হারিয়ে আসছে।

দ্রুজদের রাজনৈতিক দলের নাম প্রগ্রেসিভ সোস্যালিস্ট পার্টি (Progrestive Socialist Party); এবং তাদের মিলিশিয়া বাহিনীতে ৪,০০০ সৈন্য রয়েছে। এদেরকে সিরিয়া অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে থাকে। ওয়ালীক জুম্বলতি তাদের দল ও মিলিশিয়ার অধিনায়ক।

সুন্নি মুসলমানগণ : ইসলামের প্রধান বিশ্বাসী সুন্নিগণ-লেবাননের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ। ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত তাদের মিলিশিয়ার নাম মোবাবেতুন এবং এতে প্রায় ৫,০০০ সৈন্য রয়েছে।

শিয়া মুসলমানগণ : ১০ লক্ষ জনসংখ্যার অধিকারী শিয়াগণকে লেবাননের সর্ববৃহৎ সম্প্রদায় বলে মনে করা হয়। আসল নামীয় মিলিশিয়াগণ তাদের স্বার্থ রক্ষা করে। এরাও সিরিয়া কর্তৃক ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত (Newsweek, September 19.'83)।

শাদ

আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির উত্তর প্রান্তে অবস্থিত একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ শাদ। এর উত্তরে লিবিয়া, পূর্বে সুদান, পশ্চিমে ক্যামেরুন, নাইজার ও নাইজিরিয়া এবং দক্ষিণে সেন্ট্রাল আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র। সুপ্রাচীন সভ্যতার অধিকারী শাদের আয়তন ৪৯৫,৭৫০ বর্গমাইল, আর লোকসংখ্যা মাত্র ৪৫ লক্ষ। শাদে নিওলিথিক সভ্যতার চিহ্ন ও সুপ্রাচীন কৃষি সভ্যতার চিহ্নও বিদ্যমান। আজও কৃষিই মানুষের প্রধান জীবিকা। তাছাড়া পশু চারণকারী মরুচর বেদুঈনও তথায় বিচরণ করে। রাজা আর সর্দারেরা দেশ শাসন করতেন। মধ্যযুগে আরব দাস ব্যবসায়ীরা শাদে এসে হানা দিত।

১৯০০ সালে ফ্রান্স শাদ দখল করে এবং একটি উপনিবেশ গড়ে তোলে। ঔপনিবেশিক যুগে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ কোন সুবিবেচনা ছাড়াই এই শূন্য ও চতুর্দিকে বেষ্টিত দেশটির সৃষ্টি করে। বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে শাদ একটি। জনগণের মাথাপিছু গড় আয় বাৎসরিক ১১০ ডলার। এর সীমান্তে মরুভূমিও রয়েছে উর্বর এলাকাও রয়েছে। উত্তরে রয়েছে বেদুঈন মুসলমান,

www.pathagar.com

দক্ষিণে রয়েছে অসভ্য মানুষ ও খ্রিস্টানগণ এবং রয়েছে অসংখ্য কলহ সৃষ্টিকারী গোত্রসমূহ।

তুরস্ক

চার বছর পর তুরস্কে আবার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হতে চলেছে। সামরিক সরকার প্রধান জেনারেল কেনান এবরান নতুন সরকার গঠনের বিষয় নিয়ে নির্বাচনে বিজয়ী মাদারল্যান্ড পার্টির নেতা তুরগোত ওজালের সাথে ইতোমধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে মতবিনিময় করেছেন। আশা করা যাচ্ছে দিনকয়েকের মধ্যেই তুরস্কে সামরিক শাসনের অবসান ঘটবে এবং নির্বাচনের ফলশ্রুতির ভিতিতে মাদারল্যান্ড পার্টি একটি শক্তিশালী জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনে সফলকাম হবে। জেনারেল কেনান এবরান স্বয়ং এ প্রশ্নে সকল সংশয়ের অবসান ঘটান। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি বলেন, গণতন্ত্রের প্রতি গভীর আস্থা রয়েছে বলেই সামরিক সরকার নির্বাচন দিয়েছে। সুতরাং একই অনুভূতি নিয়ে নির্বাচনের ফলাফলের প্রতিও তারা সম্মান প্রদর্শন করবেন। জেনারেল কেনানের এ অভিমত জনমতের প্রতি সামরিক শাসকদের অকপট আস্থা অবিমিশ্র এবং সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, ধর্মীয় শ্রেণীগত সংঘাতের দরুন ১৯৭৯ সালে তুরস্কের জাতীয় জীবনে যে মারাত্মক সংকট এবং বিভেদের সৃষ্টি হয়েছিল, গণতন্ত্রের শুভ সূচনার ফলে তার স্তিমিত হয়ে আসা প্রভাব পুরোপুরি অতিক্রম করে তুর্কি জাতি রাজনৈতিক ঐক্য ও স্থিতিশীলতার মধ্যে নব উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। চার বছর পূর্বে শ্রেণীগত বৈষম্য এবং ডান বাম সংঘাতকে কেন্দ্র করে সংঘটিত দেশব্যাপী দাঙ্গার পটভূমিতেই বলবৎ হয়েছিল সামরিক শাসন। ক্ষমতা গ্রহণের সময় সামরিক শাসক প্রতিশ্রুতি দেন ১৯৮৪ সালের মধ্যে তারা দেশে সাধারণ নির্বাচন দেবেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন জনপ্রতিনিধিদের কাছে। নির্ধারিত সময় সীমার এক বছর পূর্বেই তারা নির্বাচন দেন আর মসৃণ করে দেন জাতির গণতন্ত্রে উত্তরণের পরিবেশ। নিঃসন্দেহে এই দৃষ্টিভঙ্গি অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, তুরস্কের চারশত আসনবিশিষ্ট জাতীয় পার্লামেন্টের দু'শত বারোটি আসন দখল করে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তুরগোত ওজালের মাদারল্যান্ড পার্টি। মধ্যপন্থী পপুলিস্ট পার্টি এবং ডানপন্থী ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাট পার্টি পায় যথাক্রমে একশত সতেরো ও একাত্তরটি

www.pathagar.com

আসন। তুগ্রু ও সুনাপের ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন সামরিক শাসকগণ। কিন্তু নির্বাচনে তারা অনেক কম ভোট লাভ করে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোটারদের রায়ই চূড়ান্ত।

আফগানিস্তান

আফগান কমিউনিস্ট পার্টির খালক গ্রুপের নেতা নূর মোহাম্মদ তারাকী ১৯৭৮ সালের ২৭শে এপ্রিল এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট দাউদ খানকে হত্যা করে আফগানিস্তানের ক্ষমতায় বসেন। কাবুলের রাস্তায় হাজার হাজার লোক নিহত হয়।

আফগানিস্তানের পিপলস ডেমোক্র্যাটিক লীগের দুটো গ্রুপ 'খালক' ও 'পারচাম' নামে পরিচিত। এ দুটো বিবদমান কমিউনিস্ট পার্টি পিপলস ডেমোক্র্যাটিক লীগের আওতায় একীভূত হয়। 'পারচাম'কে প্রধানত রুশপন্থী হিসাবে অভিহিত করা হয়, অপরদিকে 'খালক'-এর নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদী শিক্ষিত আফগানগণ পারচামকে ঠাট্টা করে রাজকীয় কমিউনিস্ট পার্টি বলে সম্বোধন করেন। অপরদিকে পারচাম নেতৃবৃন্দ 'খালক'কে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি.আই.এর এজেন্ট বলে আখ্যায়িত করেন। খালক নেতা হাফিজ উল্লাহ্ আমিনকে তারা সি.আই.এর এজেন্ট মনে করেন। নূর মোহাম্মদ তারাকী সম্পর্কেও তাদের একই ধারণা। তারা ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য বারবাক কারমালোর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

অচিরেই উপজাতীয় লোকজন তারাকীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে সোভিয়েত জঙ্গি বিমান হতে তাদের ওপর নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করা হয়। পাকিস্তানে আগত আফগান উদ্বাস্তু শিবিরের ওপরও বোমা বর্ষিত হয়। অতঃপর ১৯৭৮ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর অপর এক সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা হাফিজ উল্লাহ আমিন ক্ষমতায় আসেন এবং তারাকী সংঘর্ষে আহত হয়ে মারা যান। কিন্তু আমিনের কার্যকলাপে সোভিয়েত রাশিয়া অসন্তুষ্ট হয়। ১৯৭৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর অপর এক অভ্যুত্থানে হাফিজ উল্লাহ্ ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন এবং বারবাক কারমাল আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আরোহণ করেন। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য রাশিয়া এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করে। সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষত মুসলিম বিশ্ব হতে রাশিয়ার এই কার্যকলাপের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (O.I.C) আফগানিস্তান হতে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানায়। আন্তর্জাতিক জুরি কমিশন একে সোভিয়েত কর্তৃক

www.pathagar.com

জাতিসংঘ সনদ লংঘন বলে মত প্রকাশ করে। কিন্তু অপরদিকে সোভিয়েত রাশিয়া অভিযোগ করে যে, হাজার হাজার বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র বিদ্রোহী আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছে। তাই কারমাল সরকারের অনুরোধে বাধ্য হয়ে রাশিয়া সীমিত সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেছে। তাদের মতে ১৯৭৮ সালে বিপ্লবের পর আফগানিস্তানে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। জনগণ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে আরম্ভ করেছে। ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত পিপল্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সম্মেলনে দেশের সার্বিক উন্নয়নের কথা উল্লেখ করা হয়। এতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হতে সামন্তবাদী শ্রেণী ও বড় বড় মহাজন শ্রেণীকে উৎখাত করা হয়েছে। দেশের সমস্ত দেশাত্মবোধক গ্রুপসমূহের মধ্যে ক্রমশ পরস্পর সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে উঠছে

www.pathagar.com

১৯৭৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি ইমাম খোমেনী ইরানে ফিরে আসেন। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উষ্ণ আন্তরিকতায় জনগণ তাঁকে অভিনন্দন জানায়। শিয়া ধর্মীয় নেতা ইমাম খোমেনী সেদিন যে সংবর্ধনা লাভ করেন তা ছিল অভূতপূর্ব। এক সপ্তাহ পর তিনি জনগণের উদ্দেশে প্রচারিত এক ঘোষণায় সামরিক আইনের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ না করার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, সেদিন বিকাল থেকে সামরিক আইন জারি হবার কথা ছিল। ইমামের আহ্বানে সমস্ত অফিস আদালতে তাঁর সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়। অতঃপর ইমাম খোমেনী কোন প্রশাসনিক পদ গ্রহণ না করে ইসলামী শাসনব্যবস্থা পরিচালনার উপদেষ্টাস্বরূপ কোমে অবস্থান করেন। ইরানের কোম নগরী শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রাজধানী। তাদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ইমাম আয়াতুল্লাহ্ এখানে বাস করেন। এঁরা সাধারণত রাজনীতিতে জড়ান না, তবে সময় সুযোগে দেশ পরিচালকদের দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন। শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা ইমামকে শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁর পরামর্শ মান্য করেন। ইরানি জনগণের অধিকারের বিষয় বলতে গিয়ে ইমাম আয়াতুল্লাহ্ রেজা শাহের কোপানলে পড়ে স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে ফ্রান্সে আশ্রয় নেন।

ইমাম খোমেনী কোন পদপদবি গ্রহণ না করলেও তাঁর প্রদর্শিত আদর্শ অনুযায়ী দেশের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিসভা নির্বাচিত হন এবং ইসলামী সংস্কারমূলক কার্যাবলি চালিয়ে যান। বিগত নির্বাচনে আলী খোমেনী ইরানের প্রেসিডেন্ট এবং মোহাম্মদ মোসাভী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

ইরাক-ইরান যুদ্ধ : (১৯৮০-৮৮) ইরান ও ইরাক এক ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিছুকাল পূর্বে মিসর এবং সিরিয়াও এ ধরনের শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু তা এত দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। ইরাক-ইরান যুদ্ধ অদূর-ভবিষ্যতে বন্ধ হবার কোন লক্ষণও আপাতত দৃষ্টিগোচর ছিল না। এই যুদ্ধের ফলে দুই দেশের জনগণ ও সম্পদের সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়। দুটো দেশই বিপুল তেল সম্পদের অধিকারী। সুতরাং এ ক্ষতি শুধু দু'দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার নয়। অপরদিকে ইরাক আরবিভাষী আর ইরান ফার্সিভাষী হবার দরুন যুদ্ধটি অতি প্রাচীন আরবি-ফার্সি দ্বন্দ্বে রূপ নেয়াটাও বিচিত্র নয়।

একটি পুরাতন পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন (!) তৎপর হন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৮০ সালে ইরাক সরাসরি ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে বসেন। ১৯৭৫ সালের ৬ই মার্চ আলজিয়ার্স চুক্তির মাধ্যমে ইরাককে ইরানের হাতে এক গ্লানিকর পরাজয়

www.pathagar.com

মেনে নিতে হয়। সামরিক শক্তির দিক থেকে প্রাধান্যের অধিকারী তৎকালীন ইরান সরকারের সাথে ইরাক এই চুক্তিটি সম্পাদন করতে বাধ্য হয়। একে অপরের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধের শর্তে ইরাক হরমুজ প্রণালীর মুখে তিনটি দ্বীপের ওপর ইরানি কর্তৃত্ব মেনে নেয়। আর শাতিল আরবের মধ্যস্রোতকে দু'দেশের সীমান্ত হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু ইরাক সর্বদা শাতিল আরবকে ইরাকের নিজস্ব জলধারা বলে দাবি করে এবং এর পূর্বতীরকে সীমান্ত বলে মনে করে। কিন্তু তৎকালীন শাহের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর চাপে এবং ইরান কর্তৃক ব্যবহৃত কুর্দিদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ থেকে নিস্কৃতি পাবার আশায় ইরান কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া এই সীমান্ত ব্যবস্থা ইরাক মেনে নেয়। কুর্দি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দরুন ইরাকের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল। একটি সমৃদ্ধশালী তেল রফতানিকারক দেশ হয়েও ইরাক তার সামরিক অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারেনি। ১৯৭৫ সালের আলজিয়ার্স চুক্তির ফলে ইরাক কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে সে বেশ চাঙ্গা করে তোলে। সোভিয়েত সামরিক সাহায্যের দ্বারা ইরাক একটি অত্যাধুনিক করিতকর্মা সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে এবং একটি পারমাণবিক গবেষণা প্রকল্প স্থাপন করে।

ইরানের শাহের পতন এবং ইরানি সামরিক বাহিনী হতে বিপুল সংখ্যক মার্কিন-ঘেঁষা অফিসার ও সৈন্য ছাঁটাইয়ের ফলে ইরানের সামরিক ক্ষমতা বেশ হ্রাস পায়। নিয়মিত সৈন্যসংখ্যা ৪,০৫,০০০ হতে ১,৪০,০০০ এ নেমে আসে। অবশ্য বিপুল সংখ্যক অনিয়মিত বাহিনী গঠন করা হয়। এসব বাহিনী ইরানের অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা দমনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হলেও ইরাকের এই অত্যাধুনিক সামরিক বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না বিবেচনা করে ১৯৮০ সালে ইরাক সরাসরি ইরান আক্রমণ করে। প্রথম ধাক্কাতেই শাতিল আরবের পূর্ব তীর দখল করে সে ইরানের বেশ অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। হরমুজ প্রণালীর নিকটস্থ দ্বীপগুলোর ওপরও ইরাক তার কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু একটি আধুনিক যুদ্ধে চূড়ান্ত জয় এবং পরাজয় নির্ধারিত হয় না। বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় উভয় পক্ষকেই। এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ইরানের জন্য বেশি হলেও ইরাকের জন্য তা একেবারেই নগণ্য। ইতোমধ্যে ইরান এর প্রথম ধাক্কা সামলিয়ে উঠেছে এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। যদিও শাতিল আরবের পূর্বতীর হতে ইরাকিদের হটাতে সে ব্যর্থ হয়েছে। অপরদিকে ইরাকের অর্থনীতির ওপর যুদ্ধের প্রভাব খুব

www.pathagar.com

গভীর না হলেও একেবারেই উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। ইতোমধ্যে ইরাক-ইরান যুদ্ধের ডামাডোলে ইসরাইলি জঙ্গি বিমান বহর এক অতর্কিত হামলায় ইরাকের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রটি ধ্বংস করে দেয়। তাই প্রশ্ন উঠেছে ইরাক-ইরান যুদ্ধে কারা লাভবান হচ্ছে। এযাবৎ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা, আরব লীগ, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, জাতিসংঘ ইত্যাদি সংস্থা হতে বহুবার প্রচেষ্টা চালিয়েও এ যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। ইরাক কিছুটা নমনীয় ভাব দেখালেও ইরান কিছুতেই অস্ত্র সংবরণ করতে রাজি নয়।

বছরের পর বছর যায় কিন্তু যুদ্ধবিরতির কোন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না। যুদ্ধের মোড় পরিবর্তনে ব্যর্থ হয়ে ইরান কর্তৃক লক্ষ লক্ষ প্রায় প্রশিক্ষণহীন অল্পবয়সী এমনকি বাচ্চা ছেলেদেরকেও যুদ্ধক্ষেত্রে ঠেলে দেয়ার অভিযোগ ওঠে। তৎপরিবর্তে ইরাক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাঠায়। ইতোমধ্যে এ অভিযোগও উত্থাপিত হয় যে ইরাক বিষাক্ত রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করছে। কিন্তু অস্ট্রিয়া ও সুইডেনে পাঠানো দগ্ধ রোগীদের পরীক্ষা করে এই অভিযোগ সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়নি। ইরাকের বসরা দখল করে দক্ষিণের তেলক্ষেত্রগুলোর পথ বন্ধ করার জন্য ইরান ক্রমাগতভাবে চেষ্টা করে ও ব্যর্থ হয়। ইরাকের কিছু অংশ দখল করে বাগদাদকে গোলন্দাজ সীমানায় আনতে পারলে সাদ্দাম হোসেনের পক্ষে রাজধানী ত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না—এই তত্ত্ব সামনে রেখে ইরান লক্ষ লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করে, কিন্তু ইরাক তার বিমান বাহিনীর সাহায্যে এগুলোকে হটিয়ে দেয়। এভাবে ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাতের এক পর্যায়ে ইরান তার দক্ষিণাঞ্চলে হরমুজ প্রণালীর মুখে সৈন্য মোতায়েন করে যাতে প্রয়োজনে উপসাগরে চলাচলকারী পাশ্চাত্য তেলবাহী জাহাজ আক্রমণ চালিয়ে প্রণালী বন্ধ করা যায় (Time, March 19,1985)।

১৯৮৮ সালের ৩রা জুলাই ইরানের একটি যাত্রীবাহী বিমান (ফ্লাইট ৬৫৫) ২৯০ জন যাত্রী নিয়ে এর নিয়মিত যাত্রায় বন্দর আব্বাস বিমানবন্দর হতে উপসাগরে পশ্চিম তীরে অবস্থিত দুবাই যাবার পথে মার্কিন রণতরী ভিনসেন্স (U.S.S. Vincennis) হতে নিক্ষিপ্ত দুটো মিসাইলের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে উপসাগরে নিক্ষিপ্ত হয়। বিমানটির ক্রুসমেত সব যাত্রীই নিহত হয়। ইরাকি টেলিভিশনে এই হত্যাযজ্ঞের দৃশ্য দেখে বিশ্ববাসী হতবাক হয়। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বলা হয় যে, রণতরীটি উপসাগরে তেলবাহী জাহাজ পাহারা দেবার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। কুয়েতি জাহাজগুলোকে মার্কিন পতাকা ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। মার্কিন নৌবাহিনী অবশ্য স্বীকার করে যে. ভুলক্রমে এই

www.pathagar.com

যাত্রীবাহী বিমানটিকে এফ-১৪ টম ক্যাট (F. 14 Tomcat fighter) জঙ্গি বিমান মনে করে আঘাত করা হয় (Time, July 18, 1988)। দৈর্ঘ্যে ১৭৭ ফুট যাত্রীবাহী বিমানটিকে কীভাবে ৬২ ফুট দৈর্ঘ্যের কথিত জঙ্গি বিমানের সাথে তুলনা করা হল তা আজও রহস্য হয়ে রয়েছে। কারণ এই মার্কিন রণতরীতে সংযুক্ত রাডার ব্যবস্থা এত নিখুঁত যে, ১৫০ মাইল দূরত্বের একটি বাস্কেটবলকে এটি সহজেই চিহ্নিত করতে পারে এবং ওপরের দিকে ১০০০ মাইল দূরত্বের একটি বিমানকে শনাক্ত করতে সক্ষম। যুক্তরাষ্ট্র সরকারিভাবে দোষ স্বীকার করে এবং ২৯০ জন যাত্রীর সবার ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়। ইরান এ ঘটনাটিকে যুদ্ধের ভয়াবহতম অপরাধ বলে বর্ণনা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের কথা বললেও উপসাগরে চলমান কোন মার্কিন রণতরী বা জাহাজে আঘাত হানার মত মনোবল বা শক্তি ইরানের ছিল না। অপরদিকে সাবধানী ইরানি নেতৃবৃন্দ ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দেন, বিশেষত ইরানের ক্ষমতাসীন ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হাশেমী রাফসানজানী যে কোন খামখেয়ালি ব্যবস্থা হতে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। প্রতিদানে ইরান আশা করে যে বিশ্বব্যাপী ধিক্কারের ফলে সে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব নিতে পারবে এবং পারস্য উপসাগর হতে যুক্তরাষ্ট্রকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী তেমন জোরালো প্রতিবাদ না ওঠায় তার জগৎজোড়া নিঃসঙ্গ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সচেষ্ট হয়। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে সে ব্রিটেন, কানাডা, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও গোপন যোগাযোগ স্থাপন করে (Time-ঐ)।

ইরান তার নিঃসঙ্গ অবস্থা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে যখন সে দু'বার জাতিসংঘে বিমান ধ্বংস বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব নিতে ব্যর্থ হয়। ইরান তার প্রস্তাবনায় বলে যে, যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছা করেই এ আঘাত হেনেছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এ বক্তব্য নাকচ করে বলে যে, ইরান যুদ্ধ বিরতির জন্য জাতিসংঘে গৃহীত ৫৯৮ নম্বর প্রস্তাব না মানার ফলেই উদ্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, অথচ ইরাক যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র আরও বলে যে ইরান একটি বেসামরিক যাত্রীবাহী বিমান শত্রুভাবাপন্ন একটি দেশের যুদ্ধ জাহাজের ওপর দিয়ে উড়াবার ফলে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে নিজ দায়িত্ব এড়াতে পারে না।

যুদ্ধবিরতি : অবশেষে ১৮ জুলাই ১৯৮৮ ইরানি প্রেসিডেন্ট আলী খামেনী জাতিসংঘের মহাসচিব জ্যাভিয়ার প্যারেজ দি কুইলারের নিকট এক পত্রে আট

www.pathagar.com

বছর স্থায়ী ইরাক-ইরান যুদ্ধ অবসানে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব ৫৯৮ মেনে নেবার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার পরদিন ইরাকি বিমান বাহিনী বুশাইরে অবস্থিত ইরানি পারমাণবিক স্থাপনা ধ্বংস করে। তিনদিন পর ইরাক তার ৭৩০ মাইল দীর্ঘ সীমান্তে ইরানের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করে, উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার— যত এলাকা দখল করা যায়।

ইমাম খোমেনী ঘোষণা দিয়েছিলেন, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করবেন, কিন্তু তাঁর এই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা স্বভাবতই অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। কারণ হিসেবে কেউ কেউ উল্লেখ করেন যে, তেহরান ভালভাবে উপলব্ধি করেছে সামরিকভাবে এ যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নয়। অপরদিকে এরূপ জল্পনা-কল্পনাও চলে যে ৮৮ বছর বয়স্ক ইমাম খোমেনীর স্বাস্থ্যের অবনতিই এই যুদ্ধ বিরতির মূল কারণ। খবরে প্রকাশ তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত এবং মস্তিষ্কে টিউমার ও লিভারের পীড়াসহ জটিল রোগে ভুগছেন। সে যাই হোক, ইরানের যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব সবাইকে বিস্মিত করে।

যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব উভয় দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের নিউইয়র্কে ডেকে পাঠান। বাগদাদ ও তেহরানে দুটো জাতিসংঘ দল পাঠানো হয়। তাদের একটি উভয় পক্ষের প্রায় ৭০,০০০ হাজার যুদ্ধবন্দির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, অপর দলটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর করে। এভাবে আট বছর স্থায়ী ইরাক-ইরান যুদ্ধ শেষ হয়।

যুদ্ধ শেষে ইরাকের মনোবল বেড়ে যায়। যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইরাকি বাহিনী তাদের হারানো সমস্ত এলাকা দখল করে নেয়, তন্মধ্যে ফাও উপদ্বীপ, বসরার পূর্ববর্তী এলাকা এবং টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মুখে অবস্থিত তেলসমৃদ্ধ মজরুন উপদ্বীপসমূহ অন্তর্ভুক্ত। এই দখল রোধ করার জন্য খোমেনী অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ইরাকের জনসংখ্যা ইরানের এক-তৃতীয়াংশ হলেও ইরাকের সৈন্য সংখ্যা ইরান হতে অনেক বেশি। ইরাক দশ লক্ষ, ইরান ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। এটি ছাড়াও ইরাকের রয়েছে ট্যাংক প্রশিক্ষণ ও বিমান বাহিনীর প্রাধান্য। ইরানের সৈন্য তালিকাভুক্তির সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পায়। ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর সাথে আশংকাজনকভাবে হ্রাস পায়। ইরানে বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর সাথে সংযুক্ত নির্ধারিত তিন লক্ষ বাসোজির (স্বেচ্ছাসেবক) সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশে নেমে আসে। ২৯০ জন যাত্রীসমেত বিধ্বস্ত ইরানি যাত্রীবাহী বিমানের ঘটনা তাদের মনোবল সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দেয়।

www.pathagar.com

ইরাক-ইরান যুদ্ধ এবং উপসাগরীয় যুদ্ধের ভয়াবহতা স্তিমিত হয়ে আসলে ইরান সঙ্গোপনে এবং দৃঢ়ভাবে তার সশস্ত্র বাহিনী আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণে মনোনিবেশ করে। এই প্রক্রিয়ায় তারা বিশেষত ক্ষেপণাস্ত্র সংগ্রহ, বিমান বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি এবং পদাতিক বাহিনীর শক্তি প্রয়োগের দক্ষতা বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করে। নিউইয়র্ক টাইমসের এক সমীক্ষায় প্রকাশ, ইরান উত্তর কোরিয়া থেকে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ক্রয়ের ব্যবস্থা প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে—যা এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য উভয়ের জন্যই হুমকি স্বরূপ। সি.আই.এ. ও পেন্টাগন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে পত্রিকায় বলা হয়, মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রে আঘাত হানবার আওতা ৬০০ মাইল (New York Times, April, 8,1993)। এদিকে ভারত ও মিসর ইরানের এই সমরসজ্জায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

জর্ডান

১৯৮৮ সালের মধ্য জুলাই জর্ডানের বাদশাহ্ হোসেন ঘোষণা করেন যে, ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (পিএলও) ও আরব রাষ্ট্রবর্গের ইচ্ছানুযায়ী ইসরাইল অধিকৃত জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর হতে জর্ডানের আইনগত ও প্রশাসনিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হল। এ ঘোষণা বিদ্যুতের ন্যায় কাজ করে এবং আসন্ন আরব-ইসরাইল শান্তি পরিকল্পনার ভিত্তি নস্যাৎ করে দেয়। চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত বাদশাহ হোসেনের ঘোষণা পরিমাপ করার জন্য তাঁর ৪৫১ সদস্যবিশিষ্ট ফিলিস্তিন জাতীয় কাউন্সিলের সভা ডাকেন। ইসরাইলি নেসেট (জাতীয় সংসদ) জরুরি বৈঠকে মিলিত হয়। ওয়াশিংটনে কেউ কেউ বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ শুলজ উদ্ভাবিত মধ্যপ্রাচ্য শান্তি পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে গেল, আবার কেউ কেউ বলেন বরং এর দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠার গতি সঞ্চারিত হবে। বাদশাহ হোসেন পশ্চিম তীরে অবস্থানরত তাঁর আট লক্ষ নাগরিকের সাথে তিনি কিভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করেন সে ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা প্রকাশ করেননি! ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৭ সালে ৬ দিনের আরব ইসরাইলি যুদ্ধে ইসরাইল কর্তৃক দখল করা পর্যন্ত জর্ডান এ এলাকা শাসন করে। ঘোষণায় তিনি অবশ্য ফিলিস্তিনিদেরকে ত্যাগ করেননি বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু মুক্তি সংস্থা পশ্চিম তীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করার দাবি উত্থাপন করায় তিনি এ ব্যবস্থা নেন, তবে সংস্থা ব্যর্থ হলে তিনি এ এলাকার হাল ধরবেন বলে আভাস দেন!

বাদশাহর এ পন্থা শক্তি পরিচালিত হোক বা হতাশা পরিচালিত হোক, এ ঘোষণা তার ক্রমাগত নিরুৎসাহের বহিঃপ্রকাশ। বিগত আট মাসের ফিলিস্তিনি

www.pathagar.com

ইন্তিফাদাহ্ বা বিক্ষোভের দ্বারা পশ্চিম তীরে তার প্রভাব খর্ব হয়। পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনি জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত তার কর্মপন্থার স্বীকৃতি আরবরা দেয়নি। পশ্চিম তীরের পক্ষে জর্ডানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আরবরা এ বলে সমালোচনা করে যে বাদশাহ মুক্তি সংস্থার ভূমিকা দখল করতে চান। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত শান্তি পরিকল্পনায় তিনি উৎসাহ প্রদান করলে সপক্ষে অভিযোগ করা হয় যে তিনি ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কথা বলতে চান। ১৯৮৮ সালের জুন মাসে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত আরব শীর্ষ সম্মেলনে বাদশাহ্ সরাসরি বলেন, "আমাদের প্রচেষ্টাকে প্রতিযোগিতা বলে অপব্যাখ্যা করা হয়।" উল্লেখ্য, তিনদিন স্থায়ী আলজিয়ার্স সম্মেলনে বাদশাহ্ পশ্চিম তীরের জন্য ব্যয়কৃত বার্ষিক সাত লক্ষ ডলারের মধ্যে কিছু সাহায্য চাইলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়।

এই ঘোষণার পর জর্ডান পশ্চিম তীরের জন্য গৃহীত ১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলারের পঞ্চসালা উন্নয়ন প্রকল্প বাতিল করে, জর্ডানের ৬০ সদস্যবিশিষ্ট নিম্নপরিষদ বাতিল করে দেয়। এ পরিষদের অর্ধেক সদস্য পশ্চিম তীরের প্রতিনিধিত্ব করত। চারদিন পর জর্ডান পশ্চিম তীরের ২১০০০ বেসামরিক কর্মচারীকে ছাঁটাই করে বা অবসর দান করে। এই কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষক এবং স্বাস্থ্য ও অন্য সেবামূলক কাজের কর্মচারী। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক শামীর এদেরকে গ্রহণ করেন এবং ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থাকে এই দায়িত্ব গ্রহণে বাধা প্রদান করেন। তবে জর্ডান পশ্চিম তীরের ৭,৫০,০০০ ফিলিস্তিনিকে জর্ডানি পাসপোর্ট বাতিল করে নাই এবং যে দু'টি পুল পশ্চিম তীর ও জর্ডানকে সংযুক্ত করেছে সেগুলোও বন্ধ করে নাই।

পশ্চিম তীরের কোন কোন ফিলিস্তিনি মনে করে, জর্ডানের পশ্চাদপসরণ ফিলিস্তিনিদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের পথে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তারা আরও মনে করেন, ইসরাইলি দখলকৃত আরব ভূমির জন্য যুক্তিসম্মত একটি প্রবাসী সরকার গঠনের এটিই উপযুক্ত সময়। আবার অনেকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয়। ইতোমধ্যে ইসরাইলি টেলিভিশনে সচিত্র খবর প্রচারিত হয় যে, ইসরাইল পশ্চিম তীরে একটি স্বাধীনতার ঘোষণা অংকুরেই বিনষ্ট করে দিয়েছে। অনেক ফিলিস্তিনি এই আশঙ্কা ব্যক্ত করে যে, বাদশাহ্ হোসেন ইসরাইল কর্তৃক পশ্চিম তীর দখল করে নেবার পথ উন্মুক্ত করেছেন (Time, August 15, 1988)।

www.pathagar.com

ইন্তিফাদাহ (গণবিক্ষোভ)

ইসরাইল অধিকৃত পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকায় মুক্তিকামী ফিলিস্তিনি অধিবাসীদের দ্বারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে পরিচালিত গণবিক্ষোভকে ইন্তিফাদাহ বলে। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে এ বিক্ষোভ আরম্ভ হয়। ইন্তিফাদাহয় অংশগ্রহণকারী ফিলিস্তিনি ছাত্র-জনতা অধিকাংশ বালক, আলোচ্য এলাকার ইসরাইলি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক বিক্ষোভ পরিচালনা করে। ইসরাইলি পুলিশ আধা-সামরিক বাহিনী ও নিয়মিত বাহিনী পেলেই তারা প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করে। ইসরাইলি সশস্ত্র বাহিনী প্রতিশোধ গ্রহণ করে, মারধর করে, গ্রেফতার করে ও হত্যা করে। কিন্তু এর দ্বারা ফিলিস্তিনি যুবকরা নব উদ্যম লাভ করে। এ আন্দোলন শুরু হবার এক বছরের মধ্যে ইসরাইলি সৈন্যরা নৃশংসভাবে ৩১৮ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে, ৭০০০ জনেরও অধিক আহত হয়, ১৫ হাজার ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করা হয়। তন্মধ্যে ১২০০০ ফিলিস্তিনিকে জেলে দেয়া হয় এবং ৩৪ জনকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। অপরদিকে ১১ জন ইসরাইলি সৈন্য জনতার রোষে পড়ে নিহত হয়। স্বাধীনতার জন্য ফিলিস্তিনি জনগণ প্রাণ দিতে প্রস্তুত এবং এই উদ্দীপনাই ইন্তিফাদাহকে সরগরম রাখে। এই বিদ্রোহ বিক্ষোভ ফিলিস্তিন সমস্যাকে আন্তর্জাতিক বিষয়ের সম্মুখভাগে আনয়ন করে। ইসরাইলি বাহিনীর নৃশংসতায় বিশ্ববাসীকে ফিলিস্তিনিদের সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে। যতই দিন যাচ্ছে ততই বিষয়টি ইসরাইলি কর্তৃপক্ষের জন্য মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু ফিলিস্তিনিরা উৎসাহিত হচ্ছে।

ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ তাদের সেনাবাহিনীর নৃশংসতম উচ্চপদস্থ জেনারেলদের পশ্চিম তীর ও গাজায় প্রেরণ করে ইন্তিফাদাহ্ দমন করার জন্য। সেনাবাহিনীর গুলোতে নিহত বিক্ষোভকারীদের মৃতদেহ তারা ফেরৎ দেয় না বরং কোন প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াই লাশগুলোকে ইসরাইলের গোপন "সন্ত্রাসকারী" কবরস্থানে দাফন করে। জেনারেল আইজ্যাক মোরদেমাই নামক এক জঘন্যতম সেনাপতিকে অধিকৃত অঞ্চলে প্রেরণ করলে তিনি ১২ লক্ষ ফিলিস্তিনিকে এ মর্মে হুঁশিয়ার করে দেন যে সেনাবাহিনী তাদেরকে আর লালন করবেন না। তারা যদি আবারও বাধা প্রদান করে তবে তারা এর জন্য দুঃখ করেন। অপরদিকে, ৬৫ হাজার ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের তিনি শান্তির বাণী দ্বারা আশ্বস্ত করেন। অতঃপর যে কোন আরবকে ১২ মাস পর্যন্ত বিনা দোষে জেলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। মুখে কোন আবরণ দিলেই তিনি গুলি করার

www.pathagar.com

হুকুম দেন বিক্ষোভ করুক আর না করুক, ফলে অনেক নিরীহ আরব যারা প্রখর রৌদ্রের জন্য মাথায় 'যাফিয়া' পরিধান করে তারা হত্যার শিকার হয় (Newsweek, September, 18,'87)। এই নৃশংস বাহিনী একবার নাবলুসের ইত্তেহাদ হাসপাতাল তিন ঘন্টার জন্য অবরুদ্ধ রাখলে ভেতরে আহত ও জখমপ্রাপ্ত রোগীদের করুণ চিৎকারে এক ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু সমগ্র ইসরাইলে পশ্চিম তীরের দায়িত্বকে অত্যন্ত কঠিন বলে অভিহিত করা হয়। "জেরুজালেম পোস্ট" পত্রিকা পশ্চিম তীরে বদলি হওয়াকে "নিশ্চিত ব্যর্থতার কাজ" হিসাবে বর্ণনা করে। ইহুদি দমন নীতি যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে বিক্ষোভকারীদের উৎসাহ ততই ব্যাপকতর হতে থাকে।

ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর (Israili Defenc Forces, I.D.F) লোকেরা এখন এই বিক্ষোভ দমন করাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে। তারা বলে এখানে আমাদের দায়িত্ব পালনের সময় আমরা পছন্দ করি আর না করি আমরা যে মৌলিক নৈতিকতার ওপর রত হই তার পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রত্যেকদিন ছেলেরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। সেনাপ্রধান বলেন আরও সময় লাগবে। কিন্তু সময় অনেক দীর্ঘ এবং এর মূল্য অতি উচ্চ। আরেকজন বলেন, "লোকেরা আমাকে ভয় পান এ লক্ষ্য হাসিলের জন্য আমি নিষ্ঠুরভাবে তাদের সাথে আচরণ করি। এটি আমার কর্তব্য, কিন্তু আমার আচরণের দ্বারা আমি অপমানিত বোধ করি।" আরেকজন বলেন, "ব্যক্তি হিসাবে একাজ আমাকে বিদীর্ণ করে আর আরবদেরকে শক্তিশালী করে। একমাত্র রাজনৈতিক সমাধানই আমাদেরকে এ অপমান থেকে রক্ষা করতে পারে।" (Time, Aug. 30, '89)।

বিক্ষোভ দমনকারী সৈন্যদের সংক্ষেপ হল অধিকাংশ বিক্ষোভকারী ছোট ছোট বালক এবং প্রধান অস্ত্র তাদের পাথর নিক্ষেপ। তাদেরকে নিরস্ত্র করার জন্য বিভিন্ন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। পাথর নিক্ষেপের জন্য জেল পাঁচ বছর, তার পিতার এক হাজার ডলার বা তদূর্ধ্ব জরিমানা, তাদের পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং তা সত্ত্বেও তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া। তারা মনে করে টিকে থাকার জন্য পাথর নিক্ষেপকারীদের ভয়াবহ শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু ট্যাংক ও গ্রেনেডের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রিজার্ভ সৈন্য যখন পাথরওয়ালা বালকদের ধাওয়া করে তখনই বড় বিরক্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। সে তখন মন্তব্য করে, "আমি কোন ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে লড়াই করছি না, আমার শত্রু একটি বারো বছরের বালক।"

www.pathagar.com

কিন্তু তবুও ইন্তেফাদাহ্ থাকে না। ইসরাইল বিশ্ববাসীকে বোঝাতে পারে না পাথর নিক্ষেপের বিরুদ্ধে কেন লাঠি ব্যবহার না করে গুলিবর্ষণ করতে হবে। ইসরাইলি পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় সদস্যরা ফেটে পড়ে এবং মন্তব্য করে এই হত্যার নীতির দ্বারা ফিলিস্তিনিদেরকে হত্যা করছে না বরং ইসরাইলিদের আত্মাকে হত্যা করছে।

ইন্তিফাদাহ চলছে, ভবিষ্যতে আরও চলবে বলে মনে হচ্ছে। এই ইন্তিফাদাহ পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাতকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি পৌঁছিয়েছে এবং তাঁকে জাতিসংঘে ফিলিস্তিনি বক্তব্য পেশ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

৩০শে মার্চ, ১৯৯৩ ফিলিস্তিনিরা অধিকৃত গাজা ও পশ্চিম তীরে ভূমি দিবস পালন করে। গাজা এলাকায় ২ জন ইহুদি হত্যার প্রতিশোধ হিসাবে ইসরাইলি বসতি স্থাপনকারীরা ৩০শে মার্চ সেখানকার একটি মসজিদে গুলিবর্ষণ করে ও পরে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ইসরাইলি সেনারা অতঃপর গাজা এলাকা সিল করে দেয়। অপরদিকে পশ্চিম তীরে ২ জন ইসরাইলি পুলিশ নিহত হবার পর পশ্চিম তীরও সিল করে দেয়া হয়।

লেবাননের সাংবিধানিক সমস্যা

১৯৪৩ সাল থেকে প্রচলিত সাংবিধানিক আইন অনুসারে মুসলমান ও খ্রিস্টানদেরকে সংখ্যায় অর্ধেক অর্ধেক বিবেচনা করে ক্ষমতার ভাগাভাগিতে খ্রিস্টানরা পায় দেশের প্রেসিডেন্ট আর মুসলমানরা পায় প্রধানমন্ত্রী। এটিই মূলত লেবাননের সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মূল কারণ। ১৯৮৪ সালে সুইজারল্যান্ডের ন্যুজানে অনুষ্ঠিত লেবাননের বিভিন্ন উপাদানসমূহের এক সম্মেলনে এ ব্যাপারটি প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। লেবাননের প্রেসিডেন্ট আমিন জামায়েলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দ্রুজ নেতা ওয়ালীদ জুমলাত এবং শিয়া আসল মিলিশিয়া নেতা নবীহ বারী লেবাননে ৯৯ সদস্যবিশিষ্ট মৃতপ্রায় পার্লামেন্টের জন্য এমন এক নতুন নির্বাচনী ব্যবস্থা চান যাতে জাতীয় ভিত্তিতে সংসদে সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব থাকে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে মুসলমানদের সুবিধা হবে, কারণ বর্তমানে লেবাননে মুসলমানদের সংখ্যা ৫০ হতে ৬০ শতাংশ। তদুপরি জুমলাত ও নবীহ্ বারী লেবাননের সেনাবাহিনী ও সিভিল সার্ভিসের ওপরের তলায় মেরোনাইট খ্রিস্টানদের একচেটিয়া অধিকার খর্ব করতে চান। এসব প্রস্তাবনা উপলব্ধি করে মেরোনাইদের ক্রমবর্ধমান একটি অংশ লেবাননকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ভিজিত বিভক্ত করাকে স্বাগত জানায়। খ্রিস্টান মিলিশিয়া বাহিনীর

www.pathagar.com

একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হুমকি দিয়েই বসেন যে, অনুরূপ অসন্তোষজনক কিছু হলে ল্যুজান সম্মেলনের প্রস্তাবাবলি বাস্তবায়িত হবে না এবং শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে।

* * * *

রাজধানী বৈরুত তথা সমগ্র লেবাননে শান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ একটি অকল্পনীয় বিষয়ে পরিণত হতে চলেছে। লেবাননে বিবদমান দলগুলোর সংঘাত কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসলে দক্ষিণ লেবানন থেকে ইসরাইল নতুন করে সংঘাতের সৃষ্টি করে। যেমন, কিছুদিন পূর্বে ইসরাইল হিজবুল্লাহ্ নেতা শেখ ওবায়দকে বিনা উস্কানিতে অপহরণ করে এ অঞ্চলে পুনরায় সংঘাতের আগুন বাড়িয়ে দেয়।

লেবাননে সংঘাতের আরেক দিগন্ত উন্মোচিত হয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী খ্রিস্টান নেতা জেনারেল আউনকে কেন্দ্র করে। তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশে ধর্মযুদ্ধ ডাকলেন। লেবাননের বেকা উপত্যকা হতে সিরীয়বাহিনীর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার পর্যন্ত তিনি যেকোন ধরনের আলোচনা নাকচ করে দেন। কিছুদিন পূর্বে প্রেসিডেন্ট আমিন জামায়েল ক্ষমতা ত্যাগ করলে আগস্ট ১৯৮৯ সালে তিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা দেন। তিনি মনে করেন শক্তির জোরে তিনি সিরীয়বাহিনীকে তাড়াতে পারেন, অন্য সামরিক দলগুলোকে নিরস্ত্র করতে পারেন এবং মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত দাবি অগ্রাহ্য করে লেবাননের একক নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারবেন। এ সমস্ত অসংলগ্ন কথাবার্তার দরুন লেবাননে সংঘাত বৃদ্ধি পায় এবং মৃতের হারও বাড়ে। সিরীয়বাহিনী জেনারেল মোয়াল্লার নেতৃত্বে আউনের বাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। দ্রুজ মিলিশিয়া এবং সিরীয় সমর্থিত ফিলিস্তিনিরাও এতে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সিরিয়ার পক্ষে আউনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব নয়, কারণ সেক্ষেত্রে পশ্চিমা শক্তি এবং ইসরাইল তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসবে। তাই সিরিয়া চায় লেবাননের অভ্যন্তরীণ দলগুলোকে আউনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে তাকে শায়েস্তা করতে। এ উদ্দেশে সিরিয়া লেবাননের প্রধান প্রধান মুসলিম দলের নেতা যথা : দ্রুজ নেতা ওয়ালীদ জুমলাত, শিয়া আসল মিলিশিয়া নেতা নবীহ বারী এবং ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহ্র শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নিয়ে দামেস্কে এক বৈঠকে মিলিত করে জেনারেল আউন বিরোধী এক কোয়ালিশন গঠনে সম্মত করান। এ খবর পাবার পর জেনারেল আউন ঘোষণা করেন, তিনি লেবাননবাসীর পক্ষে যুদ্ধ করছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমগ্র লেবাননবাসী দূরে

www.pathagar.com

থাকুক সংখ্যালঘিষ্ঠ খ্রিস্টানদের কিছু কিছু অংশও তার পক্ষে নেই। যেমন, খ্রিস্টান ফ্রাঞ্জেইহ্ উপদলের নেতা সোলায়মান ফ্রাঞ্জেইহ্ স্পষ্টই বলে দেন যে, তাঁরা প্রয়োজনে জেনারেল আউনের বিরুদ্ধেই লড়াই করবেন। প্রথম থেকেই আউ-কে মোরানাইট খ্রিস্টানদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়, হয়ত ভবিষ্যতেও হতে হবে। বেশিদিনের কথা নয়, জেনারেল আউন খ্রিস্টান মিলিশিয়া নেবালীজ ফোর্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। জেনারেল আউন জানেন, তাঁর শক্তির উৎস কোথাও, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র ইসরাইল। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার তৎপরতাকে সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন বলে অভিহিত করে। পোপ এ যুদ্ধকে গণহত্যার সঙ্গে তুলনা করেন। ইতোমধ্যে ফরাসি রণতরী লেবাননের উপকণ্ঠে টহল দেয়া শুরু করে। সমগ্র বিশ্ব থেকে ও.আই.সি.কে শান্তি রক্ষায় দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানায়।

লেবাননে জেনারেল আউনের দ্বারা সৃষ্ট যুদ্ধ যতই তীব্রতর হয় বিশ্ববাসী আউনকে এর জন্য দায়ী করে। এর মধ্যে ইসরাইলের মুসলিম নেতা ওবায়দকে অপহরণ এবং পশ্চিমে জিম্মি সংকট সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। তবে এই ঘোলাটে অবস্থায় অধিক লাভবান হয় ইসরাইল। কারণ সে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি লেবাননে নিবদ্ধ রেখে পশ্চিম তীরের গণ অভ্যুত্থান থেকে সরিয়ে রাখে। ইসমাইল সেখানে অবলীলায় নির্যাতন চালাতে সক্ষম হয়।

১৫ আগস্ট '৮৯ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের এক বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেনারেল আউনকে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানানো হয়। তিনি তা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করেন। কিন্তু কতদিন এ যুদ্ধবিরতি টিকে তাই দেখার বিষয়।

জেনারেল আউনকে ফ্রান্সে সরিয়ে নেবার মধ্য দিয়ে লেবাননে কিছুকাল শান্তি বিরাজ করলেও সম্প্রতি ইরান প্রভাবিত হেজবুল্লাহ্ গেরিলা দলের সাথে চলতি বছরের অক্টোবর মাসে ইসরাইলি টহলদলের এক ঘোরতর সংঘর্ষ বাধে। হেজবুল্লাহ গেরিলাদের এক চোরাগোপ্তা হামলায় দক্ষিণ লেবাননে ৫ জন ইসরাইলি সৈন্য নিহত এবং ৫ জন আহত হলে ইসরাইলি গোলন্দাজ বাহিনী ও জঙ্গি হেলিকপ্টার বহর লেবাননের বেকা উপত্যকায় প্রতি মিনিটে অন্তত দুটো করে বোমার আঘাত হানতে আরম্ভ করে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতের কোন খবর পাওয়া যায়নি।

---

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

জাতিসংঘে পি.এল.ও. নেতা ইয়াসির আরাফাত

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ইন্তিফাদাহ ফিলিস্তিন সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যার আলোচ্য বিষয়ে প্রাধান্য দান করেছে। ডিসেম্বর ১৯৮৮ সালে একটি আরব প্রস্তাবে পি.এল.ও. চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাতকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তাঁর বক্তব্য প্রদানের সুযোগ করে দেয়া হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ শুলজের পরামর্শে মার্কিন নিরাপত্তার খাতিরে ইয়াসির আরাফাতকে ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের গোড়া পত্তনের সময় যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের মধ্যে যে চুক্তি হয় তাতে বলা হয়, জাতিসংঘের কাজে যে কোন লোকের সদর দপ্তর নিউইয়র্ক গমনে যুক্তরাষ্ট্র বাধা প্রদান করবেন না। কিন্তু এ চুক্তিটি মার্কিন কংগ্রেসে পাস হবার সময় শর্ত আরোপ করা হয় যে, সে দেশের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যে কোন বিদেশির ভ্রমণ যুক্তরাষ্ট্র অগ্রাহ্য করতে পারবে। অতঃপর বিশ্ববাসীর সমালোচনার মুখে জেনেভায় জাতিসংঘের এক পরিপূর্ণ অধিবেশনে আরাফাতকে তাঁর বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়। আরাফাতকে ভিসা প্রদানে অস্বীকৃতি বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় ওঠে। এমনকি ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের অতি আপন বন্ধুরাও সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার বন্ধুবর্গ কিভাবে পি.এল.ও. নেতাকে জাতিসংঘে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ করে দিল তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। ১৯৭৫ সালের মধ্যভাগে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের সঙ্গে এ মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হন যে, যুক্তরাষ্ট্র পি.এল.ও.র সাথে কোন আলোচনা টেবিলে বসবে না বা স্বীকৃতি দেবে না যতক্ষণ না পি.এল.ও. ইসরাইলের টিকে থাকার অধিকার স্বীকার করে। ওয়াশিংটন পরে আরেকটি শর্ত আরোপ করে যে পি.এল.ও. ও সন্ত্রাসবাদীকে নিন্দা করতে হবে। মার্কিনিরা সে চুক্তি এ যাবৎকাল মেনে আসছে। বর্তমানে এ শর্তাবলি পুরোপুরি না মানা হলেও

www.pathagar.com

পশ্চিম তীরের ইন্তিফাদাহ এর দরুন যুক্তরাষ্ট্র অনুভব করে যে পি.এল.ও.র সাথে বৈঠকে বসা প্রয়োজন। এ ছাড়াও নভেম্বর ১৯৮৮ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কাউন্সিলের (P.N.C.) অধিবেশনে জাতিসংঘের '২৪২ নম্বর' প্রস্তাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসরাইলের টিকে থাকার অধিকার স্বীকার করা হয়। দ্বিতীয়ত ইন্তিফাদাহ্ পি.এল.ও.কে কিছুটা নমনীয় করেছে। কেননা, বিক্ষোভকারীরা ইসরাইলের সঙ্গে শান্তিতে সহাবস্থান চায়। অধিকন্তু দীর্ঘকাল এ বিক্ষোভের স্থায়িত্বের দরুন ফিলিস্তিন সমস্যাটাকে আর আলোচনা না করে পারা যাচ্ছে না। তৃতীয়ত ইদানীংকালে পি.এল.ও. ফিলিস্তিনিদের একমাত্র মুখপাত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকার মধ্য হতে পি.এল.ও. বিহীন অন্য নেতৃত্ব জেগে ওঠায় ইসরাইলি আশা দুরাশায় পরিণত হয়েছে। চতুর্থত বাদশাহ হোসেন কর্তৃক পশ্চিম তীর হতে তার দাবি প্রত্যাহারের ফলে বাদশাহকে অনীহা সত্ত্বেও ফিলিস্তিনি প্রতিনিধি বানাবার আশাও বিলীন হয়ে গিয়েছে। পঞ্চমত অধিকাংশ আরব দেশ কর্তৃক আকারে-ইঙ্গিতে ইসরাইলের টিকে থাকার অধিকার স্বীকার করে নেবার ফলে পি.এল.ও.র সাথে আলোচনায় বসার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, (Time, Dec. 12,1988)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপলব্ধি করেছে, আরাফাতের সাথে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে সে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনিদের সহাবস্থানকে অনেক দূর এগিয়ে নিতে পারে। একান্তই যদি আলোচনা ব্যর্থ হয় তবে বের হয়ে আসার পথতো খোলাই আছে।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮ পি.এল.ও. চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত জেনেভায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিপূর্ণ অধিবেশনে ঘোষণা করেন, "আরব-ইসরাইলি সংঘাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ তৎসহ ফিলিস্তিন ও ইসরাইলি রাষ্ট্র এবং অন্যান্য প্রতিবেশীর মধ্যে পি.এল.ও. এমন একটি গ্রহণযোগ্য মীমাংসা খুঁজে বের করবে যাতে সবাই শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করার অধিকার ও নিশ্চয়তা লাভ করে।" পরদিন ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ তিনি পুনরায় বলেন, "আমার গতকালের বক্তৃতায় পরিষ্কার বলা হয়েছিল যে, আমরা বুঝি ... মধ্যপ্রাচ্য সংঘর্ষে জাতি ও সকল পক্ষের এবং আমি যেমন উল্লেখ করেছি, তৎসহ ফিলিস্তিন, ইসরাইল রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিবেশীর শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করার অধিকার আছে। (Time, Dec. 26, 1988)।

এভাবে জেনেভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পি.এল.ও. নেতা আরাফাত, ইসরাইল ও অন্যান্য প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রের শান্তিতে বসবাস করার ঘোষণা দেবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পি.এল.ও.র সাথে সরাসরি আলোচনার আয়োজন করে।

www.pathagar.com

ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ এবং আরব দেশসমূহ এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও ইসরাইল এতে অসন্তুষ্ট হয়। মার্কিন প্রতিনিধি হিসাবে তিউনিসিয়াস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে চারজন পি.এল.ও. প্রতিনিধির সাথে ৯০ মিনিট স্থায়ী এক বৈঠকে মিলিত হন। উভয় পক্ষ বৈঠককে "বাস্তবধর্মী" বলে অভিহিত করে। পূর্বের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে যে, পি.এল.ও. 'সন্ত্রাসবাদ' বর্জন করুক। এটি পি.এল.ও.র দায়িত্ব কিভাবে তারা ইসরাইলকে শান্তি বৈঠকের জন্য আশ্বস্ত করবে। সিরীয়পন্থী আবু মুসা ব্যতীত পি.এল.ও.র সকল গ্রুপ এই ফলাফলকে স্বাগত জানায়। তবে কোন কোন সন্ত্রাস প্রিয় দলের নিকট এটি শ্রুতিমধুর নাও হতে পারে। যেমন, অধিকৃত এলাকায় আরাফাত বিরোধী চক্র আবার গণ্ডগোলের আয়োজন করে শুধু এটি প্রমাণ করার জন্য যে তাঁরা এ প্রচেষ্টার সাথে একমত নয়। আবার ইসরাইলের প্রধান বিরোধীদল আলোচনার বিরোধিতা করার জন্য হত্যাযজ্ঞের আশ্রয়ও নিতে পারে। তাছাড়া আরাফাত স্বয়ং নিহতও হতে পারেন।

তবে আরাফাতের ব্যক্তিগত যা লাভ হল তা তার ঝুঁকিকে ছাড়িয়ে গেল। ওয়াশিংটন ধরতে গেলে পি.এল.ও.কে ফিলিস্তিনিদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করে নিল। এটি আরাফাতের জন্য একটি বিরাট জয়। তিনি অনেক সময় পতিত হয়েছেন কিন্তু কখনও বহিস্কৃত হননি। তার সংগঠন বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছে এবং তার সেনাবাহিনী জর্ডান হতে ইসরাইল পর্যন্ত বিভিন্ন সেনাবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু কখনও ভেঙে পড়েনি। তাঁর জনগণকে তিনি অনেক ওয়াদা করেছেন কিন্তু কিছুই দিতে পারেননি। ১৯৮২ সালে একবার তাঁকে লেবানন থেকে উদ্ধার করা হয়। মাত্র এক বছর পূর্বে এক আরব শীর্ষ বৈঠকে তাঁকে প্রায় অবহেলা করা হয় এবং ফিলিস্তিন প্রসঙ্গে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করা হয়। এতদসত্ত্বেও বুদ্ধিমত্তার ফলে তিনি পুনরায় ওপরে উঠতে সক্ষম হন। অধিকৃত এলাকার বিক্ষোভও তাঁকে শক্তিশালী করে এবং একটি ঝুঁকি নিতে উদ্বুদ্ধ করে। সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করার ব্যাপারে তাঁর ওয়াদা ছিল দ্ব্যর্থহীন : লিপিবদ্ধ করার জন্য আমি পুনরায় বলছি আমরা সকল প্রকারের সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করি। ইসরাইলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানেও তাঁর ঘোষণা অত্যন্ত পরিষ্কার। কিন্তু এই ঘোষণায় বেকায়দায় পড়ে ইসরাইল। তাঁদের কূটনীতিবিদগণ এই ঘোষণার কোন পূর্ব পরিকল্পনা করতে পারেননি! এখন বাধ্য হয়ে তাদেরকে হয়ত আলোচনার টেবিলে বসতে হবে। অপরদিকে পি.এল.ও.র আন্তরিকতা যাচাই করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কিছুই হারাতে হবে না। তারা

www.pathagar.com

পরিকল্পনা করেছিল জর্ডানের বাদশাহ্ হোসেনকে মধ্যস্থতা করে আলোচনায় বসবে। কিছুদিন পূর্বে তিনি পশ্চিমতীর ছেড়ে দিলে সে পরিকল্পনা পরিত্যাগ হয়। যাহোক, আগামী দিনগুলোর কার্যাবলি প্রমাণ করবে এই আলোচনায় কারা লাভবান হল।

কিন্তু শান্তির সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পদদলিত করে ইসরাইল তার নিজস্ব পরিকল্পনায় অনড় থাকে। তারা আলোচনার টেবিলের দিকে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হয়নি। বিরক্ত হয়ে আরাফাত পশ্চিম তীরে বিক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দেন। ইসরাইলের সাথে সমস্ত যোগাযোগ তিনি বিচ্ছিন্ন করতে নির্দেশ দেন। তবে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক শামির পশ্চিম তীর ও গাজার নতুন নির্বাচনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু আরাফাত তা প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ এর অর্থ হল ইন্তিফাদাহর বিনাশ সাধন করা। যুক্তরাষ্ট্র আরাফাতকে আরও ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেন, যার অর্থ হল বিষয়টি পুনরায় হিমাগারে প্রেরণ করা হল।

সাইপ্রাস সমস্যা

উপসাগরীয় যুদ্ধ

১৯৯০ সালের ৯ই আগস্ট রাত ২টায় ইরাকের ট্যাংক বহর পার্শ্ববর্তী তেলসমৃদ্ধ দেশ কুয়েত দখল করে নেয়। রাজপ্রাসাদে স্বল্প সংঘর্ষের পর কুয়েতের আমির শেখ জাবের আল-আহমদ আল-সাবাহ হেলিকপ্টারযোগে পার্শ্ববর্তী দেশ সৌদি আরবে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কুয়েত দখলের পর ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন কেউ বাধা প্রদান করলে সমগ্র এলাকা ধ্বংস করে দেয়া হবে।

পশ্চিমা শক্তিবর্গ এ দখলে অস্থির হয়ে ওঠে। কারণ সাদ্দাম হোসেনকে হয়তো কাবু করা যাবে কিন্তু তা অত সহজে নয়। এই ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়, উপসাগরীয় তেলসমৃদ্ধ পাশ্চাত্যের মিত্র রাষ্ট্রগুলো আতংকগ্রস্ত হয়। মধ্যপন্থী রাষ্ট্রবর্গ যারা সিরিয়া ও মিসরীয় অহমিকায় আঘাত লাগায় এবং সর্বোপরি ইসরাইলের জন্য সামরিক হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবধানে সাদ্দাম হোসেন আরব বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তিধরে পরিণত হন। বিশ্বের তেলের বাজারে তিনি অদ্বিতীয় তেল নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে আবির্ভূত হন। ইতোমধ্যে ইরাকি বাহিনী সমগ্র কুয়েত দখল করে দক্ষিণে সৌদি আরবের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়া হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের সাথে বাণিজ্য অবরোধ গড়ে তোলে এবং ইরাক ও কুয়েতের সবধরনের তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ অবিলম্বে কুয়েত থেকে ইরাকের সৈন্য প্রত্যাহার দাবি করে এবং সাদ্দাম তাতে কর্ণপাত না করলে শাস্তি বিধানের হুমকি দেয়। ইরাকের সর্ববৃহৎ অস্ত্র সরবরাহ করা সোভিয়েত ইউনিয়ন হঠাৎ ইরাকের সাথে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে। ঘটনার একদিন পর যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিকভাবে ইরাকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের ডাক দিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন অভাবিতভাবে এতে সমর্থন দেয় (Newsweek, August, 13,1990)। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ তাৎক্ষণিকভাবে ঐ অঞ্চলে মোতায়েন তিনটি সীমানাবাহী জাহাজকে কুয়েতের দিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেন। আরব লীগ এ ঘটনায় ইরাকের নিন্দা করে, অবশ্য ২১ সদস্যের মধ্যে ৮ জন বিরত থাকে বা বিপক্ষে ভোট দেয়।

কুয়েত দখলের কারণ ব্যাখ্যা : কুয়েত দখলের কারণ হিসাবে ইরাকের বক্তব্য হল যুগ যুগ ধরে কুয়েত নামক এলাকাটি বর্তমান ইরাক এবং প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার অংশ হিসাবে বিদ্যমান ছিল। তাই বসরা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত কুয়েতকে ইরাক ইতিপূর্বেও তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দাবি করেছে। ১৯৩০-এর দশকে ইরাকের সাথে ব্রিটেনের যেসব বিষয়ে মতবিরোধ ছিল তন্মধ্যে একটি হল তেলসমৃদ্ধ কুয়েত অঞ্চলের মালিকানা সম্পর্কীয়। তখন উভয়ে ঐ অঞ্চলের মালিকানা দাবি করছিল। অবস্থা চরম আকার ধারণ করে ১৯৬১ সালের জুন মাসে যখন কুয়েতের ওপর ১৮৯৯ সালের চাপানো ব্রিটিশ হুকুমনামা (Mandate) উঠিয়ে নেয়া হয় এবং তেল সমৃদ্ধ এদেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হয়। এ উপলক্ষে তৎকালীন ইরাকের সামরিক শাসক জেনারেল করিম কাশেম কুয়েতকে ইরাকের অংশ বলে ঘোষণা করেন এবং এদেশ অধিকার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু তৎকালে তাঁর সাহায্যার্থে কোন আরব দেশ বিশেষতঃ মিসর এগিয়ে না আসায় সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেপ্টেম্বর নাগাদ ব্রিটিশ সৈন্য কুয়েত ত্যাগ করলে মিসর জর্ডান ও সৌদি আরবের সম্মিলিত বাহিনী কুয়েত রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হয়।* পরবর্তীকালে ব্রিটেন তার নিজস্ব স্বার্থে কুয়েত নামক এ এলাকাটিকে পৃথক একটি রাষ্ট্র হিসাবে সৃষ্টি করে। কুয়েত দখলের অর্থনৈতিক কারণগুলো সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিগত ইরাক-ইরান যুদ্ধে ইরাক প্রায় ষাট বিলিয়ন বা ততোধিক ডলার ধার

*ইয়াহইয়া আবমাজানী লিখিত মুহাম্মদ ইনাম উল হক অনূদিত মধ্যপ্রাচ্য : অতীত ও বর্তমান, পৃ. ৪২৬।

www.pathagar.com

করে। কুয়েত ইরাকের এই যুদ্ধ চালাবার জন্য পনের বিলিয়ন ডলার সুদহীন ঋণ ইরাককে প্রদান করেছিল। এখন ইরাক চায় কুয়েত ঐ ঋণ মওকুফ করে দিক। শুধু তাই নয় ইরাক অভিযোগ উত্থাপন করে তেল রপ্তানিকারক সংস্থা (OPEC) কুয়েতকে যে পরিমাণ তেল উত্তোলন করা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিল, কুয়েত তার চেয়ে অধিক তেল উত্তোলন করে ফেলেছে। এই বাড়তি তেল উত্তোলনের ফলে ইরাকের চৌদ্দ বিলিয়ন ডলারের রাজস্ব ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে ইরাকের দাবি অনুযায়ী তেল রপ্তানিকারক সংস্থা তেলের মূল্য প্রতি ব্যারেল ১৮ হতে ২১ ডলারে বৃদ্ধি করতে রাজি হয়েছিল কিন্তু ইরাকের দাবি হল ২৫ ডলার। ইরাক আরব স্বার্থে ইরানের বিরুদ্ধে লড়েছে, এখন যুক্তিসঙ্গতভাবে সে চায় তার আরব প্রতিবেশীরা তার যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি চাঙ্গা করতে সহায়তা করুক।

ইরাকের কুয়েত দখলের ভৌগোলিক কারণ হল, কুয়েত ইরাকের (পারস্য) উপসাগরে** প্রবেশের পথ বন্ধ করে রেখেছে। উপসাগরে ইরাকের একমাত্র বন্দর উম্মে কাসরের মুখে কৌশলগত অবস্থানে বিদ্যমান দুটো দ্বীপ কুয়েতের নিকট ইজারা হিসাবে ইরাক দাবি করে কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হয়। ইরাকের অপর নদীপথ শাত-আল আরব, যার জন্য ইরাক ইরান আক্রমণ করেছিল কিন্তু এর গতিপথ তখনও যুদ্ধের ডুবন্ত জঞ্জালের জন্য বন্ধ ছিল।

ইরাককে নিরস্ত্র করার জন্য মার্কিন কৌশল ও তার কারণ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে শায়েস্তা করার জন্য বিভিন্ন পন্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে কারণ, এ ব্যাপারে ত্বরিত কোন ব্যবস্থা না নিলে তাদের মতে সদ্য সমাজতন্ত্র বিমুক্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিমা বিশ্বের অন্যান্য দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের আশঙ্কার আরেকটি কারণ হল, ৩০ দিনের মধ্যে কিছু একটা করতে না পারলে ইরাক সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত তেলক্ষেত্রগুলো দখল করে নেবে। সামরিক ব্যবস্থার কথাও যুক্তরাষ্ট্র চিন্তা করে, কিন্তু দুর্ধর্ষ এক লক্ষ ইরাকি বাহিনীর বিরুদ্ধে একাকী লড়ার কথা সে ভাবতেও ভয় পায় (Newsweek August 13, 1990)। তবে সামরিক ও রাজনৈতিক যৌথ ব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করা যায়। ইরাক ও দখলকৃত কুয়েতের তেল রপ্তানি বন্ধ করতে পারলে কাজ হতে পারে, অবশ্য তুরস্ক ও সৌদি আরব ইরাকের পাইপলাইন বন্ধ করতে রাজি

** আরবরা পারস্য উপসাগর বলতে নারাজ, কারণ এর পূর্ব তীরে পারস্য হলেও পূর্ব তীরে আরব দেশ। অতএব, ঐতিহাসিকভাবে পারস্য উপসাগর নাম হলেও আরবরা একে শুধু উপসাগর বলতে পারস্য উপসাগর হবার কারণ হল পুরনো পারস্য সভ্যতা আরব পারস্য সাম্রাজ্যের প্রভাবে এ নাম করা হয়েছে যখন আরব দেশ ইতিহাসে তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি।–গ্রন্থকার

www.pathagar.com

হলে তৎসঙ্গে উপসাগরের উত্তরাঞ্চলে ইরাকের তেলবাহী জাহাজের সংকীর্ণ জলপথ বন্ধ করার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রকে নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র এটিও চিন্তা করেছে, সামরিক ব্যবস্থার ব্যাপারে অধিকাংশ সামরিক শক্তির সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার প্রেসিডেন্ট বুশের সাথে পরামর্শক্রমে ঘোষণা করেন, "সমগ্র বিশ্ব মেরুদণ্ড খাড়া রাখতে পারলে সাদ্দামের বিরুদ্ধে একটি ধর্মযুদ্ধ (Crusade) আয়োজন করতে বেশি সময় লাগবে না (Newsweek, ঐ)।

ইসরাইল তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এই বলে যে, ইরাকের বৈরী মনোভাব সম্পর্কে তারা সময়মত সতর্ক সংকেত দিয়েছিল কিন্তু কেউ তাতে কর্ণপাত করেনি। তবে ইহুদিবাদীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে কারণ বিশ্বের দৃষ্টি ফিলিস্তিনি থেকে সরে গেল। তাদের বক্তব্য হল, মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে নয় বরং বৈরী ও শক্তিসম্পন্ন আরব রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার মধ্যে নিহিত। তাই ইতিমধ্যে ১৯৮১ সালে ইসরাইল আসিরাকে অবস্থিত ইরাকের পারমাণবিক স্থাপন ধ্বংস করেছে। কিন্তু বর্তমানে ইরাকের আক্রমণক্ষম স্থাপনাসমূহ অন্তত দু'ডজন স্থানে বিক্ষিপ্ত রয়েছে এবং সেগুলো পাহারা দিচ্ছে রুশ নির্মিত SAM-13 ও SAM-14 ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ। ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালে ইসরাইল মিসর ও সিরিয়ার শতকরা ৯০ ভাগ জঙ্গি বিমান ধ্বংস করেছিল কিন্তু ইরাকের সব ধ্বংস করলেও শতকরা ৯০ ভাগ অক্ষত থাকবে যা দ্বারা সে তেল আরবে অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করতে সক্ষম হবে। তবে ইরাক যদি জর্ডানের ওপর দিয়ে সৈন্য পরিচালনাকরত ইসরাইল আক্রমণ করে বসে সেক্ষেত্রে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা ছাড়া ইসরাইলের আর কোন বিকল্প শথাকবে না।

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরাক ও কুয়েতি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পর ইরাক তার বিদেশি কূটনৈতিক মিশনের সদস্যদের ইরাক ত্যাগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন পাশ্চাত্য জগতের সমর প্রস্তুতির জবাবে শুধু মন্তব্য করেন "যুদ্ধ সারি সারি মৃতদেহ ফেলে যাবে।" মার্কিন জনগণ মধ্যপ্রাচ্যে সৈন্য মোতায়েনের ব্যাপারে বুশ পরিকল্পনা অনুমোদন করলেও কূটনীতিকদের মুক্তির ব্যাপারে আরও সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয় কারণ এতে হাজার হাজার জীবন বিনষ্ট হতে পারে। অতএব যুক্তরাষ্ট্র কূটনীতিকদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে এবং অতি দ্রুত সৌদি আরব ও উপসাগরে সৈন্য এবং যুদ্ধোপকরণ বৃদ্ধিতে তৎপর হয়। এদিকে সে সৌদি আরবের উত্তর সীমান্তে মোতায়েনযোগ্য ইরাকের চার ডিভিশন সৈন্যদের সামাল দেবার জন্য এফ-১৫ বোমারু জঙ্গি বিমান সজ্জিত রাখে অপরদিকে কুয়েত দখলের জন্য কমান্ডো

www.pathagar.com

বাহিনী, প্যারাস্যুট বাহিনী এবং স্থলবাহিনী মোতায়েন করে। ইরাকি বাহিনী যাতে কুয়েতে তার সৈন্য আনতে না পারে তজ্জন্য সে বিমান বন্দর, স্কার্ড-ক্ষেপণাস্ত্র স্থল এবং রাস্তার যোগাযোগ স্থল ধ্বংসের পরিকল্পনা হাতে নেয়।

অতঃপর কুয়েত দখলের দু'মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ১,২৫,০০০ সৈন্য সৌদি আরবে প্রেরণ করে। নৌবাহিনীতে থাকে তিনটি বিমানবাহী জাহাজ, প্রত্যেকটিতে ৬০টি করে জঙ্গি বিমান, যুদ্ধ জাহাজ, দূর-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সহকারে একটি ফ্লোটিলা। বিমান বাহিনীতে ২০০ জঙ্গি বিমান সৌদি আরব পৌঁছে। এর মধ্যে অত্যাধুনিক জঙ্গি বিমানও অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া ৩৩,০০০ নৌসেনা রাখা হয় এক মাসের যাবতীয় সাহায্য- সহযোগিতা দানের জন্য। অপরদিকে ইরাকের হাতে থাকে ১০ লক্ষ নিয়মিত সৈন্য, যথেষ্ট ক্ষেপণাস্ত্র ৫০০ জঙ্গি বিমান এবং বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক অস্ত্র।

জিম্মি সমস্যা : ১৯৮০ সালে তেহরানে ৫২ জন মার্কিন নাগরিক জিম্মি হিসাবে আটক হওয়ায় প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের পতন হয়েছিল। লেবাননে ছয়জন মার্কিন নাগরিক উদ্ধার করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট রেগ্যানকে ইরান-কন্ট্রা কেলেংকারিতে জড়াতে হয়েছিল। এখন প্রেসিডেন্ট বুশকে ইরাকে আটক ৩৫০০ মার্কিন নাগরিকের উদ্ধারের ব্যাপারে গলদঘর্ম হতে হয়। এছাড়াও ইরাকের হাতে আরও হাজার হাজার ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় নাগরিক আটক হয়।* যদ্দরুন কুয়েতে সামরিক অভিযান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইরাকি প্রেসিডেন্ট তাদেরকে জিম্মি বলে আখ্যায়িত না করলেও কার্যত বাগদাদের আল রশিদ হোটেলে ৩৮ জন, কুয়েতে ৩০০ এবং ইরাকে কর্মরত ৫৮০ জন মার্কিন নাগরিকের ন্যায় আরও হাজার হাজার ইউরোপীয় নাগরিক জিম্মির মতোই কালাতিপাত করে।

এদিকে ক্রমাগত মার্কিন প্রস্তুতি এবং জাতিসংঘ আরোপিত অবরোধের মুখে ইরাক হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে যে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা জোরদার করলে সে মার্কিন ও অন্যান্য জিম্মিদেরকে তার বিমানঘাঁটিগুলোতে আবদ্ধ রাখবে যাতে শত্রু আক্রমণের ধাক্কা তাদের ওপর দিয়ে যায়। তাছাড়া খাদ্যশস্য আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইরাকি সৈন্য ও বেসামরিক লোকদের খাদ্য সরবরাহের পর উদ্বৃত্ত খাদ্য জিম্মিদেরকে দেয়া যেতে পারে। এই খাদ্য

---

* ব্রিটিশ : ৪৭০০; ফরাসি : ৫৬০; জাপানি : ৫০৮; সোভিয়েত ৮৭১০; অন্যান্য ইউরোপীয় : ৩১০৭ (Newsweek, 29 August 1990)।

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিদেশি পরিবারের শিশুদের ওপরও প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের তেল রফতানি এবং উপসাগরের কুয়েতি প্রবেশ পথে এবং আকাবা উপসাগরের মুখে অবরোধ আরোপ করে। ফলে ইরাক সম্পূর্ণভাবে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এদিকে ১৮ই নভেম্বর আটককৃত সকল বিদেশি জিম্মিদেরকে মুক্তিদানের কথা ইরাক বিবেচনা করে। তবে আটককৃত জিম্মিদের মধ্যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ইতিমধ্যে ছাড়া পেয়ে যায়।

ইরাকের প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্ত্র ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ বন্ধ করার পরও যুক্তরাষ্ট্র একা ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় শংকা প্রকাশ করে এবং তাই সে বিশ্বের অন্যান্য দেশের নিকট সামরিক সাহায্য চেয়ে পাঠায়। প্রত্যুত্তরে ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, সিরিয়া, বাংলাদেশ, মিসর, কানাডা এবং মরক্কো যুক্তরাষ্ট্রের ডাকে সাড়া দেয়। পরে তুরস্ক এবং ইতালি তাদের বিমান ঘাঁটি ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করে। তাছাড়া আরব লীগের অধিকাংশ সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তাদের মতামত ব্যক্ত করে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ট্রেজারিমন্ত্রী এই যুদ্ধের জন্য ২৫ বিলিয়ন ডলার নগদ ও পণ্যে প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। কে এই বিপুল খরচ বহন করবে? সৌদি সরকার মধ্যপ্রাচ্যে ব্যয়কৃত সমস্ত খরচ (যানবাহন, পানি, জ্বালানি) বহন করতে রাজি। নির্বাসিত কুয়েত সরকার ৫ বিলিয়ন ডলার দিতে রাজি হয়। ব্রিটেন সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে রাজি। জাপান ইতিমধ্যে এক বিলিয়ন ডলার দিতে রাজি হয় এবং আরও দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় (Time September 17, 1990)।

অপরদিকে ইরাকের পক্ষে থাকে জর্ডান, সুদান, তিউনিসিয়া, লিবিয়া এবং ইয়েমেন। অনারব দেশের মধ্যে শক্তিশালী ইরান ইরাকের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে এবং প্রয়োজনবোধে সৈন্য পাঠাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। শুভেচ্ছাস্বরূপ ইরাক শাত-আল-আরবের ওপর তার দীর্ঘদিনের দাবি ছেড়ে দেয়।

নিরাপত্তা পরিষদের ৬৭৮ নম্বর সিদ্ধান্তের ফলে উপসাগরীয় যুদ্ধ এক নতুন অধ্যায়ে পদার্পণ করে। এ সিদ্ধান্তে উল্লেখ রয়েছে ইরাক যদি এ পর্যন্ত গৃহীত নিরাপত্তা পরিষদের সমস্ত সিদ্ধান্ত মেনে না নেয় তবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার খাতিরে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে যারা কুয়েতকে সহায়তা দিচ্ছে তারা ইরাকের বিরুদ্ধে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ইরাককে ১৫ জানুয়ারি ১৯৯১ পর্যন্ত সময়

www.pathagar.com

বেঁধে দেয়া হয়। অপরদিকে কুয়েত ত্যাগ করে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানের জন্যও ইরাকের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ১৯৫০ সালের কোরিয়া সমস্যার পর এই প্রথম জাতিসংঘ জোরপূর্বক এলাকা দখলের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দিল (Newspot, Turky, December 6, 1990)।

কুয়েত পুনরুদ্ধারে মার্কিন স্বার্থ : ১৯৬৭ সালে ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনি এলাকা দখল, ১৯৭৬ সালে সিরিয়া কর্তৃক লেবাননের অধিকাংশ এলাকা দখল করা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিপাত হয়নি। তবে ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল করার পর বিশ্বব্যাপী এত আলোড়ন সৃষ্টি হল কেন? এই আলোড়নের প্রেক্ষিতেই ১৯৯০-এর সেপ্টেম্বরে হেলসিংকিতে দুই পরাশক্তির মধ্যে শীর্ষ সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হল। ইদানীংকালে বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় সার্বিয়দের দ্বারা মুসলিম নিধনের মধ্যেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্ববিবেক অনেকটা নির্বিকার কিন্তু কুয়েতের ব্যাপারে এত হৈ চৈ কেন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুয়েত ও সৌদি আরব রক্ষার জন্য লক্ষ কোটি ডলার মূল্যের বিশালকায় সেনা, নৌ ও বিমানবহরসম্বলিত ডেজার্ট শিল্ড (Desert Shald) বা মরুবর্ম অভিযান পরিচালনা করে। অথচ লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনিকে অসহায়ভাবে তাদের ঘর-দুয়ার থেকে বিতাড়িত করতে সে সহায়তা করেছে—কিন্তু কেন?

এর একমাত্র উত্তর মধ্যপ্রাচ্যের তেলসম্পদ। এর কারণ এ নয় যে যুক্তরাষ্ট্র তার জ্বালানি চাহিদার অর্ধেক আমদানি করে বরং এ জন্য যে, বিশ্বের মোট তেল উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ এ অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। ইরাকের কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে যে সংকটের সৃষ্টি হল তা এমনিতেই হত। এ সংকট উত্তরণের পর মার্কিন সৈন্য এ এলাকা ছেড়ে চলে যাবে তা ভাবা ভুল। আরব ভূখণ্ডে পশ্চিমা তেল কোম্পানিসমূহের শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থই জড়িত নয়, বরং পশ্চিমের ধনশালী দেশসমূহ মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর চরমভাবে নির্ভরশীল। তাই এ এলাকায় যেকোন রাজনৈতিক পরিবর্তন পশ্চিমা পুঁজিবাদী গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে। মধ্যপ্রাচ্যে বিরাজমান রাজনৈতিক ভারসাম্য পশ্চিমা বিশ্বের তেলনির্ভর দেশসমূহের স্বার্থরক্ষা করে বলে তারা এ অবস্থা বিঘ্নিত হোক তা চায় না। ইরাকের কুয়েত দখলের ফলে পশ্চিমাগোষ্ঠীর স্বার্থ এবং স্থিতি অবস্থা বিঘ্নিত হবার সমূহ আশংকাই মূলত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের বর্তমান প্রতিক্রিয়ার অন্তর্নিহিত কারণ। অতএব এ কথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে মার্কিন সরকার শুধু কুয়েতের রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই এগিয়ে আসেনি। এ ঘটনার সমকক্ষ ধরা যায়, ১৯৪৭ সালের প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কর্তৃক কমিউনিজমের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

গ্রিসকে সাহায্য করার ঘটনাকে, যার পরিণতিতে ন্যাটো (NATO) সৃষ্টি হয়েছিল। সে সময় সমস্যা ছিল কমিউনিজম ঠেকানো, আর বর্তমান সমস্যা হল তেল এলাকার নিয়ন্ত্রণ লাভ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তেল আমদানি বাদ দিলেও পাশ্চাত্য জগত প্রায় সম্পূর্ণভাবে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর নির্ভরশীল—ফ্রান্স শতকরা ৩৫ ভাগ, ইতালি ৩২ ভাগ, জাপান ৬৪ ভাগ এবং এরূপ অন্যান্য দেশ। কোন দুর্ঘটনায় তেল বন্ধ হলে এটি ইউরোপ, জাপান এবং আরও অনেক উন্নয়নশীল দেশকে পঙ্গু করে দেবে।

বিভিন্ন দেশ ধর্ম, নৃতত্ত্ব ও ইতিহাসের নিয়মে পৃথকীকৃত। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে তারা একে অপরের সাথে বাঁধনযুক্ত। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য এ পৃথকী অবস্থা মধ্যপ্রাচ্যে যেরূপ ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে অন্য কোথায়ও অনুরূপ করে না। সমস্যা হল তেল রফতানিকারক সংস্থা (OPEC)-কে নিয়ন্ত্রণ করবে? সাদ্দাম চান তেলের দাম বাড়াতে আর যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য রসদপত্রের দাম কমাতে, আর যুক্তরাষ্ট্র চান এর উল্টোটা। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক বাদশাহ্ এবং আমিরগণও মার্কিন সুরে কথা বলেন। অতএব, সাদ্দাম এখানে উপলক্ষ মাত্র বা বলা যেতে পারে সর্বশেষ শত্রু যে তালিকার পূর্বে ছিলেন আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী, সিরিয়ার হাফিজ আল-আসাদ এবং ইয়াসির আরাফাত। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রভাবকে নতুন ধাঁচে বিন্যস্ত করার প্রেক্ষাপটে এবং অভ্যন্তরীণ তীব্র অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ঐ অঞ্চলে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে বলেও কোন কোন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক অভিমত প্রকাশ করেন। ১৯৮৯-৯০ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট ঘাটতি ছিল ২৪১৭০ কোটি ডলার। এ ঘাটতি ১৯৮৬ সালের ঘাটতিকেও হার মানিয়েছে। ৮০-এর দশকে দুটো পরাশক্তির স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ব্যবসা কমে আসে। ১৯৯১ সালের শুরুতে এ ঘাটতি আরও প্রকট হয়ে ওঠে। উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে এ পর্যন্ত মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীরা ৬০ বিলিয়ন ডলার (৬ হাজার কোটি ডলার) এর অস্ত্র বিক্রয় করেছে, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে অস্ত্র ব্যবসায়ীরা আরও লাভবান হবে—জয়-পরাজয় যেদিকে যাক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র সমরাস্ত্র ও টেকনোলোজির ক্ষেত্রের যে বড় ধরনের সাফল্য এনেছে বর্তমান যুদ্ধ সেসব উন্নত প্রযুক্তি যাচাইয়েরও একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে। পেন্টাগনের একজন সমরাস্ত্র প্রকৌশলী উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত লেজার বোমা,

www.pathagar.com

টমাহক এবং পেট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র ও এম-১, এম-১, এ-১ প্রভৃতি অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র পরীক্ষার একটি যোগ্য ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

ভিয়েতনাম যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের দীর্ঘদিন পর যুক্তরাষ্ট্র এই প্রথমবারের মত উপসাগরীয় যুদ্ধে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস বেকার তিনটি নতুন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। এ তিনটি পরিকল্পনা হল : (১) ইসরাইল–আরব বিরোধ নিরসনের নতুন দিক নির্দেশ করা, (২) মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নিয়ন্ত্রিত নতুন আঞ্চলিক পরিকল্পনা গড়ে তোলা এবং (৩) স্নায়ু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে নতুন মার্কিন ধাঁচে গড়ে তোলা। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী মিসর, ইসরাইল, উত্তর ইরাক, তুরস্ক এবং সিরিয়াসহ একটি নতুন নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করা যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হবে। এই পরিকল্পনা ইসরাইলকে এমন এক শান্তিকামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে যা যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প নির্ধারক শক্তি হিসাবে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, যাতে তিনটি মহাদেশ ও দুটো মহাসাগরের সংযোগস্থল এবং সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও পৃথিবীর ৭০ ভাগ তেল সরবরাহকারী এ অঞ্চলের ওপর যুক্তরাষ্ট্র তার নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখতে পারে।

অতএব মধ্যপ্রাচ্যের তেলক্ষেত্র বা ওপেক-এর ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে হবে এবং নিয়ন্ত্রণ লাভ করার জন্য সাদ্দাম হোসেনকে বাধা দিতে হলে একা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভবও নয় আর যুক্তিযুক্তও নয়। কারণ সেক্ষেত্রে সকলের আক্রোশ যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নিপতিত হবে। Newsweek-এর নিবন্ধকারের মতে মার্কিন সৈন্যরা যদি সাদ্দামকে দমন করে ফিরে আসে তবে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে এটিও হবে এক চরম বোকামি। আরব সামরিক শক্তিগুলো হয় কিছুটা বোঝা হালকা করতে পারে। কিন্তু সৌদি আরব ও কুয়েতকে রক্ষা করার জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে অন্যান্য শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলোকে এবং প্রয়োজনবোধে ন্যাটো, জাতিসংঘ বা এ ধরনের নতুন চুক্তির দ্বারা পাশ্চাত্য শান্তি মিশন মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ীভাবে রাখতে হবে (Newsweek, August 20, 1990)।

বাগদাদে প্রথম মার্কিন বিমান হামলা

১৬ জানুয়ারি ১৯৯১, ২৭টি দেশের সম্মিলিত বাহিনীর প্রথম জঙ্গি বিমান বহর বাগদাদে হামলা চালায়। সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল নরম্যান সোয়ার্জকফ (Norman Schworzkopf) এ অভিযানের নাম দেন ডেজার্ট স্টর্ম

www.pathagar.com

(Desert Storm) বা মরুঝড়। মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রে মোতায়েনকৃত ৪,৫০,০০০ সৈন্য ছাড়াও তাঁর নেতৃত্বে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ২৬টি বন্ধুরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক বিমান ও নৌবহর। সর্বাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র ও গোলন্দাজ ইউনিটসমূহ বিশ্বের যেকোন বাধা দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে ফেলার শক্তি নিয়ে বাগদাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। অপরদিকে ইরাকের রিপাবলিকান গার্ড বাহিনী যথেষ্ট পরিমাণ রসদ গোলাবারুদ, ট্যাংক এবং বিমান বিধ্বংসী কামান নিয়ে মাটির তলায় শক্ত বাংকারের নিচে লুক্কায়িত। যুদ্ধের প্রাথমিক বিমান আক্রমণের পর অতর্কিতে এগুলোকে বের করে শত্রুমহলে ভীতি সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। প্রতিনিয়ত বি-৫২ মার্কিন বোমারু বিমানের টন টন বোমা নিক্ষেপের দ্বারা ইরাকি বাহিনীর মনোবল ভেঙে যাবার কথা, যেমনটি হয়েছিল ১৯৬৭ সালে আরব- ইসরাইলি যুদ্ধের সময় মিসরীয় বাহিনীর। কিন্তু ইরাকি বাহিনী পর্বতসম অটল। অবসরপ্রাপ্ত একজন মার্কিন সেনা অফিসারের মতে, "শক্তিশালী আক্রমণ চালিয়ে আপনি তাদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারেন কিন্তু এরা ইরাকি জাতি, যুদ্ধ তারা করবেই" (Newsweek, January 28, 1991)।

মনে হল বিষয়টি খুবই সহজ। মার্কিন বিমানের গোলা সঠিক লক্ষ্যবস্তুতে একের পর এক পড়তে লাগল। অপরদিকে পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরে অবস্থানরত যুদ্ধ জাহাজ হতে ক্রুজ মিসাইল ও কামানের গোলাসহ অনবরত বাগদাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে পড়তে থাকে। একদিকে আকাশ সীমানায় বোমা ফাটার বড় বড় নিনাদ অপরদিকে ইরাকের বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলায় রাত্রির অন্ধকার বিলীন হওয়া মহাপ্রলয়ের ভয়াবহতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ডেজার্ট শিল্ড (মরুবর্ম) ডেজার্ট স্টর্মে (মরুঝড়ে) রূপান্তরিত হবার পর আকাশ যুদ্ধ। মনে হল চৌকাঠ পার হয়ে নতুন প্রজন্মে প্রবেশ করল। একদিকে ইরাকের স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র সৌদি আরব ও তেলআবিবে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে অপরদিকে মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রোটিয়া ক্ষেপণাস্ত্র আকাশপথে বিপক্ষ বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্রকে কোন কোন ক্ষেত্রে আঘাত করতে সক্ষম হয়। মোট কথা এ যাবৎকালের যত অপরীক্ষিত অস্ত্র ছিল সবই বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষিত হতে থাকে। যুদ্ধের এক খতিয়ানে দেখা যায় প্রথম ১৪ ঘণ্টায় সম্মিলিত বাহিনী ইরাকে ১০০০টি বিমান হামলা চালায়। প্রথম ১৪ ঘণ্টায় তারা প্রায় ২২৩২ টন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক নিক্ষেপ করে। ২০০০ বিমান হামলায় তাদের ৮টি বিমান ভূপাতিত হয় (Newsweek, June 28, 1991)।

www.pathagar.com

প্রথমে নয় দিনের বিমান হামলার পরিকল্পনা নেয়া হলেও ইরাকি মনোবল বা স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রের তেমন কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয়নি।

পেন্টাগন অতঃপর মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে সাদ্দাম হোসেনের রিপাবলিকান গার্ড খতম করার জন্য, যে গার্ডরা বিদ্যুৎগতিতে কুয়েত দখল করেছিল। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ডিক চেনরি মতে, "সাঁজোয়া, পদাতিক এবং বিশেষ অভিযান চালাবার উপযোগী আট ডিভিশন সৈন্য সম্বলিত রিপাবলিকান গার্ড সাদ্দামের সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রাণকেন্দ্র। এর লোকবল ১,৫০,০০০ পর্যন্ত। একে অকেজো করতে পারলে জয় সুনিশ্চিত, তবে তা অত সহজ নয়। মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে বি-৫২ বোমারু বিমান দ্বারা এক সপ্তাহের কার্পেট সাদৃশ্য বোমার আঘাতের পরও রিপাবলিকান গার্ডদের তেমন কোন ক্ষতি করা সম্ভব হয়নি। এসব গার্ড সুরক্ষিত, অত্যাধুনিক অস্ত্র সজ্জিত, সম্মানিত ও উচ্চ বেতনভুক্ত। তাদের যুদ্ধকৌশল অতি উন্নত মানের, পাল্টা আক্রমণে সুদক্ষ এবং শত্রুর অন্তরে ত্রাস সৃষ্টিতে অদ্বিতীয়" (Newsweek January 28, 1991)। অতএব এ জাতীয় একটি বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য সম্মিলিত বাহিনী আরও শক্তিশালী আক্রমণের ধারা রচনায় ব্যাহত হয়।

কিন্তু যে গার্ড ও সময়সীমার মধ্যে ইরাককে পদদলিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল দেখা গেল তা সুদূরপরাহত। তাই মুখে উচ্চারণ না করলেও প্রেসিডেন্ট বুশ সাদ্দাম হোসেনকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যে স্থলে সাদ্দাম অবস্থান করছিলেন তথায় একটি বিমান হামলা খারাপ আবহাওয়ার দরুন ব্যর্থ হয়। মার্কিন প্রশাসন অস্বীকার করলেও জেনারেল কলিন পাওয়েলের ভাষায়, "বাগদাদ হতে আগত যুদ্ধ পরিকল্পনার স্নায়ু কেন্দ্রে আঘাত করো" (Newsweek, January 4, 1991)। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সৌদি-কুয়েতি সীমান্তে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সম্মিলিত বাহিনীর গাড়ি, ট্যাংক, সৈন্য ও সাঁজোয়া বহরে মনে হল স্থলযুদ্ধ অত্যাসন্ন কিন্তু এই স্থলযুদ্ধ আরম্ভ হতে আরও প্রায় দু'সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে গেল। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে হঠাৎ ইরাকি বাহিনী সৌদি উপকূলীয় শহর মাফজির ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে তা দখল করে নেয়। এই হঠাৎ আক্রমণে মিত্রবাহিনী হতভম্ব হয়ে যায়। প্রায় ৩৬ ঘণ্টা অবস্থানের পর মিত্র বাহিনীরা মাফজি ছেড়ে যায় এবং মিত্র বাহিনীর জন্য এ শিক্ষা রেখে যায় যে, বেপরোয়া কামানের গোলাবর্ষণের পর ইরাকি বাহিনী "সুশৃঙ্খল ও অতি উত্তম।" ইরাকি বাহিনীকে হটিয়ে দেয়া সম্ভব

www.pathagar.com

হলেও মিত্র বাহিনী তথা বিশ্ববাসীর নিকট একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিন সপ্তাহের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের পরও ইরাকি বাহিনীর আক্রমণের ক্ষমতা বিনষ্ট করা সম্ভব হয়নি।

মাফজিতে ইরাকি আক্রমণকে একটি উস্কানিমূলক ঘটনা হিসাবেও বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ইরাকি পরিকল্পনা মতে মাফজি থেকে পশ্চাদপসরণের পর মিত্রবাহিনী স্থলযুদ্ধ আরম্ভ করলে তাদের ভরাডুবির আশংকা ছিল কারণ ইরাকি রিপাবলিকান গার্ডরা তখনও সতেজ কিন্তু মিত্রবাহিনী সে ফাঁদে পা দেয় নাই। তারা আরও দু'সপ্তাহ বাগদাদে তথা ইরাকের আনাচে-কানাচে বিরামহীন বিমান ও গোলন্দাজ আক্রমণ চালিয়ে সাদ্দাম হোসেনকে খতম করতে না পারলেও তাঁর অস্ত্র ভোঁতা করে দেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল স্থলযুদ্ধ আরম্ভ হলে যাতে মিত্রবাহিনীর হতাহতের সংখ্যা কমে যায়।

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের আরেকটি চমকপ্রদ ঘটনা হল, ইরাকি বাহিনীর প্রায় ৯০টি জঙ্গি বোমারু ও সংকেত প্রদান করে বিমানের ইরানে অবতরণ। মিত্রবাহিনী ইরানকে হুঁশিয়ার করে দেয় যে, সে দেশ থেকে কোন বিমান হামলা হলে ইরান মিত্রবাহিনীর আক্রমণের শিকার হবে। কিন্তু পরে দেখা গেল মিত্রবাহিনীর আঘাতে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এগুলোকে ইরানে পাঠানো হচ্ছে।

২০ ফেব্রুয়ারি '৯১ একটি হোটেলের ভূগর্ভস্থ বেসামরিক আশ্রয় কেন্দ্রে মার্কিন বোমা আঘাত করে। মার্কিনিরা দাবি করে, এটি একটি সামরিক কমান্ড পোস্ট কিন্তু পরে তদন্তে দেখা গেল, এটি সত্যিই একটি বেসামরিক আশ্রয়কেন্দ্র। ধ্বংসস্তূপ থেকে ৩০০টি গলিত লাশ উদ্ধার করা হয়। এ সংবাদে বিশ্ববাসী বিস্মিত হয় এবং ইরাকি প্রেসিডেন্ট তাৎক্ষণিকভাবে কুয়েত ত্যাগের ঘোষণা দেন। নিরাপত্তা পরিষদের ৬৬০ নম্বর সিদ্ধান্ত তিনি মেনে নেন। এই সিদ্ধান্ত ইরাককে তাৎক্ষণিক ও নিঃশর্তভাবে কুয়েত থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহারের আদেশ দেয়া হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি ইরাক এ ঘোষণা প্রেরণ করে। ঘোষণায় মিত্রবাহিনীর কুয়েত আক্রমণকে সন্ত্রাসবাদী ইহুদি উপনিবেশবাদীদের ইরাক ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়। ঘোষণায় দাবি করা হয়, এক মাসের প্রবল প্রতিরোধের পর ইরাকি বাহিনী জয়লাভ করেছে। কুয়েত হতে ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহারের সঙ্গে কতগুলো শর্ত জুড়ে দেয়া হয়। এগুলো হল : অধিকৃত আরব ভূখণ্ড হতে ইসরাইলি সৈন্য প্রত্যাহার, উপসাগর হতে সমস্ত

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য সৈন্য বাহিনীর অপসারণ এবং কুয়েতের রাজপরিবারের স্থলে একটি নতুন সরকার গঠন। বাগদাদ আরও দাবি করে ইরাকের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত অবশিষ্ট ১১টি প্রস্তাব* নাকচ করা হোক এবং বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ তুলে নেয়া হোক। ইরাক দাবি করে যে, মিত্রবাহিনীর বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত ইরাকের স্থাপনাদি মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হোক।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইরাকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কুয়েত ও ইরাকে স্থলযুদ্ধের জন্য মিত্রবাহিনী ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এদিকে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট, গর্বাচেভের মধ্যস্থতা মানতে ইরাক সম্মতি জ্ঞাপন করায় ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী আকবর বেলায়েতি, ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোনাল্ড ডুমাস, ইরাকি প্রধানমন্ত্রী সাদুন হাম্মাদি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারেক আজিজ সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভের সাথে মস্কোতে দেখা করেন। গর্বাচেভের

১। ২রা আগস্ট '৯০ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ৬৬০ নম্বর প্রস্তাবে ইরাকের কুয়েত দখলের নিন্দা করা হয় এবং অবিলম্বে ইরাকি বাহিনী প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

২। ৬ই আগস্ট ৬৬১ নম্বর প্রস্তাবে ইরাকের বিরুদ্ধে ঔষধ ও খাদ্য ছাড়া সকল ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

৩। ৯ই আগস্ট সর্বসম্মতিক্রমে ইরাকের কুয়েত দখলকে বাতিল করে দেয়।

৪। ১৮ আগস্ট ৬৬২ নম্বর প্রস্তাবে ইরাক ও কুয়েত হতে বিদেশি নাগরিকদের চলে আসার অনুমতি দিতে ইরাকের প্রতি দাবি জানানো হয়।

৫। ২৫শে আগস্ট ৬৬৫ নম্বর প্রস্তাবে অর্থনৈতিক অবরোধ নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্রকে সীমিত নৌশক্তি ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া হয়।

৬। ১৩ সেপ্টেম্বর ইরাক ও কুয়েতে কেবলমাত্র মানবিক কারণে জাহাজে খাদ্য পাঠাবার বিষয়টি অনুমোদন করা হয়।

৭। ১৬ সেপ্টেম্বর ৬৬৭ নম্বর প্রস্তাবে অধিকৃত কুয়েতে ফরাসি ও অন্যান্য কূটনৈতিক মিশনসমূহে ইরাকি হামলার নিন্দা করা হয়।

৮। ২৪শে সেপ্টেম্বর ৬৬৯ নম্বর প্রস্তাবে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে যেসব দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের কিভাবে সাহায্য করা যায় এ ব্যাপারে পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য একটি সমিতিকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

৯। ২৫শে সেপ্টেম্বর ইরাকের সঙ্গে যোগাযোগ নিষিদ্ধ করা হয়।

১০। ১০ই অক্টোবর ৬৭৪ নম্বর প্রস্তাবে জানা যায় '৯১ জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতি ২রা আগস্টের পূর্ববর্তী কুয়েতের একটি জনসংখ্যা রেজিস্টার সংরক্ষণের আহ্বান জানানো হয়।

১১। ২৯শে নভেম্বর ৬৭৮ নম্বর প্রস্তাবে বলা হয়, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১-এর পূর্বে যদি ইরাক কুয়েত ত্যাগ না করে তবে ইরাকের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

* কুয়েত দখলের পর থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি '৯১ পর্যন্ত ইরাকের বিরুদ্ধে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ১২টি প্রস্তাব :

www.pathagar.com

প্রতিনিধির প্রিমাসভ সাদ্দাম হোসেনের সাথে দেখা করেন। সবাই আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, শিগগিরই একটি সমাধান বের হয়ে আসবে। গর্বাচেভের শান্তি পরিকল্পনায় কী আছে তা দেখার জন্য অথবা স্থলযুদ্ধের পরিকল্পনা গোপন রেখে ইরাকি বাহিনীকে বিভ্রান্তে ফেলার জন্য বুশ তার স্থলযুদ্ধের দিনক্ষণ গোপন রাখেন।

শেষ পর্যন্ত বহু প্রতীক্ষিত স্থলযুদ্ধ আরম্ভ হল। ৩রা মার্চ রোববার ভোর ৪ ঘটিকায় মিত্র বাহিনীর ট্যাংক বহর এবং তার ছত্রছায়ায় স্থল বাহিনী কুয়েত প্রবেশ করে। প্রেসিডেন্ট বুশ, প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে তাঁর সেনাবাহিনীকেও খতম করার আদেশ দিলেন। ইরাকি দূত তারেক আজিজ নিষ্ফলভাবে বাগদাদ ও মস্কোর মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করেন সময় ক্ষেপণের জন্য। মিখাইল গর্বাচেভও কয়েকবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও টেলিফোনে প্রেসিডেন্ট বুশের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেন। তখন যা ঘটার তা ঘটে গিয়েছে। শেষবারের মত সাদ্দাম তেলআবিবে একটি স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেন এবং তাতে ইসরাইলের ব্যাপক ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে ইসরাইল প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত থাকে। বিশাল মিত্রবাহিনীর সামনে বিধ্বস্ত ইরাকি বাহিনী টিকে থাকার কথা নয়, তারপরও মিত্রবাহিনী ঘোরতর যুদ্ধের আশংকা করে এবং হতাহতের জন্য প্রস্তুত থাকে। কিছুই হয়নি। প্রথম দিনেই মিত্রবাহিনী প্রায় বিনা বাধায় কোন ক্ষেত্রে ২০ মাইল এবং কোন ক্ষেত্রে ৭০ মাইল ভেতরে প্রবেশ করে। পশ্চাদপসরণকারী ইরাকি বাহিনী প্রায় ৫০০ কুয়েতি তেলক্ষেত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। মিত্র বাহিনী প্রাথমিক পর্যায়ে ৫,৫০০ যুদ্ধবন্দি আটক করে (Newsweek, March 4, 1991)।

ইরাকি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা : ইরাক তিনটি স্তরে তার প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করে। (ক) সম্মুখ ভাগ (খ) আরও পেছনে একটি কৌশলগত রিজার্ভ (গ) কুয়েতের উত্তর সীমান্তে বা দক্ষিণ ইরাকে মূল যুদ্ধক্ষেত্রের রিজার্ভ। মিত্র বাহিনীর পরিকল্পনা ছিল তিনটি স্তরে এক সঙ্গে আঘাত হানা। রিপাবলিকান গার্ড বাহিনীকে রাখা হয় দক্ষিণ ইরাক সীমান্তে মূল যুদ্ধক্ষেত্রের রিজার্ভ হিসাবে। এদের বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনী তাদের সেরা কোর* সপ্তম কোর মোতায়েন করে। এতে ছিল ৫টি মার্কিন ডিভিশন এবং ব্রিটেনের প্রথম সাঁজোয়া ডিভিশন যেটি

* তিন ব্যাটালিয়নে (প্রতি ব্যাটালিয়নে আনুমানিক ৬৫০ সৈন্য + অন্যান্য সহায়ক) এক ব্রিগেড, তিন ব্রিগেডে এক ডিভিশন, তিন ডিভিশনে এক কোর।

www.pathagar.com

"ডেজার্ট র‍্যাট" (Desert Rat) নামে খ্যাত। কিন্তু এই কোর রিপাবলিকান গার্ডকে পার্শ্বে রেখে পূর্ব কুয়েত দিয়ে ইরাকি ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং ইরাকি পরাজয় ত্বরান্বিত করে। অপরদিকে অষ্টাদশ কোর কুয়েতের আরও পশ্চিমে রিপাবলিকান গার্ডকে পূর্বে রেখে ইরাকে প্রবেশ করে।

স্থলযুদ্ধ শুরু হবার পর ঠিক ১০০ ঘণ্টায় যুদ্ধ শেষ হয়। প্রেসিডেন্ট বুশ এককভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন এবং একটি শান্তি নীতি প্রদান করেন। ছয় সপ্তাহ পূর্বে "ডেজার্ট স্টর্ম" নামে খ্যাত এবং বিমান হামলা দিয়ে সূচিত যুদ্ধে প্রেসিডেন্ট বুশ বিরাট জয় লাভ করেন। তাঁর অগণিত শত্রু নিহত হয় এবং তাঁর স্বপক্ষের সৈন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু এতদসত্ত্বেও জর্জ বুশের চেহারা মলিন, কারণ তখনও উপসাগরীয় যুদ্ধে "সাদ্দাম জীবিত ... এখনও আমাদের যুদ্ধবন্দিরা আবদ্ধ রয়েছে। আমাদের লোকদের ক্ষয়ক্ষতি এখনও নিরূপণ করা হয়নি।"

অতঃপর মিত্র বাহিনী যা স্থির করল তা হল :

১। পাশ্চাত্যের বেশ কিছু সৈন্য আগামী কয়েক মাস অত্র অঞ্চলে অবস্থান করেন।

২। ইরাকের ওপর জাতিসংঘ আরোপিত অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা অনির্দিষ্টকালের জন্য বলবৎ থাকবে। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে কিনা তা নির্ভর করবে সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় থাকবেন কিনা তার ওপর।

৩। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। ইরাকি যুদ্ধবন্দি ধরে আনার সময় মিত্রবাহিনী যুদ্ধাপরাধীদের ধরবার জন্যও প্রচেষ্টা চালায়। তাদের অপরাধ খোঁজারও চেষ্টা চালানো হয়। তবে এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা হয় কারণ বেশি বাড়াবাড়ি করলে ইরাকের হাতে বন্দি মিত্রবাহিনীর যুদ্ধবন্দিদেরও বিচার করা হবে। এছাড়াও যুদ্ধাপরাধীদের বিবাদের ব্যাপারে আরব দেশসমূহের মধ্যেও মতপার্থক্য রয়েছে। কুয়েত ও সৌদি আরব বিচার করতে চায় কিন্তু মিসর চায় না।

৪। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রদান। কুয়েত সরকার ও জনগণের প্রাপ্য হবে প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার। কুয়েতে কর্মরত ফিলিস্তিন ও অন্য বিদেশিদের দাবি হবে কয়েকশত বিলিয়ন ডলার অথচ ইরাকের তেল থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় বাৎসরিক মাত্র ১৪ বিলিয়ন ডলারের কিছু ওপরে। ইতোমধ্যে দেশটির বিদেশি ঋণের পরিমাণ রয়েছে ৭৫ বিলিয়ন ডলার। এর ওপর ইরাক পুনর্গঠনের জন্য খরচ হবে শত শত বিলিয়ন ডলার। মিত্রবাহিনী এসব হিসাব কষে শুধু

www.pathagar.com

একথা বলার জন্য যে সাদ্দাম হোসেন সরে গেলে দেনা এমনিতেই পরিশোধিত হয়ে যাবে। কিন্তু মিত্রবাহিনীর দৃষ্টিতে পরিতাপের বিষয় হল এতকিছুর পরও ইরাকের ভবিষ্যতের ওপর সাদ্দামের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ রয়েছে (Newsweek, March 11, 1991)।

মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে মিত্রবাহিনীর সামরিক ইউনিটসমূহ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলে তাদেরকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জানানো হয়। এই বিজয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে সহায়তা করে। প্রেসিডেন্ট বুশ যুদ্ধফেরৎ সৈন্যদেরকে জাতীয় টেলিভিশন মারফৎ গভীর ধন্যবাদ জানান। অপরদিকে মিত্র বাহিনীর বোমার আঘাতে ইরাকের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ এবং নগরীসমূহ পয়ঃনিষ্কাশনের অভাবে দুর্গন্ধময় হয়ে ওঠে। বিপর্যস্ত সেনাবাহিনীর এ অবস্থায় শিয়া মুসলিমরা বিদ্রোহ করে এবং কুর্দিরা ইরাকের উত্তরাঞ্চলে গোলযোগের সৃষ্টি করে।

কুর্দি বিদ্রোহীরা ইরাক-তুরস্ক সীমান্তের প্রধান সড়কে তাদের লাল ও সবুজ রং-এর পতাকা উত্তোলন করে।

কুর্দি বিদ্রোহ

ইরাকের উত্তরাঞ্চলে তুরস্ক ও ইরান সীমান্ত লাগোয়া ইরাকি কুর্দিস্তান অবস্থিত। উল্লেখ্য, এ কুর্দিস্তানের কিছু অংশ পড়েছে তুরস্কে এবং কিছু অংশ পড়েছে ইরানে। উপসাগরীয় যুদ্ধের সুযোগে ইরাকি কুর্দিরা তাদের একাধিক রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি ফ্রন্ট গঠন করে। ইরাকি কুর্দিস্তান আয়তনে হাঙ্গেরির সমান এবং ত্রিশ লক্ষ কুর্দির আবাসস্থল। এ সংখ্যা ইরাকের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ। মার্চ '৯১-এর প্রথমদিকে ইরাকি বাহিনী পশ্চাদপসরণের ঘোষণা দিলে যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় কুর্দিরা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং উত্তর ইরাকের শতকরা ৯৫ ভাগ দখল করেছে বলে দাবি করে। বিদ্রোহীর সমগ্র ইরানি ও তুর্কি সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রধান তেলকেন্দ্র কিরকুস অবরোধ করে। ইরাকি সৈন্যরা ৫,০০০ কুর্দি ধরে এনেছে বলে দাবি করে। দাঙ্গার মাধ্যমে আরম্ভ হলেও কুর্দি বিদ্রোহ বহু যুদ্ধ পরীক্ষিত সংগঠনের ওপর নির্ভর করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার কুর্দিদেরকে তাদের নিজস্ব আবাসভূমি দিতে অস্বীকার করলে কুর্দিরা গড়ে প্রতি এক যুগ পর পর বাগদাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বাগদাদ কর্তৃপক্ষ তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করে এবং হাজার

www.pathagar.com

হাজার কুর্দিকে বহিষ্কার করে। উপসাগরীয় যুদ্ধ আরম্ভ হলে '৯০-এর জানুয়ারি মাসে হাজার হাজার কুর্দি তাদের ইরান, সিরিয়া ও তুরস্কের ঘাঁটিসমূহ হতে ইরাক প্রত্যাবর্তন করে এবং সাদ্দামের পতন হলে ইরাকে আঘাত হানবার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে কুর্দি নেতা মাসুম বার্জানি (মোস্তফা বার্জানির পুত্র) সাদ্দামের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, পাছে তিনি পাল্টা আঘাত হানেন। ১৯৭০ সালের প্রথম দিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ওয়াদা করেছিলেন, কুর্দিরা ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তাদেরকে মার্কিন ও ইরানি সাহায্য দেয়া হবে। কিন্তু ১৯৭৫ সালে ইরান ও ইরাকের মধ্যে আলজিয়ার্স চুক্তির দ্বারা সমঝোতা সৃষ্ট হলে যুক্তরাষ্ট্র ঐ ওয়াদা প্রত্যাহার করে এবং হাজার হাজার কুর্দি পলায়ন করতে বাধ্য হয়।

কুর্দিদের ব্যাপারে তুরস্কের নীতির পরিবর্তনের ফলে বর্তমানের বিদ্রোহে কুর্দিরা উৎসাহ পায়। তুর্কিরা সরকারিভাবে কুর্দি সম্প্রদায়কে স্বীকার করে নেয় যদিও ইতিপূর্বে তারা আট বছর কুর্দিদের সাথে নিজ ভূমিতে যুদ্ধ করে। তুর্কি প্রেসিডেন্ট তুরগুর্ত ওজাল লন্ডন থেকে কুর্দি নেতাদেরকে আংকারায় আনয়ন করে মার্কিন ব্রিটিশ ও ফরাসিদের ন্যায় ইরাকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন। উত্তরের বিদ্রোহের খবর শুনে জেলে আবদ্ধ কুর্দিরা পুলিশদের কাবু করে বিদ্রোহে যোগ দেয়।

শিয়া বিদ্রোহ

সুযোগ বুঝে ইরান সরকারও শিয়াদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ইরান থেকে সরবরাহকৃত অথবা ইরাকি সৈন্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অস্ত্র নিয়ে শিয়ারা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ছবি সহকারে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে। ইরানের জঙ্গি বিমান বাগদাদে অতি নিচু দিয়ে উড়ে যায়। প্রেসিডেন্ট হাফেজী রাফসানজানি বলেন, "সাদ্দামের ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া উচিৎ, জনগণের রক্তে তার মেয়াদের শেষ পৃষ্ঠা লেখা উচিত নয়।" কিন্তু ইরানের প্রাধান্য আবার যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা চায় একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাদ্দাম অপসারিত হোক। তাহলে সংখ্যালঘু সুন্নি মুসলমানদের হাতে ইরাকের ক্ষমতা থাকবে এবং তারা ইরানের ক্ষমতা বিস্তারে প্রবল বাধা হিসাবে অবস্থান করবে। তাদের মূল কথা হল সাদ্দাম হোসেন সরে যাক, কিন্তু তার সরকার টিকে থাকুক। একজন মার্কিন সিনেটরের অভিযোগ "হিটলারের পতন হোক কিন্তু নাজিরা ক্ষমতায় থাকুক।"

www.pathagar.com

তিনদিন পর সাদ্দামের সৈন্যগণ দেশ পুনর্গঠনে উদ্যোগ নেয়। ইরাকিরা এই বিদ্রোহকে আধুনিককালের সর্ববৃহৎ ও ভয়াবহ ষড়যন্ত্র হিসাবে আখ্যায়িত করে। ট্যাংক, গোলন্দাজ ও ক্ষেপণাস্ত্রের বেপরোয়া ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। রিপাবলিকান গার্ডরা এই ভয়াবহ অবস্থায় সাদ্দামকে ত্যাগ করে বরং বিদেশি উস্কানিতে সৃষ্ট এসব বিদ্রোহ অতি দৃঢ়তার সাথে দমন করে।

এদিকে মুক্ত কুয়েতে রাজপরিবার এবং জনসাধারণ ফিরে আসতে শুরু করে। স্বভাবতই কুয়েতে রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি ওঠে। ১৯৮৬ সালে ইরাক-ইরান যুদ্ধের অজুহাতে কুয়েতের সীমিত গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড রহিত করা হয়েছিল। অতএব যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়টিও ওঠে আসে। কুয়েতের রাজধানীতে একটি প্রবাদ ভেসে বেড়ায়, তা হল, "ডেজার্ট স্টর্ম" কার্যক্রম কুয়েতের সারা রাজপরিবারকে মুক্ত করেছে–জনগণকে নয়। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, কুয়েতের আমির তথায় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন। অক্টোবর '৯২-এর নির্বাচনে আমির বিরোধী দলসমূহ জয় লাভ করে অপরদিকে মহিলারা ভোটাধিকারের জন্য সভা মিছিল করে। কিন্তু সংবিধান সংশোধন না করা পর্যন্ত আপাতত কিছু করার নেই।

উপসাগরীয় (প্রথম) যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সাহায্য সম্ভার

পাঁচ লক্ষ সৈন্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল ইরাকের বিরুদ্ধে লড়াই-এ প্রধান সামরিক শক্তি। তবে এদেশই একমাত্র লড়াকু দেশ নয়। অন্যান্য ৩৭টি দেশ এবং একটি বহুজাতিক গ্রুপ, উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (Self Co-operation Council) সৈন্য হতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মোজা পর্যন্ত সরবরাহ করে। সম্মিলিত দেশসমূহ যা সরবরাহ করেছে তার একটি বিবরণ নিম্নে দেয়া হল :

১। **মিসর** : ২টি সাঁজোয়া বহর এবং ৪ শতেরও অধিক ট্যাংকসহ ৩০,০০০ সৈন্য।

২। **ফ্রান্স** : গোলন্দাজ, সাঁজোয়া বহর ও হেলিকপ্টার রেজিমেন্টসহ ১৬,০০০ সৈন্য।

৩। **সৌদি আরব** : ৪৫,০০০ সৈন্য, ৫০০ ট্যাংক এবং ৩০০ জঙ্গি বিমান। ১৬.৮ বিলিয়ন ডলার এবং জ্বালানি খরচের জন্য ১.৭ বিলিয়ন ডলার।

৪। **যুক্তরাজ্য** : ২৫,০০০ স্থলসৈন্যসহ ৪০,০০০ সামরিক লোকবল, শত শত ট্যাংক, ৮০টিরও অধিক জঙ্গি বিমান এবং ২৬টি যুদ্ধ জাহাজ।

www.pathagar.com

৫। **কানাডা :** ২২০০ সামরিক লোক, ২টি ডেস্ট্রয়ার, ২৪টি সি.এফ., ১৮ জেট জঙ্গি বিমান, একটি ট্যাংকার এবং বহু সরবরাহ বিমান।

৬। **জার্মানি :** যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য ৭১টি কেমিক্যাল বাইওলোজিক্যাল স্কাউট যান এবং এগুলোর চালাবার জন্য ২০০ জনবল, ৫টি মাইন পরিষ্কারকারী জাহাজ, তুরস্কে মোতায়েন ১৮টি সামরিক বিমান। এছাড়া ৬.৬ বিলিয়ন ডলার প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ওয়াদাবদ্ধ।

৭। **উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (Self Co-operation Council) :** সৌদি আরবের উত্তরাঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের যুক্ত তত্ত্বাবধানে প্রদত্ত ১০,০০০ সামরিক লোকজন। কাতার হতে এক স্কোয়াড্রন মিরেজ জঙ্গি বিমান।

৮। **ইতালি :** ১০ খানি টর্নেডো জঙ্গি বিমান, ৩ খানি ফ্রিগেট, ৪ খানি মাইন সুইপার এবং ১ খানি সরবরাহ জাহাজ।

৯। **কুয়েত :** ৩০-৪০টি ট্যাংকসহ ১১,৫০০ সামরিক লোকজন, ১৫ খানি মিরেজ জঙ্গি বিমান, ৩৪ খানি হেলিকপ্টার, ১৬ বিলিয়ন ডলার।

১০। **পাকিস্তান :** সৌদি কমান্ডে ১১,০০০ শক্তিশালী পদাতিক সৈন্য।

১১। **স্পেন :** মার্কিন বিমান বাহিনীর ব্যবহারের জন্য ২টি বিমান ঘাঁটি তুরস্কে নিয়োজিত এফ. ১৬ মার্কিন জঙ্গি বিমানের যন্ত্রাংশ সরবরাহ এবং ৩ খানি ফ্রিগেট।

১২। **সিরিয়া :** ২০,০০০ সৈন্য এবং ৩০০ ট্যাংক।

১৩। **তুরস্ক :** প্রায় ১০০টি জঙ্গি বিমানের জন্য ঘাট ব্যবহারের সুবিধা প্রদান, ৩ খানি ডেস্ট্রয়ার, ২ খানি ডুবোজাহাজ এবং ১ খানি মাইন সুইপার।

১৪। **আফগানিস্তান :** ২০০০ মুজাহিদ।

১৫। **আর্জেন্টিনা :** ১০০ স্থল সৈন্য, ২ খানি যুদ্ধ জাহাজ, ২ খানি বিমান।

১৬। **অস্ট্রেলিয়া :** ১ খানি ডেস্ট্রয়ার, ১ খানি ফ্রিগেট, ১ খানি সরবরাহ বিমান।

১৭। **বাংলাদেশ :** প্রতিরক্ষার জন্য ২,৩০০ সৈন্য।

www.pathagar.com

১৮। **বেলজিয়াম** : ৬টি সি. ১৩০ বিমান, ১ খানি মাইন সুইপার, অবতরণ ও সরবরাহ জাহাজ।

১৯। **বুলগেরিয়া** : সেনা প্রকৌশলীদের একটি দল।

২০। **ডেনমার্ক** : ১টি যুদ্ধ জাহাজ এবং কয়েকখানি সরবরাহ জাহাজ।

২১। **গ্রিস** : ১ খানি ফ্রিগেট।

২২। **হন্ডুরাস** : ১৫০ জন সৈনিক।

২৩। **মরক্কো** : ১৩০০ সৈন্য।

২৪। **নেদারল্যান্ডস** : কয়েকটি ফ্রিগেট, একটি সরবরাহ জাহাজ এবং ৪০ সদস্যের একটি চিকিৎসক দল।

২৫। **নিউজিল্যান্ড** : ৩টি সরবরাহ বিমান, ১০০ জনবলের সাহায্যকারী দল একটি চিকিৎসক দল।

২৬। **নিগার** : ৫০০ জন সৈন্য।

২৭। **নরওয়ে** : একখানি নেভি কাঠার এবং কিছু সৈন্য।

২৮। **সেনেগাল** : ৫০০ সৈন্য।

২৯। **সিয়েরা লিয়ন** : ২০০ সৈন্যের অঙ্গীকার।

৩০। **চেকোশ্লোভাকিয়া** : একটি রাসায়নিক দূষণমুক্তকারী দল।

৩১। **জাপান** : শত শত অকেজো গাড়ি, জেনারেটর চিকিৎসাসামগ্রী, কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। নগদ ১৩ বিলিয়ন ডলার প্রদানের অঙ্গীকার।

৩২। **হাঙ্গেরি** : একটি চিকিৎসক দলের অঙ্গীকার।

৩৩। **পোল্যান্ড** : ১৭ সদস্যের চিকিৎসক দল এবং একটি হাসপাতাল জাহাজ।

৩৪। **পর্তুগাল** : একটি সাহায্যকারী জাহাজ।

৩৫। **সিঙ্গাপুর** : ব্রিটিশ আর্মি হাসপাতালে ৩৫ সদস্যের একটি চিকিৎসক দল প্রদান।

৩৬। **দক্ষিণ কোরিয়া** : ১৫৪ সদস্যের একটি চিকিৎসক দল, মিত্রবাহিনীর জন্য ৪০০ মিলিয়ন ডলার প্রদান।

৩৭। **শ্রীলঙ্কা** : বেসামরিক আসবাবপত্র বহনকারী জাহাজের জন্য পুনঃতেল গ্রহণের সুবিধা প্রদান।

www.pathagar.com

৩৮। **সুইডেন** : ৫২৫ জনবল এবং ৩৫০ শয্যার যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার্য একটি সেনা হাসপাতাল।

—(Newsweek, March, 1991)

এই শক্তিশালী বিশাল সামরিক জোটের বিরুদ্ধে যিনি একা লড়াইয়ে অবতরণ করেন তিনি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন। সাম্রাজ্যবাদীদের ত্রাস এবং ইরাকি জনগণের নিকট এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যিনি আরবদেরকে তথা মুসলিম বিশ্বকে মার্কিন-ইহুদি যাঁতাকল থেকে মুক্তিদানের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথে সাদ্দাম হোসেন সমস্ত মুসলিম দেশে কিংবদন্তি নায়ক হিসাবে আবির্ভূত হন। কুয়েত দখলের পর তাঁর সম্পর্কে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলেও সৌদি আরব মার্কিন সাহায্য চাইলে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব প্রতিবাদে ফেটে পড়ে এবং ক্রমশ জনসমর্থন সাদ্দাম হোসেনের পক্ষে চলে যায়। ইসরাইলের বিরুদ্ধে স্কার্ড ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত এবং সামরিক থাফজা দখল তাঁর শত্রুর মনেও শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলে। সাদ্দামের অনেক আরব সমালোচক তাঁর প্রশংসা করে শুধু এ জন্যেই যে, তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। আধুনিককালে মধ্যপ্রাচ্যে সাহসী পুরুষের নিতান্ত অভাবের দিনে সাদ্দাম টিকে থাকতে না পারলেও তার ক্ষমতার প্রবাদ অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য হিসাবে যুগ যুগ ধরে বিরাজ করবে।

সাদ্দাম হোসেন তাঁর মার্কিন-ইহুদি বিরোধী ভূমিকাকে ইসলামের প্রতি তাঁর খেদমত হিসাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে জর্ডানের রাজধানী আম্মানের ন্যায় মুসলিম বিশ্বের অসংখ্য স্থানের ছোট ছোট ছেলেরা তাদের কৃত্রিম যুদ্ধ খেলায় সাদ্দামকে সাত-আট শত বছরের পূর্বের ক্রুসেডখ্যাত সালাহ্ উদ্দিনের সাথে তুলনা করে এবং আশা করে যে সালাহ্ উদ্দিনের ন্যায় তিনিও ইহুদি-মার্কিন বাহিনীকে শায়েস্তা করতে সক্ষম হবেন। সাদ্দাম শুধু প্রতিবেশী আরবদেরকেই অনুপ্রাণিত করেননি বরং সুদূর ইন্দোনেশীয়দেরকেও অনুপ্রাণিত করেছেন, ফলে যুদ্ধের প্রথম দু'সপ্তাহে ১৮ জন ইন্দোনেশীয় নবজাতকের নাম রাখা হয় সাদ্দাম হোসেন। দক্ষিণে লেবাননে তথা প্রায় সমস্ত মুসলিম দেশে যে কোন শক্তিশালী ও প্রলয়ংকরির বস্তুকে স্কাড হিসাবে অভিহিত করা হয়।

মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে সাদ্দামের ছবি বিক্রয়ের ধুম পড়ে যায়। একদিকে প্রেসিডেন্ট বুশের কুশপুত্তলিকা দাহ চলে, অপরদিকে নায়কবেশী সাদ্দামের ছবি। পপগায়িকা মেডোনার একটি ছবির সঙ্গে ৫০টি সাদ্দামের

www.pathagar.com

প্রতিকৃতি বিক্রয় হয়। কিশোরদের নিকট সাদ্দাম সর্বকালের কাঙ্ক্ষিত বীর। আম্মানের ১৫ বছরের কিশোরীর ধারণা সাদ্দাম হোসেন যুদ্ধে মারা গেলেও তার আরদ্ধ কাজ শেষ করার জন্য অনেকেই থেকে যাবে। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল আক্রমণ করে পশ্চিমাগণ প্রেসিডেন্ট নাসেরকে এক মহামানবে পরিণত করেছিল। ৩৪ বছর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করে সাদ্দাম হোসেনকে আরবে জাহানের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে পরিণত করেছিল। মৃত কিংবা জীবিত সাদ্দাম হোসেনের এটিই রাজনৈতিক বিজয়।

নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত যুদ্ধবিরতি শক্তিসমূহ এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে সাদ্দাম হোসেন চাপের মুখে থাকেন এবং ফলশ্রুতিতে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। অন্য শক্তিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিরাট অংশের বোঝা চাপানো এবং আন্তর্জাতিক তদারকিতে ইরাকের পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্রসমূহ এবং ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ খুলে ফেলা বা ধ্বংস করা। এসব শক্তি থাকা পর্যন্ত ইরাকের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখা হয়। ইরাকের জাতীয় সংসদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগুলো মেনে নেয়। পরবর্তীকালে অনেক বাকবিতণ্ডা। অবরোধের হুমকি ইত্যাদির মুখে ইরাকের সামরিক স্থাপনাসমূহ এবং স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ ধ্বংস করা হয়।

এর পরও ইরাকের বাগদাদস্থ কৃষি মন্ত্রণালয়ে অস্ত্র তল্লাশিতে জাতিসংঘ দলের প্রবেশের ব্যবস্থায় ইরাক আপত্তি জানায়, ফলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এদিকে বিগত ২রা আগস্ট '৯২ ইরাকের কুয়েত দখলের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে ইরাকি পত্রপত্রিকায় দৃঢ়তার সাথে কুয়েতকে ইরাকের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে প্রচার করা হয়। জাতিসংঘের ২২ সদস্যের অনুসন্ধানী দল ইরাক পৌঁছলে তাদেরকে কোনো মন্ত্রণালয়ে অনুসন্ধানের জন্য প্রবেশে ইরাক বাধা প্রদান করে। ইরাকি ও কুয়েতি বাহিনী সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হয়। মার্কিন বাহিনী ইরাকের দিকে অগ্রসর হয়। ইরাক সরকার এ তল্লাশিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তল্লাশি কাজ চালিয়ে যাবার সংকল্প ব্যক্ত করে এবং বোমা হামলার হুমকি প্রদান করে। তারা যেটি লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে যার মধ্যে সর্বপ্রথম হল সামরিক শিল্প কারখানা। ইরাক সর্বশক্তি দিয়ে হামলা প্রতিরোধ করার সংকল্প ব্যক্ত করে।

এদিকে ইরান অভিযোগ করে যে, ইরাকে দক্ষিণের শিয়া অঞ্চলে নাপাম বোমা নিক্ষেপ করছে। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলে ইরাকি বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ করে। ইরাক এ ঘোষণাকে তার দেশ খণ্ডবিখণ্ড করার

www.pathagar.com

অংশ হিসাবে উল্লেখ করে। তারা আরও বলে যে, সর্বশেষ মার্কিন প্রস্তাবের সাথে জাতিসংঘ সিদ্ধান্তের কোন মিল নেই। সে আরও উল্লেখ করে যে, মার্কিন-ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের পরিকল্পনায় ইরান সহায়তা করছে। তবে জর্ডান এ পদক্ষেপের নিন্দা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুমকির প্রত্যুত্তরে ইরাক ২৯শে আগস্ট দক্ষিণ ইরাকের শিয়া অঞ্চলে বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ এলাকা মেনে নেয়। অতঃপর তিন দেশের (মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফ্রান্স) বিমান ঐ এলাকায় টহল দিতে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্র বিমান আক্রমণের হুমকি, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি সত্ত্বেও সাদ্দামের নেতৃত্বে কোনো ফাটল ধরাতে সক্ষম হয় নাই। একজন বিদেশি কূটনীতিক বলেন, আট বছরে ইরাক-ইরান যুদ্ধ এবং কুয়েতকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ৩০ জাতির সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাদ্দাম হোসেন কাবু হননি। শিয়াদের রক্ষা করার নামে বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের বিমান টহল দিয়েও সাদ্দামকে কাবু করতে সক্ষম হয় নাই। সাদ্দাম হোসেন কাবু হওয়া দূরে থাকুক তিনি ক্রমাগত জোরালো বক্তৃতার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ইরাকিদের মনোবল চাঙ্গা করার কাজে নিয়োজিত থাকেন। ইরাকের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করার কথা ঘোষণা করেন।

এতকিছুর পরও সাদ্দামকে উৎখাত করতে ব্যর্থ হয়ে ৪ঠা অক্টোবর '৯২ যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের এক প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিদেশে প্রাপ্ত ইরাকি সম্পদ আটক করা হবে। এ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব ও তুরস্কে ইরাকের ১০০ কোটি ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইরাক একে টেক্সাস মার্কা ব্যাংক ডাকাতি বলে আখ্যায়িত করে। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন তখনও ক্ষমতায়ই আছেন, আর এদিকে ৩রা নভেম্বর অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জর্জ বুশ শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হন।

যুদ্ধে ইরাকের বিপর্যয় : একটি পর্যালোচনা

সোভিয়েত সমর্থিত শক্তিশালী ইরাকি সেনাবাহিনী কেন উপসাগরীয় যুদ্ধে শোচনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তা ইতিহাস গবেষকদের গভীর তথ্যানুসন্ধানের বিষয়। ইরাক যেভাবে তার অভিযান সফল করেছিল এবং পরে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেছিল তাতে ধারণা করা হয়েছিল সে কিছুতেই কুয়েত ত্যাগ করবে না। কিন্তু পরে কেন সে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় সে সম্পর্কে যুদ্ধ বিশ্লেষকগণ নিম্নলিখিত সম্ভাব্য কারণ নির্ধারণ করেন।

www.pathagar.com

১। সবচাইতে বড় ভুল ছিল ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের পর সৌদি সীমান্তে থেমে যাওয়া। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন সাদ্দাম যদি দাহরাম এবং দাম্মাম পোর্ট দখল করে এবং সৌদির পূর্বাঞ্চলীয় তেলক্ষেত্রগুলো অধিকার করতেন তবে সম্মিলিত বাহিনী এত বিশাল সমরসজ্জা করতে পারত না।

২। সাদ্দাম হোসেন শুধু কুয়েতের প্রতিরক্ষা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, দক্ষিণ ইরাকের প্রতিরক্ষার কথা চিন্তাও করেননি। ফলে মিত্রবাহিনী সরাসরি কুয়েত ফ্রন্টে স্থলযুদ্ধে না গিয়ে দক্ষিণ ইরাক দিয়ে প্রবেশ করে এবং ইরাকি বাহিনীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

৩। ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে সাদ্দাম হোসেনের ধারণা ছিল মার্কিন বাহিনীর সম্মুখে যুদ্ধে অকেজো এবং তাই স্থলযুদ্ধ আরম্ভ হলে তাদেরকে সহজে কাবু করা যাবে। কার্যত মার্কিন বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধে এড়িয়ে এবং রিপাবলিকান গার্ডদের চোখে ধুলো দিয়ে ইরাকে প্রবেশ করে।

৪। ইরাকের নিজেদের অস্ত্রের ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা ভুল প্রমাণিত হয় এবং সোভিয়েত কর্তৃক যন্ত্রাংশ সরবরাহ করে দেয়ায় ভরাডুবি হয়।

৫। ইরাক রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেনি, কেন করেনি তা এখনও নির্ণয় করা যায়নি।

৬। কুয়েত দখলের জন্য ইরাকের সময় নির্ধারণ সঠিক হয়নি। পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজম বিরোধী গণজাগরণ এবং খোদ সোভিয়েত রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময় কুয়েত আক্রমণ ঠিক হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জর্জ বুশকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে ডেমোক্রাটিক দলের বিল ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ১৯৯২ সালে। নতুন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ক্ষমতায় আসীন হবার পর থেকে ইরাকের ব্যাপারে মার্কিন ও ব্রিটিশ নীতির নমনীয় পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। নিউইয়র্ক থেকে রয়টার পরিবেশিত খবরে প্রকাশ ক্লিনটন প্রশাসন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ইরাকি নেতা সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করার জন্য প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বুশের গৃহীত গোপন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে প্রশাসন একটি নিম্নমানের কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের পর সাদ্দামকে উৎখাত করার জন্য বুশ প্রশাসন দেড় কোটি ডলারের এক গোপন পরিকল্পনা হাতে নেয়। এই অঙ্ক পরে ৪ কোটি ডলারে উন্নীত হয়। ক্লিনটন

www.pathagar.com

প্রশাসন একে অর্ধেকে নামিয়ে নামেন (New York Times, April 11, 1993)। কিন্তু বিগত ৯ই এপ্রিল শুক্রবার উত্তর ইরাকে একটি সামরিক স্থাপনার ওপর মার্কিন বিমান হামলায় ইরাক হতাশা ব্যক্ত করে।

এদিকে ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধে অংশগ্রহণকারী মিসর ইরাকের সাথে আপস রফায় সম্মত হয়েছে। ইরানের ভয়ে ভীত ওমান এবং বাহরাইনও ইরাকের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের ওপর জোর দেয়। তুরস্ক পুনরায় বাগদাদে তার দূতাবাস খুলে দেয়। ইরান ও জর্ডান ইরাককে তেল রফতানি সুবিধা প্রদান করে দেয়। ইরাক তেল চুক্তি সম্পাদনের প্রচেষ্টায় ফরাসি ও অন্যান্য কতিপয় পশ্চিমা তেল কোম্পানির সাথে যোগাযোগ জোরদার করে। ফ্রান্সের এল্‌ফ ও টোটাল তেল কোম্পানিসহ পশ্চিমা ও অন্যান্য কোম্পানির প্রতিনিধিরা অবরোধ প্রত্যাহারের পর সম্ভাব্য অনুকূল চুক্তি এবং অশোধিত তেল বিক্রয়ের ব্যাপারে বাগদাদ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেন। মোট কথা অবরোধকারী অনেক দেশ ইরানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে এগিয়ে আসে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলন

মধ্যপ্রাচ্য তথা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে যাবতীয় অশান্তির মূল কারণ অধিকৃত ফিলিস্তিনে ইহুদিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইসরাইল রাষ্ট্র। এই অবস্থিত রাষ্ট্রটিকে গুটিকয়েক মুসলিম দেশ ব্যতীত প্রায় সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্র এখনও স্বীকৃতি প্রদান করেনি। বিগত উপসাগরীয় যুদ্ধের অনেকগুলো কারণের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল এই আরব- ইসরাইলি সংঘাত। যাহোক, উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের পরাজয়ের পর মধ্যপ্রাচ্যে একটি স্থায়ী শান্ত পরিবেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক পরিকল্পনা হাতে নেয়।

এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ১৯৯১ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস বেকার ইসরাইলসহ বিভিন্ন আরব দেশ সফর করেন এবং নেতাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র এবং কিছুটা যুক্তরাজ্য ইসরাইলের একক সমর্থক। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয় ইসরাইলের স্বার্থে। অতএব আলোচ্য শান্তি সম্মেলনও যে ইসরাইলের স্বার্থে করা হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। কিন্তু সোভিয়েতের ক্ষমতা হারানোর প্রক্রিয়াধীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়। অতএব, ক্ষমতায় ভারসাম্যের অভাবে আরব- ইসরাইলি শান্তি প্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত জেনেও যুক্তরাষ্ট্র এ উদ্যোগ গ্রহণ করে। জেমস বেকার উভয়পক্ষকে বাগ্মিতা ছেড়ে প্রকৃত সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানান। উভয়পক্ষ নীতিগতভাবে শান্তিপ্রস্তাব মেনে নেয়। সর্বশেষ আরব প্রস্তাব হল এ ব্যাপারে একটি 'আন্তর্জাতিক মধ্যপ্রাচ্য সম্মেলন' আহ্বান করা হোক।

শান্তি সম্মেলন সফল হবার পথে দুটো বাধা পর্বতসম দণ্ডায়মান। তার একটি হল পি.এল.ও.র অংশগ্রহণ এবং অপরটি হল পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি

www.pathagar.com

স্থাপনের বিষয়টি। ইসরাইল পি.এল.ও.কে সম্মেলনে সম্পৃক্ত করতে মোটেই রাজি নয়, আবার পি.এল.ও. প্রতিষ্ঠিত ছাড়া সম্মেলন কতটুকু সফল হবে তাও ভাববার বিষয়। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক শামীর পি.এল.ও.কে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন মনে করে। তাই যুক্তরাষ্ট্র পি.এল.ও.কে সম্মেলন থেকে বাদ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পি.এল.ও.র উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির কোন গুরুত্ব নেই। ১৯৭৩ সালে সংঘটিত ইয়ম কিপুর যুদ্ধের পর জাতিসংঘের উদ্যোগে জেনেভা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু পি.এল.ও. এবং সিরিয়া এতে যোগ না দেয়ায় কোন ফলাফল ছাড়াই সম্মেলন শেষ হয়। পি.এল.ও. চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত মার্কিন শান্তি প্রচেষ্টাকে একটি চক্রান্ত বলে অভিযোগ করেন। বেকারের মধ্যপ্রাচ্য সফরের প্রতি সমর্থন দানের জন্য তিনি আরব রাষ্ট্রগুলোর পরোক্ষ সমালোচনা করেন। তিনি মার্কিন উদ্যোগকে পর্যবেক্ষণ করছেন বলে জানান। জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা করেছে যা তারা হারাতে চায় না। অপরদিকে পূর্ব জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনিরা মাতৃভূমি হিসেবে দেখতে চায়। তবে আরবরা এতে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করবে বলে জানানো হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় বাধা পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি স্থাপন। এ সম্পর্কে ইসরাইল অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রম বন্ধ রেখে তারা শান্তি সম্মেলনে বসতে নারাজ।

অবশেষে ১৯৯১ সালের ৩০শে অক্টোবর স্পেনের মাদ্রিদে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলনের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফিলিস্তিনি মহিলা হান্নান আশরাফী ফিলিস্তিনিদের নেতৃত্ব দেন। কিন্তু মাদ্রিদ সম্মেলন অগ্রগতি ছাড়াই সমাপ্ত হয়। দীর্ঘদিন বিরতির পর বিগত ২৫শে আগস্ট '৯২ ফিলিস্তিনি-ইসরাইলের প্রতিনিধিরা ওয়াশিংটনে প্রথম দফা সরাসরি আলোচনায় মিলিত হন। ইসরাইলের নির্বাচনে লিকুদ পার্টি ও প্রধানমন্ত্রী শামীরের পতনের পর লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসে এবং অপেক্ষাকৃত উদার মনোভাবাপন্ন রবিন প্রধানমন্ত্রী হন। ক্ষমতায় এসেই তিনি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়া জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তারই ফলশ্রুতিতে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অধিকৃত গাজায় ও পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের জন্য ইসরাইল স্বায়ত্তশাসনের নতুন প্রস্তাব নিয়ে আসে। ইসরাইল অনেকটা নমনীয় মনোভাব নিয়ে আসে বিধায় তারা পি.এল.ও. প্রতিনিধি হিসাবে খ্যাত সায়েব এরিকট সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই। এরিকট ফিলিস্তিনি প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনে যোগদান করেন।

www.pathagar.com

পি.এল.ও. সরকারিভাবে সম্মেলনে যোগদান না করলেও চারজন পি.এল.ও. নেতা ওয়াশিংটনে অবস্থান করে ফিলিস্তিনি দলের সমন্বয় সাধন ও তিউনিসের সদর দফতরের সাথে যোগাযোগ রাখেন। ফিলিস্তিনি সদস্যরা মোটামুটি সন্তুষ্ট কারণ ইসরাইল অধিকৃত ভূখণ্ডে সাধারণ নির্বাচন দিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনিক পরিষদ নামে আখ্যায়িত করে। এর মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। ফিলিস্তিনি প্রতিনিধিরা এ পরিষদের আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী ক্ষমতা দাবি করে।

ইসরাইলের এ প্রস্তাব ইতিবাচক হলেও তাদের সদিচ্ছা সম্পর্কে ফিলিস্তিনিরা সন্দিহান। হান্নান আশাবাদী বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইহুদি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য ঘোষণা করায় এবং রবিন সরকার অধিকৃত এলাকায় ইসরাইলি বসতি বন্ধ হবে বলে ঘোষণা করেও ১১,০০০ গৃহ নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখার ইসরাইলের সদিচ্ছা সম্পর্কে ফিলিস্তিনিদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। তিনি ১১ হাজার ঘরকে শান্তির পথে ১১ হাজার বাধা বলে উল্লেখ করেন।

এদিকে জেনেভায় জাতিসংঘ আয়োজিত এক সম্মেলনে ভাষণদানকালে পি.এল.ও. প্রধান ইয়াসির আরাফাত ইসরাইলের নতুন প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করে বলেন, এ প্রস্তাবে সীমিত স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছে কিন্তু ফিলিস্তিনিদের দাবি পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববাসীর জানা উচিত, ফিলিস্তিনিদের লাশের ওপর মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। আবার জেরুজালেম সমস্যার সমাধান ছাড়াও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

অপরদিকে সিরীয়রা জাতিসংঘের ২৪২নং প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য চাপ দেয়। ঐ প্রস্তাবে অধিকৃত আরব এলাকা ছেড়ে দেবার কথা বলা হয়েছে। ইসরাইল গোলান মালভূমি আংশিক ছেড়ে দেবার প্রস্তাব নিয়ে নমনীয় অবস্থানে আছে। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী রবিন ইসরাইলি সংসদে বলেন, ইসরাইল ঐ উপত্যকার কিছু অংশ ছেড়ে দেবার কথা বলছে–সম্পূর্ণ নয়। তবে সিরিয়া গোলানের সকল কৌশলগত জায়গা হতে ইসরাইলকে সরে আসার দাবি জানিয়েছে সবকিছু মিলে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বৈঠক আরব-ইসরাইলি সমঝোতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে মনে হয়।

চলতি বছরের (১৯৯২) অক্টোবর মাসে শান্তি সম্মেলনের সপ্তম দফা বৈঠক সম্প্রতি ওয়াশিংটনে আরম্ভ হয়। সূচনাতেই দক্ষিণ লেবাননে ইরানপন্থী হেজবুল্লাহ্ গেরিলা দলের চোরাগোপ্তা হামলায় ৫ জন ইসরাইলি সৈন্য নিহত ও

www.pathagar.com

৫ জন আহত হলে ইসরাইলি গোলন্দাজ ও জঙ্গি হেলিকপ্টারসমূহ লেবাননের হেজবুল্লাহ্ অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠানরত শান্তি সম্মেলনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের জন্য সম্মেলন ১ সপ্তাহের বিরতি ঘোষণা করে এবং ৯ই নভেম্বর সম্মেলন পুনরায় আরম্ভ হবে।

কিন্তু একই বছরের শেষের দিকে ইসরাইল অধিকৃত পশ্চিম তীর[১] থেকে ইসরাইলি সরকার ৪১৫ জন ফিলিস্তিনিকে তথায় গোলযোগ সৃষ্টির অভিযোগে বহিষ্কার করলে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলন বাধাগ্রস্ত হয়। বহিস্কৃত ব্যক্তিগণ উত্তর লেবাননে প্রবেশের চেষ্টা করলে ইসরাইলি সৈন্যদের গোলাবর্ষণে তারা মাঝপথে আটকে যায়। জানুয়ারি মাসের প্রচণ্ড শীতে তারা উন্মুক্ত আকাশের নিচে কালাতিপাত করে। তাদের রসদ ফুরিয়ে গেলে লেবানন থেকে গোপনে তাদেরকে অতিকষ্টে রসদ সরবরাহ করা হয়। বিশ্ব জনমতের চাপে ইসরাইল তাদের কয়েকজনকে গ্রহণ করতে স্বীকার করলেও বহিস্কৃত ব্যক্তিবর্গ দাবি করে যে সবাইকে না নেয়া পর্যন্ত তারা এককভাবে যাবে না। এ দিকে ইসরাইলি আদালত তাদের বহিষ্কারকে অবৈধ ঘোষণা করে। ৪ মাস অতিবাহিত এ সংকটের পর গত ২০শে এপ্রিল ওয়াশিংটনে পুনরায় বৈঠকে বসবার পূর্বে ফিলিস্তিনি প্রতিনিধিগণ ঘোষণা করেন যে, বহিস্কৃত ফিলিস্তিনিদেরকে ইসরাইল ফেরৎ না নেয়া পর্যন্ত তারা বৈঠকে অংশগ্রহণ করবে না। অতঃপর ইসরাইল তাদেরকে ফেরত নেবার আশ্বাস দিলে শান্তি সম্মেলন পুনরায় আরম্ভ হয়। ইতোমধ্যে ইসরাইল ১৫ জন বহিস্কৃতকে ফেরত নেয়। এটিকে ফিলিস্তিনিরা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সম্মেলন চলছে। তবে ইসরাইল যেভাবে একগুঁয়েমি মনোভাব দেখায় তাতে এ সম্মেলন কতদিন চলে তা নির্ণয় করা কঠিন।

পি.এল.ও.–ইসরাইল শান্তি চুক্তি

ওয়াশিংটনে আরব-ইসরাইল পক্ষদ্বয় যখন মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তির ফর্মুলা ও দর কষাকষি নিয়ে ব্যস্ত ঠিক সে সময় বিবদমান দু'পক্ষ–পি.এল.ও. ও ইসরাইল সমগ্র বিশ্বকে তাক লাগিয়ে এক বিস্ময়কর শান্তি চুক্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। প্রায় অর্ধশতাব্দীর ঘৃণা ও শত্রুতা ভুলে গিয়ে ফিলিস্তিনি ও ইসরাইলিরা

---

১. জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরকে সাধারণ্যে পশ্চিম তীর বলা হয়।

www.pathagar.com

পরস্পরকে স্বীকৃতি দিয়ে এক স্বায়ত্তশাসন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ চত্বরে এক অনাড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রায় তিন সহস্র দেশি ও আন্তর্জাতিক অতিথিদের উপস্থিতিতে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের উপস্থিতিতে ইসরাইলি পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষরদান করেন ইসরাইলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন পিরেজ আর চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাতের উপস্থিতিতে পি.এল.ও.-র পক্ষে স্বাক্ষর করেন পি.এল.ও. প্রতিনিধি মাহমুদ আব্বাস।

এ দু'পক্ষের বৈঠক হয় নরওয়ের রাজধানী অসলোতে। প্রথমে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে এক ইসরাইলি অধ্যাপক ইয়ার হার্সফেল্ড-এর উদ্যোগে লন্ডনের এক হোটেলে প্রথম গোপন বৈঠক বসে। অধ্যাপক হার্সফেল্ড পি.এল.ও.-র অর্থবিষয়ক প্রধান আহমদ ক্রিয়ার সঙ্গে কথা বলেন। এ বৈঠক ব্যর্থ হলেও এটিই ছিল প্রথম ইতিবাচক পদক্ষেপ। অতঃপর অসলোতে প্রায় তের চৌদ্দটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক হার্সফেল্ড ইসরাইলি উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োসি বেইলিনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং লেবার পার্টি ক্ষমতায় বসলে শিমন পিরেজও এর সাথে জড়িত হন। অতঃপর নরওয়ে সরকার সমস্ত সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানে সম্মত হয়। ২৭ আগস্ট ১৯৯৩ দলিলের চূড়ান্ত খসড়া তৈরির পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তা জানানো হয়। যুক্তরাষ্ট্র তাৎক্ষণিকভাবে তা সমর্থন করে।

এ চুক্তি অনুযায়ী ইসরাইল অধিকৃত গাজা উপত্যকা এবং জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরের জেরিকো শহরকে পাঁচ বছরের জন্য সীমিত স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে। এ দুটো ভূখণ্ড থেকে ইসরাইল তার সমস্ত সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে। ফিলিস্তিনিরা দশ মাসের মধ্যে একটি কর্তৃপক্ষ নির্বাচন করে এবং ঐ কর্তৃপক্ষই স্বায়ত্তশাসিত ভূখণ্ড দুটোর প্রশাসন পরিচালনা করে। বিশ হাজার ফিলিস্তিনি পুলিশের একটি বাহিনী গাজা ও জেরিকোর আইন-শৃংখলা রক্ষা করবে। জেরিকো ও গাজাকে একটি করিডোর দ্বারা সংযুক্ত করা হবে।

১৩ অক্টোবর ১৯৯৩ এই স্বায়ত্তশাসন চুক্তি কার্যকর হবে। এ বছর ১৩ ডিসেম্বর গাজা ও জেরিকো থেকে ইসরাইলি সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য পি.এল.ও.-ইসরাইল আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষর করবে। এ চুক্তির আওতায় ভূখণ্ড দুটোতে ফিলিস্তিনি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার যাবতীয় ব্যাপারে চূড়ান্ত আলোচনা শুরু হবে (Newsweek, September 13, '93)। চুক্তির বিশেষ বিশেষ দিক হলো শিক্ষা ও

www.pathagar.com

সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ কর ব্যবস্থা ও পর্যটন–এ বিষয়গুলো ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে। এ অঞ্চলে ফিলিস্তিনি পুলিশ মোতায়েন করা হবে। ইসরাইল-প্যালেস্টাইন লিয়াজোঁ কমিটি, অর্থনৈতিক সহযোগিতা কমিটি, ১৯৬৭ সালে উচ্ছেদকৃত ফিলিস্তিনিদের ফিরিয়ে আনার জন্য কয়েকটি কমিটি গঠন করা হবে। দু'মাস পর গাজা-জেরিকো হতে ইসরাইলি সৈন্য, প্রশাসন প্রত্যাহার করে সীমিত স্বায়ত্তশাসন শুরু হবে। ছয় মাস পর ইসরাইলি নিরাপত্তা বাহিনীর সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের সর্বশেষ তারিখ ঘোষণা করা হবে। ফিলিস্তিনি কাউন্সিল নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে নয় মাস পর। তারপর কাউন্সিলের গঠন, আকার, ক্ষমতা, বিভাগীয় কর্তৃত্ব, বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্ব সম্পর্কে আরো একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। পূর্ব জেরুজালেমে ফিলিস্তিনিরা তাদের প্রার্থী নির্বাচন এবং ভোট দেবার অধিকার পাবে।

চুক্তির প্রতিক্রিয়া : এ চুক্তির ব্যাপারে ফিলিস্তিন, ইসরাইল ও আরব বিশ্বে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। চুক্তি সমর্থক একজন ফিলিস্তিনির নিকট এ চুক্তির অর্থ ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জন্য প্রথম ছোট পদক্ষেপ। ইয়াসির আরাফাতের কাছেও তাই। জার্মান সাপ্তাহিকীর সাথে সাক্ষাৎকারে ইতোমধ্যেই তিনি বলেছেন, 'পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে শীঘ্রই ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণা করা হবে। চুক্তি সমর্থক একজন ইসরাইলির কাছে এ চুক্তির অর্থ হচ্ছে শান্তি ক্রয় করার জন্য ফিলিস্তিনিদের সীমিত স্বায়ত্তশাসন লাভ। প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের কাছেও তাই। চুক্তির বিরোধী ফিলিস্তিনিদের নিকট এ চুক্তির অর্থ হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা।

১৮ জনের নির্বাহী কমিটি হতে ৫ জন পি.এল.ও. নেতা ইতোমধ্যেই চুক্তির বিরোধিতা করে পদত্যাগ করেন। চরমপন্থী ফিলিস্তিনিদের ৭টি সংগঠন এবং হামাসসহ পি.এল.ও. বহির্ভূত তিনটি সংগঠন চুক্তির বিরোধিতা করে। ইসরাইলি পক্ষে চরম বিরোধিতা আসছে ইহুদি অধিবাসীদের তরফ থেকে। একটি সূত্র মতে, ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা হলে প্রায় ১০ হাজার অভিবাসী অস্ত্র হাতে ইসরাইল প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে (Newsweek 13 September, 1993)।

দীর্ঘ ৫০ বছরের সন্দেহ ও অবিশ্বাস এবং ইহুদিবাদী চিন্তার প্রভাব সহজেই মুছে যাবে তা পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন না। বিশ্বাস সাক্ষী রেখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও ইসরাইলি চরমপন্থী এবং অভিবাসীরা চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক বাধা প্রদান করবে বলে কূটনৈতিক মহল মনে করে।

www.pathagar.com

আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সিরিয়ান নেতা হাফেজ আল আসাদ প্রকাশ্যে কিছু না বললেও গোলান মালভূমি ফিরে পাবার আগে ফিলিস্তিনিরা পশ্চিম তীর ফিরে পাওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ। তিনি বলেছিলেন, সিরিয়া, পি.এল.ও. ও জর্ডান একটি গতিতে আলোচনা করে ইসরাইলের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে। লিবিয়া সরাসরি চুক্তির বিরোধিতা করে এবং আলজেরিয়া, মরক্কো ও তিউনিসিয়াকে অনুরোধ করে এ চুক্তিতে সমর্থন না দিতে। ইসরাইলের অভ্যন্তরে আরব-ইসরাইলিদের অনেকেই এ চুক্তিকে স্বাগত জানায়। কিশোর-তরুণদের মধ্যে চুক্তির সমর্থক অনেক বেশি।

এ চুক্তির পরিণতি সম্পর্কে কিছু বলা মুশকিল। তবে আরবদেরকে ইসরাইল যেভাবে ফিলিস্তিনের বাসভূমি থেকে একদা বিতাড়ন করেছে, যেভাবে ইসরাইল জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সংস্থার শান্তির প্রস্তাব একের পর এক প্রত্যাখ্যান করেছে তা স্মরণ করলে এটি ভাবা দুরূহ ব্যাপার যে ইসরাইল এ শান্তি চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। পশ্চিম তীরসহ সমগ্র ইসরাইলে ইহুদিবাদীরা যেভাবে ইহুদি অভিবাসন কাজ সম্পাদন করে তাতে মনে হয় দেশের বাইরে বসবাসরত ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুরা চিরকাল উদ্বাস্তুই থেকে যাবে। তবে আমার কথা ইসরাইল অত সহজে এ চুক্তির দিকে অগ্রসর হয়নি। অধিকৃত পশ্চিম তীর ও গাজায় অনুষ্ঠানরত ইন্তিফাদা যা গণবিক্ষোভ এবং ইসরাইলসহ সমগ্র বিশ্বে পি.এল. ও গেরিলাদের ইহুদি হত্যাযজ্ঞের কষাঘাতে রবিন সরকার অনেকটা বাধ্য হয়ে এই শান্তিচুক্তির প্রতি অগ্রসর হয়েছে। ইসরাইলের এমন কোনো পরিবার নেই যার এক বা একাধিক সদস্য ফিলিস্তিনি গেরিলাদের হাতে প্রাণ দেয় নাই। অতএব দুর্বিষহ এক জীবন হতে মুক্তি লাভের উদ্দেশে ইসরাইল এ চুক্তির প্রতি অগ্রসর হয়েছে, কোন মানবতা প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে নয়। অপরদিকে ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থার লোকজনও এক অসম যুদ্ধের হাত থেকে নিস্তার লাভের উদ্দেশ্যে এই চুক্তির প্রতি অগ্রসর হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য এখন আর সোভিয়েত ইউনিয়ন নাই। তাছাড়া বিগত উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের পক্ষাবলম্বনের দায়ে প্রায় সমস্ত বাদশাহ ও আমির শেখ, পি.এল.ও.র ওপর বিরক্ত। অপরদিকে ইরানপন্থী হেজবুল্লাহ্ গ্রুপ আরেক কূটনীতি নিয়ে ব্যস্ত যা ফিলিস্তিনি স্বার্থকে ব্যাহত করবে বলে কেউ কেউ মনে করেন। এ চুক্তির ফলে লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনি তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যাবার অধিকার লাভ করবে। ইতোমধ্যে তাদের এক পুরুষ তাঁবুর অধিবাসী হিসাবে ধরাধাম ত্যাগ করেছে।

www.pathagar.com

হাজার হাজার ফিলিস্তিনি মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু সফলতার মুখ দেখেনি। তারা এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে তাড়া খেয়ে ফিরেছে। তাদের নারী, শিশু, বৃদ্ধ অকাতরে লাঞ্ছনা ভোগ করেছে। তাই এ চুক্তি তাদের জন্য কিছুটা হলেও আশার আলো প্রদর্শন করেছে। তাছাড়া এটিও সত্য, হাওয়ার ওপর মানুষ অনেক আস্ফালন করতে পারে কিন্তু মাটিতে পা ঠেকাতে না পারলে সেই আস্ফালন বা হাত পা ছোঁড়ার কোন অর্থ নাই। সবকিছু ঠিকমত অগ্রসর হলে এ চুক্তি ফিলিস্তিনিদের জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনবে বলেই মনে হয়। ১৯২০ সাল থেকে ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসরাইলে বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা প্রায় ৫৪ লক্ষ। তাদের একটি খতিয়ান নিম্নরূপ (যায়যায়দিন-এর সৌজন্যে) :

লেবানন : ৩,৩৮৯০০।
ইসরাইল : ৬,৪০,০০০।
গাজা উপত্যকা : ৭,২১,০০০।
পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম : ১১,০০,০০০।
জর্ডান : ১৫,৭০,০০০।
সৌদি আরব : ১,৫৬,৬০০।
সিরিয়া : ৩,০১,০০০।
ইরাক : ২৪,০০০।
সংযুক্ত আরব আমিরাত : ৫০,০০০।
কুয়েত : ৫০,০০০।
কাতার : ৩৩,৫০০।
কানাডা : ১৫,০০০।
লিবিয়া : ২৪,০০০।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : ২,১০,০০০।
বিশ্বের অন্যান্য স্থানে : ১,২১,৩০০।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়
আফগানিস্তান

উজর হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রমণ করে উজবেকিস্তান, বালম-বাদামসান দক্ষিণে ও পূর্বে পাকিস্তান, পশ্চিমে ইরান এর মধ্যবর্তী মধ্যপ্রাচ্যের সর্ব পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত আফগানিস্তান নামক দেশটি প্রাচীন ও মধ্যযুগে পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরই মধ্যে অবস্থিত ক্ষুদ্র গজনী বংশ (৯৬৩-১১৮৬) থেকে সুলতান মাহমুদ (৯৯৭-১০৩০) ১৭ বার ভারত আক্রমণ করে হিন্দুস্থানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নড়বড়ে করে দিয়ে হিন্দুস্থানে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার গোড়াপত্তন করেন। সুলতান মাহমুদ ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করলে ও তার উত্তরসূরি ঘোর বংশের (১১৭৫-১২০৬) মুহাম্মদ ঘোরী (১১৭৫ সালে হিন্দুস্থান আক্রমণ করে তার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করেন। মুহাম্মদ ঘোরী আফগানিস্তানে ফিরে আসার পর তাঁর সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০) ভারতে প্রাথমিক তুর্কি সামাজ্য (১২০৬-১২৯০) বা তথাকথিত দাশ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

পূর্বকথা : ১৫০০ সালে শাহ্ ইসমাইল পারস্য সাফাভীয় বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। মূলতঃ তিনি একজন তুর্কি। ওসমানীয় সুলতানগণ যেহেতু সুন্নি মতাবলম্বী তাই তাদের প্রতি বৈরী মনোভাবের কারণে তিনি শিয়া মতাবলম্বন করেন এবং শিয়া মতবাদকে তিনি এ বংশের রাষ্ট্রীয় মতবাদের স্বীকৃতি প্রদান করেন। ইসমাইলের পূর্বপুরুষ এবং একজন অতীন্দ্রিয়বাদী শাহ্ সাফি নামানুসারে বংশের নাম দেয়া হয়, সাফাভীয় বংশ।

সাফাভীয় বংশে কৃতিত্বপূর্ণ অনেক শাসকের পর সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে শাহ্ সুলতান হোসাইনের সময় (১৬৯৪-১৭২২) সাম্রাজ্যের অবস্থা খারাপের দিকে যায় এবং সাম্রাজ্যের অনেক এলাকা হারিয়ে যায়। ঐতিহাসিকদের মতে, সে সময় সৌভাগ্যের সৈনিক নামে পরিচিত ইরানের নেপোলীয়ন শাহ্ নাদিরের উত্থান না হলে সমগ্র সাম্রাজ্যই বিলুপ্ত হয়ে যেত। নাদিরের কৃতিত্ব অধিককাল স্থায়ী না থাকলেও এটি এমন এক সময় আত্মপ্রকাশ করে যখন এটি ইরানিকে স্থিতিশীলতা দান করে এবং একটি শক্তিশালী সরকারসহ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত

www.pathagar.com

টিকে থাকতে সহায়তা করে। ১৬৮৮ সালে তিনি অতি সাধারণ একটি তুর্কি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। কালক্রমে তিনি সাফাভীর সেনাবাহিনীতে একজন অফিসারের পদে উন্নীত হন। সাফাভীদের দুর্বলতায় তারা ওসমানীয়দের হাতে পরাজিত হয় এবং ইরান ককেসাসে পাঁচসনগর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অতঃপর ১৭৩৬ সালের ৬ই মার্চ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন স্তরের সরকারি আমলাকে অনুরোধে তিনি ইরানের শাহ হিসাবে অভিষিক্ত হন। ১৭৩৮ সালে তিনি ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন এবং গজন, কাবুল ও লাহোর অধিকার করেন। ১৭৪৭ সালে নাদির শাহ গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন।

আহমদ শাহ্ আবদালী বা দুরবানী (১৭৪৮-১৭৬২) নাদির শাহের একজন সুযোগ্য সেনাপতি ছিলেন। নাদির শাহ নিহত হবার পর আহমদ শাহ্ আবদালী নিজেকে কান্দাহারের বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন। তিনি কাবুল ও অধিকার করেন। এভাবে তিনি স্বাধীন আফগানিস্তানের বাদশাহ্ হিসাবে পরিচিত হন। ১৭৪৮ থেকে ১৭৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতে অনেকগুলো অভিযান পরিচালনা করেন। এসব অভিযান শুধুমাত্র সামরিক অভিযানই নয় বরং আফগানরা ভারতের কোন কোন জায়গায় মুঘলদের ধ্বংসাবশেষের ওপর নিজ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে। যাহোক, এভাবে আহমদ শাহ্ আবদালী নিজেকে বাদশাহ ঘোষণার মাধ্যমে স্বাধীন আফগানিস্তানের গোড়াপত্তন করেন।

আফগানিস্তানের উত্তর প্রতিবেশী সোভিয়েত প্রভাবাধীন উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান প্রজাতন্ত্র আফগানিস্তানে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রভাব বলয় সৃষ্টি করে। উত্তর আফগানিস্তানের হেরাত অঞ্চল প্রথমত সমাজতান্ত্রিক জালে আবদ্ধ হয়। অতঃপর এটি ক্রমশ দক্ষিণে কাবুল কান্দাহারের দিকে বিস্তার লাভ করে। এই প্রভাব রাজকীয় মহলেও কিছুটা ছড়িয়ে পড়ে। দেশের শেষ বাদশাহ জহির শাহের প্রধানমন্ত্রী এবং ভাই ও শ্যালক দাউদ খানও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। তবে তিনি এই আদর্শকে তাঁর ক্ষমতারোহণের সোপান হিসাবে ব্যবহার করেন। ১৯৭৩ সালের ১৭ই জুলাই এক সেনা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তাঁর ভাই ও ভগ্নিপতি বাদশাহ্ জহির শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেন। আফগানিস্তানকে রাজতন্ত্রের বদলে প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করেন। ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি ঘোষণার মাধ্যমেই আফগানিস্তানের শাসন পরিচালনা করেন। অতঃপর তিনি প্রথম প্রজাতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ঘোষণা করে সংবিধান চালু করেন।

www.pathagar.com

যাহোক, বিগত ২৭শে এপ্রিল ১৯৭৮, আফগানিস্তানে এক সশস্ত্র সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। নাদির শাহের সর্বশেষ বংশধর প্রেসিডেন্ট দাউদের পতন ঘটে। অতঃপর সামরিক বাহিনীর সহায়তায় ক্ষমতায় বসেন সোভিয়েত রাশিয়ার একান্ত অনুগত নূর মোহাম্মদ তারাকী। প্রেসিডেন্ট দাউদের ক্ষমতারোহণ এবং ক্ষমতাচ্যুতির প্রক্রিয়া এক হলেও ঘটনা হয়েছে ভিন্নতর। প্রেসিডেন্ট দাউদ ক্ষমতায় এসেছিলেন বাদশাহ জহির শাহকে সরিয়ে এবং তাই ঐ অভ্যুত্থান ছিল রক্তপাতহীন কিন্তু বর্তমান অভ্যুত্থান হয় রক্তক্ষয়ী, যাতে প্রেসিডেন্ট দাউদ স্বয়ং নিহত হন। কাবুলের রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার লোক নিহত হয়। মৃত্যু পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট দাউদ আত্মসমর্পণ করেন নাই।

১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে বাদশাহ্ জহির শাহ্কে উৎখাতের সময় দাউদ বলেছিলেন, আধুনিক জগতে রাজতন্ত্র চলতে পারে না। জহির শাহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসাবে দীর্ঘ ১০ বছর (১৯৫৩-১৯৬৩) তিনি জহির শাহের অধীনে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেও তিনি প্রকাশ্যে রাজতন্ত্রের সমালোচনা করেন। এ কারণে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে তিনি পদচ্যুত হন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেই সেনাবাহিনীর সোভিয়েত ঘেঁষা জেনারেলদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। ১৯৭৩ সালে এঁদের সাহায্যেই তিনি ক্ষমতারোহণ করেন।

১৯৭৭ সালে প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান ঘোষণার মাধ্যমে দাউদ প্রেসিডেন্ট হিসাবে বৈধ ক্ষমতাবান পুরুষ হিসাবে আবির্ভূত হন। ১৯৭৮ সালের অভ্যুত্থানের সহযোগী সামরিক অফিসারদের সাথে তাঁর মতান্তর শুরু হয়। এসব সামরিক অফিসাররা আরও অধিক সোভিয়েত ঘেঁষা নীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যদিকে দাউদ চান সবার নিকট থেকে সমদূরত্বে অবস্থান করা। নতুন ক্ষমতাবদ্ধ বিপ্লবী কাউন্সিল ইতোমধ্যে নিজেদেরকে নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করেন। তাঁরা বিশ্বের সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবেন। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইসলাম, গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও দেশের অগ্রগতি হবে মৌলনীতি।

পাল্টা বিপ্লব

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে আফগান কম্যুনিস্ট পার্টির 'খালক' গ্রুপের নেতা নূর মোহাম্মদ তারাকী ১৯৭৮ সালের ২৭শে এপ্রিল এক সামরিক

www.pathagar.com

অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট দাউদ খানকে হত্যা করে আফগানিস্তানের ক্ষমতায় বসেন। কাবুলের রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার লোক নিহত হয়।

আফগানিস্তানের পিপল্‌স ডেমোক্র্যাটিক লীগের দুটো গ্রুপ 'খালক' ও 'পারচম' নামে পরিচিত। এ দুটো বিবদমান কমিউনিস্ট পার্টি, পিপলস ডেমোক্র্যাটিক লীগের আওতায় একীভূত হয়। 'পারচম'কে প্রধানত রুশপন্থী হিসাবে অভিহিত করা হয়, অপরদিকে 'খালক' এর নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদী। শিক্ষিত আফগানগণ 'পারচম'কে ঠাট্টা করে 'রাজকীয় কমিউনিস্ট পার্টি' বলে সম্বোধন করেন। অপরদিকে 'পারচম' নেতৃবৃন্দ 'খালক'কে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি.আই.এ.র (CIA) এজেন্ট বলে আখ্যায়িত করেন। 'খালক' নেতা হাফিজ উল্লাহ্ আমিনকে তাঁরা সি.আই.এ.র এজেন্ট মনে করেন। নূর মোহাম্মদ তারাকী সম্পর্কেও তাদের একই ধারণা। তারা ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য বারবাক কারমালের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

অচিরেই উপজাতীয় লোকজন তারাকীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে সোভিয়েত জঙ্গি বিমান থেকে তাদের ওপর নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করা হয়। পাকিস্তানে আগত আফগান উদ্বাস্তু শিবিরের ওপরও বোমা বর্ষিত হয়। অতঃপর ১৯৭৮ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর অপর এক সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা হাফিজ উল্লাহ্ আমিন ক্ষমতায় আসেন এবং তারাকী সংঘর্ষে আহত হয়ে মারা যান। কিন্তু আমিনের কার্যকলাপে সোভিয়েত রাশিয়া অসন্তুষ্ট হয়। ১৯৭৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর অপর এক অভ্যুত্থানে হাফিজ উল্লাহ ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন এবং বারবাক কারমাল আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আরোহণ করেন। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য রাশিয়া এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করে। সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষত মুসলিম বিশ্ব হতে রাশিয়ার এই কার্যকলাপের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানায়। আন্তর্জাতিক জুরি কমিশন একে সোভিয়েত কর্তৃক জাতিসংঘ সনদ লঙ্ঘন বলে মতপ্রকাশ করে। কিন্তু অপরদিকে সোভিয়েত রাশিয়া অভিযোগ করে যে, হাজার হাজার বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র বিদ্রোহী আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছে। তাই কারমাল সরকারের অনুরোধে বাধ্য হয়ে রাশিয়া সীমিত সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করে। তাদের মতে, ১৯৭৮ সালের বিপ্লবের পর আফগানিস্তানে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। জনগণ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে আরম্ভ করে। ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত পিপল্‌স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সম্মেলনে দেশের সার্বিক উন্নয়নের কথা উল্লেখ করা হয়।

www.pathagar.com

এতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সামন্তবাদী শ্রেণী ও বড় বড় মহাজন শ্রেণীকে উৎখাত করা হয়েছে। দেশের সমস্ত দেশাত্মবোধক গ্রুপসমূহের মধ্যে ক্রমশ পরস্পর সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠছে। (New Times, March, '82)।

রুশ-বিরোধী পাল্টা কর্মসূচি

মুসলিম বিশ্ব এবং পশ্চিমা শক্তিবর্গ একে রাশিয়ার আগ্রাসন হিসেবে আখ্যায়িত করে। তাদের সহায়তায় আফগান মুজাহিদ বাহিনী আফগানিস্তানে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী প্রবল নিন্দা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও সোভিয়েত বাহিনী তখনও আফগানিস্তানে অবস্থানরত। সোভিয়েত বিরোধী বিভিন্ন মুজাহিদ বাহিনী ক্রমশ সংগঠিত হতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্র এবং আর্থিক ও কৌশলগত সহায়তায় তারা ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি করে এবং বারবাক কারমাল সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

এদিকে আফগান কম্যুনিস্ট পার্টি বা পিপল্স ডেমোক্র্যাটিক লীগের নেতা ড. নজিবুল্লাহ্ বারবাক কারমাল থেকে ক্ষমতা দখল করে সোভিয়েত সহায়তায় দেশ পরিচালনা এবং বিদ্রোহী আফগান মুজাহিদদের মোকাবিলায় রত। সোভিয়েত রাশিয়া লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে আফগান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মত্ত। মুসলিম বিশ্ব এবং পশ্চিমা শক্তিবর্গ একে মস্কোর আগ্রাসন বলে আখ্যায়িত করে এবং অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানকে গঠনে মুজাহিদ বাহিনী সাহায্য করে।

সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ ক্ষমতায় আসার পর তিনি আফগান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এই নিষ্ফল যুদ্ধের বাতুলতা উপলব্ধি করেন। একদিকে সোভিয়েত লোকক্ষয় অপরদিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় সোভিয়েত প্রেসিডেন্টকে আফগানিস্তান থেকে সৈন্য সরিয়ে আনার সিদ্ধান্তে উৎসাহিত করে। ১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে মিখাইল গর্বাচেভ, সোভিয়েত নীতির ভ্রান্তির কথা স্বীকার করেন। একটি আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের কথা বলা হলেও আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য ফেরত আনা আরম্ভ হয়ে যায়। তবে গ্রহণযোগ্য কোন বিকল্প না পাওয়া পর্যন্ত কিছু সৈন্য কাবুলে রেখে যাবার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। কাবুলে অবস্থানরত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত নিকোলাই ইয়োগেবিচেভ বলেন, "কম্যুনিস্ট ও মুজাহিদ সম্বলিত একটি সমঝোতামূলক সরকারের মধ্যে এ সমস্যার সমাধান নিহিত।" তিনি আরও বলেন, "সামরিক ব্যবস্থার দ্বারা এ

www.pathagar.com

সমস্যার সমাধান হবে না। একমাত্র রাজনৈতিকভাবেই এর সমাধান করতে হবে।"

অতঃপর আফগানিস্তান, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৮৮ সালে জেনেভায় যে সমঝোতায় উপনীত হয় তাতে ১৯৮৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত সৈন্য সম্পূর্ণভাবে ফেরৎ যাবার সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়। সোভিয়েত পররাষ্ট্র বিষয়ক মুখপাত্রসহ আরও অনেকেই নজিবুল্লাহ সরকারকে একলা ফেলে যাবার বিপদের কথা উল্লেখ করেন কিন্তু পরে দেখা গেল নজিবুল্লাহর সৈন্যরা আশাতিরিক্ত সফলতা প্রদর্শন করছে। তবে ১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে রুশ সৈন্য অপসারণ করা শুরু হলে ক্রমশ সরকারি সৈন্য নিস্তেজ হয়ে আসে এবং বিভিন্ন এলাকা মুজাহিদদের দখলে চলে যায়। যতই সোভিয়েত সৈন্য অপসারণ হয় ততই মুজাহিদদের শক্তি বেড়ে যায়। শেষের দিকে মুজাহিদদের গঠিত মজলিশে শূরায় নজিবুল্লাহ সরকারের প্রতিনিধিত্বের একটি দাবি মুজাহিদরা প্রত্যাখ্যান করে। সোভিয়েত বাহিনী মুজাহিদদের হাতে আত্মসমর্পণ হতে রক্ষা পাবার জন্য অতিদ্রুত অপসারণের কাজ সম্পন্ন করে বিধায় শূরায় নজিবুল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দাবি তেমন গুরুত্ব পায়নি। ১৫ই ফেব্রুয়ারি শেষ সোভিয়েত সৈন্য অপসারণের পর জালালাবাদের দখল নিয়ে মুজাহিদদের সাথে সরকারি বাহিনীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। উভয়পক্ষে বিপুল লোকক্ষয়ের বিনিময়ে মুজাহিদ বাহিনী জালালাবাদ দখল করে নেয়।

অতঃপর কাবুলের পথে মুজাহিদ বাহিনী অগ্রসর হতে থাকে। পথিমধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, উজবেক নেতা আহমদ শাহ্ মাসুদের গেরিলা লোকজন অপর একটি গেরিলা দল হেজবে ইসলামী নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের লোকজন দ্বারা আক্রান্ত হওয়া। শাহ্ মাসুদের সশস্ত্র দলটি পথিমধ্যে আক্রান্ত হলে ৩০ জন সংগ্রামীকে হেজবে ইসলামীর লোকেরা হত্যা করে। ঘটনাটি বিক্ষিপ্ত হলেও এটি একটি অশুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে।

১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে মুজাহিদদের হাতে কাবুলের পতনের মধ্য দিয়ে নজিবুল্লাহ্ সরকার তথা সমাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান হয়। নজিবুল্লাহ্ কাবুল থেকে পলায়ন করেন। কিন্তু কাবুল দখলের পূর্বে ও পরে বিভিন্ন মুজাহিদ দলগুলোর মধ্যে পরস্পর গুলি বিনিময় হয়।

২৮শে এপ্রিল '৯২ অধ্যাপক সিবঘাত উল্লাহ্ মুজাদ্দেদী অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসাবে কাবুলে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। কাবুল ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে থাকলেও মুজাদ্দেদীর সমর্থকদের সাথে হেজবে ইসলামী প্রধান

www.pathagar.com

গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড গোলা বিনিময় হয়। তাজিক নেতা কমান্ডার আহমদ শাহ্ মাসুদ প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে ইতোমধ্যে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক মুজাদ্দেদী মুজাহিদদের একটি ছোট গ্রুপের নেতা। তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামি বিবর্জিত একজন ধর্মীয় পণ্ডিত। ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে তিনি প্রথমে প্রবাসী সরকারের এবং কাবুল দখলের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হন। কাবুলে তাঁর ক্ষমতার মেয়াদকাল মাত্র দু'মাস। পরে তিনি ক্ষমতা তুলে দেবেন জামাতে ইসলামীর বুরহানুদ্দীন রব্বানীর হাতে। তিনি চার মাস ক্ষমতায় থাকবেন এবং সেই সময় দেশের নির্বাচনও দেবেন। এদিকে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের দল থেকে ওস্তাদ ফারুকীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হতে হেকমতিয়ারের বাইরে থাকাটা অনেক জল্পনা-কল্পনার জন্ম দেয়। হেকমতিয়ার বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত পামতুনদের নেতা। তবে ওস্তাদ ফারুকী প্রধানমন্ত্রী হলেও প্রকৃত ক্ষমতা হেকমতিয়ারের হাতেই থাকে।

নতুন সরকার আফগানিস্তানকে ইসলামী রিপাবলিক হিসাবে ঘোষণা দেয় তবে বিশ্বের সামনে এদেশের প্রগতিশীল চেহারা তুলে ধরার ঘোষণাও দেয়। যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘসহ বিশ্বের যারাই মুজাহিদদের সাহায্য করেছে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং তাদের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

রাজনৈতিক বন্ধনের চাইতে উপজাতীয় বন্ধন আফগান সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানে গোত্র ও গোত্রপ্রধান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। অনুগত জিরগাই আধুনিক পার্লামেন্টের ভূমিকা পালন করে। তাই রাজনৈতিক পরিচয়ের চেয়ে গোত্রীয় পরিচয় এখানে মুখ্য। মুজাদ্দেদী কিংবা রব্বানী বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত এ আফগানিস্তান কিভাবে এক রাখবেন সেটি এখন বড় প্রশ্ন। রব্বানী নিজে তাজিক গোত্রের লোক। আহমদ মাসুদও তাই। এরা সংখ্যালঘু কিন্তু হেকমতিয়ারের নিয়ন্ত্রণাধীন পশতুনরা সংখ্যাগুরু। মুজাদ্দেদী বা রব্বানী উভয়েই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে চান কিন্তু কিভাবে তা বাস্তবায়িত করবেন তাই প্রশ্ন। ইরানের ন্যায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রগঠন আফগানিস্তানে সম্ভব নয় কারণ এদেশের জনগণ, ইরানের ন্যায় রাজনীতিসচেতন নয়। তাছাড়া ইরানের অর্থনৈতিক অবস্থাও সচ্ছল ছিল, যা আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে নয়। অধিকন্তু ১৩ বছরের সশস্ত্র সংঘাত এদেশের অর্থনীতিকে দেউলিয়া করে দিয়েছে। অপরদিকে প্রতিবেশী তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান বা উজবেকিস্তানও

www.pathagar.com

চায় না যে, এদেশ একটি গোড়া ইসলামী দেশে পরিণত হোক। আরেকটি বিষয়, পাকিস্তান ও সৌদি আরব এদেশের ব্যাপারে আগ্রহী। মুজাদ্দেদীর ক্ষমতা গ্রহণের একদিন পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ কাবুল সফর করেন। তাঁর সাথে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আসিফ নেওয়াজও ছিলেন। পাকিস্তানই প্রথম দেশ যে কাবুল সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে। আফগানিস্তানে একটি গোঁড়া ইসলামীয় রাষ্ট্র কায়েম হলে ইসলামী ব্লকের স্বার্থে আঘাত করতে পারে, তাই এ ব্লকে পাকিস্তানকে অনেকটা বাধ্য করেছে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে। সৌদি আরবের স্বার্থ পাকিস্তানের মতোই প্রায়। অধিকন্তু হেকমতিয়ারের মতো রাজতন্ত্র বিরোধী কোন মহলকে সৌদি আরব সমর্থন করতে পারে না।

কিন্তু কাবুলের ক্ষমতা গ্রহণের দু'সপ্তাহের মধ্যে মুজাহিদদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর ভেতর ব্যাপক সংঘর্ষ আরম্ভ হয়ে যায়। হেজবে ইসলামী দলের নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার বাহিনীর ক্রমাগত রকেট হামলায় প্রায় দু'হাজার লোক নিহত হয় এবং আহত হয় প্রায় হাজার লোক। বৃষ্টির ন্যায় অঝোরে বর্ষণরত গুলি বিনিময়ের মধ্যে বিদেশি কূটনীতিকসহ প্রায় দু'লক্ষ লোক কাবুল ত্যাগ করে। নজিবুল্লাহ্ সরকারের পতনের পর হেকমতিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারকে তিনটি শর্ত দিয়েছিল। এগুলো হল–১. দু' মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, ২. এক বছরের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন দেয়া, ৩. উজবেক মিলিশিয়াদেরকে রাজধানী কাবুল থেকে দ্রুত প্রত্যাহার করা। সিবঘাত উল্লাহ্ সরকার এসব শর্ত বাস্তবায়নে অস্বীকৃতি প্রদান করেন কারণ গত ১৩ বছরের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দরুন দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত। পরবর্তীতে শক্তিশালী গেরিলা সংগঠন হেজবে ইসলামীর সাথে সরকারের দ্বন্দ্ব অন্যান্য দলের মধ্যে ব্যাপক অবিশ্বাস ও রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষিতে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো একটি যৌথ শান্তিবাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেয়। দশদিন আলোচনার পর সরকার ও হেকমতিয়ারের বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়। ৫ হতে ৭ হাজার সদস্য নিয়ে গঠিত শান্তি বাহিনী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করবে এবং কাবুলসহ তিনটি প্রদেশের সেনাকর্তারা বিশেষ ভূমিকায় থাকবেন। অতএব কাবুলে সাময়িক জনসমাগম দেখা দেয় এবং দোকানপাট খুলতে আরম্ভ করে।

মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে স্থিতিশীলতার কথা বললেও শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের পর তা আশানুরূপ কার্যকর হয়নি। হেকমতিয়ার

www.pathagar.com

তার লোকদের মধ্যে পুনরায় অস্ত্রবিতরণ করেন, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নগরীতে প্রবেশের পথে গেরিলারা অস্ত্র বহন করে এবং কাবুলের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত রশীদ দোস্তামির মিলিশিয়া বাহিনীকে আক্রমণের পরিকল্পনা করে। জালালাবাদ শহরের ডেপুটি গভর্নর ড. আশিক হেকমতিয়ার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করলে সমঝোতার কাঠামো আরও নড়বড়ে হয়ে যায়।

কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে দীর্ঘ ১৩ বছরের সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং লোকক্ষয়ের পরও দেশে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বাধা কোথায়। গত যুদ্ধে মোট আফগান জনগোষ্ঠীর এক কোটি ৬০ লক্ষের মধ্যে ২০ লক্ষ লোক নিহত হয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি ৮ জনে একজন নিহত এবং প্রতি ৮ জনে একজন পঙ্গু হয়েছে। একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের দিকে বর্তমান সরকার অগ্রসর হলেও বিশেষত দুটো কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। প্রথমত গত ১৩ বছরে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে একটি অখণ্ড জাতিসত্তা ভিত্তিক দেশ গঠনের উদ্যোগ নেয়া হলেও বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। গেরিলা দলগুলোর সরকার বিরোধী রক্তক্ষয়ী ধর্মভিত্তিক যুদ্ধ আফগান উপজাতিসমূহের হাজার বছরের পুরাতন বিরোধকে বরং বহুগুণে উসকিয়ে দিচ্ছে। একে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রাচীন ধ্যান-ধারণা তাদেরকে একক জাতিসত্তায় একত্রিত হতে বাধা প্রদান করছে। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন দল উপজাতীয় ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে নজিবুল্লাহ্ সরকারের বিরুদ্ধে লড়েছে–একক মুজাহিদ বাহিনী হিসাবে নয়। তাজিক গোত্রীয় নেতা আহমদ শাহ্ মাসুদ উত্তর আফগানিস্তানের তাজিক নেতা হিসাবে পরিচিত। পূর্ব থেকেই সরকারি মিলিশিয়া বাহিনীতে এবং সেনা ও বিমান বাহিনীতে তাজিকদের প্রাধান্য ছিল। এই সুবাদেই আহমদ শাহ্ মাসুদের সাথে আরেক তাজিক নেতা জেনারেল দোস্তামের গোপন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নজিবুল্লাহ্ সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলে নিয়োজিত জেনারেল দোস্তাম এবং তৎসহ আহমদ শাহ্ মাসুদ সর্বত্র তাজিক প্রাধান্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। এ সঙ্গে তারা সংখ্যাগুরু পাশতুন ও তাদের নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারকে বাধা দিতে তৎপর হন। পরবর্তীতে হেকমতিয়ার জেনারেল দোস্তামকে সাবেক সরকারের সহযোগী হিসাবে চিহ্নিত করে তাকে কাবুল থেকে সরে যাবার শর্ত জুড়ে দেন। এ শর্ত বর্তমান সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আহমদ শাহ্ মাসুদ বরাবরই প্রত্যাখ্যান করে আসছেন। তাজিক ও পাশতুনগোত্রের মধ্যে বিদ্যমান কালজয়ী সংঘাতই বর্তমান আফগান বাহিনীকে পরিচালিত করছে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জাতিসত্তায় রূপান্তরিত হতে বাধা দিচ্ছে।

www.pathagar.com

সিবগাতুল্লাহ্ মুজাদ্দেদী দু'মাস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান থাকার পর বোরহানুদ্দিন রব্বানী আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। নজিবুল্লাহ সরকারের পতনের পর এরা সবাই আফগানিস্তানকে একটি আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চান, যার অগ্রযাত্রা আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত হবে। কিন্তু হেকমতিয়ারের সাথে তাদের বিরোধ এ জায়গাতেই। হেকমতিয়ার কাবুলে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে চান। প্রেসিডেন্ট বোরহানুদ্দিন রব্বানী আধুনিক ধারায় একটি আফগান মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ায় আফগান জনগণের সমর্থন লাভ করেন। দীর্ঘকাল যাবৎ পাশতুন গোত্রীয় নেতারা তাদের গোত্রীয় প্রাধান্যের দ্বারা আফগান জনগণকে ইসলামের নামে একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিতে পরিণত করেছেন বলে অভিযোগ, তাই জনগণ আর সে পথে যেতে রাজি নয়।

১৯৪৮ সালে আফগানিস্তানের সামন্তীয় ভূমি ব্যবস্থাকে ভেঙে সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। এর ফলে সরকার দীর্ঘদিনের বঞ্চিত ও উপেক্ষিত কিছু জনগণের সমর্থন লাভ করে। কিন্তু আফগান ভূস্বামীরা এ সংস্কারের বিরোধিতা করেন। ফলে সরকার-বিরোধী আন্দোলন আরও জোরদার হয়। ১৯৮৭ সালে ইউ.এম.এ. (দি ইসলামিক ইউনিয়ন অব আফগান মুজাহিদিন) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দল ইসলামের নামে তাদের শ্রেণী স্বার্থ উদ্ধারে অধিক নিয়োজিত থাকে। মৌলবাদী কিছু মুজাহিদের সঙ্গে এরা একান্ত হয়ে কাজ করে। নজিবুল্লাহ্ সরকারের পতনের পর আফগানিস্তানের সমাজ বিন্যাস প্রবল চাপের সম্মুখীন হয়। ১৩ বছর দেশের সমাজ, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন হওয়ায় সামন্তপতিদের অনুকূলে বর্তমান সরকারের পক্ষে কোন পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। হেজবে ইসলামী দলের প্রধান হেকমতিয়ারের অসন্তোষ মূলত এখানেই। তবে হেকমতিয়ার যতই শক্তি প্রদর্শন করুক ফলাফল একই হবে। তাই বর্তমান অবস্থা মেনে সরকারের সঙ্গে সমঝোতা সৃষ্টিই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে বলে পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন।

আফগানিস্তানে প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী সংগঠনসমূহ

কাবুলে সোভিয়েত প্রভাবাধীন ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব আফগানিস্তান (D.R.A.) গঠিত হবার পর ইসলামপন্থী আফগান জনগণ বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। এই জনগণ মূলত পাকিস্তান ও ইরানে শিকড় গড়ে উপজাতীয় ভিত্তিতে গঠিত ৮টি গেরিলা দলে বিভক্ত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে।

www.pathagar.com

সবগুলোকে একত্রে মুজাহিদ বাহিনীও বলা হয়। এই ৮টি ইসলামী গেরিলা দল নিম্নরূপ :

১। **জমিয়ত-ই-ইসলামী, আফগানিস্তান** (ইসলামিক সোসাইটি) এ দলের সৈন্যরা আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে এবং এ দলের প্রধান আহমেদ শাহ্ মাসুদ বর্তমানে কাবুল সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

২। **হেজবে ইসলামী** (ইসলাম পার্টি) : গোঁড়া ধর্মীয় নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের নেতৃত্বাধীন এ দলটিকে সবচাইতে সুসজ্জিত ও সুসংগঠিত বিদ্রোহী গ্রুপ বলে মনে করা হয়। গত ১৩ বছরে এ দলটি সবচাইতে বেশি পরিমাণে মার্কিন সাহায্য পেয়েছে। এ দলের একটি অংশ দল থেকে বের হয়ে গিয়েছে। তারাও হেজবে ইসলামী বলে পরিচিত আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে তাদের সৈন্যদের অবস্থান সীমিত।

৩। **ইত্তেহাদ-ই-ইসলামী** (ইসলামিক ইউনিটি) : ইন্টারন্যাশনাল মুসলিম ব্রাদারহুড নামে একটি জঙ্গি আন্তর্জাতিক গ্রুপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। এ দলটি সৌদি আরবের গোঁড়া ইসলামী দলগুলোর নিকট থেকে প্রচুর অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। এ দলটি আফগানিস্তানে তেমন শক্তিশালী নয় বলে ধারণা করা হয়।

৪। **হরকত-ই-ইনকিলাব-ই-আফগানিস্তান** (Movement for Islami Revolution) : মুসলিম ধর্মীয় নেতা মৌলভী নবী মুহাম্মদীর নেতৃত্বাধীন এ দলটি এক সময় আফগানিস্তানে সবচাইতে শক্তিশালী প্রতিরোধ গ্রুপগুলোর অন্যতম ছিল। কিন্তু ব্যাপক দুর্নীতির কারণে এ দলের প্রভাব হ্রাস পায়।

৫। **মাহাজ-ই-মিলি-এ ইসলামী** (National Islamic Front of Afghanistan) : এ দলটি আফগানিস্তানের সুফিবাদীদের ধর্মীয় নেতা সৈয়দ আহমদ গেইলানীর নেতৃত্বাধীন। আফগান রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত এ নেতা প্রাক্তন বাদশাহ্ জহির শাহের প্রত্যাবর্তনের দৃঢ় সমর্থক।

৬। **জেভা-ই-নেজাত-ই-মিলি** (Afghan National Liberation Front) : কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী দর্শন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক সিরঘাতুল্লাহ্ মুজাদ্দেদীর নেতৃত্বাধীন এ দলটি আফগানিস্তানের ক্ষুদ্রতম বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর অন্যতম।

৭। **হেজাবে ওয়াহ্দাত** (Islami Qualition Council of Afghanistan) : এটি ইরান ভিত্তিক ৮টি প্রধান গেরিলা গ্রুপের একটি কোয়ালিশন। এ

www.pathagar.com

গ্রুপগুলোর অধিকাংশই আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু শিয়াদের নিয়ে গঠিত। ইরানের দৃঢ় সমর্থনপুষ্ট এ কোয়ালিশনের শক্তি আফগানিস্তানের পশ্চিমে ও মধ্যাঞ্চলে সীমিত।

৮। হরকত-ই-ইসলামী আফগানিস্তান (Islami Movement of Afghanistan) : এবং শুরু-এ-ইতেফাকে ইসলামিয়া এ দু'টো শিয়া প্রধান ছোট গ্রুপের সদর দফতর পাকিস্তানে, বর্তমানেও এদের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

* * * * *

আফগানিস্তানে সরকারি বাহিনী এবং গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের হেজবে ইসলামী দলের সংঘর্ষ বেশ কিছুদিন অব্যাহত থাকে প্রচণ্ড গোলাগুলিতে শত শত লোক নিহত হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ আফগানিস্তানের দু' প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা প্রেসিডেন্ট বোরহানুদ্দিন রব্বানী এবং গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারকে এক আলোচনা সভায় একত্রিত করেন। উভয়ের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি হয় এবং চুক্তি মোতাবেক গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারকে আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

আফগানিস্তানে তালেবান শাসন

পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলে কিছুদিন অবস্থা শান্ত থাকে। কিন্তু শীঘ্রই প্রেসিডেন্ট বোরহানুদ্দিন রব্বানীর সাথে তাঁর মতবিরোধ হয় এবং তিনি কাবুল অবরোধ করেন। ইতোমধ্যে তালেবান যোদ্ধাদল কাবুল দখল করে উত্তর দিকে মাজার-ই-শরীফের দিকে অগ্রসর হয়। মাজার-ই-শরীফ একমাত্র প্রধান নগরী যা তখনও তালেবানদের নিয়ন্ত্রণে আসে নাই। ১৯৯৬ সালে দক্ষিণ কান্দাহারে তাদের ঘাঁটি থেকে নির্গত হয়ে তালেবান (ছাত্রদল) ইসলামী যোদ্ধারা প্রায় সমগ্র আফগানিস্তান জয় করে মাজার-ই-শরীফের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তারা আফগানিস্তান শাসনকারী জমিয়তে ইসলামীর নেতা প্রেসিডেন্ট বোরহানুদ্দিন রব্বানীর নিকট থেকে জাতীয় রাজধানী কাবুল দখল করে উত্তরে মাজার-ই-শরীফের ওপর আঘাত হানে। মাজার-ই-শরীফ যে অঞ্চলের রাজধানী তাতে তার নিজস্ব মুদ্রা ও নিজস্ব বিমান সার্ভিস রয়েছে এবং অতীত সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত মধ্য এশিয়ার জাতিসমূহের সাথে সাংস্কৃতিক বন্ধনও রয়েছে। কিন্তু মাজার-ই-শরীফ দেশের সর্বশেষ স্বাধীন জমিদারির চাইতেও বেশি কিছু। তালেবানদের হাত থেকে পলাতক হাজার হাজার মহিলা ও শিক্ষিত লোকের জন্য এটি একটি আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ কাবুলের ওপর তালেবানদের নিয়ন্ত্রণ দিন দিন কঠোর হয়ে আসছে। তালেবান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের ন্যায় এখানে এখনও মহিলাদের পর্দাপ্রথা তেমন কড়াকড়ি নয়। এখনও তারা এখানে পর্দা ছাড়া স্কুল কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারে এবং ঘরেও পর্দাবিহীন খোলা জানালা রাখতে পারে।

গত বসন্তকালের বাদাম ও কিশমিশের নব কিশলয় মাজার-ই-শরীফের অধিবাসীদের জন্য ভয়াবহ বিপদের বার্তা নিয়ে আসে। এমনকি প্রচণ্ড শীতের সময় তালেবান যোদ্ধারা দক্ষিণাঞ্চলের হালকা পোশাক, কখনও কখনও খালি গায়ে বরফের ওপর দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে মাজার-ই-শরীফের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

www.pathagar.com

এলাকা দখল করে আসে। এখন গরম আবহাওয়ায় নতুন আক্রমণ তাদের জন্য আরামপ্রিয়। তালেবানদের চূড়ান্ত বিজয় "সময়ের ব্যাপার মাত্র"—মন্তব্য করেন তালেবান সর্বাধিনায়ক মোল্লা মোহাম্মদ ওমর।

নগরীর প্রতিরক্ষাকারী আবদুর রশিদ দোস্তাম সোভিয়েত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একমাত্র জীবিত এবং একটি শক্তিশালী ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ। তবুও ১৯৯৬ সালে দোস্তাম স্যালাঙ্গ গিরিপথের রাস্তা উড়িয়ে দিয়ে তালেবানদের অগ্রযাত্রা রুখবার জন্য শেষ প্রচেষ্টা চালান। উত্তর ও দক্ষিণকে বিভক্তকারী পাহাড়ের একমাত্র সুতনের নাম স্যালাঙ্গ টানেল। বর্তমানে তিনি এবং তাঁর জটিল মিত্র এককালের সোভিয়েত বিরোধী বিদ্রোহী নেতা আহমদ শাহ্ মাসুদ রক্ষণভাগে। কিছুদিন আগে দোস্তাম বলেন, "আমাদের আক্রমণ করার কোন পরিকল্পনা নেই, তবে আমরা আক্রান্ত হলে আমাদের নিজেদের রক্ষা করার পরিকল্পনা আছে।"

তালেবান যোদ্ধারা প্রধানত পাকিস্তান ও সৌদি আরবের আর্থিক সাহায্যে মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে গঠিত ইসলামী যোদ্ধাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে এবং নৈতিক বলে বলীয়ান একটি সুদক্ষ বাহিনী গড়ে তোলে। ইতোমধ্যে উভয় দিকে দোস্তাম মাসুদ বাহিনীকে উজ্জীবিত করার জন্য প্রত্যেক রাতে ইরানি সরবরাহ ট্রাকসমূহ সশব্দে মাজার-ই-শরীফে প্রবেশ করে। দোস্তামের লোকজন রুশ উর্দি পরিধান করে এবং রুশ অস্ত্র বহন করে। একটি পাশ্চাত্য গোয়েন্দা সূত্র অনুযায়ী প্রতিবেশী উজবেকিস্তান দোস্তামকে মিগ-২১ জঙ্গি বিমান সরবরাহ করে। অপরদিকে প্রতিবেশী তাজিকিস্তান মাসুদকে কুলাইব শহরে একটি সরবরাহ ঘাঁটি প্রদান করে (Newsweek, April 14, 1997)।

ঐদিকে উত্তর উজবেকিস্তান প্রচণ্ড চাপের মুখে দিনাতিপাত করে কখন তালেবান বাহিনী বন্ধুত্বের পুল (Friendship Bridge) পার হয়ে উজবেকিস্তানে প্রবেশ করে। এই পুল আফগানিস্তান ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের উজবেকিস্তানের মধ্যে প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে। তাদেরকে তেমন দোষও দেয়া যায় না কারণ গত সপ্তাহে আফগান গৃহযুদ্ধের ঢেউ উজবেক সীমান্ত পর্যন্ত এসে পৌঁছে। বন্ধুত্বের পুলের ৬০ কি.মি. দক্ষিণের স্থানটি বিগত দু' যুগের আফগান গৃহযুদ্ধের সময় থেকে একটি চমৎকার ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে বিদ্যমান, শান্তিপূর্ণ এ স্থানটি গত সপ্তাহে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তালেবান বাহিনী হঠাৎ মাজার-ই-শরীফ আক্রমণ করে দখল করে নেয়। আবদুর রশিদ দোস্তাম তার ব্যক্তিগত জেট বিমানে করে তুরস্কে পলায়ন করেন। তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মালিক পলওয়ান

www.pathagar.com

শহরটি তালেবানদের হাতে ছেড়ে দেয়। মাজার-ই-শরীফ দখল করে তালেবান সেখানে ইসলামী শাসনব্যবস্থা চালু হবার ঘোষণা দেয় এবং লোকদের অস্ত্রশস্ত্র জমা দিতে বলে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে মালিক পলওয়ান বিদ্রোহ করেন এবং তালেবানদের মাজার-ই-শরীফ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন (News week, June 9, 1997)।

তালেবানদের উৎপত্তি

তালেবানদের উৎপত্তির ইতিহাস অনুমান ও গুজবনির্ভর। রণকৌশল, শক্তিমত্তা, কৌলিন্য ও কার্যকরী কর্মপন্থায় অদ্বিতীয় তালেবান নামের এ আফগান বাহিনী। বিদেশি পরিকল্পনা, অর্থ ও অস্ত্রের জোরে গঠিত এ বাহিনীর মূলে কাজ করেছে একজন ধর্মীয় নেতা এবং বিশ্বব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত ব্যক্তি, যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে একজন সন্ত্রাসীর কৌশলগত মিত্রতা। এ জোটের মধ্যে আরও রয়েছে মধ্য-এশিয়ার স্থলবেষ্টিত তেল সম্পদ সমুদ্রে বহনকারী সম্ভাব্য পাইপলাইনের দু'প্রতিদ্বন্দ্বী নির্মাতার মধ্যে সংঘর্ষ। তালেবান এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক কোন যোগসূত্র পাওয়া না গেলেও তালেবানদের পেছনে সক্রিয় রয়েছে ঐ অঞ্চলের যুক্তরাষ্ট্রের দুই ঘনিষ্ঠ মিত্র–রিয়াদ ও ইসলামাবাদ। তবে এদেরকে একটি শক্তিতে পরিণত করেন নিভৃতাচারী আফগান মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের নেতৃত্বে একদল ধর্মীয় গোষ্ঠী।

তালেবানদের গোড়াপত্তন হয় ১৯৮০ সালের শুরুতে। পাকিস্তানের স্পেশাল অপারেশনের অফিসার সুলতান আমিরের হাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অধিকাংশ ধর্মীয় যোদ্ধা এসেছে সনাতন গ্রাম্য ধর্মীয় মাদ্রাসা (কওমি) থেকে। এ ধরনের যুবকদের সাধারণভাবে তালেবান বা ছাত্র বলা হয়। এসব অভিজাত যোদ্ধাদের একটি অংশকে রুশবিরোধী মুজাহিদ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অবশিষ্টগণকে প্রাচীন গোত্র ব্যবস্থার বাইরে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত বিশেষ যোদ্ধাদলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমেরিকার সি.আই.এ. (CIA) সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহের জন্য কোটি কোটি ডলার প্রেরণ করার সময় ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মীয় দলের কোন বাছবিচার করে নাই। যুদ্ধ চলাকালে সৌদি আরব উদ্বাস্তু শিবিরে কোরআন শিক্ষার জন্য অর্থ প্রেরণ করে। ১৯৯২ সালে কাবুলের মস্কো সমর্থিত সরকারের পতনের সময় এসব তালেবানের সংখ্যা কয়েক হাজারে দাঁড়ায়। ছাত্ররা তাদের গ্রামে এবং মাদ্রাসায় প্রত্যাবর্তন করে কিন্তু তারা এই সংকল্প ও ঐক্য নিয়ে যায় যে কখনো যুদ্ধের প্রয়োজন হলে তারা পুনরায় অস্ত্র ধারণ করবে।

www.pathagar.com

এ যুদ্ধের ডাক আসে হঠাৎ করে ১৯৯৪ সালে। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত সৈন্যদল ঘরে ফিরে গেলে ইসলামাবাদে মার্কিন সাহায্য স্রোতে ভাটা পড়ে। নতুন অর্থের উৎসের সন্ধানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো করাচি থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাচীনকালের সিল্করোড সরাসরি আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে খুলবার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি বোধ হয় চিন্তা করেন নাই যে মধ্যবর্তীদের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো শক্তভাবে স্থানীয় ডাকাতদল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সে বছর ৩০ ট্রাকের একটি বহর ঔষধ ও খাদ্য নিয়ে পাকিস্তান থেকে দক্ষিণ আফগান শহর কান্দাহারের মধ্য দিয়ে তুর্কমেনিস্তানের দিকে রওয়ানা হয়। পাকিস্তানের গুপ্তচর শাখার একজন চৌকস অফিসার সুলতান আমীর এ বহরের নেতৃত্ব দেন। এ আমীর অতীতে ১৫ বছর ধরে সোভিয়েত বিরোধী যুবক মুজাহিদ গেরিলা দলকে প্রশিক্ষণ দান করেন। এগুলো আফগানিস্তানে মার্কিন সাহায্য সম্ভার আনার পূর্বের কথা। মুজাহিদ যুবকগণ তাকে ইমাম হিসাবে জানে এবং অনেকটা ধর্মীয় অনুভূতির শ্রদ্ধা করে। পরবর্তীকালে গঠিত তালেবান বাহিনীতে তাঁর হাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুজাহিদও রয়েছে। যাহোক, এ ট্রাকবহর একজন স্থানীয় সন্ত্রাসী নেতা নিয়াজ ওয়ায়ান্দ কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং স্বয়ং আমীর ভীষণভাবে প্রহৃত হন। তাঁর পুরাতন মুজাহিদ শিষ্য ছাত্রগণ এ খবর পেয়ে তাঁকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসে এবং নিয়াজকে পরাস্ত করে তাঁকে উদ্ধার করে। এসব ডাকাতের ওপর বিরক্ত হয়ে তালেবানগণ ধর্মীয় শিক্ষক মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে কান্দাহার দখল করে নেয়।

এ অপ্রত্যাশিত বিজয় আফগানদের মধ্যে বিদ্যুতের মত কাজ করে। প্রাচীন কোরআনি বা কওমি মাদ্রাসার মুজাহিদগণ আফগানিস্তানকে সন্ত্রাসমুক্ত করার স্বপ্ন দেখেন। এখন তাঁরা দলে দলে কান্দাহারে একত্রিত হন। আইন-শৃংখলাহীন আফগানিস্তানে আরও অধিক প্রভাব বিস্তারে আগ্রহী পাকিস্তান এমন আন্দোলনকে আরও চাঙ্গা করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়ায়। সাহায্যের মধ্যে ছিল বেশ কিছু সংখ্যক ট্যাংক চালক ও পাইলট এবং দু'জন নওমুসলিম সামরিক উপদেষ্টা। তাঁদের একজন হলেন সুলতান আমীর। এঁদেরকে কূটনৈতিক আচরণে পশ্চিমাঞ্চলীয় নগরী হেরাতে পাঠানো হয়। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে তালেবানদের উত্থানকে অনেকটা অলৌকিক বলে মনে হয়। পাকিস্তান তার সাহায্য সম্ভারকে বেশ গোপন রাখে এবং ক্রমশ আমেরিকার সিআইএ (CIA)-ও আগমন করে।

www.pathagar.com

সফলতা তালেবানদের প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিল। যোদ্ধারা অতঃপর ইসলামাবাদের পরামর্শে কান না দিয়ে পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার সতর্কবাণী উপেক্ষা করে ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে কাবুল আক্রমণ করে বসে। তাদের কাবুল আক্রমণ ছিল অনেকটা পাগলা ঘোড়ার মত। ফলে তারা শুধু আরেক কাবুল অবরোধকারী গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। অতঃপর কাবুল সরকার গোলন্দাজ বাহিনী নিয়োগ করে এবং কামানের গোলা থেকে পালাবার পূর্বেই প্রায় ৪০০ তালেবান নিহত হয়।

তালেবানরা কোন প্রকারে টিকে থাকে। সে সময় সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত মোল্লা ওমরের সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য রাস্তার বাইরে চলার উপযোগী গাড়ি এবং অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও নতুন সাহায্য নিয়ে হাজির হয়। রিয়াদ হয়ে গেল তালেবান অর্থের প্রধান জোগানদার এবং বেতন প্রদানকারী হন যুবরাজ তুর্কি বিন ফয়সল। তালেবান ব্যক্তিবাহকদের নিয়ে সৌদি গোয়েন্দাপ্রধান প্রতিনিয়ত রিয়াদে নিয়মিত বৈঠক করেন। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে তালেবান বাহিনী কাবুল অভিযানে বের হয়। ওসামা বিন লাদেন নামক একজন চরমপন্থী সৌদি নাগরিক আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেন। ওসামাকে ধরার জন্য মার্কিন বিচার বিভাগ ব্যাপক প্রচেষ্টা চালায়। তিনি বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপকে সাহায্য করেন বলে যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করে। আফগান ও পশ্চিমা সূত্র অনুযায়ী মোল্লা ওমরকে প্রদত্ত ওসামা বিন লাদেনের উপহারের পরিমাণ ৩০ লক্ষ ডলার। সে সময় ওসামা তাঁর ১৬০ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারবর্গ নিয়ে পারিবারিক ৩ কোটি ডলারের লভ্যাংশসহ মোল্লা ওমরের বন্ধু হিসাবে কান্দাহারে অবস্থান করছিলেন। তালেবানদের উজ্জ্বল ধর্মীয় চেতনা এবং কাবুলের আশেপাশের গোত্রপতিদের আত্মসমর্থনের মাধ্যমে শীঘ্রই কাবুলের পতন হয়।

কাবুলের পতনের পূর্ব পর্যন্ত মার্কিন প্রশাসন তালেবানদের ব্যাপারে নির্বিকার ছিল। মহিলাদের ব্যাপারে কড়াকড়ি সত্ত্বেও মধ্যপদবীর কর্মকর্তাগণ আইন-শৃংখলার পুনরুদ্ধারে তালেবানদের ভূমিকার বেশ প্রশংসা করেন। তবে তারা আদম ব্যবসা হতে প্রাপ্ত ট্যাক্সের সমালোচনা করেন। উল্লেখ্য, সর্বকালে আফগানিস্তানে আদমের ব্যবসা একটি অতি লাভজনক ব্যবসা বলে বিবেচিত।

মার্কিন প্রশাসন তখনও তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করেনি। তবে কাবুলের সঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে যদিও মার্কিন বাহিনী এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। একটি মার্কিন নির্মাণ

www.pathagar.com

সংস্থা তুর্কমেনিস্তান থেকে আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে পাকিস্তান পর্যন্ত তেলের পাইপ লাইন নির্মাণের কাজে লিপ্ত রয়েছে এবং শীঘ্রই তারা আফগানদেরকে এ কাজে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করবে বলে জানিয়েছে। অপর একটি আর্জেন্টাইন কোম্পানিও এ কাজ নিয়ন্ত্রণ লাভের চেষ্টা করছে। উভয় কোম্পানি আফগানদের বিষয়ে তাদের সাহায্য করার জন্য সৌদি কোম্পানিদের ভাড়া করেছে। উভয়ে আফগানিস্তানে কর্মরত প্রাক্তন মার্কিন কূটনীতিকদেরকে পরামর্শক হিসাবে নিয়োগ দান করেছে। তবে সময় যতই অতিবাহিত হচ্ছে তালেবানদের ব্যাপারে মার্কিন নীতি পাইপলাইন রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা বেশি (News week, October 13, 1997)।

তালেবানদের সাথে উত্তরে যুদ্ধরত ক্ষমতাচ্যুত আফগান প্রেসিডেন্ট রব্বানীর অনুগত রশিদ দোস্তাম ও আহমদ শাহ মাসুদের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একাধিক বৈঠক তেহরান ও অন্যত্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ বৈঠক পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। আফগানিস্তানে বিবদমান গোষ্ঠীগুলোর প্রতিনিধিগণ তাদের মধ্যকার গভীর বিভেদ দূর করার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিতদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করার বিষয়ে একমত হন। ইসলামাবাদে তাদের বর্তমান শান্তি আলোচনার চতুর্থ দিনে গতকাল (২৮/০৪/১৯৯৮) প্রতিনিধিগণ এ বিষয়ে সম্মত হন। এর মধ্য দিয়ে তারা দু'দশকের সংঘাত বন্ধের লক্ষ্যে একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ নেন। জাতিসংঘ এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) ইসলামাবাদে এই আলোচনার ব্যবস্থা করে। ওআইসি-র একজন মুখপাত্র জানান, প্রতিনিধিদলগুলো একটি ওলামা কমিশন গঠনের ব্যাপারে একমত হন। প্রত্যেক পক্ষ এ কমিশনের সদস্য হিসাবে তাদের মনোনীত আলেম বা ইসলামী ধর্মীয় পন্ডিতদের নাম জমা দেন। কোন পক্ষই অপরপক্ষের কোন সদস্যের নাম তালিকা থেকে বাদ দেবার দাবি করাতে পারবে না। বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ওলামা কমিশন ইসলামী আইন বা শরিয়া অনুযায়ী দেশ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেবেন এবং সে সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন। শান্তি প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত কর্মকর্তাগণ আশা করেন অতঃপর যুদ্ধবিরতি ও যুদ্ধবন্দি বিনিময়ের বিষয়ে আলোচনা হবে।

গতকালের (২৮/০৪/৯৮) আলোচনা বৈঠকে ইসলামাবাদে মার্কিন রাষ্ট্রদূত টমাস সাইমন্‌স যোগ দেন। উভয়পক্ষকে আলোচনা টেবিলে বসতে সম্মত করার ব্যাপারে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিল রিচার্ডসন মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তালেবান পক্ষের আলোচক এবং পাকিস্তানে তালেবান রাষ্ট্রদূত আবদুল হাকিম মুজাহিদ বলেন, আমরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট ছাড় দিয়েছি (BBC)।

www.pathagar.com

কিন্তু CNN-এর ৪ঠা মে '৯৮-এর খবরে প্রকাশ বিবদমান দু'পক্ষের শান্তি আলোচনা ভেঙে গিয়েছে। তালেবান বাহিনীর সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার ও বন্দি বিনিময়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের পর আলোচনা বৈঠক ভেঙে যায়। জাতিসংঘ প্রতিনিধি জেমস নব বলেছেন, বৈঠক অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। তালেবান আলোচক হাকিম মুজাহিদ বলেন, সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার এবং বন্দি বিনিময়ের জন্য তারা প্রস্তাবিত গভর্নিং কমিশন চান। কিন্তু গভর্নিং কমিশন গঠনের বিষয়টি বিরোধী জোট পরে আলোচনা করতে চায়। আলোচনা হতে কোন যুদ্ধবিরতি হয়নি। শুধুমাত্র উভয়পক্ষ সাময়িকভাবে বড় ধরনের হামলা চালানো হতে বিরত থাকার ব্যাপারে এক মত হয়। তালেবান মিলিশিয়া বাহিনী আফগানিস্তানের ৮৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। উত্তরাঞ্চলীয় আশিব ১৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে বিরোধী জোট। বিরোধী জোটের মুখপাত্র রসুল তালিব বলেন, তারা মধ্য আফগানিস্তান থেকে অবরোধ প্রত্যাহার চান। জাতিসংঘ বলেছে এখানে অনাহারে শতাধিক লোক মারা গিয়েছে। হাজার হাজার আফগান খাদ্য সংকটে পড়েছে (BNS, CNN)।

তবে উভয়পক্ষ বড় ধরনের হামলা চালানো থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার করলে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কাবুলের ২৫ কি.মি. উত্তরে উভয় পক্ষ বেশ বড় ধরনের সংঘর্ষে লিপ্ত। তালেবান বাহিনী বিমান হামলার সুযোগ নিয়ে সম্মিলিত বাহিনীকে বেশ পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়। এ সংঘাতে তালেবান বাহিনী বেশ বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করেছে বলে দাবি করে। অতঃপর মধ্য ও পশ্চিম আফগানিস্তানে বড় ধরনের সফলতা অর্জনের পর তারা উত্তরে তালেবান বিরোধী জোটের সদর দফতর মাজার-ই-শরীফ অবরোধ করে। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর তালেবান বাহিনী তা দখল করেছে বলে রয়টার, এ.এফ.পি. ও বিবিসি-র খবরে প্রকাশ। শহরটির বিমানবন্দরসহ সব কয়টি কৌশলগত ও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। বিরোধী বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পার্শ্ববর্তী সামাল গান এলাকায় পলায়ন করে। গতকাল (৮/৮/'৯৮) খুব ভোরের দিকে রকেট ও বিমান হামলা চালাবার পর সম্পূর্ণ শহরটি তালেবান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে। সর্বশেষ এই বৃহত্তম শহরটি দখলের মাধ্যমে প্রায় গোটা আফগানিস্তান তালেবান নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। পাশ্চাত্য সূত্রে বলা হয়, মুসলিম মিলিশিয়ার। গতকাল ভোরে প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে বিরোধী বাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে ফেলে এবং নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করে নেয়। ইরানের সরকারি সংবাদ সংস্থা ইরনার খবর অনুযায়ী তালেবানরা মাজার-ই-শরীফ দখল করে নিয়েছে এবং

www.pathagar.com

আফগান বিরোধী জোট মাজার-ই-শরীফের পতনের কথা স্বীকার করেছে (ইনকিলাব, আগস্ট ৯, ১৯৯৮)।

আফগানিস্তানে ইসলামী শরীয়া আইন চলে

উত্তর আফগানিস্তানের মাজার-ই-শরীফ দখলের পর তালেবানরা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের নেতৃত্বে আফগানিস্তানের শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেয়। দীর্ঘদিনের যুদ্ধ বিধ্বস্ত এবং গোষ্ঠীগত বিবাদে আক্রান্ত আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা পর্বত প্রমাণ দুরূহ কাজ। তালেবানরা আফগানিস্তানকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের আদলে গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। এরই অংশ হিসাবে তারা মহিলাদের কঠোর পর্দা প্রথা প্রবর্তন করে এবং তাদের জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করে। একাকী কোন মহিলার ঘর থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ করে দেয়। তদুপরি তারা ইসলামী দণ্ডবিধিও (Islami Penal Code) চালু করে।

এ সমস্ত বিধি ব্যবস্থা চালু করার ফলে, বিশেষত মহিলাদের ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপের ফলে পাশ্চাত্য জগত তালেবানদের সমালোচনা করে।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রুশ আধিপত্য অবসানের পর আফগানিস্তানে বিবদমান মুজাহিদ গ্রুপগুলোর অন্তর্কোন্দল ও কলহের অবসান ঘটিয়ে তথায় মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে তালেবানগণ তাদের একক শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। তারা তথায় একটি নিরঙ্কুশ ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েমের প্রচেষ্টা চালায়। ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক আধুনিকতা তারা পরিহার করে। মহিলা চলাচলে ইসলামী বিধিবিধান প্রয়োগ করে এবং দণ্ডবিধি কার্যকর করার মাধ্যমে আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ করে। কঠিন এক খরায় পতিত হয়ে দেশে উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে দেশ এক চরম দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি দাঁড়ায়।

অপরদিকে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী এবং সমগ্র বিশ্বে মুসলিম জনগণের ত্রাণকর্তা, বিশেষ করে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের মুক্তিদাতা স্বরূপ নিজেকে উৎসর্গকারী হিসেবে পরিচয় দিয়ে ওসামা-বিন-লাদেন মোল্লা ওমরের অতিথি হিসাবে কান্দাহারের পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী তিনি তার মুজাহিদ বাহিনী দ্বারা (মার্কিনিদের ভাষায় সন্ত্রাসী দ্বারা) বিশ্বের বিভিন্ন অবস্থানে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে আঘাত হানেন। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থসম্পদ, তাদের দূতাবাস, সর্বোপরি তাদের লোকজন বিন লাদেনের আক্রমণের শিকার। তাই যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে বিন লাদেনের অবস্থান এবং তজ্জন্য এর শাসক মোল্লা ওমরকে কখনো ভাল চোখে দেখে নাই।

www.pathagar.com

নিউইয়র্কের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে বোমা হামলা

১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সকাল ০৯.০৩ মি. আমেরিকান এয়ারলাইন্স-এর দুটো ছিনতাইকৃত বিমান যাত্রী শুদ্ধ নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন স্ট্রিটে অবস্থিত বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের (World Trade Centre) যুগল উচ্চ ভবনে (Twin Tower) হামলা চালায়।

সম্ভবত: নিশানা ভুল করে বিমানদ্বয় হোয়াইট হাউসের পরিবর্তে পেন্টাগনে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালায় (News week Speid Issue, September 24, 2001)। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে প্রকাশ, যুগল উঁচু ভবনদ্বয় বিমানে রক্ষিত ৬০,০০০ গ্যালন বিস্ফোরক জ্বালানি তেলের আঘাতে ভস্মীভূত হয়। জ্বালানি তেল ভবনে আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিগোলায় পরিণত হয়। ভবনদ্বয় বিকট শব্দে গলে গলে মাটিতে পতিত হয়। শুধুমাত্র লোহার ফ্রেম খাড়া থাকে। অপরদিকে পেন্টাগনে ধ্বংসস্তূপ এবং ক্রমাগত আগুনের লেলিহান শিখায় দু'দিন উদ্ধার তৎপরতা বাধাগ্রস্ত হয়। এভাবে নিউইয়র্কের আকাশ সীমায় সগৌরবে গর্বিত উজ্জ্বল বাণিজ্য কেন্দ্রের যুগল ভবন হঠাৎ ভয়ংকরভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়।

নিউইয়র্ক নগরীর নিরাপত্তায় নিয়োজিত শত শত রক্ষী ও গোয়েন্দার চোখ ফাঁকি দিয়ে কিভাবে ছিনতাইকৃত বিমানদ্বয় বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে আঘাত হানতে সক্ষম হল? অপরদিকে মার্কিন ফেডারেল রাজধানীর নিরাপত্তা বেষ্টনি ভেদ করে, বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনীর সদর দফতর পেন্টাগনে কিভাবে দুটো বিমান এমন প্রচণ্ড আঘাত হানতে সক্ষম হল? খুঁটিনাটি বিশ্লেষণে শতকরা ৩০ ভাগ লোক মনে করে, ফেডারেল গোয়েন্দা সংস্থা (FBI) এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা শাখা (CIA)-র গোয়েন্দা তৎপরতায় গাফিলতির জন্য এটি সম্ভব হয়েছে, আর ৫৭ ভাগ মনে করে বিমান বন্দরের দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী। সমস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এমন হতভম্ব হয়ে যায় যে আক্রমণের ১৫ মিনিট পরেও বিমান বাহিনীর কোন জঙ্গি বিমান রাজধানীর আকাশে উড্ডয়ন করে নাই। ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিকচেনি দৌড়িয়ে হোয়াইট হাউসের শক্ত, মজবুত, বিমানাক্রমণ ঠেকাতে সক্ষম বাংকারে আশ্রয় নন। প্রেসিডেন্ট এমনভাবে আত্মগোপন করেন যে, পেরুভিয়ার লিমায় অবস্থানরত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেননি। প্রেসিডেন্ট বুশ তখন পরিবর্তিত আমেরিকার ওপর দিয়ে তাঁর নিজস্ব বিমানে উড্ডয়নরত (News week, October 1, 2001)। পুনরায় হামলার আশঙ্কায় তখনও

www.pathagar.com

মার্কিনিদের বিচলিত করে। ৮২ ভাগ লোক মনে করে বিভিন্ন নগরীতে ভবনসমূহে বা উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহে শীঘ্রই আরও হামলার আশঙ্কা রয়েছে।

বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে হামলাকে প্রেসিডেন্ট বুশ আমেরিকার বিরুদ্ধে একটি হীন সন্ত্রাসী কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করেন। ফলে তার নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র বিশ্বে সন্ত্রাসী দমনের এক মিশনে নিজেকে নিয়োগ করেন। সন্ত্রাসী তালিকায় এবং যে বা যারা বিশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্রে হামলা করেছে তাদের মধ্যে শীর্ষস্থান পায় আফগানিস্তান। কারণ এ দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের এক নম্বরের দুশমন ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে থাকে।

প্রকাশ্য দিবালোকে যুক্তরাষ্ট্রে হামলাকারী এই জঘন্য শত্রুর প্রতিশোধ নিতে প্রেসিডেন্ট বুশ (জুনিয়র) প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সাপ্তাহিক নিউজউইক পত্রিকার এক জরিপে প্রকাশ, আমেরিকার শত্রুর ৭১ ভাগ মানুষ সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে শক্ত আঘাত হানবার পক্ষে, সেই হামলায় অগুনতি অসামরিক লোকক্ষয় হলেও। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে হাজার হাজার লোক নিহত হবার ঘটনায় বিশ্বব্যাপী বুশের সমর্থন ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। বিভিন্ন দেশ হতে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও আসে। তন্মধ্যে এক নম্বরে আসে ব্রিটেন, অতঃপর অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি এবং নিউজিল্যান্ড থেকে। সম্ভাব্য সামরিক অভিযানে নিম্নলিখিত ছকে সমর্থন বা বিরোধের তালিকা পাওয়া যায়।

১। যারা সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করবে :

ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, নিউজিল্যান্ড।

২। যারা তাদের ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেবে :

মিসর, ভারত, ইসরাইল, ইতালি, জাপান, জর্ডান, কুয়েত, পাকিস্তান, সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া, তাজিকিস্তান, তুরস্ক, আরব আমিরাত, উজবেকিস্তান।

৩। যারা গোয়েন্দা সহায়তা দেবে :

আলজিরিয়া, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, লেবানন, রাশিয়া, সুদান, সিরিয়া।

৪। যারা সামরিক ব্যবস্থা সমর্থন করে না :

ইরাক, কিউবা, উত্তর কোরিয়া, লিবিয়া (News week, October 1, 2001)

বুশের কৃতিত্ব বলতে হবে যে, তিনি এ হামলাকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাস দমনের নামে সমগ্র বিশ্বকে, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর পরিচালিত ধর্মযুদ্ধে (Crusade) অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন। অথচ এ আক্রমণে বিন লাদেনের হাত আছে কিনা তা কেউ যাচাই করেননি। বিন লাদেন নিজে

www.pathagar.com

বলেছেন তিনি এ হামলা পরিচালনা করেননি, তবে তিনি এটি জানতেন কিন্তু প্রেসিডেন্ট বুশ সতর্ক করেছেন, তালেবান নেতৃবৃন্দ যদি কিছু আপসহীন শর্ত মেনে না নেন। যার মধ্যে সৌদি পলাতক ওসামা বিন লাদেন এবং তাঁর আল কায়েদা নেটওয়ার্ককে হস্তান্তর রয়েছে, তবে যুক্তরাষ্ট্র তাদেরকেও সন্ত্রাসী তালিকার অন্তর্ভুক্ত করবে। প্রত্যুত্তরে তালেবানরা বলে, যুক্তরাষ্ট্র যদি আক্রমণ করে তবে তারা সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের কোপানলে পড়বে এবং সমগ্র অঞ্চলে তারা ভয়াবহ অবস্থায় পতিত হবে। মোল্লা ওমর টেলিফোনে নিউজউইক প্রতিনিধিকে বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র যদি আমাদের আক্রমণ করে তবে আমরা জেহাদের ডাক দেব।"

পেন্টাগনের প্রতিরক্ষা নীতি বোর্ড (Pentagons Defence Policy Board) : আসন্ন হামলা নিয়ে এ বোর্ডে বিভিন্ন প্রকারের জল্পনা-কল্পনার পর স্থির হয় যে, আফগানিস্তানে বিমান হামলা এবং অতঃপর বিভিন্ন প্রকারের ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হবে। অতঃপর উত্তর আফগানিস্তানের তালেবান বিরোধী জোট গঠন করে তাদের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্র সীমিত স্থল বাহিনী নিয়োগ করবে। এ জোট তালেবানদের হটিয়ে কাবুল দখল করবে এবং মার্কিন সমর্থক একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করবে। ইতোমধ্যে মার্কিন সৈন্যরা ওসামা-বিন-লাদেন এবং মোল্লা ওমরকে তাদের অনুসারীসহ পাকড়াও করবে। প্রেসিডেন্ট বুশ প্রভুর (God) নামে প্রচণ্ড শপথ করেন, সন্ত্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও সভ্য জগতের এক চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনা করবেন। এ অভিযান প্রথম পরিচালনা করা হবে ইসলামী চরমপন্থী ওসামা-বিন-লাদেন এবং আফগানিস্তানে পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত তাঁর আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে। প্রেসিডেন্টের ঘোষণা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন জঙ্গি বিমান, যুদ্ধ জাহাজ এবং সৈন্য-সামন্ত বিন-লাদেনের উদ্দেশে রওয়ানা দেয় এবং মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে তালেবান বাহিনীও এই মহাজেহাদী শপথে দণ্ডায়মান হয় (News week September 24, 2001)।

প্রেসিডেন্ট বুশ সরাসরি সতর্ক করে দেন, তালেবান নেতারা ওসামা বিন-লাদেন ও তাঁর কয়েকজন নেতাকে হস্তান্তরসহ কিছু আপসহীন শর্ত মানতে ব্যর্থ হলে যুক্তরাষ্ট্র তালেবানদের সন্ত্রাসী হিসেবে গণ্য করবে। তালেবানরা তাদের নিজস্ব সতর্কবাণীও উচ্চারণ করে। যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করলে তারা সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের কোপানলে পড়বে এবং এ অঞ্চলটি ভীষণ দুর্যোগে নিপতিত হবে। তালেবান মুখপাত্র মোল্লা মাহ্জাবিন নিউজ উইককে টেলিফোনে জানান মার্কিন

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্র আমাদের আক্রমণ করলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক দেব (News week, October 1, 2001)।

পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিন বাহিনী তাদের মিত্র ব্রিটিশ বাহিনী নিয়ে আফগানিস্তানে এক সর্বাত্মক বিমান আক্রমণ পরিচালনা করে। বোমার আঘাতে বড় বড় পাথরের পাহাড় পুকুরে পরিণত হয়। টন টন বোমা মেরে মার্কিন বাহিনী তালেবানদের পরাস্ত করার চেষ্টা করে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ভয়াবহ বি-৫২ বোমারু বিমান হতে শুরু করে এ যাবৎকালের সমস্ত আধুনিক জঙ্গি বিমান প্রয়োজনে বা বিনা প্রয়োজনে তারা ব্যবহার করে নিছক তাদের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য। এক মাসের প্রচণ্ড বিমান হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র উত্তরের জেনারেল দোস্তামের নেতৃত্বে আফগান স্থলবাহিনী প্রস্তুত হয়। বেশ কয়েকদিন ইতস্ততার পর এ বাহিনী তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সম্মুখযুদ্ধে কয়েকবার বিপর্যয়ের পর মার্কিন বিমান বাহিনীর সহায়তায় তারা তালেবানদের বিরুদ্ধে সফলতা লাভ করে। তালেবানরা ক্রমশ উত্তরের মাজার-ই-শরীফ, হিরাত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ শহর এলাকা ত্যাগ করে কাবুলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এই সমস্ত এলাকায় বিপুল সংখ্যক তালেবান আত্মসমর্পণ করে বা বন্দি হয়।

অতঃপর মার্কিন বাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল এবং উত্তরের তালেবান বিরোধী জোট কাবুলে ও কান্দাহারের উপকণ্ঠে অবস্থান গ্রহণ করে, মার্কিন মিত্র বাহিনীর ব্রিটিশ সেনারা কান্দাহারে এক হঠাৎ আক্রমণ করলে তালেবান বাহিনী তা দৃঢ়তার সাথে প্রতিহত করে। মোল্লা ওমরের নেতৃত্বাধীন তালেবান এবং ওসামা-বিন-লাদেনের আল-কায়েদা যোদ্ধাদলের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ ক্রমশ মার্কিন বাহিনীর হাতে ধরা পড়লে আফগান প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং মোল্লা ওমর অজানা গন্তব্যের উদ্দেশে কান্দাহার ত্যাগ করেন। অতঃপর তালেবানদের শেষ ঘাঁটি কাবুল, কান্দাহার মার্কিন বাহিনীর হস্তগত হয়।

ওসামা-বিন-লাদেনের পরিণতি

মোল্লা মোহাম্মদ ওমর এবং তাঁর অতিথি সৌদি যুবরাজ ওসামা-বিন-লাদেন আফগানিস্তানের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে আত্মগোপন করেন। বিভিন্ন সূত্রমত, তাঁরা পৃথক হয়ে যান এবং ওসামা-বিন লাদেন পূর্ব আফগানিস্তানের তোরাবোরা পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ অঞ্চলে মার্কিন বাহিনী তন্ন তন্ন করে তল্লাশি

www.pathagar.com

চালায়। কুখ্যাত ক্লাস্টর বোমা নিক্ষেপ করে হাজার হাজার আফগানদের প্রাণ সংহার করে। তোরাবোরা পাহাড়ে তারা এক প্রকারের বোমা নিক্ষেপ করে যা পাথরের পাহাড় ভেদ করে পাহাড়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত গুহায় আঘাত হানে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বিন-লাদেন ঐ পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলে তিনি নিশ্চয় নিহত হয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন গুহায় অনুসন্ধানে জানা যায়, তিনি জীবিত আছেন, যদিও পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়।

কিছুদিন পর খবর পাওয়া যায়, ওসামা-বিন-লাদেন আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় আশ্রয় নিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট বুশের অনুরোধে পাকিস্তানের সামরিক শাসক পারভেজ মোশাররফ পশ্চিমের ওয়াজিরিস্তান এলাকায় অভিযান প্রেরণ করেন। বিন-লাদেনের সহকারী আল-জাওয়াহিরির এক ভিডিও টেপের মাধ্যমে জানা যায় তাঁরা ওয়াজিরিস্তানেই অবস্থান করছেন। সম্পূর্ণ এলাকা অবরোধ করা সত্ত্বেও অলৌকিকভাবে তাঁরা সে স্থান ত্যাগ করেন।

অতঃপর ২০০২ সালে আফগানিস্তান হতে একদা বহিস্কৃত মার্কিন মিত্র আবদুল হামিদ কারজাইকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করে মার্কিন মিত্র বাহিনী দেশের শাসনভার গ্রহণ করে। অপরদিকে পাঁচ শতাধিক আফগান বন্দিকে উউবার উপকূলবর্তী মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীন গুয়ানতানামো বে'তে অবস্থিত বিশেষভাবে নির্মিত বন্দি শিবিরে আটক করে। পরে অনুসন্ধানে জানা যায় তালেবান বাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক মার্কিন ও ব্রিটিশ নাগরিক ঐ বন্দিদের তালিকায় রয়েছে। বন্দি শিবির মার্কিন বন্দিদের অমানবিক নির্যাতন করে। এক পর্যায়ে নিরূপায় বন্দিরা খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলে জানাজানি হয়ে গেলে মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যায়। তারা বন্দি শিবির পরিদর্শন করেন এবং এভাবে বিনাবিচারে আটক রাখার নিন্দা করেন।

এদিকে ওসামা-বিন-লাদেনকে ধরার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েও তাঁকে ধরতে তারা ব্যর্থ হয়। তবে বিভিন্ন সূত্র মনে করে তিনি পাকিস্তানে কোথাও পালিয়ে রয়েছেন। বিশ্বস্ত সূত্রমতে তিনি ও তাঁর শীর্ষ নেতা আইমাক আল-জাওয়ারিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে মিরান-শাহ্ নামক স্থানে দেখা গিয়েছে (News Week 15 July, 2002)।

www.pathagar.com

সন্ত্রাস বা তালেবান দমনে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একযোগে কাজ করছে বিধায় পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে জনগণ বিশেষত তালেবান সমর্থক আলেমগণ পারভেজ মোশাররফের বিরোধিতা করেন। এমনকি কয়েকবার তাঁর জীবন নাশের চেষ্টাও চালানো হয়। তবে সৌদি আরব ও অন্যান্য মার্কিন সমর্থক গোষ্ঠীবিন লাদেন পাকিস্তানে অবস্থান করছেন বলে মন্তব্য করে। প্রতি উত্তরে পারভেজ মোশাররফ তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেন বিন লাদেনের অবস্থান জানাবার জন্য। খোদ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাও তার অবস্থান নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়। সম্প্রতি সি.আই.এ.র একজন মুখপাত্র বলেন, বিন লাদেনের অবস্থান তাদের জানা আছে। কিন্তু তাঁর সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন তথ্য বা প্রমাণ না থাকায় তাঁকে আটক করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে পাকিস্তান আফগানিস্তানে

গেরিলা ও আল কায়েদার বিরুদ্ধে অব্যাহত তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। (পূর্বকোণ ২৮ শে জুন, ২০০৫)।

যতই দিন যাচ্ছে আফগানিস্তানে মার্কিন বিরোধী প্রতিরোধ শক্তিশালী হচ্ছে। মার্কিন বাহিনী এবং তাদের কারজাই সরকারের বিরুদ্ধে হামলা জোরদার হচ্ছে। তিনমাস গৃহীত জাতি গঠনের উচ্চাশা এখন হতাশায় নিমজ্জিত। অতর্কিত হামলা বোমা নিক্ষেপ এবং সর্বশেষ মার্কিন কপ্টার ভূপাতিত হবার ঘটনায় মার্কিন বাহিনী ও কারজাই সরকার উদ্বিগ্ন। বর্তমানে আফগানিস্তানে মার্কিন ক্ষয়ক্ষতি ইরাককেও ছাড়িয়ে গেছে। তালেবান মুখপাত্র মোল্লা লতিফ হাকিমা বলেন, বিদেশি সৈন্য আফগানিস্তান ত্যাগ না করা পর্যন্ত হামলা অব্যাহত থাকবে। তারা ক্রমশ বিদেশি সৈন্যদের ভিত ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি আরও জানান, তালেবান যোদ্ধারা যথেষ্ট শক্তিশালী এবং মোল্লা ওমর তাদের নেতৃত্বে রয়েছেন। গত তিন মাসে দুটি মার্কিন কপ্টার ভূপাতিত হয়েছে। ৪৭ জন আফগান পুলিশ, ১৩৪ জন বেসামরিক নাগরিক এবং ৪৫ জন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে। যোদ্ধাদের রণকৌশলে মার্কিন বাহিনী অবাক! তাদের দক্ষতা ইরাকিদের চাইতে সুনিপুণ (নয়া দিগন্ত, ৬ জুন ২০০৫)।

এদিকে পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে তালেবান যোদ্ধাদের সাথে সংঘর্ষে ১১ জন পাক সৈন্য ও ৩০ জন তালেবান যোদ্ধা নিহত হয়েছে। এ হিসাবের বাইরে ২০ জন পাক সৈন্য নিখোঁজের খবর পাওয়া গিয়েছে। অপরদিকে ব্রিটেন আফগানিস্তানে আরও কয়েক হাজার ব্রিটিশ সৈন্য পাঠাচ্ছে। ইতোমধ্যে সেখানে ৯০০ সৈন্য মোতায়েন রয়েছে (প্রথম আলো, ২ অক্টোবর, ২০০৫)।

www.pathagar.com

গুয়ানতানামো বে বন্দি শিবির

কিউবার সাথে সংযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন গুয়ানতানামো বে'-তে (Guantanamo Bay) অবস্থিত বন্দিশিবির বিশেষ কায়দায় নির্মিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহায়ক মিত্রবাহিনীর হাতে ধৃত ইরাক ও আফগানিস্তানের স্বাধীনতাকামী গেরিলাদের এখানে বন্দি করে রাখা হয়। ২০০১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত (জুন ২০০৫) পাঁচ শতেরও অধিক লোক এখানে বিনা বিচারে আটক রয়েছে। হাতে পায়ে লোহার ডাণ্ডারেডি পরিয়ে তাদেরকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে আনা-নেয়া করা হয়। ভয়াবহ অত্যাচারের শিকার এসব বন্দি প্রতিনিয়ত মৃত্যু কামনা করে। সম্প্রতি তাদের অত্যাচারের কাহিনি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সভ্য জগতের মানুষ এসব লোমহর্ষক নির্যাতনের কথা জানতে পেয়ে বিস্ময়ে শিউরে ওঠে। বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থা প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের সুশীলসমাজ প্রতিবাদে সোচ্চার হন। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন গুয়ানতানামো বের মার্কিন বন্দিশিবির বন্ধ অথবা সংশোধন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ের কোন ব্যক্তি মার্কিন বন্দি শিবিরটি নিয়ে কড়া সমালোচনা করলেন। এক সাক্ষাৎকারে ক্লিনটন বলেন, বিচার করে দেখতে হবে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ কতটা যুক্তিযুক্ত; কিংবা মার্কিন সমাজের মৌলিক চরিত্রকে এটি চ্যালেঞ্জ করে কিনা? যদি এর উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে সন্ত্রাসীদের হাতেই বিজয় তুলে দেয়া হয়েছে। গুয়ানতানামো বে'র মার্কিন বন্দি শিবিরটির ভবিষ্যৎ নিয়ে ওয়াশিংটনে যে বিতর্ক-আলোচনা হয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট একথা বলেন। গত সপ্তাহে বিষয়টি নিয়ে মার্কিন সিনেটেও ব্যাপক আলোচনা হয়। (প্রথম আলো, ২১ জুন, ২০০৫)।

এদিকে এই বন্দি শিবিরে ৩ জন বন্দি আত্মহত্যা করে। এটিকে নিয়ে সারাবিশ্বে প্রতিবাদের ঝড়ের মুখে প্রেসিডেন্ট বুশ ২৩শে জুন ২০০৬ এক বিবৃতিতে বলেন, তিনি এ বন্দি শিবিরটি বন্ধ করে বহু বন্দিকে তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরৎ পাঠাতে চান (আমার দেশ, ২৩ জুন, ২০০৬)।

আফগানিস্তানে প্রতিরোধ যুদ্ধ দিন দিন ব্যাপকতা লাভ করছে। হেলমান্দ প্রদেশের গভর্নরের মুখপাত্র হাজী মুহাম্মদ ওয়ালা জানান, ওয়াশার জেলায় তালেবান যোদ্ধারা একটি সরকারি কার্যালয়ে হামলা চালালে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সংঘর্ষে জেলা গভর্নর মোল্লা সাকী ও একজন আফগান সৈন্যও প্রাণ হারায়।

www.pathagar.com

তালেবানদের পক্ষে ১১ জন নিহত হয়। মধ্যরাতে জাবুল প্রদেশে কাবুল-কান্দাহার মহাসড়কে এক সংঘর্ষে ৭ জন যোদ্ধা নিহত হয়। অপরপক্ষে অপহৃত আফগান পুলিশ প্রধান ও তার পাঁচ সহযোগীকে তালেবান যোদ্ধারা হত্যা করে। আফগানিস্তানের দক্ষিণে এবং পূর্বে সম্প্রতি রক্ষক্ষয়ী সংঘর্ষে অসংখ্য সন্দেহভাজন যোদ্ধা ও সরকারি বাহিনী সদস্য নিহত হয়। (প্রথম আলো, ২১ জুন, '০৫)। বর্তমানে আফগানিস্তানে ১৮ হাজার মার্কিন সৈন্য রয়েছে।

এদিকে আফগানিস্তানে তালেবানরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে আঘাত হানতে শুরু করেছে। অন্যদিকে এদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণে নেমেছে মার্কিন বাহিনী ও ন্যাটো (NATO) বাহিনী। কোয়ালিশন বা মিত্র বাহিনী টনের পর টন বোমা মেরেছে। তালেবান সরকারকে উৎখাত করতে গিয়ে তারা হাজার হাজার নিরীহ আফগানদের হত্যা করেছে। কিন্তু তার পরও দেখা যাচ্ছে বড় বড় শহর ছাড়া প্রায় সমগ্র গ্রামাঞ্চল তালেবানদের দখলেই রয়েছে গিয়েছে। বর্তমানে (২০০৫) যে হারে তালেবানরা সংগঠিত হচ্ছে এবং খোদ কাবুল-কান্দাহার মহাসড়ক সরকারি বাহিনীর ওপর হামলা করছে, তাতে প্রতীয়মান হয় হামিদ কারজাই সরকার খুব বেশিদিন আফগানিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। মার্কিন বাহিনীকে আফগানিস্তান ছাড়তে হবে। তবে উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সেনাদলকে আফগানিস্তানে যে ভাগ্য বরণ করতে হয়েছিল তাই মার্কিন বাহিনীর ভাগ্যে রয়েছে কিনা তা দেখার বিষয়।

ANB জানায়, গত বৃহস্পতিবার (১লা ফেব্রুয়ারি '০৭) তালেবান দখলকৃত শহরের ওপর এখনও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে তালেবান যোদ্ধারা। ন্যাটো বাহিনীর ব্যাপক অভিযান সত্ত্বেও গত বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের মুজাকালা জেলাশহর তারা দখল করে নেয়। ঐ শহরে ওড়ানো হয় তালেবান সাদা পতাকা। অপরদিকে আফগান ও ন্যাটো সেনারা মুজাকালা পুনরুদ্ধারে সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। অতি দীর্ঘ ভয়াবহ এক সংঘর্ষের আশঙ্কায় অধিবাসীরা শহর ছেড়ে অন্যদিকে সরে পড়েছে। হেলমান্দ শহরের উপজাতীয় প্রধান বলেন বৃহস্পতিবার তালেবানরা শহরের সরকারি ভবনে তাদের নিজস্ব পতাকা উড়িয়েছে (দৈনিক পূর্বকোণ, ৬ই ফেব্রুয়ারি '০৭)। প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রতিবেদন অনুযায়ী কাবুল শহর ও এর আশপাশের কিছু এলাকা এবং কান্দাহারে ন্যাটো বাহিনীর নড়বড়ে অবস্থান ছাড়া অবশিষ্ট আফগানিস্তানে এবং উত্তরের প্রদেশগুলোতে ন্যাটো বা মার্কিন সৈন্যদের কোন অবস্থা নেই।

www.pathagar.com

গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, সংঘর্ষ চলছে শুধু উপরোল্লিখিত এলাকাগুলোতে। অন্যত্র ল্যাটিন বাহিনী শুধু বোমা হামলাই চালাচ্ছে।

এদিকে মিউনিখ ও কান্দাহার হতে এ.এফ.পি (AFP) জানায় ন্যাটোর শীর্ষ কমান্ডার বলেন, আফগানিস্তানের সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ এবং পুনর্গঠন কাজ যথাযথভাবে করার জন্য যে পরিমাণ বিদেশি সৈন্য প্রয়োজন তা সেখানে নেই। ন্যাটো কমান্ডার মার্কিন সেনা বাহিনীর জেনারেল বান্তজ-ক্রাডক বলেন, "সোভিয়েতে অনুষ্ঠিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে সাম্প্রতিক বৈঠকে আফগানিস্তানের ন্যাটো জোটের আরও সেনা থাকার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বেশ গুরুত্ব পায়।" তিনি বলেন, পর্যাপ্ত সেনা ছাড়াই কমান্ডারেরা তাদের কাজ করেছেন। তাদেরকে অনবরত এক স্থান হতে আরেক স্থানে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। উল্লেখ্য, ক্রাডক সম্প্রতি আফগানিস্তানে ন্যাটো নেতৃত্বাধীন আরও ৩৫০০০ সেনা পাঠাবার পরামর্শ দিয়েছেন।

অপরদিকে আফগানিস্তানের *কান্দাহার* প্রদেশের পুলিশ প্রধান জেনারেল আসমত উল্লাহ আলীজি জানান, শুক্রবার রাতে বিদ্রোহী অধ্যুষিত পাঞ্জাবী (পাকিস্তানের পাঞ্জাব নয়) জেলার টহল দেয়ার সময় তালেবান যোদ্ধারা হামলা করে। এ সময় উভয়পক্ষের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। তালেবান মুখপাত্র ইউসুফ আহমদ হামলার দায়িত্ব স্বীকার করে বলেন, হামলায় প্রায় ১০ পুলিশ হতাহত হয়। উল্লেখ্য, ২০০১ সালে মার্কিন নেতৃত্বাধীন হামলার পর পুলিশ নিয়মিতভাবে তালেবানদের হামলার শিকার হচ্ছে। আফগানিস্তানের জন্য আরও ৩৫০০০ ন্যাটো সৈন্য তলব এবং কান্দাহার প্রদেশের পাঞ্জাবী জেলায় তালেবানদের হামলায় পুলিশ হতাহতের ঘটনা প্রমাণ করে আফগানিস্তানে দখলদার বাহিনী তাদের অবস্থান বজায় রাখতে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন, সে জন্য তারা আরও সৈন্য তলব করেছে।

অপরদিকে আফগান-পাকিস্তান সীমান্তে তালেবান ও আলকায়দার যোদ্ধাদের নিয়ে উভয় দেশ সমস্যায় নিপতিত। সীমান্তের ওয়াজিরিস্তান এলাকায় বসবাসকারী পাঠানদের মাঝখান দিয়ে সীমান্ত রেখা গিয়েছে। ফলে এক পাশের পাঠানরা কোন দেশ-আফগানিস্তান বা পাকিস্তান দ্বারা আক্রান্ত হলে উভয় পাড়ের পাঠানরা বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। পাঠানদের তীব্র জেহাদি মনোভাব এবং সে সঙ্গে দুর্গম ও দুর্ভেদ্য পাথুরে পাহাড় দ্বারা গঠিত এলাকাটি অনেকটা দুরতিক্রম্য।

www.pathagar.com

ওয়াজিরিস্তানের সর্দারদের সহযোগিতা ছাড়া কোন লোককে সে এলাকা থেকে বের করা একরূপ অসম্ভব। তাই আল কায়েদার শীর্ষ কয়েকজন নেতা এখানে লুক্কায়িত রয়েছেন বলে ন্যাটো বাহিনীর ধারণা। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে নিরুপায়। অগত্যা পাকিস্তান সহযোগিতা করছে না বলে তারা পাকিস্তানের ওপর দোষ চাপায়। কিন্তু পাকিস্তানও এ ব্যাপারে নিরুপায়। তার উপর মার্কিন হামলা অত্যাসন্ন দেখে পাকিস্তান ওয়াজিরিস্তানের ওপর বোমা হামলা করে প্রায় ২০০ লোক হত্যা করলেও নেতাদের ধরতে ব্যর্থ হয়।

তালেবানদের সঙ্গে মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনীর সংঘর্ষ ক্রমশ বেড়েই চলছে। তালেবানরা প্রায়ই কাবুল-কান্দাহার সড়কে ন্যাটো বাহিনী বা আফগান পুলিশের উপর হামলা করেই যাচ্ছে। পশ্চিমা তথ্য বিবরণী অনুযায়ী এসব হামলায় বহু জঙ্গি নিহত হলেও হামলার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাতে প্রতীয়মান হয় জঙ্গি নিহতের এই সংখ্যা কিছুটা বাড়াবাড়িই বটে। এছাড়াও এসব মৃতের সংখ্যা কোন নিরপেক্ষ সংখ্যা নিশ্চিত করেনি।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

ইরাক : দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধ ও প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের পতন

১৯৯১ সালে ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের পর যুদ্ধ বিরতির শর্ত হিসাবে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইরাক আন্তর্জাতিক তদারকিতে তার সমস্ত পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্রসমূহ ধ্বংস করে এবং ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ খুলে ফেলে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরাবর বলতে থাকে যে, ইরাকের নিকট প্রচুর গণবিধ্বংসী অস্ত্র (Weapem of mass destruction) মজুদ রয়েছে। এদিকে (২০০০ সালে) যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী আল-গোরকে পরাজিত করে জর্জ ডব্লিউ বুশ (জুনিয়র) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তার নির্বাচিত হবার পর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যের বৈরী শাসকদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেন। এরই এক পর্যায়ে ২০০১ সালের ৯ই নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরীর বিশ্ব-বাণিজ্য কেন্দ্রে (World Trade Centre) বিমান হামলায় যুগল ভবন ভস্মীভূত হয়। প্রেসিডেন্ট এ কাজের জন্য আফগানিস্তানে অবস্থানরত আল-কায়েদা নেতা ওসামা-বিন-লাদেনকে দায়ী করেন। তিনি আফগান কর্তৃপক্ষের নিকট এ নেতার হস্তান্তর দাবি করেন। কিন্তু আফগানিস্তান শাসনকারী তলেবান নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর অস্বীকার করলে প্রেসিডেন্ট বুশ বিশ্বের সম্মিলিত বাহিনী দ্বারা আফগানিস্তান দখল করে যদিও তিনি ওসামা-বিন-লাদেন ও মোল্লা ওমরকে ধরতে ব্যর্থ হন।

বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে বোমা হামলার পর হতে প্রতিনিয়ত প্রতিশোধের সম্ভাব্য তালিকায় এক নম্বরে ছিল আফগানিস্তান প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের হাতের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের পরাজয়ের পর যুদ্ধ বিরতির শর্ত হিসাবে ইরাক তার সমস্ত ভয়াবহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করলেও

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্র তাতে আশ্বস্ত হতে পারছিল না। কথা ছিল সমস্ত গণবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র ইরাক ধ্বংস করবে। কিন্তু তা ধ্বংস করার পরও এরা জাতিসংঘ পরিচালিত সংস্থার পরিদর্শকদের Popetive রিপোর্ট সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র বলে বেড়ায়—না ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র তার অস্ত্র ভাণ্ডারে, তার রাজপ্রাসাদ, এমনকি তার যৌদ্ধাগারে থাকতে পারে তাই ওগুলো তন্ন তন্ন করে খোঁজ করেও কিছু পাওয়া না গেলেও ডব্লিউ বুশ আশ্বস্ত হতে পারছিলেন না।

তাই প্রশ্ন দাঁড়ায় ডব্লিউ বুশের এত ভয়ের কারণ কী? মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর যে গণবিধ্বংসী ক্ষমতা তাতে তারা যেকোনো অবস্থায় যেকোনো পরিশোধ এবং যেকোনো বাধা মুহূর্তের মধ্যে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু ইরাকের ব্যাপারে তার এত সতর্কতা কেন? এর উত্তর একেতো মনস্তাত্ত্বিক; দ্বিতীয় ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ছাড়া মার্কিন বিরোধী কোনো শক্তিকেই যুক্তরাষ্ট্র তেমন গুরুত্ব দেয় না। কারণ সাদ্দাম দুর্দমনীয় কিছু ধাতু দ্বারা নির্মিত। তদুপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় ১৯৯১ তার শত্রু নিধনের আশা হিসেবে ইরাককে এমন মহার্ঘ কিছু অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছিল যা ছিল ব্যাপক গণবিধ্বংসী। এখন ইরাক-ইরান যুদ্ধ শেষ, তাই যুক্তরাষ্ট্র এখন ক্রমশ ইরাক-ইরান উভয়কে ধ্বংস করতে চায় কিন্তু বাদ সেধেছে এসব গণবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র। সমগ্র বিশ্ব এমনকি জাতিসংঘ নিয়োজিত অস্ত্র তদারকিদলও দেখেছে অস্ত্র নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র জানে তারা কী ভয়াবহ অস্ত্র ইরাককে সরবরাহ করেছে, যার ভয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তারা ইরাক আক্রমণে সাহস পাচ্ছে না।

ফলে ইরাকে মার্কিন হামলা বিলম্বিত হতে থাকে। এদিকে প্রতিনিয়ত বি-৫২ মার্কিন বোমারু বিমানের টন টন বোমা নিক্ষেপের দ্বারা ইরাকীয় বাহিনীর মনোভাব ভেঙে যাবার কথা, যেমনি হয়েছিল ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইলি যুদ্ধের সময় মিসরীয় বাহিনীর। কিন্তু ইরাকি বাহিনী পর্বতসম অটল। অবসরপ্রাপ্ত একজন মার্কিন সেনা অফিসারের মতে, "শক্তিশালী আক্রমণ চালিয়ে আপনি তাদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারেন, কিন্তু তারা ইরাকি জাতি, যুদ্ধ তারা করবেই (Newsweek Janu 28, 1991)। ওপরে এ ব্যাখ্যা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার যে, একমাত্র সাদ্দাম-ভীতির কারণেই প্রেসিডেন্ট ডব্লিউ বুশ ইরাক আক্রমণে এত সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন।

www.pathagar.com

বিমান বিধ্বংসী কামান	১৭০০০
আধা সামরিক	৪৪,০০০
উপকূল রক্ষী Coast Grd	৩৭,১৬৬

উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের চাইতে ইরাকের বর্তমান সামরিক শক্তি এক-তৃতীয়াংশ এবং অনেক সৈন্য ছিল অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

ইরাকি অস্ত্রশস্ত্র :

প্রধান যুদ্ধ ট্যাংক	২২০০
অন্যান্য আর্মার্ড যানবাহন	৩৭০০
প্রধান গোলন্দাজ অস্ত্র	২৪০০
জঙ্গি বিমান	৩০,০০০

ইরাকের অধিকাংশ অস্ত্রশস্ত্র প্রথম উপসাগরীয় (১৯৯১) যুদ্ধের পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় আবার অনেক যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের অভাবে বিকল হয়ে পড়ে। যাও অবশিষ্ট ছিল তাও যুদ্ধবিরতির শর্ত হিসাবে জাতিসংঘের তদারকিতে ধ্বংস করা হয়। অতএব বাহ্যত অনেক অনেক শক্তিশালী মনে হলেও অস্ত্র পরিদর্শক দল তার প্রধান বিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র ধ্বংস করে দেয় (Neorwech, Sept 13, 2002)। তাই বার বার পরিদর্শন সত্ত্বেও জাতিসংঘ পরিদর্শন দল ইরাক ব্যাপক গণবিধ্বংসী কোন অস্ত্রের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়। বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হলে ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, চীন, আরও অনুসন্ধান এবং দু'নম্বরেই ছিল ইরাক। আফগানিস্তান দখল করার পর বুশ ইরাক আক্রমণের দিকে নজর দেন। কিন্তু কেবল কূটনৈতিক ব্যবস্থা বা অস্ত্র পরিদর্শন ছাড়া সরাসরি ইরাক আক্রমণের ব্যাপারে তাঁর দল রিপাবলিকান দলের অনেক নেতাই জর্জ বুশকে নিষেধ করে (Newsweek, sept 3, 2002)।

কিন্তু বুশ তাঁর নিজস্ব ঢালাও মতবাদ ঘোষণা করেন এবং তা হল যে সমস্ত দেশ গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মালিক তাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সতর্কতামূলক যুদ্ধ (Premative war) পরিচালনা করা। অর্থাৎ আক্রান্ত হবার আশঙ্কার পূর্বেই আক্রমণ করা। একে তিনি ১৯৪৭ সালের ট্রুম্যান মতবাদের (Truman Doctrcins) এর সাথে তুলনা করেন। তবে জর্জ বুশের এ নীতি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান মতবাদের ন্যায়ই বিতর্কিত (Newsweek, sept. 9, 2002)। কিন্তু ইরাক আক্রমণের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিক্যান দল সতর্ক করে নতুন কোন

www.pathagar.com

কূটনৈতিক উদ্যোগ এবং অস্ত্র পরিদর্শন ছাড়া ইরাক আক্রমণ বোকামি হবে। অতঃপর ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডিক চোনি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রামসফেল্ড এবং প্রধান সেনাপতি এ্যান্ডি কার্ড (Andy Card)-এর পরামর্শক্রমে প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাক আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন।

ইরাক আক্রমণের প্রাক্কালে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইরাক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনামূলক অস্ত্রভাণ্ডার নিম্নরূপ :

	ইরাক	যুক্তরাষ্ট্র
সেনাবাহিনী	৪,২৪,০০০	৪,৮৫,৫৩৬
রিজার্ভ	৬,৫০,০০০	৮,৬৫,২০০
মেরিন কোর		১,৭৩,৩৮৫
নৌবাহিনী	২,০০০	৩,৮৪,৫৭৬
বিমান বাহিনী	৩০,০০০	৩,৬৯,৭২১

আরও অনুসন্ধান ছাড়া ইরাক আক্রমণের বিরোধিতা করে। নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হয়ে প্রেসিডেন্ট ডব্লিও বুশ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার সম্মতিতে ইরাক আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন।

২২শে ২০০৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সম্মিলিত কোয়ালিশন বাহিনী অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম (Operation Iraqi Frudem) নামের অভিযানের ইরাক আক্রমণ করে। পারস্য উপসাগরে অবস্থিত মার্কিন বিমানবাহিনী রণতরী হতে ঝাঁকে ঝাঁকে জঙ্গি বিমান ইরাকের ওপর টন টন ওজনের বোমা নিক্ষেপ করে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী বসরা এলাকায় এবং মার্কিন বাহিনী মূলভূমিতে ইরাকি সাদ্দাম বিমান ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হয়।

আক্রমণের দু'সপ্তাহ পর দু'টি শক্তিশালী মার্কিন এ ক্রম এম-১ ট্যাংক ইরাকি গালার আঘাতে ধ্বংস হয়। ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে বিধ্বস্ত দুটো ট্যাংক খুব বেশি নয়। কারণ কোয়ালিশন বাহিনীর নিকট অনুরূপ প্রায় ৬৫০টি ট্যাংক রয়েছে এবং আরও ট্যাংক পড়ে রয়েছে। কিন্তু মার্কিনিদের যা ভাবিয়ে তোলে তা হলো যে পদ্ধতিতে ওগুলো ধ্বংস হয়েছে তাতে ইরাকি গেরিলা বাহিনীর যুদ্ধ কৌশলের উৎকর্ষতা প্রমাণ করে। উল্লেখ্য, মার্কিন বাহিনী হালকা বাধার মুখে বাগদাদের অতি সন্নিকটে পৌঁছিলে ইরাকিরা গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করে। আরও দুশ্চিন্তার কারণ হল রাশিয়ার নির্মিত ট্যাংক ধ্বংস এ কামান ইরাকিরা কোথায়

www.pathagar.com

পেল? ইরাকিরা অতি গোপনে এসব হাল্কা, শক্তিশালী এবং সহজে ক্ষেপণযোগ্য এক হাজার ট্যাংক, বিধ্বংসী কামান ক্রয় করে। পেন্টাগনের সূত্রমতে, ইউক্রেনের অস্ত্র ব্যবসায়ীদের নিকট হতে এসব সংগ্রহ করা হয় (জানুয়ারিতে তারা এসব ৫০০ ধরনের ট্যাংক বিধ্বংসী কামান সরবরাহ করে।) পেন্টাগনের ধারণা সিরিয়াও এসব যুদ্ধ সামগ্রী ইরাককে সরবরাহের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন (Newsweek, April 7, 2003)।

ইরাক আক্রমণের দু'সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে প্রশ্ন দাঁড়ায় ইরাকি মুক্তি কার্যক্রম (Operation Iraqa Fredom) মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের গতি কোন দিকে মোড় ফেরায়? নিত্যনতুন জঙ্গি বিমান প্রয়োগের দ্বারা যুদ্ধের পরিধি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। অতি সতর্ক বুশ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের আশঙ্কা, অগ্নিশর্মা আবার সড়কসমূহ কি মার্কিনপন্থী সরকারগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধরা যাক, জর্ডানের আম্মানে বাগদাদ পতনের পূর্বেই সরকার পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছে? ইরাক বাথ পার্টির পতনের পর যুদ্ধ আরও রক্তাক্ত হবে বলে সিনিয়ার মার্কিন কর্মকর্তাগণ মন্তব্য করেন।

যতই দিন যেতে থাকে ইঙ্গ-মার্কিন বিমান আক্রমণ এবং ইরাকি গেরিলাদের নিত্য নতুন যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টির ফলে ইরাকে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইরাকে মার্কিন স্থলবাহিনীর কমান্ডার লে. জেনারেল উইলিয়াম ওয়ালেস (Lt. General Willian Walace) বলেন, "যে শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি সে আমাদের মহড়া যুদ্ধের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।" তিনি সাংবাদিকদের বলেন, শত্রুর ভয়ঙ্কর বাধা এবং বিশাল সরবরাহ লাইনের দরুন যুদ্ধের স্থায়িত্ব পূর্ব অনুমানের চাইতে অনেক দীর্ঘ হবে। প্রেসিডেন্ট বুশ এবং তার মন্ত্রী রামসফেল্ড, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি ধারণা করেছিলেন, মার্কিন সৈন্যরা (তৎসহ ৪৫,০০০ ব্রিটিশ সৈন্য) অতি দ্রুত শক্তিশালী গোলার সাহায্যে সবকিছু দুমড়িয়ে মোচড়িয়ে অগ্রসর হবে এবং সাদ্দাম ও তাঁর পুত্রদের অচিরেই আটক করবে। অতি দীর্ঘ তারা বাগদাদ দখল করে প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে গ্রেফতার করবে। সাধারণ মানুষ বিশেষত শিয়া সম্প্রদায় যারা সাদ্দামকে ঘৃণা করে, মার্কিন সৈন্যদের ফুলের মালা প্রদান করবে বা সাদ্দাম ও বাথ পার্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। কিন্তু তৎপরিবর্তে যখন ইরাকি গেরিলাদের পিছন হতে হঠাৎ আক্রমণে মার্কিন সৈন্যদের দলে দলে মৃত্যুবরণের খবর আসতে থাকে তখন মার্কিন কর্মকর্তাদের হুঁশ হয়। তারা এমন দোষ স্খলনের পথ খুঁজতে থাকে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি.আই.এ (CIA)

www.pathagar.com

এমন সাবধানী ধ্বনি উচ্চারণ করে, ইরাকি গেরিলারা পিছন দিক থেকে গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ করে মার্কিন বাহিনীর সরবরাহ লাইন তছনছ করে দিতে পারে। এদিকে "ফেদাইয়ানে সাদ্দাম" নামক অপর একটি গেরিলা বাহিনী মার্কিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনা করে। ফেদাইয়ানরা এ কে. ৪৭ রাইফেলের ন্যায় হালকা অস্ত্র ব্যবহার করলেও তাদের কার্যাবলি ছিল নৃশংস। সাদ্দামের জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়-এর পরিচালনায় গঠিত ফেদাইয়ান বাহিনী এ. কে. ৪৭ রাইফেল, মর্টার এবং আর. পি. জি অস্ত্র সজ্জিত। তাদের সংখ্যা প্রায় ২০ থেকে ৪০ হাজার। উদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুসাইয়ের হাতে ছিল স্পেশাল সিকিউরিটি (Speical secuity) অফিস নিয়ন্ত্রিত স্পেশাল রিপাবলিকান গার্ড। তারা মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে।

প্রবল বাধার মুখে মার্কিন কোয়ালিশন বাহিনী সাদ্দাম বিমান বন্দরের দিকে অগ্রসর হয়। ২০১০ মার্চ, ০৩ স্থল বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়। বোমার আঘাতে বাগদাদ জ্বলতে থাকে। ২৩শে মার্চ ০৩, মার্কিন বাহিনীর নাসিরিয়া নামক স্থানে বাধাগ্রস্ত হয়। ইরাকিরা একটি মার্কিন অগ্রসরমান গাড়ি বহরে অতর্কিত হামলা চালায় এবং তাতে প্রায় ১৫ জন সৈন্য মৃত বা নিখোঁজ হয়। পরদিন মাঝরাতে অভিযান বাধাগ্রস্ত হয়। একটি এ্যাপাচি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয় এবং দু'জন মার্কিন সৈন্য ইরাকি গেরিলাদের হাতে ধৃত হয়। ২৬ শে মার্চ ১০০০ মার্কিন প্যারাসুট সৈন্য উত্তরের কুর্দি এলাকায় অবতরণ করে এবং তথায় অবস্থানরত কয়েকজন স্পেশাল ফোর্সের সাথে মিলিত হয়। ৭ই এপ্রিল বোমার কারবালার প্রতিরক্ষা ভেদ করে মার্কিন বাহিনী বাগদাদ ও সাদ্দাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দখল করতে অগ্রসর হয়। ১৯ এপ্রিল ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক বসরা দখলের দু'দিন পর বাগদাদের পতন হয়। ঐ মার্কিন সৈন্যরা বাগদাদের কেন্দ্রস্থলে নির্মিত সাদ্দামের পিতল মূর্তি ধ্বংস করে এবং তার মুখে মার্কিন পতাকা উড়ায়। ১১ই এপ্রিল উত্তরে কিরকুফ দখলের একদিন পর মার্কিন সৈন্য ও কুর্দি যোদ্ধারা মসুল দখল করে। কুর্দিরা উত্তরের তেলক্ষেত্রগুলো দখলে আনতে মার্কিনিদের সাহায্য করে (Newsweek, April 21, 2003)।

বাগদাদ শহরে প্রবেশ করে মার্কিন সৈন্যরা নিরাপত্তাহীনভাবে শহরটি ছেড়ে দেয়। দোকানপাট হতে মূল্যবান সামগ্রী ছাড়াও নিউজিয়াম হতে অতি মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী লুট হয়। দখলদার সৈন্যরা শুধু তাকিয়েই থাকে। কারও কারও মতে মার্কিন সৈন্যরা লুণ্ঠনকারীদের লেলিয়ে দেয়। ফলে হাজার হাজার বছরের মেসোপটেমিয়ান প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন লুট হয়ে যায়। এসব মূল্যবান নিদর্শন

www.pathagar.com

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশরা যেমন দক্ষিণ এশিয়ার সমস্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সভ্যতার নিদর্শনসমূহ লুট করে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামকে সমৃদ্ধ করেছিল, তেমনি এখন বাগদাদ হতে চুরি হওয়া বা লুট হওয়া প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মিউজিয়ামের শোভাবর্ধন করে। অতঃপর সমগ্র বিশ্বের ধিক্কারের মুখে মার্কিন বাহিনী লুটপাট বন্ধের নিমিত্তে শহরে কারফিউ জারি করে (Newsweek)।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বাগদাদ ত্যাগ : এদিকে সাদ্দাম হোসেন গোপনে বাগদাদ ত্যাগ করেন। ইরাকি সৈন্যরা অস্ত্র ত্যাগ করে এবং সামরিক উর্দি ত্যাগ করে বেসামরিক ব্যক্তিতে পরিণত হয়। বিভিন্ন জায়গায় তাদের ফেলে যাওয়া সামরিক বস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। যুদ্ধের পূর্বে অনেক জল্পনা-কল্পনা, তর্জন-গর্জন শোনা গেলেও রাস্তায় কিছু দেখা গেল না। সাদ্দাম ইচ্ছা করলে অগ্রমান মার্কিন বাহিনীকে ঠেকাতে অসংখ্য পুল ধ্বংস করতে পারতেন। তিনি নদীতে নির্মিত বাঁধসমূহ ধ্বংস করে বন্যার সৃষ্টি করতে পারতেন। তিনি বাগদাদ দখলের দিবসে সৃষ্ট যানজটের সুযোগে আটকে পড়া মার্কিন গাড়ি বহরে আক্রমণ করতে পারতেন। তিনি দক্ষিণ ইরাকের তেলক্ষেত্রগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারতেন। তিনি বিষাক্ত গ্যাস ছাড়তে পারতেন। কিন্তু তিনি কিছুই করেনি। কিন্তু কেন? দু'সপ্তাহ যাবৎ যুদ্ধে নিয়োজিত মেরিন জেনারেল এবং জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের যুগ্ম চিফ অব স্টাফ পিটার পেস (Peter pace) একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেন (Newsweek April 21, 03) : "হয়ত তিনি মৃত অথবা তিনি (সাদ্দাম) এবং বিশ্বের নিকৃষ্টতম সেনাপতি।" হঠাৎ একদিন তিনি (সাদ্দাম) বাগদাদের রাস্তায় জনগণ কর্তৃক বেষ্টিত এবং হাস্যোজ্জ্বলভাবে দেখা দিলেন টিভির পর্দায়। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা ঐ এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি চালায়। তাদের মতে একজন সাদ্দামের অবস্থান নির্দিষ্ট করেন। মুহূর্তে বোমার আঘাতে ঐ ভবন সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করা হয়। অতঃপর দখলদার বাহিনী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে সাদ্দাম ঐ ধ্বংসস্তূপে নিহত হয়েছেন। কিন্তু যতই দিন গড়াতে থাকে ততই ইরাকি গেরিলাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে শত শত মার্কিন সৈন্যদের মৃত্যুর খবরে প্রমাণিত হয় তারা এক কঠিন বিভরে অবস্থান রত। এদিকে মার্কিন পদাতিক ডিভিশন কর্তৃক সাদ্দাম বিমান বন্দর ও বাগদাদ নগরীর পতনের পর কোয়ালিশন বাহিনী সমগ্র ইরাকে ছড়িয়ে পড়ে। একে একে ফালুজা, তিকরিত, কিরকুফ, কারবালা, নাজাদ, মসুল মার্কিন বাহিনীর করতলগত হয়। তবে এই সমগ্র এলাকা সহজে হস্তগত হয় তা

www.pathagar.com

ভাববার কোন কারণ নেই, কারণ মার্কিন বাহিনী এখানে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয় এবং অনেক মার্কিন সৈন্যের প্রাণের বিনিময়ে এসব এলাকা হস্তগত হয়। অতপর প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ও তার সহযোগীদের ধরার জন্য কোয়ালিশন বাহিনী সামরিক প্রচেষ্টা চালায়। কারণ ইরাকি যোদ্ধারা দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিরোধের সৃষ্টি করে তাতে শত শত মার্কিন সৈন্য নিহত হয়। হাজার হাজার সৈন্য আহত ও পঙ্গুত্ববরণ করে। তাই প্রতিরোধ যুদ্ধের স্নায়ুকেন্দ্র সাদ্দাম ও তার সহকর্মীদের ধরার জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠে। একে একে তারিক আজিজ, তাহা রামাদান ও অন্যান্য নেতা ধরা পড়তে থাকেন। কিন্তু সাদ্দামকে ধরা যেন নাগালের বাইরে।

২২শে জুলাই ২০০৩ সাদ্দাম হোসেনের পুত্রদ্বয় উদয় হোসেন এবং কুসাই হোসেন মসুলে মার্কিন সৈন্যদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে গোলাগুলিতে নিহত হন। সে সঙ্গে কুসাইর শিশুপুত্র মোস্তফাও নিজের এ. কে. ৪৭ রাইফেলের গুলিবর্ষণ করতে করতে মৃত্যুবরণ করে। মার্কিন সৈন্য কর্তৃক শনাক্তকৃত সাদ্দাম পুত্রদ্বয়কে তারা তালিকাভুক্ত করে উচ্চমূল্যের লক্ষ্য (High value Target No 2 and No 3) হিসাবে। তারা আশা করে এ দ্বারা ইরাকিরা বুঝতে পারবে যে পুরাতন শাসনামল শেষ এবং সাদ্দাম হোসেনের ফিরে আসার আর কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এর দ্বারা দৈনিক একজন মার্কিন সৈন্য নিহত হবার ঘটনা কি শেষ হবে? একজন কুর্দি গোয়েন্দা বলেন উদ এবং কুশাইয়ের হাতেই ছিল প্রকৃত ক্ষমতা। আরেক তথ্য মতে, এখনও ৩৫,০০০ যোদ্ধা সম্বলিত একটি বাহিনী সাদ্দামের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে। কিন্তু সাদ্দাম পুত্রদ্বয় নিহত হয়েছেন—এ কথা ইরাকিদের বিশ্বাস করাতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করে মার্কিন সৈন্যরা তাদের লাশকে মোম দিয়ে পুনর্গঠিত করে টেলিভিশনে বার বার তা দেখাতে থাকে।

কিন্তু উদ ও কুশাইকে ধরা অত সহজ হয়নি। উত্তর মসুলের যে বাড়িতে তারা লুকিয়ে ছিলেন তথায় প্রবেশে দখলদার বাহিনী দু'বার বাধাগ্রস্ত হয়। ভিতর হতে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে মার্কিন সৈন্যরা ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ১০১ উড়ন্ত ডিভিশন (101 Air forsed Divesion) পুরো মোতায়েন করে ভবনটি ঘিরে রাখা হয়। ওপর হতে হেলিকপ্টার গোলাবর্ষণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় বার ১০টি Tow ক্ষেপণাস্ত্রের দ্বারা ভবন ধ্বংস করে তারা ৩টি লাশ মার্কিন গোলার আঘাতে ঝাঁজরা অবস্থায় দেখতে পায়। ওগুলোই উদয়, কুসাই, মোস্তফা এবং

www.pathagar.com

একজন দেহরক্ষীর লাশ। পরে জানা গেল তারা এ বাড়িতে ২৪ দিন ধরে অবস্থান করছিলেন। বাড়ির মালিক, নাওয়াফ আল-জায়েদান মার্কিন ঘোষিত প্রতি পুত্রের জন্য ১৫ মিলিয়ন ডলার পুরস্কারের লোভে তাদের সন্ধান দেয়।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের পতনের পর উত্তরে কুর্দিগণ এবং দক্ষিণের শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়। শিয়ারা নিজেদেরকে অতঃপর ইরাকের ন্যায়াযুগ উত্তরাধিকারী বিবেচনা করে। ইরাকি মুসলমানদের ৬০ ভাগ শিয়া বিধায় তারা আইনানুগতার প্রশ্ন অতঃপর তারা মার্কিন বাহিনীর ইরাক ত্যাগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যে সব দল বা গ্রুপ ইরাকের ক্ষমতায় উত্তরাধিকারী হিসাবে নিজেদের বিবেচনা করে তাদের তালিকা নিম্নরূপ :

গ্রুপ	নেতা	উদ্দেশ্য	মন্তব্য
১. সাংবিধানিক রাজতন্ত্র আসে	শরীফ আলী মিঃ হোসেন হাশেমীয় রাজাদের উত্তরাধিকারী যারা ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত শাসনকাজ চালায়।	গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা	
২. ইরাকি কমিউনিস্ট পার্টি	আজিজ মোহাম্মদ : ১ম সেক্রেটারি পদাধিকারী	কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা	
৩. ইরাকি ন্যাশনাল কংগ্রেস (Iraqi National Congres)	আইয়াফ আলাভী ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত ইরাকে অবস্থানকারী পেন্টাগন সমর্থিত	ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা	
৪. ইরাকি ন্যাশনাল একার্ড (Iraqi National Accord)	আইয়াফ আলাভী সাবেক দলত্যাগী পার্টি নেতা	ঐ	

www.pathagar.com

গ্রুপ	নেতা	উদ্দেশ্য	মন্তব্য
৫. কুর্দিস্তান গণতন্ত্রী দল (Kurdistan Democrate Party)	মারাউদ বার্জানা, উত্তর-পশ্চিম কুর্দি অঞ্চল প্রধান	কুর্দিদের স্বায়ত্তশাসনসহ একটি ফেডারেশন ধরনের ব্যবস্থা	
৬. প্যাট্রিয়টিক ইউনিয়ন অব কুর্দিস্তান (Patratic Union of Kurdistan)	জালান তালবানি কুর্দি অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় অবস্থিত।	ঐ	
৭. নাজাদ হাওজা (Najaf Howza)	মোকতাদা আল-সদর, ইরাকে একজন প্রভাবশালী শিয়া নেতা হিসাবে আবির্ভূত	একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা	
৮. ইরাকে ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ কাউন্সিল (Supreme council for the Islamic Rev. in Iraq)	মোহাম্মদ বাকিব আল হাকিম, ১৯৮০ সালে ইরানে পলায়ন একটি শিয়া গ্রুপ	একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা	

– Newsweek, May 5–2003

ইরাকে সাদ্দাম সরকারের পতনের ফল ভোগ করার জন্য যেসব ব্যক্তিত্ব এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে প্রথম উদয় হন আহমদ সালমী। তার দল ইরাকি ন্যাশনাল কংগ্রেস। অতীতে মাত্র তের বছরকাল ইরাকে অবস্থানের পর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। ইরাকি হান্টটিং ক্লাবে (Iraqi Hunding club) তিনি তার অফিস স্থাপন করেন। বর্তমানে বিপর্যস্ত এ ক্লাবটি একটি আউটডোর চলচ্চিত্র থিয়েটার এবং টেনিস মেলার স্থান হিসেবে সাদ্দাম পুত্র উদয়ের শখের

www.pathagar.com

ক্লাব ছিল। নিউজউইক সাপ্তাহিকীর রিপোর্টারের সাথে একান্ত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তিনি বাগদাদের চতুপার্শ্বের সব গোত্রের সাথে একান্ত এক সাক্ষাৎকারে তিনি কথা বলেছেন। সব পেশার লোকদের সাথে আলাপচারিতার মাধ্যমে তিনি সাদ্দাম আমল এবং বাথ শাসনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি ইরাকে গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া আরম্ভ করতে চান এবং সে সাথে একটি বেসামরিক সুশীলসমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চান। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে কেউ কেউ তাঁকে পছন্দ করেন, কেউ কেউ পছন্দ করেন না। মার্কিনিরা কখনও এদেশ নিজেরা শাসন করবে না। তিনি তাদের সমর্থনে এগিয়ে যেতে চান। কিন্তু আমেরিকায় একজন প্রার্থী হিসাবে নয়। প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের ভাষ্য মতে সালাবী একজন চোর এবং অধিকাংশ ইরাকিও তা বিশ্বাস করে— এরূপ একটি প্রশ্ন তিনি সাদ্দামের বানানো গল্প হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি যত শিগগির সম্ভব মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান করেন (Newsweek, May 5, 23)।

ক্ষমতা প্রত্যাশী আরেক ব্যক্তিত্ব মোহসিন জুবাইদি। ইনি সাদ্দাম আমলে ইরাক থেকে বহিষ্কৃত এক ব্যক্তি। বাগদাদ দখলের পর রাতারাতি তিনি এখানে হাজির হন এবং নিজেকে একজন ক্ষমতার দালাল হিসাবে প্রতিভাত করেন। বাগদাদের ইজাতার শেরাটন হোটেলে তিনি নিজেকে বাগদাদ কার্যনির্বাহী পরিষদের (The Exective Courcil of Baghdad) প্রধান বলে প্রকাশ করেন। তার সঙ্গের লোকেরা নিজেদের স্বেচ্ছাসেবক বলে উল্লেখ করেন। জুবাইদি যাকে কেউ কেউ বাগদাদের মেয়র বলেও উল্লেখ করেন। দাবি করেন বিগত ১৭ এপ্রিল ২০০৩, ২২ সদস্যবিশিষ্ট এক নির্বাহী পরিষদ তাকে নির্বাচিত করেছেন এবং তিনি মার্কিন সৈন্যদের সাথে একযোগে ইরাক পুনর্গঠনের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। নিউজউইককে তিনি বলেন, "আমার অর্থ আছে, আমার নিকট হাসপাতালসমূহের চাহিদা মোতাবেক চিকিৎসাসামগ্রী রয়েছে সর্বোপরি ইরাকি জনগণ আমার সঙ্গে রয়েছে। (অর্থ তিনি দান হিসেবে পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেন)। Newsweck ঐ।

তিন যুগের কঠোর সাদ্দাম শাসনের পর ছোট বড় অনেক ইরাকি এখন ক্ষমতা দখলে ব্যস্ত। কালো মিহি সুতার পোশাকে গোত্রীয় লোকগণ নিজেদের উপগোত্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণের ওকালতি করার জন্য লোক লাগিয়েছেন। অপব্যয়ী পরিবারগুলো সাদ্দামের অভিজাত এলাকায় বাড়িঘর দখলের জন্য তোষামোদকারী নিয়োগ করেছেন। প্রত্যাবর্তনকারী বহিষ্কৃত ইরাকিগণ আলেম ওলামা হতে রাজনীতিবিদগণ নামাজের ইমামতি এবং জনগোষ্ঠীর ওপর

www.pathagar.com

নেতৃত্বদানের জন্য তাদের দাবি উত্থাপন করেছেন। তবুও এসব হবু রাজা-বাদশাহদের কেউই ৫১ বছর বয়সী সাবেক জুবাইদির ন্যায় উদ্ধত প্রকাশ করেননি। বিগত ২৩ বছর সাদ্দামকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ইরাকি ন্যাশনাল কংগ্রেসের একজন গোপন নেতার ভূমিকা পালন করলেও প্রকৃতপক্ষে হাতেগোনা কয়েক ব্যক্তি ছাড়া কেউই তার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। অধিকাংশই তাকে সম্বোধন করে একজন নেকড়ে হিসাবে (Al-deeb)।

জুবাইদি মার্কিন সেনা ও পুলিশের যৌথ পাহারার ব্যবস্থা শুধু নয় বরং তিনি এ সপ্তাহে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিতব্য তেল রপ্তানিকারকদের সংগঠন ওপেক (OPEC)-এ তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থাও প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিলেন। কিন্তু ইরাকি ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রধান সালাবী এবং ইরাকে ওয়াশিংটনের অন্তর্বর্তীকালীন বেসামরিক প্রশাসন লে. জেনারেল (অবঃ) জে. গার্নার (Retired Lt General Jay Garner)-এর সতর্কবাণীর দ্বারা তিনি নিবৃত্ত হন।

মোকতাদা -আল-সদর : প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের পতনের পর সবচাইতে উল্লসিত হয় দক্ষিণ ইরাকের শিয়া মুসলমান। শতকরা ৬০ ভাগ শিয়া অধ্যুষিত ইরাকে সংখ্যালঘু সুন্নি। কিন্তু সাদ্দাম হোসেন দোর্দণ্ড প্রতাপ শাসন চালিয়ে শিয়াদের মাথা তুলতে দেননি। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার বশবর্তী বাথ পার্টি শাসিত ইরাক ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা ছিল অনেকটা শিথিল এবং এ কারণেই শিয়া ধর্মীয় কেন্দ্রস্থল নাজাফ ইরাকে অবস্থিত হলেও অনেকে মনে করেন ইরানই শিয়াদের কেন্দ্রস্থল এবং কোম নগরী একটি কেন্দ্রবিন্দু যেখানে ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী ও অন্যরা বাস করেন। প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের পতনের পর খোমেনীগণ মনে করেন শিয়া ধর্মের কেন্দ্রস্থল কোম হতে নাজাফ চলে গেল। তাই সাদ্দামের পতনের পর দক্ষিণের শিয়ারা উল্লসিত হয়। এই উল্লাস এবং শিয়াদের সংঘটিত করার জন্য যিনি বের হয়ে আসেন তিনি মোকদাতা-আল-সদর।

মোকদাতা-আল-সদরের সদর দফতর নাজাফ হজরত আলী (রা.) মাজারের পার্শ্বে এক বাজারের স্যাঁতস্যাঁতে এক দোকানে অবস্থিত। তার পিতা শিয়াদের এক নেতা ১৯৯৯ সালে সাদ্দামের আদেশে নিহত হন। কালো পাহারা পরিহিত এ শিয়া নেতাকে এক নজর দেখার জন্য শত শত লোক বাইরে জড়ো হয় এবং এক এক করে তিনি তাদের সাক্ষাৎ দেন। তার নিহত পিতা মোহাম্মদ সাদেক আল সদরকে তিনি আল্লাহর নবী হিসাবে আখ্যায়িত করেন। প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের পতনের পর আল-সদর মার্কিন স্বার্থের প্রবল বিরোধী হিসাবে আবির্ভূত

www.pathagar.com

হন। ইরানভিত্তিক শক্তিশালী এক শিয়া ধর্মীয় নেতার সাথে তার সম্পর্কের কারণে ইরাকি শিয়ারা তার কট্টরপন্থী হবার ভয়ে ভীত হয়। কিন্তু আল-সদর ঐ নেতার সাথে তার সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন। সাদ্দামের পতনের পর তিনি মার্কিনিদের নিকট কৃতজ্ঞ কিনা— এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা আল্লাহ্‌র নিকট ঋণী। কেউ কেউ বলেন তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতিভূ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। বিগত কয়েকদিনের হিংসা-বিদ্বেষের মধ্যে নাজাফে এ যুবক কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে আবির্ভূত হন। (Newsweek, May 19, 2003)। তার আগমনের পিছনে কারণ হলো ধর্মীয় নেতাদের আস্তিনে লুক্কায়িত অগণিত ডলার এবং শিয়া ইসলামের এক পবিত্র স্থানে আবদুল মজিদ খোয়াই নামক এক ধর্মীয় নেতার হত্যাকারী। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম কর্তৃক লন্ডনে নির্বাসিত এ নেতা মার্কিন প্রহরায় ইরাকের নাজাফে আগমন করেন। তাকে সামনে রেখে মার্কিনিদের পরিকল্পনা হলো সাদ্দামোত্তর ইরাকে মধ্যবর্তী নেতাদের উত্থাপন ঘটানো যা কট্টরপন্থী ইরাকের বিরুদ্ধে একটি বাধা হিসাবে বিরাজ করে। দৃশ্যত আবদুল মজিদকে হত্যার কারণ হিসাবে তাঁর মার্কিন সম্পর্ককে দায়ী করা হয়। কিন্তু প্রতৃতপক্ষে আল-সদরের দোরগোড়ায় এ হত্যাকাণ্ডকে সমাগত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব হিসাবেও কেউ কেউ উল্লেখ করেন। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আল-খোয়াই মনে করেন সাদ্দাম শাসন শেষ হয়ে যাবে। তাই তিনি নাজাফকে কেন্দ্র করে একটি ক্ষমতা বলয় সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অচিরেই প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম কঠোরভাবে সে শিয়া অভ্যুত্থান প্রতিষ্ঠা নস্যাৎ করে দিলে আল-খোয়াই লন্ডনে পলায়ন করেন।

নাজাফের একটি সূত্র অনুযায়ী আল-সদর তাঁর অনুসারীদের বলেন, তিনি আল-খোয়াইয়ের আগমনে উদ্বিগ্ন। তিনি তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেন এবং এই মার্কিন দানবের বিরুদ্ধে শিয়াদের বাধা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করেন। ইরানের কোম নগরীতে অবস্থানরত এক কট্টর শিয়া নেতা, খাদেম আল-হোসাইনী আল-হায়েবী পত্র মারফৎ আল-সদরকে উৎসাহিত করেন এবং তাকে ইরাকে তার প্রতিনিধি হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তিনি সমস্ত সাদ্দামপন্থীদের ইরাক হতে বহিষ্কারের আহ্বান জানান। আল-খোয়াই আল সদরের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এর দু'দিন পরই আল-খোয়াই এবং অপর এক শিয়া নেতা হায়দর রাহফী সদরের সমর্থকদের হাতে নিহত হন। অতঃপর আল সদর কুফা মসজিদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইরাকে ইসলামী আইনের কিছু অংশ কার্যকরী করার নির্দেশ দেন।

www.pathagar.com

দক্ষিণ ইরাকের শিয়া জনগোষ্ঠী আল-সদরের আহ্বানে সাড়া দেয়। তারা মার্কিন বাহিনীর ইরাক ত্যাগের ঘোষণা দেন। অতঃপর এর সাথে মার্কিন বাহিনীর ঘোরতর সংঘর্ষ বাধে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আল-সদর বাহিনী জয়যুক্ত হয়। কিন্তু অচিরেই আল হায়েবীর আহ্বানে আল-সদর মার্কিনিদের সাথে এক সমঝোতায় উপনীত হয়ে যুদ্ধ থামিয়ে দেন।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন গ্রেফতার

অপরদিকে সমগ্র ইরাকে মার্কিন বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। সাদ্দামের রিপাবলিকান গার্ডরা বেসামরিক বেশে মরিয়া হয়ে মার্কিন স্বার্থের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে মার্কিন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। শুধুমাত্র রাইফেলের সাহায্যে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তারা শত শত মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্য হত্যা করে। যে সমস্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ইরাকে সৈন্য প্রেরণ করে তাদের বেসামরিক লোকদের অপহরণ করে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার অথবা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিতে বাধ্য করে। ডজন ডজন সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়। অসংখ্যক ট্যাংক সাঁজোয়া যান, লরি, জিপ রাস্তার পার্শ্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেখা যায়। এ দিকে জ্বালানি তেলবাহী পাইপে আগুন ধরিয়ে তারা ইরাকের তেল রফতানি বন্ধ করে দেয়। মার্কিন সৈন্যরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে গেরিলা পথচারী নির্বিশেষে ইরাকিদের হত্যা করে। প্রেসিডেন্ট পুত্র উদয় ও কুসাই একমাত্র পৌত্রসহ উত্তর মসুলে লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। মার্কিনিরা সাদ্দাম এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের তালিকা বানিয়ে সর্বত্র প্রচার করে এবং ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এরই এক পর্যায়ে ২০শে ডিসেম্বর ২০০৩ সাদ্দামের জন্মভূমি তিকরীতে তারই এক জ্ঞাতি ভাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম মার্কিন বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। তার গ্রেফতারে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এবং মুক্তিকামী সমগ্র বিশ্বে শোকের ছায়া নেমে আসে।

কিন্তু যুদ্ধ থেমে যায়নি। অতঃপর মার্কিন বাহিনী সাধারণ ইরাকিদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে মার্কিন সৈন্যের পোশাক পরিধান করিয়ে মাঠে নামায়। অতএব গেরিলারা সৈন্য রিক্রুটিং সেন্টারে হামলা চালিয়ে বহু ইরাকিকে হত্যা করে। ইরাকে অবস্থিত জাতিসংঘ সদর দফতরে হামলা চালিয়ে গেরিলারা ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে এবং একজন উঁচুমানের কূটনীতিককে হত্যা করে। ফলে নিরাপত্তার অভাবে জাতিসংঘ সদর দফতর জর্ডানে স্থানান্তর করা হয়।

www.pathagar.com

বিশ্ববাসীকে জর্জ ডব্লিউ বুশের ছলচাতুরি

ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র, রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ আছে এবং সর্বোপরি নিউইয়র্কের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে (World Trade Centre) হামলাকারী (?) ওসামা বিন-লাদেনের আল কায়েদা জঙ্গিগোষ্ঠীর সাথে প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের গোপন সম্পর্ক আছে— এ ধুয়া তুলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিও বুশ অত্যাধুনিক সমরশক্তি নিয়ে জাতিসংঘের কোন সম্মতি ছাড়াই ইরাকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতা ও যশ সুখ্যাতির অধিকারী মার্কিন প্রেসিডেন্টের পক্ষে এতবড় জালিয়াতি ও শঠতা বিশ্ববাসীকে অবাক করেছে। এ যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণত সম্পর্কে মিসরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসনি মুবারকের উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইরাক আক্রমণের প্রাক্কালে তিনি বুশকে সাবধান করেছিলেন এ বলে যে আমেরিকায় ইরাক আক্রমণ সমগ্র বিশ্বকে সন্ত্রাসী কাজের বৈধতা দেয়া হবে। অবশ্য ডব্লিউ বুশ নিজেও জালিয়াতির মাধ্যমে ফ্লোরিডা রাজ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং তার ভাই ফ্লোরিডার গভর্নরের সহায়তায়। সে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিশেষত ফ্লোরিডার ব্যাপারে একটি প্রবাদ আছে–যে ফ্লোরিডায় জয়লাভ করবে সে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও জয়লাভ করবে।

যাহোক ইরাক যুদ্ধ শেষের কিছুদিনের মধ্যে জানা গেল প্রেসিডেন্ট বুশের বিভিন্ন দাবির অসারতা। যে ভুয়া দাবি নিয়ে বুশ ইরাক আক্রমণ করেছিলেন, অর্থাৎ ওসামা বিন লাদেনের সাথে প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের সম্পর্ক রয়েছে–তা অচিরেই ভুল প্রমাণিত হল। গণ-বিধ্বংসী অস্ত্র ইরাকে নেই–এ ধরনের একটি জাতিসংঘ রিপোর্টকে উপেক্ষা করে তিনি ইরাক দখলের পর স্বীয় গোয়েন্দা দল লেলিয়ে দিয়ে কোন অস্ত্র ইরাকে খুঁজে পাননি। অপরদিকে আল-কায়েদার সঙ্গেও সাদ্দামের কোন সম্পর্কের সূত্রও তিনি খুঁজে পাননি। বড় বড় শহরগুলো সম্মিলিত বাহিনীর হস্তগত হলেও যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি জর্জ বুশের অনুকূলে যাচ্ছে না। ইরাকে কয়েক হাজার মার্কিন সৈন্য নিহত এবং প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক সৈন্য আহত ও পঙ্গু হওয়ার ঘটনায় মার্কিন জনগণ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে। আর হুসনি মুবারকের ভবিষ্যদ্ববাণী ফলাও হতে দেখা গেল যখন সমগ্র ইরাক এবং প্রায় সমগ্র বিশ্ব আজও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিণতিতে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে অবস্থান করার মাধ্যমে। ইরাকে শান্তিতো আসেইনি বরং নিত্যনতুন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মাধ্যমে অবস্থা আরও সংকটময় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই বুশ এ অভিযান পরিচালনা করে। তার ধারণা ছিল এ ধরনের একটি

www.pathagar.com

আত্মঘাতী যুদ্ধের আতঙ্ক লেলিয়ে দিতে পারলে দেশবাসী একত্রিত হয়ে তার লুক্কায়িত হিংসা চরিতার্থ করতে এগিয়ে আসবেন তার প্রতিহিংসার কারণ হন বুশ সিনিয়রের প্রতি সাদ্দাম হোসেনের বল্গাহীন কথাবার্তা।

৬ ডজন অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন জেনারেল ইরাক যুদ্ধে খামখেয়ালি, ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও চরম অব্যবস্থাপনার জন্য সরাসরি রামসফেল্ডকে দায়ী করে তার পদত্যাগ দাবি করেন। প্রেসিডেন্ট তার প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পক্ষাবলম্বন করলেও তাঁরা তাদের দাবিতে অটল। যুদ্ধারম্ভের যুগের বৈদেশিকমন্ত্রী, যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী প্রধান কলিং পাওয়েল, ডেক চেনি এবং রামসফেল্ডকে বোঝাতে সক্ষম হননি যে, তারা সঠিক পথে নেই। দু' ব্যক্তি আমেরিকার প্রশাসনকে এমনভাবে বিন্যস্ত করছেন যদ্বারা সমগ্র বিশ্বে মার্কিনিরা একটি একগুঁয়ে জাতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে (Newsweek, sept. 2, 2002)। পাওয়েল প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের ন্যায় বিশ্বায়নের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। তিনি বলেন, "আমরা সহস্রাধিক গ্রন্থির সাহায্যে যুক্ত বিশ্বের অগণিত নগরী এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহ এবং সুপ্রাচীন সভ্যতাসমূহ এবং মুক্তির নবতর দাবীর সাথে আবদ্ধ (Newsweek do)। সাদ্দামের নির্গমনের ব্যাপারে তিনিও চেনি এবং রামসফেল্ডের সাথে একমত। কিন্তু সাদ্দামের বহিষ্কারের পন্থা নিয়ে তাদের মতপার্থক্য। অতি গভীর, কট্টরপন্থীরা মনে করেন মার্কিন শক্তি প্রয়োগই যথেষ্ট। কিন্তু কলিং পাওয়েল এসব পরিচালিত বেসামরিক যুদ্ধবাজদের ব্যাপারে শংকিত। দুবার ভিয়েতনাম সফরের পর তিনি বলেন, "আমার প্রজন্মের অনেক পেশাজীবী ক্যাপ্টেন, মেজর, লে. কর্নেল যাঁরা ঐ যুদ্ধে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, প্রতিজ্ঞা করেন (নীতি নির্ধারণে) আমাদের পাল্লা আসলে আমরা মার্কিন জনগণ বুঝে না বুঝে সমর্থন করে না। এ ধরনের স্বল্প প্রস্তুতিমূলক অনাগ্রহী যুদ্ধে রাজি হব না। (Newsweek, sept 23, 2002) তাই ইরাক যুদ্ধে বৈদেশিকমন্ত্রী কলিং পাওয়েলকে বাদ দিয়ে আরেক কন্টরপন্থী মহিলা রাইসকে বৈদেশিকমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।

অবসরপ্রাপ্ত ৬ মার্কিন জেনারেলের সাথে হাত মিলিয়েছেন আরেক সেনা কর্মকর্তা, ন্যাটোর সাবেক কর্মকর্তা জেনারেল ওয়েলেসলি ক্লার্ক। তিনি বলেন, "তিনি চেনি এবং রামসফেল্ড যুক্তরাষ্ট্রকে ইরাক যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেছেন।" তিনি ইরাক অভিযানকে মর্মান্তিক ভুল ও কৌশলগত বিপর্যয় আখ্যা দিয়ে বলেন, 'এর সাথে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নেই। ভুল নীতির কারণে রামসফেল্ড

www.pathagar.com

জেনারেলদের আস্থা হারিয়েছিলেন। তাই তার পদত্যাগ করা উচিত।' (আমার দেশ, ১৯ এপ্রিল ২০০৬)।

মার্কিন জনগণ এবং পেন্টাগনের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন এসব ব্যক্তির বক্তব্য হতে বোঝা যায়, তেল ব্যবসায়ী ডিক চেনি এবং অস্ত্র ব্যবসায়ী রামসফেল্ডের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এক চরম বিপর্যয়ে এনে ফেলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নির্বাচনী খেলার মাধ্যমে গঠিত ইরাকের পুতুল সরকার চরম বিপর্যয় হতে বুশ প্রশাসনকে রক্ষা করতে পারবে না। প্রেসিডেন্ট বুশ এবং রামসফেল্ড গং 'ভুল হয়েছে' 'ভুল হয়েছে' বলে যতই চেঁচাক না কেন বাঁচার কোন পথ নেই।

এদিকে কোয়ালিশন বাহিনী কর্তৃক ইরাকে ঠান্ডা মাথায় চলছে অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট নাগরিক হত্যাকাণ্ড। এ জন্য একদিন নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্বের নানা অংশের বিশিষ্ট জন জাতিসংঘের নিকট চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে স্বাক্ষর কয়েকজন নোবেল বিজয়ী হ্যান্ড পিন্টার, জে. এম. কোয়েতজী, হোসে মায়া মাগে এবং দার্বিও ফো। অন্যদের মধ্যে রয়েছেন নোয়াস চমস্কি, হাওয়ার্ড জিন, কর্নেল ওয়েস্ট এবং টনি বেন। এরা এ অভিযোগের পূর্ণ তদন্ত এবং ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। ইউরোপের সংসদে গ্রিন পার্টির প্রতিনিধি ক্যারিলিন লুকাসও এ তদন্তের দাবি সমর্থন করেছেন।

গত মাসে (মার্চ ২০০৬) গার্ডিয়ান সংবাদপত্রে ইরাকি লেখিকা হাইফা জাঙ্গামা এ হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, সঠিক সংখ্যা হয়ত কোন দিনই পাওয়া যাবে না। তবে এটি হাজারের অনেক বেশি। শুধু বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়েই ৮০ জন শিক্ষক এ পর্যন্ত খুন হয়েছেন। যারা আক্রান্ত হয়েও বেঁচে গিয়েছেন তাদেরকে তো তালিকার বাইরেই রাখা হয়েছে। হাইফা দেখেছিল, কোন বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছে তা নয়। সমস্ত ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকই এই নিহতের তালিকায় রয়েছে। এর মধ্যে চিকিৎসক, আইনজীবী, বিজ্ঞানী, গবেষক, আরবি পণ্ডিত এবং বিশিষ্ট সাংবাদিকরাও রয়েছেন।

২৮ জানুয়ারি বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক আল-নাসেরের বাড়ির সামনে দু'টি মোটরগাড়ি এসে দাঁড়ায়। বন্দুকধারী কয়েকজন নেমে এসেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। ঘটনা হল কয়েকদিন আগে আলজাজিরা ও আল-আরাবিয়া টেলিভিশনে ইরাক-মার্কিন আগ্রাসনের কঠোর

www.pathagar.com

বিরোধিতা করে মতামত জানিয়েছিলেন এই অধ্যাপক। আরেক প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী ড. আব্দুল লতিফ আল-মায়া-আল জাজিরা টেলিভিশনে ইরাকের পুতুল শাসকদের সমালোচনায় মুখরিত হন। এর পরপরই তিনি বন্দুকধারীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে খুন হন। (প্রথম আলো : এপ্রিল ১৮, ২০০৭)।

উল্লেখ্য, ঘরে এবং বাইরে প্রবল সমালোচনার মুখে প্রেসিডেন্ট বুশ সৈন্য প্রত্যাহারের কথা চিন্তা করেন। কিন্তু তাতে কি নড়বড়ে প্রশাসন মজবুত করা যায়? এ জন্য ইরাক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার (?) অংশ হিসাবে বাথ পার্টির দলত্যাগী নেতা এবং ইরাকি ন্যাশনাল একদিব আইয়াদ আলাভীকে তিনি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে এবং কুর্দি নেতা জালাল তালবানীকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিয়োগ দান করেন। ইরাকে সাধারণ নির্বাচন করে নতুন সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। কিন্তু নির্বাচন সম্পন্ন হবার চার মাস পরও একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি; কারণ মার্কিনিদের তত্ত্বাবধানে প্রণীত সংবিধানে শিয়াদের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বেশি। অপরদিকে কুর্দিদের প্রদত্ত সুবিধাদির দ্বারা তাদের স্বাধীনতার পথ সুগম করা হবে। ফলে সুন্নিরা এতে ক্ষুব্ধ হয়। তাই সুন্নিরা মন্ত্রিসভা প্রক্রিয়া হতে নিজেদের সরিয়ে রাখে। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শিয়া নেতা নূরী আল-মালিকীকে মনোনয়নদানের মধ্য দিয়ে টানা চার মাসের অচলাবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটবে বলে আশা করা হয়। নতুন প্রধানমন্ত্রী আজ হতে ৩০ দিনের মধ্যে সরকার গঠন করবে। আর এ হবে সাদ্দাম হোসেনের পর প্রথম পূর্ণাঙ্গ সরকার। ইরাকের পুনর্নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জালাল তালেবান আশা করেন এর মাধ্যমে ইরাকের জাতিগত দাঙ্গার অবসান হবে। মালিকী মিলিশিয়াদের ইরাকি নিরাপত্তা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করার মধ্য দিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

কিন্তু নিজ দেশ থেকে আমেরিকার জনপ্রিয়তা ২৯ ভাগে নেমে আসা প্রেসিডেন্ট বুশ নতুন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করেন জাতিগত মিলিশিয়া, বিশেষত সুন্নি গেরিলাদের। এদিকে ইরাকে মোতায়েন কোয়ালিশন বাহিনীর কমান্ডার ব্রিটিশ জেনারেল রবার্ট ফ্রে বলেন, দেশটিতে মিলিশিয়া সমস্যার সমাধান কেবল রাজনৈতিকভাবে সম্ভব।

লে. জেনারেল (অব.) জে. গার্নারের পর ইরাকে মার্কিন প্রশাসক বা দূত হিসাবে প্রেরণ করা হয় পল ব্রেমারকে (Paul Breamar)। তিনি ইরাকে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান। ২০শে

www.pathagar.com

ডিসেম্বর ২০০৩ তিকরিতে এক খামার বাড়ির ভূগর্ভস্থ মাটির বাংকার হতে প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে গ্রেফতার করার পর ব্রেমার সাদ্দাম আমলের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি কুর্দি নেতা তালবানীকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট এবং আলাদিন প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন দান করেন। একটি বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা তিনি চালু করেন এবং অতঃপর একটি সামরিক বিমানযোগে ইরাক ত্যাগ করেন। কিন্তু ইরাকি গেরিলাদের সঙ্গে কোয়ালিশন বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে এবং একদিকে সুন্নি-শিয়া এবং অপরদিকে কুর্দিদের মধ্যে এক প্রবল গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় ইরাক।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে উচ্ছেদ করা এবং মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্র (?) চালুর যে লক্ষ্য নিয়ে মার্কিনিরা ইরাক আক্রমণ করেছিল তার তিন বছর পর দেখা যাচ্ছে যে, ইরাক সর্বাত্মক এক গৃহযুদ্ধের মুখে চলে গিয়েছে। সম্প্রতি মার্কিনিরা ১৬ মার্চ ২০০৬ ইরাকে এক প্রচণ্ড বিমান হামলা চালায়। সাদ্দামের পতনের পর দেশটিকে শান্ত করার প্রয়াস হিসাবে এ হামলা মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট এবং ইরাকি পুতুল সরকারের আরেকটি ব্যর্থতার প্রতীক। গত মাসে সামারায় শিয়াদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাজার ইমাম আল হাদি মসজিদে বোমা হামলায় সাম্প্রদায়িক সংঘাতে ইরাকে শত শত মানুষ মারা যায়।

২০০৫ সালের এপ্রিলে ইরাক প্রথম নির্বাচনে ওয়াশিংটন অতি উচ্চসিত থাকলেও ঐ সময় ইরাকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল হোসেন কামিল দেশটিতে নিম্ন মাত্রার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, সুন্নি আরবরা শিয়া লোকজনকে প্রতিদিন হত্যা করছে, একই সময় প্রতিবাদ হিসাবে শিয়ারাও সুন্নিদের হত্যা করছে।

এদিকে নূরী আল-জাওয়াদ আল মালিকী ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রেসিডেন্ট জালাল তাবাবানীর মনোনয়ন লাভ করেন। তিনি অবিলম্বে, অর্থাৎ ২২শে মে ০৬ এর মধ্যে মন্ত্রিসভা গঠন করতে সক্ষম হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

ইরাকে সর্বশেষ পরিস্থিতি (মে ২০০৬)

ইরাকে কার্যত মারাত্মক গণবিধ্বংসী ও রাসায়নিক অস্ত্র রয়েছে এবং ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র (World Trade Centre) ধ্বংসকারী আল-কায়েদা সংগঠনের

www.pathagar.com

সম্পর্ক রয়েছে এ অজুহাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এবং তাঁর প্ররোচনায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশ নিয়ে গঠিত সম্মিলিত সামরিক জোট ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ করে। কিন্তু বিশাল বাহিনী নিয়ে ইরাক আক্রমণ ও করায়ত্ত করা এবং এর প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেফতার করার পরও মার্কিন বাহিনী কোন গণবিধ্বংসী অস্ত্র ও আল-কায়েদার সঙ্গে সুসম্পর্ক আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে লক্ষাধিক নিরীহ ইরাক এবং কয়েক হাজার মার্কিন সৈন্য নিহত হন। সমগ্র বিশ্বে এ যুদ্ধের জন্য প্রেসিডেন্ট বুশ ও টনি ব্লেয়ারকে ধিক্কার প্রদান এবং স্বযং ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ প্রতিবাদী মানুষের হুংকারে প্রেসিডেন্ট বুশ এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যে এবং জনসমক্ষে স্বীকার করেন যে ইরাক যুদ্ধে তারা অনেক ভুল করেছেন। বৃহস্পতিবার ২৫শে মে ২০০৬ হোয়াইট হাউসে ৫০ মিনিটের এক সংবাদ সম্মেলেন দু'নেতা তাদের এ ভুলের কথা স্বীকার করেন। এ সম্মেলনে ইরাক হতে সৈন্য প্রত্যাহারের কোন সময়সূচি তারা ঘোষণা করেননি, তবে প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার আশা প্রকাশ করেন , ২০০৭ সাল নাগাদ ইরাকি সৈন্যরা সে দেশের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে। আরেক খবরে প্রকাশ, জর্জ বুশ বলেছেন, আগামী জুলাই ০৬ এ মার্কিন সৈন্য আংশিক হ্রাস করা হবে।

বিচারের কাঠগড়ায় ইরাকের প্রেসিডেন্ট

২০০৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর তিকরিতের এক খামারবাড়ি থেকে মার্কিন সেনা কর্তৃক গ্রেফতারের পর সাদ্দাম হোসেনকে বাগদাদ বিমানবন্দরের নিকটবর্তী একটি গোপন স্থানে বন্দি করে রাখা হয়। তাঁর বিচার নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সাদ্দামের সমর্থকগণ আশঙ্কা করেন বর্তমানে মার্কিন সমর্থন ইরাকি প্রশাসক দ্বারা তার বিচার হলে তা নিরপেক্ষ হবে না। বরং যেন তেন প্রকারে তার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে এবং তা দ্রুত কার্যকর করা হবে, কারণ বর্তমান সরকার এমন সব ব্যক্তিবর্গ নিয়ে গঠিত যারা কোন না কোনভাবে সাদ্দাম কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছিলেন। অতএব এমনকি নিরপেক্ষ হবে না। তাই তারা এ বিচার ইরাকের বাইরে কোনো স্থানে বা আন্তর্জাতিক আদালতে কিংবা খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হইলেও তিনি ন্যায় বিচার পাবেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকিদের দ্বারা বিচারকার্য সম্পূর্ণ করতে জেদ ধরেন। অতঃপর ইরাকেই সাদ্দাম এবং তার সাত সহযোগীর তারেক আজিজ, তাহা রামাদান প্রমুখের বিচার আরম্ভ হয়।

www.pathagar.com

প্রথমত, সাদ্দামের এক উকিলকে হত্যা করা হয়। অন্যজনকে হুমকি প্রদান করা হয়। কিন্তু তারপরও বিচারক বিব্রতবোধ করেন এবং বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর প্রধান বিচারক হিসাবে বিচারক রউফ আবদেল রাহমানকে নিয়োগ দেয়া হয়।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ও তার সাত সহযোগীর পক্ষে অভিযোগ আনা হয় যে ১৯৮০ সালে ইরাকের দোজাইল গ্রামে তারা ১৪৮ শিয়া প্রতিবাদকারীকে হত্যা করেন এবং তাদের ফলের বাগান ও বাড়িঘর ধ্বংস করেন। সরকার পক্ষ বিভিন্ন সাক্ষী উপস্থাপন করলেও সাদ্দাম হোসেনকে প্রকৃত আদেশকারী হিসাবে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়।

১৫ই মে ২০০৬ তাদের তাদের বিরুদ্ধে আনা হয় যে ১৯৮০ সালে ইরাকের দোজাইল গ্রামে তারা খুন, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং ৩৯৯ জনকে অবৈধভাবে গ্রেফতার করেন। এ মাসে তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠন করা হয়। এ অভিযোগের ব্যাপারে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক তিনি দোষী নাকি নির্দোষ এ ধরনের এক প্রশ্নের জবাব কোরআন হাতে সাদ্দাম হোসেন দাঁড়িয়ে বলেন, তিনি হ্যাঁ বা না উচ্চারণ করে জবাব দেবেন না। বরং তিনি বিচারককে আবারও স্মরণ করিয়ে দেন, তিনিই এখনও ইরাকের বৈধ প্রেসিডেন্ট।

বিগত ২০শে জুন ২০০৬ অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীর গুলিতে আইনজীবী খামিস-আল-ওবাইদি নিহত হন। আরও ২০ জনের সাথে তাঁকে তার বাসভবন হতে বন্দুকধারীরা তুলে নেয় এবং বাগদাদের বামায় গুলি করে হত্যা করে। আইনজীবী খামিস-আল-ওবাইদিকে হত্যার প্রতিবাদে সাদ্দাম হোসেন ও তার ৫ জন সঙ্গী অনশন পালন করেন বলে তাঁর প্রধান আইনজীবী খলিল আল দুলেইমি অভিযোগ করেন। আইনজীবী খামিসসহ সাদ্দামের মোট তিন জন আইনজীবীকে হত্যা করা হল। ঘটনাদৃষ্টে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, সাদ্দাম পক্ষের কোন আইনজীবী বা সাক্ষী জোরালো ভূমিকা রাখলে তাঁকে হত্যা বা হুমকির মাধ্যমে নিরস্ত্র করে প্রকারান্তরে এরূপ একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে কেউ সাদ্দামের পক্ষে দাঁড়াতে না পারে এবং এ জন্যই সাদ্দামের দাবী সত্ত্বেও এক অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের অনুরোধ সত্ত্বেও বিচারকার্য ইরাকেই পরিচালনা করা হয়। খলিল আল-দুলাইমি আরও বলেন, সাদ্দাম ও অন্যান্য বিবাদি তাদের পক্ষের আইনজীবীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক পরিষদের নিকট দাবি জানান।

www.pathagar.com

ইরাকি গেরিলাদের প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রতীক জারকারি নিহত

সাদ্দাম হোসেনের গ্রেফতার বা তার পূর্বে ও এই আল-কায়েদা তার নিজস্ব ফিকিরে আমেরিকান বিরোধী স্বার্থে আঘাত হানতে থাকে। মাত্র ১৯৬৬ সালে জারকারির জন্ম। সোভিয়েত বিরুদ্ধ যুদ্ধে হাজার হাজার আফগানের ন্যায় তিনিও সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন অতঃপর আফগান যুদ্ধ শেষে তিনি আমেরিকান স্বার্থের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানেন। প্রকৃতপক্ষে আফগান বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও তিনি আল কায়েদার সদস্য ছিলেন না। যুদ্ধ শেষে দেশে আসার পর তিনি জিহাদের বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন। যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে তিনি সম্ভবত মিসরীয় ইসলামিক জিহাদে দেন যোগ। এ দলটি পরে ১৯৯৮ সালে আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হন। পাশাপাশি হিজবুল তাহারীর দলেরও সদস্য হন তিনি। ইসলামী শাসন কায়েম করাই ছিল এ দলের মূল লক্ষ্য। ২০০৬ সালের ৭ই জুন বাগদাদের অদূরে সহযোদ্ধা অবস্থায় মার্কিন হামলায় তিনি মারা যান।

সাদ্দামবিহীন ইরাক

সাদ্দাম পরবর্তী ইরাকে দুর্নীতির নজিরবিহীন বিস্তৃতি ঘটে। দুর্নীতি দমনবিষয়ক কমিটি প্রধান হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, সাদ্দাম হোসেনের পরবর্তী সময়ে দুর্নীতি সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পায়। দুর্নীতিবাজ লোকেরা ধরাছোঁয়ার বাইরে। ইরাকি কমিশন অন পাবলিক ইনটিগ্যারিটর প্রধান বিচারপতি রবদি হামজা বলেন, দুর্নীতির বিস্ফোরণ ঘটেছে। ২০০৩ সালে সাদ্দামের পর দুর্নীতি লাগামহীনভাবে বেড়ে যায়। তিনি এ অবস্থার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতাকে দায়ী করেন। এছাড়াও অপরাধীরা কড়া শাস্তি পায় না বলেও দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, মন্ত্রীর অনুমতি ছাড়া কোন অপরাধীকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় না। আবার তদন্তে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলেও আগেভাগে ইঙ্গিত দিয়ে তাকে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়।

ইরাকের আবু ঘারিব জেলখানা এবং গুয়ানতানামো বের নৃশংস অত্যাচার নিবাস

আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা (F. B. I) যদি ২০তম হবু ছিনতাইকারী জাফারীয়া মুসাভিকে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংসের পরিকল্পনা সময়মত উদ্ধার

www.pathagar.com

করার জন্য অত্যাচার করত তবে কী হত? এর জন্য কে অপবাদ দিত? ঘটনা এমন নয় যে তারা সভ্য সমাজের কোন যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে কাজ করছে কিংবা তারা ইরাকের কোন সন্ত্রাসীও নয়। আবু ঘারিব জেলখানায় সামরিক গোয়েন্দা প্রশ্নোত্তরে বন্দিদের নিকট থেকে যা পাচ্ছে তা পশ্চিমা সাংবাদিকদের মতে "সামান্যই"। এজন্য জেলখানায় অত্যাচারের অভিযোগে ৬ সামরিক পুলিশের জেরা করার ফাঁকে ফাঁকে তাদের প্রতি সদয় হবার জন্য বলা হয়। অভিযোগে প্রকাশ, সামরিক পুলিশ কর্পোরাল চার্লস গ্রানার জুনিয়ার (CPL Charler Grance Jr) এক তরুণীকে তার শার্ট গলা পর্যন্ত তুলতে আদেশ দেয়। সে একজন কার্যত যৌন কর্মী। মিলিটারি পুলিশ হোসেন মোহসেন আতার নামীয় একজনকে উদোম গায়ে আরেক জনের ওপর চড়তে বলে। সে কথিত চোর। হাজী ইসমাঈল আব্দুল হামীদকে কুকুর দ্বারা ভয় দেখানো হয়। সাধারণ পুলিশ আবু ঘারিব জেলখানায় শুধু বন্দিদের অত্যাচার করেনি বরং অনেক ক্ষেত্রে নির্দোষ বন্দিদেরও অত্যাচার করে।

আবু ঘারিব জেলখানায় যে ১৩ জনকে অত্যাচার করা হয় বলে চার্জ গঠন করা হয় তন্মধ্যে ৮ জনকে তদন্তকারীরা বেকসুর খালাস দেয়। সন্ত্রাসী সন্দেহভাজন মোহাম্মদ হাবিবুল্লার ব্যাপারে দেখা যায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভাসা ভাসা এবং অনির্ভরযোগ্য। পরিশেষে এ উপসংহারে আসতে হয় যে এই বন্দিদের উপর নির্যাতন চালানো হয় শুধুমাত্র কৌতুক করে। কর্পোরাল গ্র্যানার সম্পর্কে একজন তদন্তকারী মন্তব্য করেন, "শুয়রের বাচ্চা" (S. O. B. Son of a Bitch)। এ মন্তব্যটিকে তিনি দু'বার রেখাংকিত করেন। এ দলটি আমেরিকার যে ক্ষতি করেছে তা অবর্ণনীয়। আমেরিকার দখলদারিত্বে ইরাকিদের সমর্থনের বিষয়ে যে ক্ষতি করছে তা গণনাহীন। নূর বলে (প্রকৃত নাম গোপন করা হল) এক তরুণীকে গ্র্যানার তার স্তন ও লজ্জাস্থান উন্মোচন করতে নির্দেশ দেয়, যা লঙ্ঘন করার উপায় ছিল না। নূর পরে বাগদাদে বিজ্ঞপ্তি দেয় যে মার্কিন সৈন্যরা তাকে ধর্ষণ করে গর্ভবতী করে। সে আরও লেখে "বাধা দিয়ে তারা বলে, অনুগ্রহ করে আমাদের সবাইকে হত্যা করুন।" (....beggins resistance to place to hill of us) (Newsweek, July 19, 2004)। বন্দি সাত্তার জাব্বার এর মাথায় হুড দেয়া হয় এবং বিদ্যুায়িত তার দিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখার ছবিটিকে ইরাকিরা বিদ্রূপ করে নাম দিয়েছে 'স্ট্যাচু অব লিভার্টি'।

গুয়ানতানামো বে বন্দিদের জন্য সরকার নিযুক্ত উকিল বলেন, "এটি এমন একটি জেলখানা যা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে।" তিনি আপিলে বলেন, এটি

হয়ত ইচ্ছাকৃতভাবে করা হচ্ছে অথবা আমরা জানি না এতে কারা আছে। মার্কিন সেনাবাহিনী কারাগারে ৩২ জন বন্দির মৃত্যু সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। এদের অধিকাংশই আবু ঘারিবে মারা গিয়েছে।

মৃত্যুবরণকারী একজনের নাম মুলাদিল আল-জুমাইলী, ৪০ বছরের স্বাস্থ্যবান যুবক ফেব্রুয়ারি ১০ তারিখ ২০০৪ মারা যান। মাথায় রক্তক্ষরণে তিনি মারা যান। তাঁর পরিবার জানেও না কখন মারা গেল। তাঁর ১২ বছরের কন্যা পত্রিকায় ছবি দেখে, বরফের ওপর লাশ রাখা, এম. পি. হারমান ও গ্র্যানার তাঁর ওপর বিজয়সূচক চিহ্ন দেখাচ্ছেন। বন্দিদের উকিল বলেন, "আপনারা হয়ত বলবেন নির্দেশিত হয়ে এসব করেছি, কিন্তু ছবিটি প্রকাশ করছে আপনারা আমোদ-আহলাদ করার জন্য এগুলো করেছেন।" (Newsweek, Do)।

বিচারের প্রহসনে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুদণ্ড

অবশেষে ইরাকের প্রহসনের বিচারে সাদ্দাম হোসেন ও তাঁর সহযোগীর ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়। বিশ্বব্যাপী এ রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না করার দাবি জানায়। ৩০শে ডিসেম্বর ২০০৬ শনিবার সকালে বাগদাদের গ্রিন জোনে ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের আমেরিকান সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর উপরস্থ কর্মকর্তাগণই নিরাপদ আশ্রয়ে রাখার জন্য তারা কঠিন নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করে খোদ বাগদাদের মধ্যস্থলে। এটিকেই বলা হয় গ্রিন জোন। ফাঁসির আদেশ তড়িঘড়ি কার্যকরী করা হয়। এদিন সৌদি আরব ও ইরাকসহ সমস্ত আরব বিশ্বে ছিল কুরবানির ঈদ (ঈদ-উল-আজ্‌হা)। ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাবার প্রক্রিয়া টেলিভিশনে দেখান হয়। সাদ্দাম হোসেন অচলভাবে কালেমা শাহাদাত পাঠ করতে করতে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন। নিয়মানুযায়ী মুখে মুখোশ পরান হয়। কিন্তু সাদ্দাম হোসেন মুখোশ পরতে অস্বীকার করেন এ বলে যে "মুখ লুকিয়ে আমি মৃত্যুবরণ করব না।" কলেমা শাহাদাতের 'মুহাম্মদ' পর্যন্ত পরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পায়ের পাটাতন সরিয়ে ফেলা হয় এবং তিনি অপসৃত হন। অতঃপর ঐ দিনই তার জন্মভূমি তিকরিতে তাঁর শহীদ পুত্রদ্বয় উদয় ও কুসাই এবং দৌহিত্র মোস্তফার পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

জঘন্যভাবে কার্যকর এই ফাঁসির দৃশ্য দেখে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়। আরব বিশ্বে ক্ষোভের আরেকটি কারণ হল ঐ দিনটি ছিল পবিত্র কুরবানির দিন। মার্কিন

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পরোক্ষ ইঙ্গিতে এই দণ্ডাদেশ প্রদান এবং কার্যকর করা হয় বলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অক্ষরে ছাপা হয়। ফাঁসি কার্যকরকারীদের মধ্যে শিয়া মতাবলম্বী লোকজনের উপস্থিতি এবং সাদ্দামকে বিদ্রূপ করা এবং শিয়া নেতা মোকতাদা আল সদরের পক্ষে ধ্বনি দেয়ার মাধ্যমে একদিকে শিয়াদের বিজয়ের ভাব প্রকাশ করা হয়, অপরদিকে ইরাকে শিয়া-সুন্নিদের মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব আরও উসকিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র বলে আরববাসী মনে করে।

তড়িঘড়ি ফাঁসির আদেশ কার্যকর করার আরেক বৈশিষ্ট্য হলো প্রেসিডেন্ট জালাল তালবানীর সম্মতি ছাড়াই আদেশ কার্যকরী করা হয়। বিশ্লেষকরা মনে করেন শিয়া অনুসারীকে মালিকী সন্দেহ প্রকাশ করেন, সুন্নি অনুসারী কুর্দি নেতা প্রেসিডেন্ট তালাবানী মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কার্যকরে সম্মত নাও হতে পারেন। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী ফাঁসির আদেশ কার্যকরী না করার আবেদন-নিবেদন এবং বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয়। সেই প্রেক্ষিতে তড়িঘড়ি এ আদেশ কার্যকরী করা হয়। প্রেসিডেন্ট তালাবানী উচ্চারণ করেছিলেন যে তিনি মৃত্যুদণ্ড আদেশে সম্মতি প্রদান হতে বিরত থাকবেন।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের মৃত্যুর পর আরব বিশ্বে একমাত্র লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফী ছাড়া অন্যকোন রাষ্ট্রপ্রধান কোন সমবেদনা বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। লিবিয়া তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করে এবং পতাকা অর্ধনমিত রাখে। মিসরের প্রেসিডেন্ট হুসনী মুবারক শুধু সমালোচনা করেন সাদ্দামের ফাঁসি কার্যকর করার প্রক্রিয়ার বিষয়টি। তিনি বলেন, যে অমানবিক পন্থায় সাদ্দামের ফাঁসির আদেশ কার্যকরী করা হয় তাকে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। পন্থা নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডব্লিউ বুশ এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারও সমালোচনা করেন। দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার দু-একটি মুসলিম দেশ ছাড়া অবশিষ্ট মুসলিম বিশ্বও কোন শোক বা সমবেদনা জ্ঞাপন করেননি। আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা, সমগ্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন সাদ্দামের বিচার ও ফাঁসির প্রতিবাদ জানায়। মানবিক সংস্থা বিচারের নামে এ প্রহসনেরও সমালোচনা করে। মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ তীব্র ভাষায় শুরু থেকে এ বিচার প্রহসনের প্রতিবাদ জানায়। ফেব্রুয়ারি ২০০৭ কুয়ালালামপুরে এক যুদ্ধবিরোধী সমাবেশে তিনি বুশ-ব্লেয়ারকে সাদ্দামের চাইতেও বড় খুনি হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে শিশু হত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধী বলে নিন্দা করেন। (দৈনিক আমার দেশ ৬/২/০৭)।

www.pathagar.com

ইরাকে অবস্থার কোন পরিবর্তন না হওয়ায় এবং হত্যাযজ্ঞ বেড়ে যাওয়ায় জর্জ বুশ ইরাকে ২১৫০০ মার্কিন সৈন্য প্রেরণের পরিকল্পনা করেন এবং বাগদাদে সর্বাত্মক হামলার আয়োজন করেন। অতঃপর বাগদাদে যৌথ বাহিনীর সর্বাত্মক হামলার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে মার্কিন বাহিনী। সাঁজোয়া যান ও ট্যাংক বাহিনী নিয়ে তারা রাস্তায় নামে। কিন্তু এর মধ্যে মার্কিন মেরিন সেনা বহনকারী একটি হেলিকপ্টার বিধ্বংস হয়ে বাগদাদের উত্তর-পশ্চিমে একটি মাঠে পড়ে আগুন ধরে যায়। আরোহী ৭ মেরিন সৈন্য সবাই নিহত হয়। ইরাকি বিমান বাহিনী কর্মকর্তারা বলেন, বিমানবিধ্বংসী ও ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে এটিকে ভূপাতিত করা হয়। তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে এটি ষষ্ঠ মার্কিন বিমান ধ্বংসের ঘটনা। এ ঘটনা ইরাকে বিমান চলাচলে ক্রমবর্ধমান সমস্যারই ইঙ্গিত বহন করে। অপরদিকে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম আট দিনে ৩ জন মার্কিন সেনা প্রাণ হারায়।

এদিকে মার্কিন প্রতিনিধি সভায় ডেমোক্র্যাট দেলের নেতারা বুশ সরকারের স্বরূপ উন্মোচন করে আনীত একটি প্রস্তাবের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছাবার চেষ্টা করছেন। এ প্রস্তাবে ইরাকে আরও সৈন্য পাঠাবার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট বুশের সিদ্ধান্ত নাকচ এবং সেনাবাহিনীর প্রতি সমর্থন ঘোষণা করা হবে। ০৭ নভেম্বর ০৬, ডেমোক্র্যাটরা মার্কিন কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর প্রতিনিধি সভায় ইরাক যুদ্ধের ওপর এটিই প্রথম ভোটাভুটি। মার্কিনিরা বুশের যুদ্ধ নীতির ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। চার বছর ব্যাপী এ যুদ্ধে তিন হাজারেরও বেশি মার্কিন সৈন্য এবং হাজার হাজার ইরাকি নিহত হয়।

মার্কিন বাহিনীর প্রতীক্ষিত বাগদাদ হামলা আরম্ভ হয়েছে ৯ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার এতে দক্ষিণ বাগদাদে মার্কিন বিমান হামলায় ৮ সন্দেহভাজন গেরিলা নিহত হয় বলে দাবি করা হয়। বিমান হামলায় একটি ভবন ধ্বংস হলে তাদের প্রাণহানি ঘটে। বাগদাদের দক্ষিণ উপকণ্ঠে সুন্নি অধ্যুষিত জাবুর এলাকায় বৃহস্পতিবার এ হামলা চালান হয়। ইরাকে আল কায়েদা ও বিদেশি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে আমেরিকান সৈন্যরা ব্যাপক গেরিলা হামলা মোকাবিলা করে বলে মার্কিনি সৈন্য নিধন যতই বাড়ছে ইরাকি বেসামরিক লোকজন হত্যার তাৎপর্য কী তা রহস্যজনক। বিশ্লেষকদের মতে, যতই মার্কিন সৈন্য নিহত হচ্ছে ততই ইরাকে বেসামরিক নিরীহ লোকদের ওপর বোমা হামলার ব্যাপকতা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ দুইয়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক অবশ্যই আছে এবং সে সম্পর্কটি হল মার্কিন বাহিনীর দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ যুদ্ধ হচ্ছে

www.pathagar.com

তাকে বিভক্ত করে শিয়া-সুন্নিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক হানাহানি লাগিয়ে রেখে উভয়কে দুর্বল করার চেষ্টা। এ চেষ্টা ইরাকে মার্কিন দখলদার বাহিনী নিজেদের গোয়েন্দা বাহিনী ও সে সঙ্গে ইসরাইলি গোয়েন্দা বাহিনী মোসাদের মাধ্যমে করছে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ বেসামরিক হামলাগুলোকে যতই ইরাকিদের কাজ বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করুক— এ কাজের কলকাঠি তারাই নাড়ছে পিছন থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন মহল এখন শিয়া-সুন্নির এ পারস্পরিক হানাহানিকে গৃহযুদ্ধ হিসাবে আখ্যায়িত করে এমন প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে এটি মনে করার কোন উপায় নেই যে, এ বিভেদ ও হানাহানির মূল কলকাঠি মার্কিন সরকার ও ইরাকে তাদের দখলদার বাহিনীর দ্বারাই নাড়া হচ্ছে। ইরাকের পরিস্থিতির দিকে তাকালে এ বিষয়টি সহজেই স্পষ্ট হবে (দৈনিক আমার দেশ, ১০ ফেব্রুয়ারি ০৭)।

এদিকে ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুর ৪০ দিন পূর্ণ হয় গত ফেব্রুয়ারি (৮ ফেব্রুয়ারি ০৭)। সাদ্দামের চেহলামে এ দিনটিতে তার জন্মস্থান তিকরিতের মসজিদে ছিল বেদনাহত মানুষের সমাগম। প্রিয় নেতার রুহের মাগফিরাত কামনায় তারা সে স্থানে জড়ো হয়। সুন্নি নেতা জুমা আল আতাওয়াই মসজিদে আগতদের উদ্দেশে বলেন, সাদ্দাম হোসেনকে আমরা কখনও ভুলব না। সমগ্র আরব ও ইসলামী বিশ্বের এ মহান নেতা চিরকাল ইসলাম বিরোধী শক্তি ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। মসজিদের বাইরে সাদ্দামের মৃত্যুতে শোকবার্তা লেখা ব্যানার ঝুলান হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে এখন কতখানি আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে তার পরিচয় পাওয়া যায় অতি সাম্প্রতিক একটি ঘটনা হতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) কন্ডোলিসা রাইস সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। এ সফর শেষ হয় বিগত ১৬ জানুয়ারি কুয়েতে। সেখানে কুয়েতের আমির এর বায়ান প্রাসাদে ঐ দিন উপসাগর সহযোগিতা কাউন্সিল (Gulf Cooperation Council–GCC) এর ছয় সদস্য সৌদি আরব, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সে সঙ্গে মিসর ও জর্ডান মধ্যপ্রাচ্যের এই আটটি দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এক যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন।

ঐ বিবৃতিতে উপরোক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা প্রেসিডেন্ট বুশ কর্তৃক ইরাকে ২১,৫০০ সৈন্য পাঠাবার প্রস্তাবকে সমর্থন করে বলেন এর দ্বারা ইরাকে গৃহযুদ্ধ

www.pathagar.com

বন্ধ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া ইরাকের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা এর সেখানে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এটি সহায়ক হবে—এ মর্মে রাইস-এর প্রস্তাবকেও তাঁরা সমর্থন করে। প্রকৃতপক্ষে এভাবে বুশের পরিকল্পনাকে সমর্থন প্রদানের অর্থ হলো ইরাকে রক্তারক্তি ও হানাহানি বৃদ্ধি করে সেখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়িয়ে তোলা এবং এভাবে বিভেদ সৃষ্টি করে ইরাকি জনগণকে নির্মমভাবে দমন করা। এ বিষয়টি এখন স্পষ্ট যে ১৬ জানুয়ারি কুয়েতে যারা রাইসের সঙ্গে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন, তাঁরা যে ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধ প্রস্তাবকে সমর্থন করেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ ইরাকে প্রস্তাবিত সৈন্য পাঠাবার জোর বিরোধিতা করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট উভয় হাউস।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

নতুন তুরস্ক

প্রথম মহাযুদ্ধে কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের স্বপক্ষে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের যোগদান করা সম্ভবত অনিবার্য হয়ে পড়ে। রাশিয়া পুরাতন শত্রু এবং অতীতের অভিজ্ঞতা তুর্কিদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে তারা সর্বদা ব্রিটিশ ও ফরাসিদের উপর নির্ভর করতে পারে না, বিশেষত তারা যখন রাশিয়ার মিত্র। অপরদিকে জার্মানি একটি নতুন শক্তি যার সঙ্গে তাদের কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়নি। সাম্রাজ্যে জার্মানদের ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান এবং কাইজারের সফল (১৮৮৯ ও ১৮৯৮ খ্রিঃ) বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তদুপরি সাম্রাজ্য পরিচালক ত্রিরত্ন—জামাল, আনোয়ার ও তালাত জার্মান সমর্থক, তাই অনেক তুর্কি বিশ্বাস করে, জার্মানির আগমনের ফলে রাশিয়া ও ব্রিটেনের শক্তি নিরপেক্ষ হয়ে যাবে।

অবশ্য যুদ্ধ ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। বিভিন্ন রণাঙ্গনে তুর্কি সৈন্যদের সাহসিকতা এবং গ্যালিপুলিতে তাদের জয়লাভ সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি। জার্মানির পরাজয়ের অনেক পূর্বেই ওসমানীয়গণ পরাজয়বরণ করে। 'ধ্বংসের মুখে' কথাটি সুবিবেচনামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়। কারণ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ৩রা অক্টোবর মুদ্রসের সন্ধির পর মিত্রশক্তি বিশেষত গ্রেট ব্রিটেন ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা যুক্তিযুক্ত মনে করেনি। একটি দুর্বল ও অনুগত ওসমানীয় রাষ্ট্র একই উদ্দেশ্য সাধন করবে। 'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তিটি' এখনও উপকারী। একে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের পরিচালনাধীন হাসপাতালে জীবিত রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। ১৯১৯ হতে ১৯২৩ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েই তুর্কিগণ এই রুগ্ন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে নতুনভাবে কাজ আরম্ভ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে আধুনিক তুর্কিদের নিকট যুদ্ধকালীন চার বছরের তুলনায় প্রথম মহাযুদ্ধের পরের চার বছরই অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

www.pathagar.com

পরাজিত ওসমানীয়দের নিকট প্রেসিডেন্ট উডরু উইলসনের বাণীই সম্বল হিসাবে থাকে, তিনি বলেন : 'বর্তমান ওসমানীয় সাম্রাজ্যের তুর্কি অংশটুকুর পূর্ণ সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা দিতে হবে।' যুদ্ধ চলাকালে (১৯১৫-১৯১৭ খ্রিঃ) গোপন চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে মিত্রশক্তিবর্গ এশিয়া মাইনরকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেয়। ওসমানীয় রাষ্ট্রের জন্য শুধু উত্তর আনাতোলিয়া অবশিষ্ট থাকে। ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো পশ্চিম ইউরোপের শক্তিবর্গ রাশিয়ার হাতে প্রণালীর কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে সম্মত হয়। সম্ভবত ক্ষতিপূরণস্বরূপ দার্দানালিসের দক্ষিণে এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাংশ গ্রিসের নিকট হস্তান্তর করতে গ্রেট ব্রিটেন পীড়াপীড়ি করে এবং ফ্রান্স ও ইতালি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাতে রাজি হয়।

বলশেভিকগণ রাশিয়ার সরকার হাতে নিয়ে পূর্ববর্তী সরকারের সমস্ত চুক্তিসমূহ বাতিল করে এবং গোপন চুক্তিসমূহ ফাঁস করে তাদের প্রাক্তন মিত্ররাষ্ট্রসমূহকে বেকায়দায় ফেলে। এতে অবস্থার তেমন কিছু পরিবর্তন আনয়ন করেনি এবং তা ১৯২০ সালের ১০ই আগস্ট স্বাক্ষরিত সেভারদের সন্ধি দ্বারাই বোঝা যায়। একমাত্র পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় গোপন চুক্তি দ্বারা রাশিয়াকে প্রদত্ত ভূখণ্ডসমূহের নতুন বিন্যাসের মধ্যে। পশ্চিমে জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণে প্রণালীকে আন্তর্জাতিক করা হয়, কিন্তু ইস্তাম্বুল তুর্কি আধিপত্যে থেকে যায়। পূর্বে রাশিয়াকে প্রদত্ত অবিকল সেই এলাকায় স্বাধীন আর্মেনীয় রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। অধিকন্তু, গণভোটের অধিকার সহকারে কুর্দিদিগকে স্বায়ত্তশাসন এবং এক বছরের মধ্যে সম্ভাব্য স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।

ভূখণ্ডের ভাগবাটোয়ারা ছাড়াও তুর্কি সেনাবাহিনীর সংখ্যা ৫০,০০০ এ সীমিত করে। একে মিত্রশক্তি অথবা কোনো নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উপদেশ সাপেক্ষ রাখা হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালির প্রতিনিধিত্বে গঠিত একটি অর্থনৈতিক কমিশনের হাতে রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থনৈতিক বিষয়াদি অর্পণ করা হয়। উপরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চালু রাখা হয় এবং তুর্কিদেরকে স্বীয় সীমান্তভুক্ত সমস্ত সংখ্যালঘুদের দায়িত্ব ও সুবিধাদির নিশ্চয়তা প্রদান করতে হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন এরূপ একটি অপমানজনক চুক্তি তুর্কিগণ হয়ত গ্রহণ করত যদি গ্রিকদেরকে এই যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির ভাগ দিতে না হত। গ্রিস ওসমানীয় শাসনের অধীনে প্রায় তিন শতাব্দী ছিল। তাদেরকে প্রভু হিসাবে আনয়ন করাটা তুর্কিদের সহ্য করার পক্ষে অতি তিক্ত ব্যাপার। গ্রিকদের সম্ভাব্য লাভই শুধু তুর্কিদিগকে

www.pathagar.com

জাগরিত করেনি, বরং সেভারসের চুক্তির অন্তর্ভুক্ত আর্মেনিয়া রাষ্ট্র গঠন, কুর্দদের স্বায়ত্তশাসন, আত্মসমর্পণ ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব সমস্ত কিছু তুর্কিদের নবজাগরণে সহায়তা করে। অবশ্য এর সকল কিছুই হয়ত চাপানো যেত কিন্তু শুধু একজন লোকের জন্য তা সম্ভব হয়নি। তিনি মুস্তাফা কামাল পাশা, পরে আতাতুর্ক নামে পরিচিত, যিনি তুর্কিদেরকে একত্রিত করেন এবং জয়ের পথে পরিচালিত করেন।

মুস্তাফা কামালের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। একজন যুবক অফিসার হিসাবে তিনি কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেসে (Committee of Union and Progress) যোগদান করেন। ১৯১৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থানে তাঁর কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। কোন সময় তিনি নব্য তুর্কিদের নীতি ও কার্যাবলির সঙ্গে জড়িত হননি যারা সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। ত্রিরত্নের সাথে তাঁর মতবিরোধ হয়, কিন্তু তাঁকে একপাশে ঠেলে ফেলা তেমন সহজ ব্যাপার ছিল না। গ্যালিপুলির প্রতিরক্ষায় তিনি জাতীয় সম্মান লাভ করেন। অবশ্য যুদ্ধের শেষভাগে সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মোহমুক্তি ঘটে। দুর্ঘটনাবশত নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে তা হয়ত জানা যাবে না, কিন্তু ১৯১৯ সালে মে মাসে আনাতোলিয়ায় তাকে তৃতীয় বাহিনীর ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হয়। ১৯১৯ সালে ১৯শে মে তিনি উত্তর আনাতোলিয়ায় কৃষ্ণসাগরের সামসান বন্দরে অবতরণ করেন। এই তারিখটি পরে সমস্ত তুরস্কে জাতীয় দিবস হিসাবে পরিগণিত হয়।

অবতরণ করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতিকে সামনে আগত কঠিন পরাধীনতার বিষয় অবহিত করেন। বলশেভিকগণ এসব গোপন বিষয়াদি পূর্বেই প্রকাশ করে দেয়। ১৯১৯ জুলাই মাসে আরজেরুমে অনুষ্ঠিত আরেকটি সম্মেলনে তিনি পূর্ব এশিয়া মাইনরের প্রতিরক্ষার জন্য কমিটি গঠন করেন। প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করে ওসমানীয় পার্লামেন্টের নতুন নির্বাচন দেবার জন্য তিনি সুলতানের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করেন। সুলতান এই কাজ করার জন্য অগ্রসর হন। স্মরণ রাখতে হবে যে, মুস্তাফা কামাল একজন সুপরিচিত নেতা। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আনাতোলিয়ার তৃতীয় বাহিনী পূর্ণ শক্তিতে বিদ্যমান এবং জেনারেল বাকেরের নেতৃত্বে ককেশাশে সফল অভিযানে ব্যস্ত। নবম বাহিনী জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে যোগদান করেছে। মুস্তাফা কামাল যে শক্তিশালী, সুলতান এ বিষয়ে বেশ অবগত।

নির্বাচনে কামালের সমর্থকগণ চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে এবং দেশের বিভিন্ন অংশ হতে প্রতিনিধিবর্গ ইস্তাম্বুলে জমায়েত হয়। ব্রিটিশগণ হৃদয়ঙ্গম করে যে, এ

www.pathagar.com

ধরনের পার্লামেন্টের সাথে তাল মিলিয়ে চলা দুরূহ ব্যাপার এবং তাই তারা প্রতিনিধিবর্গকে বন্দি করে ও এদের কিছুসংখ্যককে মাল্টায় প্রেরণ করে। সুলতান জাতায়তাবাদীদের বিরোধিতা করতে বাধ্য হন। শেখ-উল-ইসলাম ইতিহাসের সর্বশেষ ফতোয়া ঘোষণা করেন যে সমগ্র ওলামাদিদের একত্রিত করে শেখ-উল-ইসলামের বিরোধী একটি পাল্টা ফতওয়া জারি করেন। নিষিদ্ধ ওসমানীয় পার্লামেন্টের স্থলে জাতীয়তাবাদীগণ ১৯২০ সালে ২৩শে এপ্রিল আংকারায় গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি প্রতিষ্ঠা করে।

গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি প্রতিষ্ঠিত হবার পর তুরস্কে বস্তুত দুটি সরকার চলতে থাকে, কিন্তু আংকারায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী সরকারই অধিক ক্ষমতাশালী ও জনপ্রিয়। মুস্তাফা কামাল সমাগত সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। এর একটি হল মিত্রশক্তির আত্মকলহ। যুদ্ধের পর ফারটাইল ক্রিসেন্টকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের মধ্যে দারুণ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে এটি চরম শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। তদুপরি তুরস্কে ব্রিটিশদের তুলনায় ফরাসিদের অনেক ব্যাপক অর্থনৈতিক বিনিয়োগ বিদ্যমান। ফরাসি মহাজনদের চিন্তা ছিল, পাছে বলশেভিকদের ন্যায় তুর্কি জাতীয়তাবাদীগণও সমস্ত ঋণ বাতিল ঘোষণা করে। ইতালীয়গণ গ্রিকদের আগমনে অসন্তুষ্ট হয়। অধিকন্তু ইস্তাম্বুলে ইতালির কমিশনার কাউন্ট ফরজা (Count Sforza) জাতীয়তাবাদীদের বিজয়ের পূর্বাভাস দান করেন। ফ্রান্স ও ইতালি উভয়ে যুদ্ধে জড়িত না হয়ে যতদূর সম্ভব লাভবান হতে চেষ্টা করে এবং এ ব্যাপারে তারা ব্রিটিশদের আঘাত করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। এভাবে অর্থনৈতিক অনুমতিপত্রের বিনিময়ে তাদের এলাকা ছেড়ে দিয়ে ইতালি ও ফ্রান্স মুস্তাফা কামালের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়।

মুস্তাফা কামালের অতি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র সম্ভবত সোভিয়েত ইউনিয়ন। বলশেভিকদের মার্কস মতবাদীগণ পূর্ব ঘোষিত সর্বহারার বিপ্লবের জন্য ইউরোপের দিকে তাকালেও তাদের মধ্যে অনেক 'এশিয়া প্রথম'-এর সমর্থক বিদ্যমান ছিল, যারা ইরান ও তুরস্কের প্রতি দৃকপাত করে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ই নভেম্বর বলশেভিকগণ জার রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত সমস্ত এলাকা ছেড়ে দেয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বলশেভিকগণ মুস্তাফা কামাল ও তাঁর বিপ্লবের প্রতি সমর্থন প্রদান করে। অনেকে এতদূর পর্যন্ত বলে যে তুরস্কের লাল পতাকা ও রাশিয়ার লাল পতাকার মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। মুস্তাফা কামাল কমিউনিস্ট

www.pathagar.com

ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলেন। ১৯১৯ সালে তুর্কি কমিউনিস্ট শেফি দেগমার সোস্যালিস্ট ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি (Socialist Workers and Peasants party) প্রতিষ্ঠা করেন যা ১৯২২ সালে কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে যায়। ১৯২২ সালে বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলনে কার্যকরী সংসদে একজন তুর্কি অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু মুস্তাফা কামাল তুরস্কের অবস্থা স্বীয় আয়ত্তাধীন করার পর কমিউনিস্ট দলকে বেআইনি ঘোষণা করেন এবং দেগমারসহ অনেককে কারারুদ্ধ করেন।

বলশেভিকগণ তাদের নিজস্ব গৃহযুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ে এবং তাই মুস্তাফা কামালকে সামরিক সাহায্য দিতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু লেনিনের সরকারের সাথে বন্ধুত্ব থাকবার ফলে তুর্কিদের মনোবল দৃঢ় থাকে এবং এটি তাদেরকে পূর্বাঞ্চলের আক্রমণ হতে রক্ষা করে। জেনারেল কাইয়াজিম বাকেরের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী বাহিনী আর্মেনীয়দের হাত থেকে কার্স অধিকার করলে বলশেভিকগণ এতে আনন্দ প্রকাশ করে। ১৯২০ সালে ৩রা ডিসেম্বর তারা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্স, আর্দনহান এবং এশিয়া মাইনরের এক বিরাট অংশ তুর্কিদের হাতে ছেড়ে দেয়। ১৯২১ সালে ১৬ই মার্চ মুস্তাফা কামাল পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাথে একটি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করেন।

গ্রিক-তুর্কি যুদ্ধ

গ্রিকগণ ছিল বৃটিশের পদলেহী। জাতীয়তাবাদীদের কর্মসূচি বানচাল করবার জন্য তারা বৃটিশের অনুচর হিসাবে কাজ করে। তদুপরি তাদের পুরাতন শত্রু তুর্কিগণের পরাজয় ও অপমানে গ্রিকগণ অতি প্রফুল্ল হয়। এই পরাজয় তারা এশিয়া মাইনরে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার এক বিরাট সুযোগ দেখতে পায় এবং সম্ভবত বাইজেন্টাইনদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসাবে ইস্তাম্বুলের আধিপত্য লাভেরও স্বপ্নও দেখে। ১৯১৯ সালে ১৫ই মে গ্রিকগণ এশিয়া মাইনরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত স্মারণায় অবতরণ করে।

মুস্তাফা কামালের প্রবল বাধার সম্মুখে ওসমানীয় রাষ্ট্রকে শাসন করার ব্রিটিশ পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এক সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষ করার পর ব্রিটিশ জনগণের একটি অংশ তুরস্কে জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মনোবল হারিয়ে ফেলে। তদুপরি ইংল্যান্ডের পরিচিত ও উদার জনমত এই

www.pathagar.com

আত্মনিয়ন্ত্রণকামী জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সমর্থন করেনি। এই অবস্থায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের একমাত্র করণীয় কাজ হল মুস্তাফা কামালের বিরুদ্ধে গ্রিকদের সাহায্য করা। গ্রিকরাও এই ধরনের সুযাগের সদ্ব্যবহার করতে অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে উঠে।

১৯২০ সালে জুন মাসে গ্রিক সেনাবাহিনী স্মারণা থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে অনেকগুলো যুদ্ধে জয়লাভ করে। ওসমানীয়দের প্রথমদিকের রাজধানী ব্রুসা তারা অধিকার করে। এইসব বিজয় সহজে লাভ করা সম্ভব হয়নি। ১৯২১ সালের মার্চ মাসের পূর্বে তারা আর একটি আক্রমণ পরিচালনা করার সময় পায়নি। পুনরায় তারা সফলতা লাভ করে এবং আঙ্কারার নিকটবর্তী কুতাইয়া দখল করে। গ্রিক অগ্রগতির প্রথম বাধা আসে সাফারিয়ার যুদ্ধে (২৪শে আগস্ট ১৬ই সেপ্টেম্বর) এক বছর পর ১৯২২ সালে আগস্ট মাসে তুর্কিগণ একটি প্রতিআক্রমণ পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। এই আক্রমণে তারা সম্মুখের সবকিছু ভাসিয়ে চলে এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে গ্রিকদের তারা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। উভয় পক্ষেই অত্যাচার চলে। পশ্চাদপসারণের সময় গ্রিকগণ অত্যাচার করে এবং স্মারণা দখলের পর তুর্কিগণও ভীষণ অত্যাচার করে। গ্রিক স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয় এবং মুস্তাফা কামাল ইস্তাম্বুলের দিকে অগ্রসর হন।

ল্যুজ্যানের চুক্তি

জাতীয়তাবাদীদের হাত থেকে প্রণালী রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশকে সাহায্য করতে লয়েড জর্জ তাঁর প্রাক্তন মিত্রদের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে ফ্রান্স ও ইতালি প্রণালী হতে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে। গ্রেট ব্রিটেনের তখন যুদ্ধ করার মতো অবস্থা হয়নি এবং সৌভাগ্যবশত মুস্তাফা কামাল পশ্চিমা শক্তিবর্গকে খোঁচাতে চাননি। ফলে মুদাইনার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তদানুসারে পূর্ব থ্রেস ও আদ্রিয়ানোপল তুরস্ককে ছেড়ে দেয়া হয় এবং মুস্তাফা কামাল প্রণালীর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেন।

ততদিনে সেভার্সের চুক্তি কার্যহীন হয়ে পড়ে। একটি দ্বিতীয় শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য ১৯২২ সালে ল্যুজ্যানে আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিবদমান প্রতিনিধি ছিলেন বৃটিশের লর্ড কার্জন এবং তুরস্কের জেনারেল ইসমত পাশা, পরে ইনুনু নামে সমধিক পরিচিত। দাম্ভিক কার্জন তুর্কি জাতীয়তাবাদীদের ইচ্ছানুসারে কাজ করতে নারাজ, অপরদিকে ইসমত পাশা

www.pathagar.com

অনুভব করেন যে অবস্থা তাঁর অনুকূলে এবং তাই তিনি ধৈর্য ধারণ করেন। প্রধান বিষয়াদি হল তৈলসমৃদ্ধ মৌসুল প্রদেশ যা তুর্কিগণ দাবি করে এবং উপরাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নীতি যা লর্ড কার্জন ছাড়তে রাজি না। শেষ পর্যন্ত সম্মেলন স্থগিত হয় এবং পুনরায় ১৯২৩ সালে জুলাই মাসে আরম্ভ হয়। এই সময় লর্ড কার্জন উপস্থিত ছিলেন না। এই সম্মেলনে ল্যুজ্যানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তুরস্ককে সমগ্র এশিয়া মাইনর, প্রণালী ও পূর্ব থ্রেসের মালিক বলে স্বীকার করা হয়। উপরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বাতিল করা হয়। জাতিপুঞ্জের আওতায় প্রণালী আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয় তবে কমিশনের চেয়ারম্যান একজন তুর্কি হবেন বলে স্বীকার করা হয়। প্রণালী সেনাবাহিনীমুক্ত করা হয় কিন্তু তুরস্ককে ইস্তাম্বুলে ১২০০ সৈন্য রাখার অনুমতি দেয়া হয়। ইস্তাম্বুলের গ্রিক অধিবাসী এবং পশ্চিম থ্রেসের তুর্কিগণ ছাড়া তুর্কি ও গ্রিকগণ লোক বিনিময়ে সম্মত হয়। মৌসুল প্রশ্নটি জাতিপুঞ্জের এখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। চার বছরের ধৈর্য, আত্মদান, কূটনীতি ও যুদ্ধের পর মুস্তাফা কামাল ও তাঁর সহকারিগণ তাঁদের উদ্দেশ্য হাসিল করেন। কামালী তুরস্ক ওসমানীয় সাম্রাজ্যের চেয়ে অনেক ছোট কিন্তু এটি অনেক সন্নিবেশিত ও নিয়ন্ত্রণশীল এবং শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র।

তুর্কি সংস্কারসমূহ

মুস্তাফা কামালের জন্য বিদেশি হস্তক্ষেপ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করাই শেষ নয় বরং একটি নতুন তুরস্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে তুর্কিদের সুযোগ প্রদানের একটি পন্থা মাত্র। এটি জীবনের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী সংস্কারের দ্বারা লাভ করা সম্ভব। মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদীদের প্রবর্তিত অধিকাংশ সংস্কারের কর্মসূচি তাঞ্জিমাত থেকে আরম্ভ করে অনেক তুর্কি বুদ্ধিজীবী সংস্কারক প্রস্তাব করেন ও আলোচনা করেন। মুস্তাফা কামাল যে মৌলিক ভাবধারার প্রবর্তন করেছেন তা নয় বরং তাঁর অবদান হল, তিনি যুক্তিসঙ্গত কতকগুলো ভাবধারা হতে একটি বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণে সক্ষম হয়েছেন। তিনি নব্য ওসমানীয় নন বরং একটি নব্য তুর্কি শিশু এবং প্যান তুর্কির তুলনায় তিনি একজন সাধারণ তুর্কি। তাঁর তুর্কিকরণের ভাবধারা অতুর্কিদের উপর তুর্কি ভাষা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়া নয় বরং তুর্কি ভাবধারা এমনকি অ-তুর্কি অঞ্চল ও লোকজন হতে মুক্তি লাভ করা।

www.pathagar.com

এই ভাবধারার কিছু কিছু প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী জিয়া গোকাল্প (১৮৭৬-১৯২৪) সামঞ্জস্য বিধান করেন। মুস্তাফা কামালসহ অনেক তুর্কি জাতীয়তাবাদী তাঁর রচনায় প্রভাবান্বিত হন। গোকাল্প সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে আলাদা করেন এবং তুর্কি জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে "পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে গেঁথে নেয়ার" প্রস্তাব করেন। তাঁর মতে বিগত সংস্কারকদের গলদ হল পাশ্চাত্যের সভ্যতার সাথে প্রাচ্যের সভ্যতার সমন্বয়ের প্রচেষ্টা। গোকালপের মতানুসারে সভ্যতাসমূহ একটি অপরটির তুলনাহীন বলে এগুলো মিশে যায় না। তুর্কিদের কর্তব্য হল প্রাচ্য সভ্যতা থেকে মুক্ত হওয়া, তুর্কি সংস্কৃতি পুনর্জীবিত করা এবং তাদের সংস্কৃতির মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা গেঁথে ফেলে। গোকাল্পের নিকট তুর্কি সংস্কৃতি হল কিছুটা আদর্শ গ্রাম্যরীতি, ইসলাম এবং কিছুটা আধুনিক ভাবধারার সংমিশ্রণ, তবে এগুলো তুর্কি ভাষার মাধ্যমে। ধর্মীয় ব্যাপারে তুর্কিবাদ হল তুর্কি ভাষায় কোরআন তেলাওয়াত করা, আজান দেয়া ও নামাজপড়া। আইনগত দিক হতে এ দ্বারা আধুনিক আইন প্রবর্তন করা বুঝায় এবং নৈতিকতার দিক থেকে এর দ্বারা বুঝায় তুর্কিদের প্রাচীন যুগের 'গণতন্ত্রে' ফিরে যাওয়া। তুর্কিবাদকে বলা হয় একটি "বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ও সাহিত্যিক আন্দোলন", কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। অবশ্য তুর্কিবাদ "আমাদের মহান মুস্তাফা কামালের...পিপ্লস পার্টিকে" সমর্থন করে, কারণ তিনি "দেশকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন এবং তৎসঙ্গে আমাদের রাষ্ট্র, জাতি ও ভাষাকে প্রকৃত নামে সম্বোধন করেন..." অর্থাৎ তুর্কি নামে। গোকাল্প্কে শেষের দিকে তুর্কি জাতীয়তাবাদের দার্শনিক বলা হয়, যে জাতীয়তাবাদের রূপদানকারী ও উৎসাহদাতা হলেন কামাল আতাতুর্ক।

১৯১৯ সালে আরজেরুম ও সিভাসে সম্মেলন আহ্বানকারী পূর্ব এশিয়া মাইনর প্রতিরক্ষা কমিটি (Committee for the Defence of Eastern Asia Minor) ১৯২৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ক্রমশ পিপল্স পার্টি বা হাক ফিরকাশি (Halk Firkasi)- তে রূপান্তরিত হয়। এই দল ছয় দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে, যাকে 'কামালের ছয় নীতি' বলা হয়। ১৯৩৭ সালে এগুলোকে তুর্কি শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করা হয়। অবশ্য এই ছয় নীতি ঘোষণার পূর্বে ও পরে সমস্ত সংস্কারের উপর ভিত্তি করে প্রবর্তন করা হয়। এসব নীতি হল :

১। প্রজাতন্ত্রবাদ, যা জনগণের সার্বভৌমত্ব সূচনা করে।

২। জাতীয়তাবাদ, যা তুরস্ককে তুর্কিদের বলে দাবি করে এবং অ-তুর্কি জনগণ সংবলিত অঞ্চলসমূহের উপর তাদের আধিপত্য অস্বীকার করে।

www.pathagar.com

৩। জনগণবাদ, যা মিল্লাত প্রথা বাতিল করে এবং আইনের চোখে সমস্ত শ্রেণীর জনগণের সমতা ঘোষণা করে।

৪। রাষ্ট্রবাদ, যা জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের গঠনমূলক হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে।

৫। ধর্মনিরপেক্ষতা, যা ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথক নীতি প্রতিষ্ঠা করে।

৬। সংস্কারবাদ, যা জাতীয় স্বার্থে অপ্রয়োজনীয় ঐতিহ্য ও দৃষ্টান্ত পরিবর্তন ও ছাঁটাই করার একাগ্রতার উপর জোর দেয়।

এখানে উল্লেখ করা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, ভয়াবহ গোলযোগ, ১৯৩৮ সালে আতাতুর্কের মৃত্যু এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সত্ত্বেও উপরের নীতিগুলোর বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। অধিকন্তু এসব নীতি ও অন্যান্য সংস্কারসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রাচ্য সভ্যতার পরিবর্তন করে তদস্থলে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবর্তন করা। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশসমূহ এই উভয় সভ্যতার সমন্বয় সাধন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তুর্কিগণ প্রাচ্যের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নিজদেরকে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করতে চেষ্টা করে।

ইসলাম যেহেতু ধর্মীয় ও জাগতিক কার্যাবলির মধ্যে পার্থক্য করার নীতি প্রত্যখ্যান করে, তাই এটি জীবনের প্রত্যেকক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে এবং সমস্ত কার্যাবলিকে স্বীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু নামাজ বা হজ্ব নয়, বরং সরকার ও বাণিজ্য, শান্তি ও যুদ্ধ, যৌন বিষয়াদি, বিবাহ ও তালাক এবং এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদ, কোরআন ও হাদিস অথবা রীতি ও ঐতিহ্য দ্বারা নিয়মিত এবং প্রায় অবশ্য পালনীয়। ফলে আলোচ্য সংস্কারগুলোর প্রত্যেকটির সাথে ইসলামের সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৯২২ সাল থেকে ১৯৩৮ সালে আতাতুর্কের মৃত্যু পর্যন্ত তুরস্কের সরকার ও জনগণের প্রধান কার্যাবলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অথবা আইন অথবা জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে নতুন আইন সংবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

১। **সুলতানাত বিলুপ্তি :** গ্রিকদের বিরুদ্ধে সামরিক বিজয় এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ১৯২২ সালে ১লা নভেম্বর গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদকে পদচ্যুত করে। আতাতুর্কের অন্তরে সম্ভবত সুলতানের বিলুপ্তি ঘটে প্রথম থেকেই কিন্তু তিনি প্রকাশ করেননি। ১৯১৯ সালে আরজেরুম ও সিভাসের সম্মেলনে প্রতিনিধিগণ সুলতানের জন্য সমবেদনা

www.pathagar.com

জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে তিনি মিত্রপক্ষের হাতে 'বন্দি'। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসেও এমনকি শেখ উল-ইসলাম কর্তৃক জাতীয়তাবাদীদের নিন্দা করার পরও আংকারার হাজী বৈরাম মসজিদে অনুষ্ঠিত ন্যাশন্যাল এসেম্বলি সুলতানের 'পবিত্র' আত্মার জন্য মোনাজাত করে। পঞ্চম মুহাম্মদ জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকলেও তারা জনসাধারণকে 'বন্দি' থেকে সুলতানকে 'উদ্ধার' করতে বলে। এসব মন্তব্য সম্ভবত সুলতানের কপট নিরাপত্তার জন্য প্রকাশ করা হয়নি, যদিও এগুলোর মধ্যে বেশ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। প্রকৃত ব্যাপার হল আংকার জাতীয়তাবাদীদের অনেকেই ওসমানীয় বংশের বিলুপ্তি কামনা করেনি, বরং একটি শাসনতান্ত্রিক সুলতান আশা করেছিল। এমনকি সুলতান ও তাঁর পরিবার একটি ব্রিটিশ জাহাজে করে নির্বাসনে যাবার সময়ও তাঁর চাচাতো ভাই আবদুল মজিদকে খলিফা বলে ন্যাশনাল এসেম্বলি তুরস্ককে একটি প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করে এবং মুস্তাফা কামালকে এর প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে গ্রহণ করে।

২। **খিলাফতের বিলুপ্তি :** সুলতানাতের বিলুপ্তির দ্বারা অনেক তুর্কি দুঃখিত হয়। কিন্তু খিলাফতের বিলুপ্তির পর সমস্ত বিশ্বের সুন্নি মুসলমানগণ মর্মাহত হন। এই সিদ্ধান্তও অতি সাবধানে নেয়া হয়। আতাতুর্ক ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করেন এবং আংকারায় ওলামাদিগকে এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের দ্বারা অভিভূত করেন। এমনকি ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সিভাসে প্যান ইসলামী সম্মেলন আহ্বানও তিনি নীরবে অনুমোদন করেন। গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি সদস্যদের এক-পঞ্চমাংশ ছিল ওলামা। আতাতুর্কের সহচরদের অনেকেই একটি উদার ইসলামী রাষ্ট্র কামনা করেন। একজন প্রখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী হিসাবে আতাতুর্ক সম্ভবত মনে করেন যে রাষ্ট্র ইসলামী হলে উদার হতে পারে না। তবে জনগণের মনে খলিফা আবদুল মজিদ ও সুলতান আবদুল মজিদ অভিন্ন। সর্বদা এটি অভিন্নই ছিল। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানী লোকদের বিবেচনায় সুলতানের ক্ষমতা ছাড়া খিলাফতের পদ বিধিবিরুদ্ধ। প্রশ্নটি এসেম্বলিতে আলোচিত হয় এবং ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ খলিফার পদ বিলোপ করা হয়। আবদুল মজিদ এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ওসমানের পরিবারের সদস্যবৃন্দকে তুরস্ক হতে বহিষ্কার করা হয়। ওসমানীয়গণ ৬২৫ বছর রাজত্ব করেন। খিলাফত প্রতিষ্ঠানটি অন্য কিছু দ্বারা পূরণ করা হয়নি।

www.pathagar.com

৩। ইসলামী আইনের বিলুপ্তি : সুলতানাত ও খিলাফতের বিলুপ্তির দ্বারা সাধারণ তুর্কিদের দৈনন্দিন জীবনে কোনো পরিবর্তন আসেনি। অবশ্য খিলাফতের বিলুপ্তির ফলে এমন কতকগুলো সুদূরপ্রসারী সংস্কারের দ্বার উন্মুক্ত হয় যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে আঘাত করে এবং সমস্ত দেশকে আন্দোলিত করে। এগুলোর মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি হল ইসলামী আইন বা শরিয়তের বিলুপ্তি। ১৯২৬ সালের বিচার-সংক্রান্ত সংস্কার ধর্মীয় বিচারালয়সমূহকে বাদ দিয়ে তদস্থলে সুইস বেসামরিক এবং ইতালীয় দণ্ডবিধি চালু করে। এই বিধির ফলে ওলামাগণ অকেজো হয়ে যান। আইন ব্যবসায়ে তাঁদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। একমাত্র যাঁরা পাশ্চাত্য আইন অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাই ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন। বস্তুত ইসলামী আইন শিক্ষার সমস্ত বিদ্যালয়ই বন্ধ করে দেয়া হয়। ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব বিভাগ এত ছোট হয়ে যায় যে একে শেষ পর্যন্ত সাহিত্য বিভাগের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়। শেখ উল-ইসলামের পদ বিলুপ্ত করা হয় এবং তদস্থলে প্রধানমন্ত্রীর পদের সাথে দুটি সংস্থা সংযুক্ত করা হয়। এই সংস্থাগুলোর কাজ হল সমস্ত ধর্মীয় বিষয়াদি পরিচালনা করা। এদের একটির নাম ধর্মীয় কার্যাবলি সংস্থা (Bureau of Religious Affairs)। এটি ধর্মপ্রচারকদের লাইলেন্স প্রদান করে, ধর্মীয় ভাষণ পরীক্ষা করে এবং শরিয়তের বিভিন্ন দ্বিমতের উপর উপদেশ দান করে। দ্বিতীয়টির নাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্থা (Bureau of Religious Foundation) বা আওকাফ। এটি ধর্মীয় দান সম্পত্তি পরিচালনা করে।

ইসলামী আইনের পরিবর্তে ইউরোপীয় আইন চালু করা হয় এবং সম্ভবত কিছু সংখ্যা নেতা এর দ্বারা বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারাকে ধর্মীয় মনোভাব থেকে পরিবর্তন করে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের দিকে ফিরাবার আশা করেন। সরকারি নীতি হিসাবে ধর্মতত্ত্বকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করা হয়নি বরং জাতির ধর্মীয় স্বভাবকে পরিবর্তন করা হয়। আতাতুর্ক বলেন, "আমরা এখন বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে জীবন ও শক্তির আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি"। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে "বাঁচবার একমাত্র উপকরণ" বলে মনে করি।

৪। ইসলামী পঞ্জিকার বিলুপ্তি : যে বছর শরিয়ত বাদ দেয়া হয় সেই একই বছর (১৯২৬) মুসলিম পঞ্জিকার পরিবর্তে খ্রিস্টান পঞ্জিকা চালু করা হয়। বহু বছর ধরে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো মুসলিম চান্দ্র তারিখ এবং পশ্চিমা সূর্য তারিখ

www.pathagar.com

উভয়ই ব্যবহার করে আসছিল। সমস্ত মুসলিম অনুষ্ঠানাদি ও ধর্মীয় তারিখগুলো মুসলিম পঞ্জিকা অনুসারে সম্পন্ন হত। তবে রাষ্ট্র পাশ্চাত্য পঞ্জিকা প্রবর্তন করে এবং নাগরিকদেরকে সর্বতোভাবে ব্যবহার করতে নির্দেশ প্রদান করে। প্রাচ্য থেকে দূরে সরতে এবং পাশ্চাত্যের ঘনিষ্ঠ হবার পক্ষে এটি আরেকটি পদক্ষেপ। পঞ্জিকা পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজধানীও পরিবর্তন হয়। নতুন মনোভাবের পক্ষে ইস্তাম্বুল অতি ওসমানীয় এবং 'বিদেশি'। আংকারা আনাতোলিয়ায় অবস্থিত, যেখানে 'প্রকৃত' তুর্কিদের বাস। ইস্তাম্বুলে অসংখ্য মসজিদ স্থাপিত হয়নি। তদুপরি আংকারা শহর একটি কৃষিপ্রধান জেলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলে সরকারি কর্মকর্তাগণ ওসমানীয়দের ন্যায় চতুর্দিকে বসবাসকারী তুর্কি চাষিদের অবহেলা করতে পারে না।

৫। **আরবি বর্ণমালার বিলুপ্তি :** প্রাথমিক যুগের দিগ্বিজয়ীদের আশানুরূপ বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমানগণ আরবি ভাষা গ্রহণ না করলেও আরবি বর্ণমালা গ্রহণ করে। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শব্দ না বুঝলেও কোরআন পড়তে পারা। ১৯২৮ সালে তুর্কি এসেম্বলি আরবি বর্ণমালার স্থলে তুর্কি ভাষার প্রয়োজন অনুযায়ী লাতিন বর্ণমালার প্রবর্তন করে। আতাতুর্ক তুর্কি ভাষায় কোরআন অনুবাদ করে নতুন বর্ণমালায় তা প্রকাশ করতে আদেশ দেন। তিনি তুর্কি ভাষায় আজান দিতেও আদেশ দেন এবং জনসাধারণকে তুর্কি ভাষায় নামাজ পড়াবার চেষ্টা করেন। সমস্ত মুসলমানদেরকে তুর্কি ভাষায় নামাজ পড়াতে তিনি পারেননি; কিন্তু বর্ণমালা পরিবর্তনের ফলে নতুন বংশধরগণ আরবি ভাষায় কোরআন পড়তে অক্ষম হয়ে পড়ে। শুধু অত্যন্ত খাঁটি মুসলমানগণ তাদের সন্তানদের আরবি বর্ণমালা শিখাবার কষ্ট স্বীকার করে।

বর্ণমালা পরিবর্তনের পেছনে জনসাধারণকে কোরআন তেলাওয়াত বিমুখ করবার কোনো উদ্দেশ্য আতাতুর্কের ছিল না। তিনি নিরক্ষরতা দূর করতে চান এবং একটি সমন্বয়পূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত তুর্কি ভাষা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তিনি সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে একজন তুর্কির পক্ষে লাতিন বর্ণমালার মাধ্যমেই সহজে লেখাপড়া শেখা সম্ভব। তিনি এবং এসেম্বলির সদস্যবৃন্দ প্রত্যেকে এক একটি কালো বোর্ড নিয়ে গ্রামে ও শহরে যান এবং প্রমাণ করেন যে মাধ্যম হিসাবে লাতিন বর্ণমালাই সহজতর। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই মুদ্রণের কাজ নতুন বর্ণমালা উদ্ভাবনের ফলে বিঘ্নিত হয়, কিন্তু তবুও

www.pathagar.com

এটি কার্যকর হয়। এই প্রথমবারের মতো সর্বত্র তুর্কিগণ বুঝতে পারল একটি শব্দ কিভাবে লিখে উচ্চারণ করতে হয়।

৬। উপাধি বিলুপ্তি : বে, পাশা ইত্যাদি উপাধি প্রচলন জনগণবাদ নীতির বিরোধী, যে নীতি আইনের চোখে সকল মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ওসমানীয় যুগের শেষের দিকে উপাধিসমূহ সর্বোচ্চ ডাক প্রদানকারীর নিকট বিক্রয় করা হত এবং এটি একটি মিথ্যা শ্রেণীবিভেদ সৃষ্টি করত। ১৯৩৪ সালে সমস্ত উপাধি বিলোপ করা হয় এবং তুর্কিদেরকে পারিবারিক নাম গ্রহণ করতে আদেশ দেয়া হয়। কোনো দুই পরিবারকে একই নাম গ্রহণ করতে দেয়া হয় না, তবে যদি প্রথম গ্রহণকারী অনুমতি দেয় তা হলে সরকার কোনো আপত্তি করে না। অনেককে খাঁটি তুর্কি নাম গ্রহণ করবার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়। এই আইনের সাথে সামঞ্জস্য রাখাই মুস্তাফা কামালকে এসেম্বলি আতাতুর্ক বা জাতির পিতা নাম প্রদান করে।

৭। পুরুষদের তুর্কি পোশাক বিলুপ্তি : রাশিয়ার প্রসিদ্ধ পিটারের ন্যায় আতাতুর্ক তাঁর পাশ্চাত্যকরণ কর্মসূচির মধ্যে তুর্কিদেরকে ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করতে বাধ্য করেন। নিঃসন্দেহে উভয় জননেতা মনে করেন যে, পোশাক- পরিচ্ছদ পরিবর্তনের দ্বারা একজন লোকের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হতে পারে। কোনো লোকের ইউরোপীয় টুপি পরিধান তার ইউরোপীয় ভাবধারা প্রকাশের ক্ষেত্রে সহায়কও হতে পারে। তুর্কিদেরকে ফেজ পরিধান করার অনুমতি প্রদান করলে তারা হয়তো ইউরোপীয় কোট ও ট্রাউজার পরিধান করতে আপত্তি করত না কিন্তু আতাতুর্ক হ্যাট (ইউরোপীয় টুপি) পরিধানের উপর জোর দেন। তুর্কিরা হয়তো ভুলে গিয়েছিল যে উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিকতার চিহ্ন হিসাবেই ফেজ প্রবর্তন করা হয়। অবশ্য ফেজ এককভাবে মুসলিম রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু হ্যাট তা নয়। নামাজের সময় মুসলমানগণ মস্তক আবৃত করে। নামাজের একটি ভঙ্গি যেহেতু প্রণত হওয়া এবং কপাল মাটিতে স্পর্শ করা তাই ইউরোপীয় হ্যাট সমস্যা সৃষ্টি করে। কিন্তু তুর্কিরা অভ্যাস পরিবর্তন করে; বিশ্বাসীগণ টুপি ছাড়া নামাজ পড়বার অভ্যাস করে অথবা হ্যাট পেছনের দিকে দিয়ে নামাজ পড়ে।

৮। পর্দা বিলুপ্তি : কোনো বিনম্র মহিলা কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক চলতে চাইলে তার পোশাক হবে মোটামুটি একটি রোমান ক্যাথলিক ব্রহ্মচারিণীর

www.pathagar.com

ন্যায়। যে পর্দা মহিলাদের মুখমণ্ডল আবৃত করে তার মূল কোথায় কেউ জানে না। কিন্তু যদিও অ- কোরআনি তবুও এই রীতি ইসলামের বলে পরিগণিত হয় এবং সর্বত্র পালন করা হয়। নারীদের মুক্তিদানের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই পর্দা উঠিয়ে দেয়া হয় এবং তুর্কি মহিলাগণ জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। ১৯৩৪ সালে তাদেরকে ভোটদানের অধিকার দেয়া হয়। বহুবিবাহ প্রথা বিলোপ করা হয় এবং শীঘ্রই মহিলাদেরকে শিক্ষিকা, উকিল, ডাক্তার, কেরানি এবং এমনকি গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলিয় সদস্য হিসাবেও দেখা যায়।

৯। মক্তব বিলুপ্তি : ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা ওলামাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। প্রত্যেক মসজিদের সাথে সাধারণত একটি বিদ্যালয়ও থাকে। ছোট ছোট শহরে মসজিদগুলো বিদ্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হল কোরআন তেলাওয়াত, নামাজ এবং ইসলামের মূল রীতিনীতিগুলো পালন করবার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া। যারা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে চায় তারা ধর্মীয় শিক্ষা লাভের জন্য বিশেষ ইউরোপীয় ধরনের বিদ্যালয় গড়ে উঠে। কিন্তু সেগুলোর সংখ্যা ছিল খুবই কম। প্রজাতন্ত্রের সময় ওলামাদের নিকট থেকে শিক্ষা ছিনিয়ে নেয়া হয়। সরকার পাশ্চাত্য ধরনের বিদ্যালয় নির্মাণ করে এবং শিক্ষাকে সার্বজনীন ও অবৈতনিক বলে ঘোষণা করে। শিক্ষা অবৈতনিক করা সহজ হয় কিন্তু বিশ্বজনীন করতে কয়েক যুগ সময় প্রয়োজন।

১০। সাপ্তাহিক ছুটি হিসাবে শুক্রবার বিলুপ্তি : এটি ১৯৩৫ সালে করা হয়। এর যুক্তি ধর্মতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক। যুক্তি দেয়া হয় যে, মধ্যপ্রাচ্যের তিনটি প্রধান ধর্ম ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলামের উদ্দেশ্য একই, অর্থাৎ সপ্তাহের একদিন বিশ্রামের জন্য রাখা। ইহুদিদের শনিবার, খ্রিস্টানদের রবিবার এবং মুসলমানদের শুক্রবার নিছক দৈবাৎ মাত্র এবং প্রধান বিষয়ের সাথে এর কোনো মিল নেই। তদুপরি পাশ্চাত্যের সমস্ত জাতিগুলোর বিশ্রামের দিন রবিবার হওয়ায় এবং তুর্কিদেরও ইউরোপীয় হবার আকাঙ্ক্ষা থাকায় তাদের রবিবারকে বিশ্রামের দিন হিসাবে নেয়া উচিত। আরও উল্লেখ করা হয় যে শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসাবে নেয়ার মধ্যে বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতিরও সম্ভাবনা। তুরস্কের অধিকাংশ ব্যবসা ইউরোপের সাথে যারা রবিবারে ব্যবসা বন্ধ রাখে। তুরস্ক যদি শুক্রবারের উপর জোর দেয় তবে সপ্তাহে তাদের তিন দিন ক্ষতি হয়, কারণ

www.pathagar.com

মাঝখানে পড়ে শনিবারও বাদ যায়। তুরস্ক অত দিন ক্ষতির কল্পনা করতে পারে না। সমস্ত মুসলিম দেশের মধ্যে তুরস্কই একমাত্র দেশ যেখানে শুক্রবার জাতীয় ছুটির দিবস নয়।

১১। অ-তুর্কি শব্দের বিলুপ্তি : তুর্কি ভাষা প্রচুরভাবে আরবি ও ফার্সি থেকে শব্দসম্ভার ধার করে। তুর্কি লেখক ও বুদ্ধিজীবিগণ এই দুই ভাষায় যথেষ্ট লেখেন এবং কথা বলেন। জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ বুঝত না কারণ তারা আরবি ও ফার্সি জানত না। জনগণের নিকট পৌঁছবার খাঁটি আগ্রহ নিয়ে এবং একটি বোধগম্য জাতীয়তাবাদের চাপে জাতীয়তাবাদীগণ যতদূর সম্ভব আরবি ও ফার্সি শব্দ বাদ দিয়ে তদস্থলে 'তুর্কি' শব্দ ব্যবহার করে। প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে পত্র-পত্রিকাগুলো এইসব শব্দের তালিকা প্রকাশ করে অনেক ক্ষেত্রে তুর্কি প্রতিশব্দ না থাকলে আরবি ও ফার্সি শব্দের স্থলে ইউরোপীয় শব্দ ব্যবহার করে। একই উৎসাহে তারা অনেক স্থানের নামও পরিবর্তন করে, যথা—ইজমিরের স্থলে স্মারণা এবং ইদির্নের স্থলে আদ্রিয়ানোপল।

গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির মধ্যে যা পরবর্তী বছরগুলোতে তুর্কি প্রজাতন্ত্রকে বিষম সমস্যায় ফেলে তা হল অর্থনীতির ক্ষেত্রে। উপরোল্লিখিত সংস্কারগুলোর কোনোটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ ছিল আরও জনপ্রিয়। ওসমানী যুগে লোক বিনিময় এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আর্মেনীয়দের একচেটিয়া দেশ ত্যাগের ফলে প্রজাতন্ত্রের অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর অভাব দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে উঠে।

১৯৩০ সালের দিকে ফরাসি বিশেষজ্ঞগণ সরকারকে অর্থনীতি জীবনের সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ দেয়। কৃষিকার্য, শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ, বাণিজ্য ও আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাহায্য করবার জন্য নতুন নতুন ব্যাংক খোলা হয়। পরিকল্পনার সমস্ত দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে এবং তামাক, লবণ, মাদকদ্রব্য, দিয়াশলাই, তাস, গোলাবারুদ ইত্যাদিতে সরকারের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়, কারখানাসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ ও ব্যবসায় উৎসাহ প্রদান করা হয়। ক্রমশ রেলপথ জাতীয়করণ করা হয়। এইগুলোর উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ককে অর্থনৈতিক দিক হতে স্বাধীন করা এবং এইগুলো করতে গিয়ে তুর্কিদেরকে অনেক পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ করতে হয়।

www.pathagar.com

ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এই সংস্কারসমূহ সহজে সাধিত হয়নি। আতাতুর্কের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার দ্বারা না হলে এগুলো করা কিছুতেই সম্ভব হত না। ১৯২৪ সালে গৃহীত শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্র ঘোষণা করা হয় এবং সার্বভৌমত্ব জনগণের নিকট বলে উল্লেখ করা হয়। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে আতাতুর্ক ছিলেন এমন এক স্বেচ্ছাচারী যাঁর কথাই ছিল আইন। তাঁর কোনো কোনো সহকর্মী তাঁর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। আবার কেউ কেউ তাঁর কতিপয় সংস্কারের উপর আপত্তি উত্থাপন করেন। ১৯২৬ সালে ব্যাপক ধরপাকড়ে তাদের কেউ কেউ প্রাণ হারান এবং গ্রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নায়ক জেনারেল কাইয়াজিম বাকের এবং ঔপন্যাসিক ও সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিণী সম্ভবত প্রথম তুর্কি নারী হালিদা আদিব প্রমুখ নির্বাসিত হন। ১৯২৭ সালে সাধারণ নির্বাচনে আতাতুর্কের পিপলস্ পার্টি জয়লাভ করলে কতকটা উৎসাহিত হয়ে এবং কতটা আত্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তিনি এক বক্তৃতা দান করেন, যা ছয়দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। "১৯১৯ সালে ১৯শে মে আমি সামসুনে অবতরণ করি" বলে তিনি আরম্ভ করেন এবং শেষ করেন এই বলে "আমাদের জাতি মরিতে পারে না, কখনও যদি এইরূপ হয় তবে বিশ্ব এই শবদেহ বহন করিতে ব্যর্থ হইবে।"

আতাতুর্ক একজন উপকারী স্বেচ্ছাচারী, যিনি কখনও দেশ ও জাতি থেকে পৃথক নন। তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণদাতার ন্যায়। ১৯৩০ সালে তিনি তাঁর এক বন্ধুকে একটি বিরোধীদল গঠন করতে বলেন, কিন্তু তাঁর সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পিপলস্ পার্টি একমাত্র দল হিসাবে বিরাজ করে, তবে ১৯৩৫ সালে ১৬ জন স্বাধীন সদস্য নির্বাচিত হন। ক্ষমতা প্রয়োগ ছাড়া সংস্কার সাধন ব্যর্থ হত। আতাতুর্কের স্বেচ্ছাচারিতা যে কার্যকর তার প্রমাণ এই যে ১৯২৬ সালে স্বাধীন মতামতের সুযোগ দেয়া হলে অধিকাংশ সংস্কার বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য ১৯৪৭ সালের অবাধ নির্বাচনের পর অধিকাংশ সংস্কার বহাল রাখা হয়।

বৈদেশিক নীতিতে তুরস্ক সাবধানী ও শান্তিপূর্ণ ভাবধারা গ্রহণ করে। রাশিয়ার সাথে এর সম্পর্ক সঠিক থাকে, তবে কমিউনিজমের বিষয় নিয়ে তারা পৃথক হয়ে যায়। আতাতুর্ক পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ থাকেন। মৌসুল প্রশ্নে তাঁকে আপস করতে হয়। মৌসুলের উপর

www.pathagar.com

আধিপত্য ছেড়ে দেবার বিনিময়ে তুরস্ককে প্রাপ্যাংশের শতকরা দশভাগ প্রদান করা হয়। ভূমধ্যসাগরের আলেকজান্দ্রাতা (ইসকান্দরুম) বন্দরের ব্যাপারে ফরাসিদের সাথে মত বিনিময়ে তিনি সফল হন; ফরাসিগণ সিরিয়ার বিরোধিতা সত্ত্বেও এই বন্দর তুরস্ককে ছেড়ে দেয়। প্রণালীর প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত তুরস্কের সন্তুষ্টিমাফিক মীমাংসা করা হয়। ১৯৩৬ সালের ২০শে জুলাই মন্টু সম্মেলন (Montrue Convention) ডাকা হয় এবং এতে সোভিয়েত ইউনিয়নও অংশগ্রহণ করে। হিটলারি ভূত এবং তার সাথে মুসোলিনির ক্রমবর্ধমান বন্ধুত্বের ফলে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স তুরস্কের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ হয়। শান্তির সময় এবং যে যুদ্ধে তুরস্ক নিরপেক্ষ সে সময় প্রণালীতে সবার জন্য অবাধগতি। তুরস্ক যুদ্ধে জড়িত হলে সে সময় শুধু তুরস্কের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলোর জাহাজের জন্য প্রণালীর গতি অবাধ। এগুলোর চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যান্য আইনগুলো হল আন্তর্জাতিক প্রণালী কমিশন (International Straits Commission) বিলোপ, যদ্বারা তুরস্কের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রণালী সামরিকীকরণের অনুমতি প্রদান করা হয়।

আতাতুর্ক ১৯৩৮ সালে ১০ই নভেম্বর ক্যান্সার রোগে মারা যান। তাঁর মৃত্যু হয় অপরিণত বয়সে এবং তা হয় অতি পরিশ্রম, অতিমাত্রায় মদ্য পান এবং উশৃঙ্খল জীবন যাপনের ফলে। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর তিনি একটি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী রাষ্ট্র সৃষ্টি করেন। কৃতজ্ঞ জাতি তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে। ৫০০ বছরের মধ্যে প্রায় প্রথমবার কোনো রক্তপাত ছাড়া শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী একজন উত্তরাধিকারী ইসমত ইনুনুর নিকট তুরস্কের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

মিসর- স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার কয়েক মাস পর ১৯১৪ সালের ১৮ই ডিসেম্বর গ্রেট ব্রিটেন প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, মিসর গ্রেট ব্রিটেনের আশ্রিত রাজ্য এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্যের কোনো আধিপত্য এর উপর নেই—যুগ যুগ ধরে এটি বাস্তব হিসাবেই প্রতীয়মান হচ্ছিল। অবশ্য মিসরের উপর ওসমানীয়দের আধিপত্য ছিল খুবই মামুলি। গ্রেট ব্রিটেনের সৌভাগ্যবশত ব্রিটিশবিরোধী খেদিভ আব্বাস হিলমী তখন ইস্তাম্বুলে ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে পদচ্যুত করা হয় এবং তাঁর চাচা হোসাইন কামিলকে তাঁর স্থলে বেছে নেয়া হয়। নতুন শাসককে আর খেদিভ বলা হয় না, বরং 'সুলতান' পদে উন্নীত করা হয়।

মিসরে তাদের কার্যাবলির উপর ব্রিটিশ গর্ব করে। দুর্যোগপূর্ণ একটি দেশে তারা শান্তি স্থাপন করে এবং দেউলিয়া একটি জাতিকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করে। মিসরীয়দেরকে তারা একটি সুযোগ্য শাসনব্যবস্থাও প্রদান করে। কিন্তু সেখানে ব্যর্থতাও বিদ্যমান এবং নব্য মিসরীয়গণ শুধু সেইগুলোই দেখে। সুযোগ্য শাসনব্যবস্থার সাথে খাপ খাবার জন্য মূলত কোনো সামাজিক পরিবর্তনই আনয়ন করা হয়নি। তুর্কি-মিসরীয়গণ তখনও শাসক শ্রেণী। অধিকাংশ জমির মালিক তারা এবং তাদের আত্মীয়স্বজনরাই। ফালাহীন বা কৃষকগণ তখনও কুঁড়েঘরে বাস করে, কর প্রদান করে এবং বাধ্যতামূলক শ্রম প্রদান করে। ওলামাদের প্রচারকৃত ধর্মীয় আইনে গরিবদের জীবিকার সংগ্রাম অথবা ধনীদের অলস জীবন সম্পর্কে কোনো উল্লেখই নেই বলে মনে হয়। ব্যাংক, ব্যবসা, জাহাজ চলাচল এবং অর্থনীতি বিদেশি ব্রিটিশ, ফরাসি, ইটালীয়, গ্রিক, আর্মেনীয় ও অন্যান্যদের নিয়ন্ত্রণে, যারা তাদের বিদেশি পাসপোর্টের দ্বারা উপভূম্যাধিকারী সুবিধা ভোগ করে এবং কোনো অনিশ্চয়তা ব্যতিরেকে সমস্ত সুযোগ লাভ করে। বস্তুত ব্রিটিশ সরকার সেখানে ছিল শুধু তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য।

www.pathagar.com

মিসর তুলনামূলকভাবে উন্নতশীল ও সুশৃংখল হয়ে উঠে এবং যতই এটি অনুরূপ হয় ততই ব্রিটিশ তাদের ক্ষমতা ত্যাগ করতে নিরুৎসাহ হয়। সুখ্যাত ব্রিটিশ কমিশনার লর্ড ক্রোমার ও তাঁর উত্তরাধিকারিগণ মিসরীয়দের ব্যাপারে কৃপামূলক মনোভাব পোষণ করেন এবং বলেন যে, তাদের (মিসরীয়দের) মধ্যে দায়িত্ব এড়াবার ভাব বিদ্যমান এবং মিসরের প্রশাসনের ব্যাপারে তাদের উপর আস্থা রাখা যায় না। ক্রোমারের সময় শাসনব্যবস্থা সুদক্ষ পিতৃসুলভ এবং ন্যায়পরায়ণ থাকে। তবে তাঁর উত্তরাধিকারী গর্স্ট্ ও কিচেনার তাঁদের যোগ্যতা বা ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা মিসরীয়দেরকে মোহিত করতে ব্যর্থ হন। ক্রোমারের অধীনে মিসরীয়দের দ্বারা পূরণকৃত পদসমূহ আরও অধিক বেতন দিয়ে ইংরেজগণ দ্বারা পূরণ করা হয়। বিদেশি অনুমতিপত্র শিকারি মুনাফাখোর ও সুদখোরে দেশ ছেয়ে যায় এবং তারা উপভূম্যাধিকারী সুযোগের অপব্যবহার করে। প্যান ইসলামি ও ওলামাগণ সাধারণভাবে ব্রিটিশ-খ্রিস্টান শাসনে আক্ষেপ করে। শিক্ষিত প্রশাসক, অধ্যাপক, আইনজ্ঞ ও সাংবাদিকগণ ইউরোপীয় উদারনৈতিক লেখক ও রাজনীতিবিদদের গ্রন্থসমূহ থেকে পাতার পর পাতা নিয়ে এগুলো ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ লেখকদের উদ্ধৃতি দেয়া মিসরীয় জাতীয়তাবাদের একটি প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।

রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন প্রায় সমস্ত মিসরীয় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ব্রিটিশদেরকে বহিষ্কার করবার সম্মিলিত উদ্দেশ্য ছাড়া তাদের আর কোনো কাজ ছিল না। তারা হল সাংবাদিক, ছোট ছোট জমিদার, যুবক, ইংরেজদের অধীনে কাজ করতে অনিচ্ছুক বয়োজ্যেষ্ঠ বুর্জুয়াগণ, প্যান-ইসলামিবাদী, হতাশ রাজনীতিবিদ এবং স্বাধীন মিসর প্রত্যাশী জাতীয়তাবাদীগণ। খেদিভ আব্বাস হিলমী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কাজ করেন। এক নব্যপুরুষের আগমন ঘটে, যারা ১৮৮২ সালে ব্রিটিশ অধিকারের পূর্ববর্তী মিসরের অবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং তাই ব্রিটিশদের কার্যকলাপের কোনো প্রশংসাই তারা করে না। তদুপরি পুরাতন পুরুষের ন্যায় সহিষ্ণুতা না থাকায় তারা আরও আক্রমণাত্মক মনোভাব গ্রহণ করে।

যা হোক, যুদ্ধের বছরগুলো মোটামুটি শান্তিতেই কাটে। মিসরে হাজার হাজার ব্রিটিশ, অস্ট্রেলীয়, নিউজিল্যান্ড ও ভারতীয় সৈন্য অবস্থান করে। সামরিক

www.pathagar.com

আইন জারি করা হয় এবং সেনাবাহিনী সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। সমগ্র যুদ্ধের সময় রুশদী পাশা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন। মিসরীয়গণ কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের পক্ষে থাকলেও তারা তা প্রদর্শন করে নাই। এতগুলো বিদেশি সৈন্যের অবস্থানের ফলে জাতীয়তাবাদীগণ মর্মাহত হলেও তারা ব্রিটিশ সমর প্রস্তুতিকে নস্যাৎ করতে চেষ্টা করেনি। সামরিক খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের ফলে ভীষণ অভাব ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কিন্তু কোনো দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়নি। ফ্রান্সে পশ্চিম রণাঙ্গনে ব্রিটিশগণ বাধ্যতামূলক শ্রমের ব্যবস্থা করে, কিন্তু কেউই প্রকাশ্যে কোনো আপত্তি উত্থাপন করেনি, এমনকি দৈনিক বাধ্যতামূলক শ্রম প্রদানকারী কৃষকগণও কোনো আপত্তি করেনি। মিসরের সুলতান হোসাইন কামিল ১৯১৭ সালে মারা যান এবং তাঁর ভ্রাতা ফুয়াদ উত্তরাধিকারী হন।

ওয়াফ্দ্ পার্টি

যুদ্ধের পর যে অভ্যুত্থানের আরম্ভ হয় তাতে ব্রিটিশদের শান্তিপূর্ণ নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। তবে এই আঘাত ও আশ্চর্যের বিনিময়ে তারা তাদের হস্ত সুদৃঢ় করে এবং মিসরীয়দের সমস্ত দাবির প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। মিসরীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্থাপিত হয়, কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের আগুন প্রজ্বলিত হয় উডরু উইলসনের চৌদ্দ দফা, বিশেষত তাঁর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আদর্শের দ্বারা। প্রেসিডেন্ট উইলসনের উদার দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের নেতৃস্থানীয় জাতীয়তাবাদীদের মনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কম নয়। তাদের সকলেই প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চায় এবং আশা করে যে উইলসনের উপস্থিতি ও প্রভাবের দ্বারা তারা তাদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ এবং স্বীকৃতি লাভ করবে।

মিসরীয়গণও যেতে চায় এবং যে ব্যক্তি তখন নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তিনি হলেন সা'দ জগলুল পাশা (১৮৫৭-১৯২৭)। তিনি আবদুহুর বন্ধু এবং আফগানীর এককালের ছাত্র। বিচারক হিসাবে তিনি আধুনিক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী মিসরের আইন সংস্কারে তৎপর হন। ১৯০৬ সালে ক্রোমারের অধীনে তাঁকে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। ক্রোমারের সাথে তিনি বন্ধু ভাবাপন্ন ছিলেন। সম্ভবত গর্স্ট ও কিচেনারকে অপছন্দ করতেন বলে তিনি মন্ত্রীপদে ইস্তফা দেন এবং মিসরীয় পরিষদে ডেপুটি হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৯১৮ সালের নভেম্বর

www.pathagar.com

মাসে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে একটি প্রতিনিধিদল (ওয়াফ্দ্) নিয়ে যাবার জন্য তিনি ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি অনুমতি পাননি। অতঃপর তিনি লন্ডনে গিয়ে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের নিকট মিসরের অভিযোগ পেশ করার অনুমতি চান, কিন্তু তাও অস্বীকার করা হয়। ব্রিটিশগণ যুক্তি প্রদর্শন করে যে মিসরীয়দের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য জগলুল 'নির্বাচিত' হননি। তা সত্য কথা, কিন্তু তারা বুঝতে পারল না যে, তিনি অধিকাংশ জাতীয়তাবাদীদের মনের ভাবই ব্যক্ত করছেন। প্যারিস যাবার অনুমতি চাইবার জন্য জগলুল প্রধানমন্ত্রী রুশদী পাশাকে সম্মত করান। রুশদীও প্রত্যাখ্যাত হন এবং প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা প্রদান করেন। ইতিমধ্যে ১৯১৯ সালের প্রথম মাসগুলোতে জগলুল ওয়াফ্দ্ পার্টি গঠন করেন এবং এ দলের সহায়তায় তিনি সুলতানকে একজন নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করার ব্যাপারে বাধা প্রদান করেন। প্রত্যুত্তরে ব্রিটিশ জগলুল ও তার কয়েকজন সহকর্মীকে কারারুদ্ধ করেন। জগলুলকে মাল্টায় নির্বাসিত করা হয়। ততদিনে প্রতিনিধি দল (ওয়াফ্দ্) প্রেরণ করা একটি প্রসিদ্ধ দাবিতে পরিণত হয় এবং হাজার হাজার লোক ওয়াফ্দ্ পার্টিতে যোগদান করে। জগলুলের নির্বাসন এক বিরাট বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। দাঙ্গা, সাধারণ ধর্মঘট, বিদেশিদের ঘর জ্বালানো এবং ব্রিটিশ সৈন্যদের হত্যা করা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেশ কিছুদিন পর যেসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা মিসরকে প্রকম্পিত করে তন্মধ্যে এটি প্রথম।

প্রত্যুত্তরে ব্রিটিশগণ তাদের কব্জা আরও মজবুত করে। কিন্তু সাধারণ ধর্মঘটের নেতৃবৃন্দ 'প্রতিনিধিদলের' উপর জোর দেন। শৃংখলা রক্ষা করার জন্য জেরুজালেম-বিজয়ী লর্ড এল্লেনবীকে মিসরে পাঠানো হয়। শেষ পর্যন্ত যাবার অনুমতি দেয়া ছাড়া বৃটিশের গত্যন্তর রইল না। প্যারিসে অথবা লন্ডনে তিনি তেমন কোনো সফলতা লাভ করতে পারেননি। কিন্তু দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং বিজয়ীবেশে ফিরে আসেন।

আংশিক স্বাধীনতা

ব্রিটিশগণ শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে একটা সমঝোতার প্রয়োজন। ১৯১৯ সালে ডিসেম্বর মাসে এই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী গোলযোগের যুগে নিজেদের অভ্যাস মতো অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট পেশ করার জন্য

www.pathagar.com

তারা একটি কমিশন প্রেরণ করে। অপরদিকে ওয়াফ্‌দ্‌ দল, এমন এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে যাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ফিলিস্তিনে অধিকাংশ আরব নেতৃবৃন্দ অনুসরণ করে—তারা কমিশন বর্জন করে।

কমিশনের প্রধান লর্ড মিলনার ১৯২০ সালের মার্চ মাসে তাঁর অনুসন্ধান কার্য শেষ করেন এবং তাঁর সুপারিশ পেশ করেন। একটি 'স্বাধীন' মিসরের সাথে নিম্নলিখিত শর্তানুযায়ী আশ্রিত (Mandate) অবস্থা ত্যাগ করে একটি সন্ধির চুক্তি স্বাক্ষর করবার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে বলা হয়। মিসরে একটি শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। শর্তানুযায়ী মিসরের প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক 'পরিচালনা' এবং সুয়েজ খাল নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব বৃটিশের হাতে থাকবে। জগলুল কর্তৃক শর্তগুলো প্রত্যাখ্যান করবার ফলে আপস ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশগণ জগলুলকে বাদ দিয়ে একটি সমঝোতায় আসতে চেষ্টা করে কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়। ১৯২১ সালে আরও দাঙ্গা ও রক্তপাত হয়। জগলুল ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে পুনরায় নির্বাসিত করা হয়। এবার তাদেরক নির্বাসিত করা হয় এডেনে ১৯২২ সালে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ একতরফাভাবে আশ্রিত অবস্থা নাকচ করে মিসরের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সুলতান ফুয়াদ রাজা বা মালিক উপাধি গ্রহণ করেন। (সুলতানের অর্থও রাজা, কিন্তু সম্ভবত ওসমানীয়দের সাথে সাদৃশ্য থাকবার ফলে এটি বাদ দেয়া হয়)। এভাবে আরবিভাষী জনগণের মধ্যে সর্বপ্রথম মিসর অন্ততপক্ষে আংশিক স্বাধীনতা লাভ করে। নতুন ব্যবস্থায় তেমন কিছু পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। চারটি বিষয় যেগুলোকে 'সম্পূর্ণভাবে ব্রিটেনের মহিমান্বিত সরকারের এখতিয়ারে রাখা হয়' সেগুলো হল—

১। মিসরের রাজকীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তা,

২। মিসরের প্রতিরক্ষা,

৩। বৈদেশিক স্বার্থ ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা,

৪। সুদানের নিয়ন্ত্রণ

১৯২৩ সালে রাজা ফুয়াদ একটি শাসনতন্ত্র জারি করেন। এতে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের ব্যবস্থা করা হয় এবং রাজার হাতে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে পারেন, মন্ত্রিবর্গ নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারেন অথবা ইচ্ছা করলে আদেশ বলে শাসন করতে পারেন। তিনি প্রতিষেধক ক্ষমতার মালিক হন, যাকে শুধু দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা বাতিল করা যায়। তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন এবং সিনেটের

www.pathagar.com

দুই-পঞ্চমাংশ সদস্য নিযুক্ত করতে পারেন। শাসনতন্ত্র ঘোষণা করবার সঙ্গে সঙ্গে একটি সাধারণ নির্বাচনও ঘোষণা করা হয়। সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে সাদ জগলুল মিসরে ফিরে আসে। ১৯২৪ সালে জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ওয়াফদ্ পার্টি বিপুল ভোট লাভ করে। ১৯৯ আসনের প্রতিকূলে মাত্র ২৭টি আসন বিপক্ষে যায়। জগলুল প্রধানমন্ত্রী হন এবং সঙ্গে সঙ্গে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা পরিবর্তনের জন্য চাপ দেন। তিনি মিসর ও সুদানের সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্ব দাবি করেন।

ওয়াফ্দ্ পার্টি ১৯৫২ পর্যন্ত মিসরের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করে। এটি ব্যাপক জনসমর্থনের অধিকারী ও একটি জনপ্রিয় দল। ওয়াফদ্ শুধু আপসই করেনি, বরং ধর্মঘট, দাঙ্গা এমনকি সন্ত্রাসবাদী কার্যাবলিও পরিচালনা করে। ১৯৫২ সালের পূর্বে অধিকাংশ সময় এটি পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে। প্রধানমন্ত্রীর পদ, যে পদে নিযুক্তি রাজার একচেটিয়া অধিকার, সাধারণত ওয়াফদ্ বিরোধী ব্যক্তির হাতেই থাকে। ফলে মন্ত্রিপরিষদ ও পার্লামেন্ট সর্বদা ঝগড়াতেই লিপ্ত থাকে এবং এতে জয়লাভ করে সাধারণত রাজা অথবা ব্রিটিশ কিংবা উভয়ে। মিসরে অন্যান্য রাজনৈতিক দলও ছিল। একটি হল মুহম্মদ মাহমুদ পাশা কর্তৃক ১৯২২ সালে গঠিত লিবারেল কনসটিটিউশনাল পার্টি (Liberal Constitutional Party)। এদল সাধারণ অভিজাতবর্গ ও জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। আরেকটি হল ইয়াহ্ইয়া ইব্রাহীম পাশা কর্তৃক ১৯২৫ সালে গঠিত ইউনিয়ন (ইত্তেহাদ) পার্টি। এ দল প্রতিনিধিত্ব করে। তৃতীয় দল হল ইসমাইল সিদ্‌কী কর্তৃক ১৯৩০ সালে গঠিত পিপলস (শার্ব) পার্টি। এ দল প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিত্বের দ্বারা গঠিত এবং তেমন কোন জনসমর্থন লাভ করেনি। ১৯৩২ সালে ওয়াফদ্ পার্টি দুইভাগ হয়ে যায় এবং বিদ্রোহীগণ আহমেদ মাহের ও নুক্রাশী পাশার নেতৃত্বে সা'দী ওয়াফদ পার্টি গঠন করে। এই সমস্ত দল ওয়াফদ্ পার্টির চাইতে অধিক সংযত। তারা ব্রিটিশ অথবা রাজা অথবা উভয়ের সাথে সহযোগিতা করতে রাজি থাকে।

জাতীয়তাবাদীগণ মোটামুটিভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা উপেক্ষা করে কারণ তারা ব্রিটিশদেরকে বহিষ্কৃত করবার প্রচেষ্টায় তাদের সমস্ত ক্ষমতা ব্যয় করে। বস্তুত তারা সমস্ত অপবাদ ব্রিটিশদের উপর আরোপ করে এবং বিশ্বাস করে যে ব্রিটিশগণ মিসরে এক দরজা দিয়ে বের হলে অপর দরজা দিয়ে উন্নতি ও প্রগতি প্রবেশ করবে। অপরদিকে ব্রিটেন তখনও ভারতবর্ষের রাস্তা

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ করতে আগ্রহী এবং মিসরে বিদেশি অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যস্ত। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয়তাসহ 'আইন ও শৃংখলা' রক্ষা করা ছাড়া ব্রিটিশগণ তেমন কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। জনসাধারণ ও জমিদারের উপর কর বোঝা ছিল তখনও প্রকাণ্ড। মিসরের লম্বা আঁশের তুলা যেহেতু পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ তাই ব্রিটিশ টেক্সটাইল কারখানাগুলোর চাহিদা পূরণ করার জন্য আরও অধিক জমি তুলার চাষে চলে যায়। ১৯১৭ থেকে ১৯৩৭ এই ২০ বছর মিসরের জনসংখ্যা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু চাষোপযোগী জমি পূর্বের ন্যায় রয়ে যায়, ফলে জীবিকার মান নিম্নস্তরে নামিয়া যায়।

১৯২৪ সালে আরও দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং একই বছর ১৯শে নভেম্বর মিসরীয় সেনাবাহিনীর ব্রিটিশ প্রধান সেনাপতি এবং সুদানের গভর্নর জেনারেল লী স্ট্যাক্ আততায়ীর হাতে নিহত হন। ব্রিটিশগণ এই বিদ্রোহের কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি, ক্ষমা প্রার্থনা ও ১৫,০০,০০০ ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করে। তদুপরি তারা রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে এবং সুদান থেকে মিসরীয় বাহিনী অপসারণের আদেশ প্রদান করে। তারা আরও দাবি করে যে অর্থনীতি, বিচার ও স্বরাষ্ট্র বিভাগে ব্রিটিশ উপদেষ্টা রাখতে হবে। সব চাইতে মারাত্মক দাবি সম্ভবত সুদানের জাজিরায় চাষাবাদের এলাকা সম্প্রসারণ করবার হুমকি। এই কাজ নীলনদের পানি জলসেচের জন্য ফিরিয়ে দেবে এবং ফলে মিসরের পানির প্রবাহ কমে যাবে। নীলনদ ছাড়া মিসর হতে পারে না। নীলনদের প্রবাহ যেহেতু সুদান থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাই সুদানের সরকারের সাথে সদ্ভাব সর্বদাই মিসরের কাম্য।

ইঙ্গ-মিসরীয় সুদান

১৮৮১ সালে জনৈক মুহাম্মদ আহমদ নিজেকে মুসলমানদের মুক্তিদাতা মেহ্দী (মসিয়াহ) বলে দাবি করেন। এর দ্বারা প্রসিদ্ধ মেহ্দী আন্দোলন আরম্ভ হয়, যা সুদানকে কয়েক বছর ধরে প্রকম্পিত করে। আরাবি বিদ্রোহের ফলে মিসরের অবস্থা তখন খুবই জটিল এবং তাই মেহ্দী নিয়ে কেউ (ব্রিটিশ বা মিসরীয়) চিন্তা করার সুযোগ পায়নি। ফলে তাঁর ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে এবং খার্তুমে অবস্থিত ইঙ্গ-মিসরীয় সেনাবাহিনী বিপদগ্রস্ত হয়। ১৮৮৪ সালে লর্ড ক্রোমার এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল জর্ডনকে প্রেরণ করেন,

www.pathagar.com

কিন্তু তিনি এই কাজে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন এবং ফলে মেহ্দীর সমগ্র সেনাবাহিনী কর্তৃক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। একযুগেরও অধিককাল পর্যন্ত মেহ্দী সমগ্র সুদানের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেন। ১৮৯৬ সালে লর্ড কিচেনার মেহ্দীর রাজধানী দঙ্গোলা দখল করেন এবং দুই বছর পর ওমদারমানের যুদ্ধে মেহদীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এর ফলে ব্রিটেন ও মিসরের মধ্যে একটি চুক্তি হয় যাকে সাধারণত "কনডোমিনিয়াম" (যৌথ শাসন) বলা হয়। ১৮৯৯ সালের ১৯শে জানুয়ারিতে স্বাক্ষরিত এই দলিলের দ্বারা সুদান বৃটিশের পছন্দমত কিন্তু খেদিভ কর্তৃক নিযুক্ত একজন গভর্নর জেনারেল কর্তৃক শাসিত হয়। সুদানের আইন প্রণয়ন করেন গভর্নর জেনারেল এবং মিসরের আইন সেখানে অচল। মিসরীয় পণ্যদ্রব্য সেখানে যায় আমদানি কর ব্যতিরেকে, অথচ ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি ছাড়া সুদানে কেউ কোনো রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করতে পারে না। ক্রীতদাস প্রথা রহিত করা হয় এবং ১৮৯০ সালে ব্রাসেলস্ অ্যাক্টের দ্বারা আমদানি, বিক্রয় এবং গোলাবারুদ ও মদ্য প্রস্তুত নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এরপর থেকে এই অঞ্চল "ইঙ্গ-মিসরীয় সুদান" বলা হয়, কিন্তু সুদানে মিসরের প্রভাব স্বীয় ভূখণ্ডের চাইতেও ক্ষীণ।

কনডোমিনিয়াম (যৌথ শাসন) যেহেতু ইতোমধ্যে সুদানের উপর মিসরের আইনানুগ স্বার্থ স্বীকার করেছে সেহেতু সুদান থেকে মিসরীয় সৈন্য প্রত্যাহার সংক্রান্ত ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ দাবিকে জগলুল অত্যাচারমূলক বলে বিবেচনা করেন। আবার নীলনদের পানির গতি পরিবর্তন করে জজিরায় জলসেচের হুমকিকে অনেক মিসরীয় নেতা যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর বলে অভিহিত করেন। এই চরমপত্রের প্রতিবাদে জগলুল পদত্যাগ করেন। এবং জিওয়ার পাশা মন্ত্রী হন। তিনি এই চরমপত্র গ্রহণ করেন, অবশ্য ব্রিটিশ জজিরায় জলসেচ ব্যতীত চরমপত্রের বাকি সমস্ত শর্তগুলো আদায় করে নেয়। ১৯২৪ সালে দাঙ্গার ফলে মিসরীয় কার্যাবলিতে ব্রিটিশগণ অপেক্ষাকৃত প্রবল আধিপত্য লাভ করে এবং মিসর সুদানের ব্যাপারে সকল প্রভাব হারিয়ে ফেলে।

১৯২৭ সালে সা'দ জগলুল পরলোক গমন করেন। তাঁরপর ওয়াফদ্ পার্টির নেতৃত্ব নাহাস পাশার উপর অর্পিত হয়। অবশ্য নেতৃত্ব পরিবর্তনের ফলে ব্রিটিশ ও ওয়াফদ্ পার্টির মধ্যে মতবিনিময় সহজতর হয়নি। মূল সমস্যাসমূহ থেকে যায়। ব্রিটিশ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি চায় যার দ্বারা ব্রিটিশ আধিপত্য বজায় থাকে, অথচ ওয়াফদ্ চায় মিসর হতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ এবং সুদানের উপর কর্তৃত্ব।

www.pathagar.com

১৯৩০ সালে আলোচনা ভেঙে যায়। পাঁচ বছর পূর্বে এই আলোচনা পুনরায় শুরু হয়নি। জগলুলের মৃত্যু, অন্যান্য দলের অস্তিত্ব এবং রাজার প্রকাশ্য বৈরীভাবের ফলে ওয়াফ্দ্ পার্টি দুর্বল হয়ে যায়। এই দুর্বল অবস্থা সত্ত্বেও ১৯২৯ সালে ওয়াফদ্ পুনরায় নির্বাচনে জয়লাভ করে। রাজা ফুয়াদ ওয়াফদ্ পার্টির একজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করার পরিবর্তে পার্লামেন্ট বন্ধ করে দেন, পিপলস্ পার্টির নেতা সিদকী পাশাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন এবং ১৯২০ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করেন। ১৯৩০ সালে ফুয়াদ কর্তৃক জারিকৃত নতুন শাসনতন্ত্রে তিনি নিজেকে আরও অধিক ক্ষমতা দান করেন এবং একটি দুইস্তরের পরোক্ষ ভোট প্রদান ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই সমস্ত ব্যবস্থার দ্বারা তিনি এবং সিদকী পাশা কোনো কার্যকর প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত মিসর শাসন করেন।

মিসরের স্বাধীনতা

১৯৩৪ সালে ইথিওপিয়ার ইতালীয় অভিযানের ফলে ইঙ্গ-মিসরীয় সম্পর্কের ধারা পরিবর্তিত হয়। ব্রিটিশগণ সুয়েজের নিরাপত্তার ব্যাপারে আরও বিব্রত বোধ করে, কারণ তারা মিসরে ইতালীয়দের ব্রিটিশবিরোধী প্রচারণায় শংকিত হয়। মোটের উপর ব্রিটিশগণ মিসরীয়দের সাথে একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তির ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠে। এক বছর পূর্বে শক্ত মানব সিদকী পাশা স্বাস্থ্যহীনতার দরুন পদত্যাগ করেন এবং অন্যান্য দলসহ ওয়াফদ্ পার্টি ১৯৩০ সালের শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে তাদের অসন্তোষ আর গোপন রাখেনি। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশদের পরামর্শ অনুযায়ী রাজা ফুয়াদ ১৯৩০ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করেন, কিন্তু ব্রিটিশ পরামর্শের প্রতিকূলে তিনি ১৯২৩ সালের শাসনতন্ত্র পুনরায় চালু করেন। তদনুসারে ১৯৩৫ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ওয়াফদ্ পার্টি পুনরায় জয়লাভ করে। ফুয়াদ ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে পরলোকগমন করেন এবং তদস্থলে তাঁর ১৬ বছর বয়স্ক পুত্র ফারুককে রাজা বলে ঘোষণা করা হয়। মিসরীয়গণ ফুয়াদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এবং ফারুককে উৎসাহের সাথে গ্রহণ করে। কিন্তু মিসরীয় দৃশ্যের পর্যবেক্ষকগণের চোখে এটি একটি পরস্পরবিরোধী ঘটনা বলে প্রতীয়মান হয়। একদিকে মিসরীয়গণ রাজতন্ত্র ও রাজার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, অপরদিকে তারা পরপর প্রাসাদ দলকে পরাজিত করে এবং রাজতন্ত্র বিরোধী

www.pathagar.com

ওয়াফদ্ পার্টিকে নির্বাচিত করে।

১৯৩৬ সাল নাগাদ ওয়াফদ্ পার্টি অপেক্ষাকৃত পুরাতন, কোমল ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠে। চার বছরের সিদকীর "একনায়কত্ব" নাহাস পাশা ও ওয়াফদ্ পার্টিকে শিক্ষা প্রদান করে যে, রাজনীতি সম্ভাব্যতার কৌশল, অবিমিশ্রতার দাবি নয়। তদুপরি সমস্ত দলের মিসরীয়গণ ইতালির হুমকি সম্পর্কেও শংকিত হয় এবং মনে করে যে প্রভু হিসাবে ইতালীয়গণ ব্রিটিশদের তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্য নয়। বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ ব্রিটিশ ও মিসরীয়দের জন্য একটি চুক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

ব্রিটিশগণ নতুন প্রধানমন্ত্রী নাহাস পাশার সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ১৯৩৬ সালের ২৬শে আগস্ট মিসরকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করে একটি সন্ধির চুক্তিস্বাক্ষর করা হয়। প্রথম অধ্যায়ে পরিষ্কারভাবে বলা হয়, "মহামহিম (ইংল্যান্ডের) রাজা ও সম্রাটের সেনাবাহিনীর মিসরের উপর সামরিক অধিকার বাতিল হল।" অতঃপর ষোলটি অতিরিক্ত অধ্যায়ে মিসরের স্বাধীনতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়। এতে মিসরীয়দের পক্ষে দেখা যায় দুই দেশের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময়, জাতিপুঞ্জে মিসরের সদস্যপদ লাভ, উপ-ভূম্যাধিকারীস্বত্ব বিলোপ, সুদানে মিসরীয় বাহিনীর প্রত্যাবর্তন এবং সুদানে বাধাহীন মিসরীয় বসতির আইনগুলো সংযুক্তকরণ। এর প্রতিকূলে এমন কতকগুলো ধারাও এতে সন্নিবেশিত করা হয়, যার দ্বারা মিসরের সার্বভৌমত্ব খর্ব হয়। এগুলো হল গ্রেট ব্রিটেনকে মিসরের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়, আর মিসরকে দায়িত্ব দেয়া হয় যুদ্ধের সময় গ্রেট ব্রিটেনকে "সমস্ত সুবিধাদি ও সহযোগিতা.... বন্দর, বিমান বন্দর এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহারের সুবিধাদি প্রদান করা।" তদুপরি সুয়েজ খালের প্রতিরক্ষার জন্য তথায় অনূর্ধ্ব ১০,০০০ সৈন্য ও ৪০০ পাইলট রাখবার অনুমতিও গ্রেট ব্রিটেনকে দেয়া হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২০ বছরের জন্য।

ব্রিটেন তেমন কিছু দান করেনি, কিন্তু মিসরীয়গণ তাদের আশাতিরিক্ত লাভ করে। ফলে ওয়াফদ্ পার্টি এই চুক্তি গ্রহণ করে এবং ১৯৩৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর মিসরীয় পার্লামেন্ট এটি অনুমোদন করে। ১৯৩৭ সালের ৮ই মে মিসর জাতিপুঞ্জের সদস্য পদ লাভ করে। কিছুকালের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও অল্পবয়স্ক রাজার পরিচালক হিসাবে নাহাস পাশা দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। কিন্তু ১৯৩৭ সালে ফারুক বয়ঃপ্রাপ্ত হন এবং পুনরায় প্রাসাদ ও ওয়াফদ্ পার্টির পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। রাজা নাহাস পাশাকে বরখাস্ত করেন এবং

www.pathagar.com

অ-ওয়াফ্দি মাহমুদ পাশাকে নিয়োগদান করেন যিনি পার্লামেন্টের মোকাবিলা করেন। কয়েক বছর পর ওয়াফ্দ পার্টি এর সচেতনতা ও প্রভাব হারিয়ে ফেলে। নাহাস পাশা জগলুলের ন্যায় বিচক্ষণ ছিলেন না। ওয়াফদ্ দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা নেতৃত্ব লাভ করেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ শিকারি হন তাঁদের কেউ কেউ দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠে এবং অন্যান্যগণ বৃদ্ধ ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। অধিকন্তু তাঁদের জাতীয়তাবাদীগণ ১৯৩৬ সালের চুক্তিকে 'শটগান বিবাহ' হিসাবে বিরোধিতা করে এবং ওয়াফদ্ পার্টিকে এর জন্য দায়ী করে।

সামাজিক ও বুদ্ধিমত্তার পরিবেশ

মিসরের নেতৃবৃন্দ দুটি মহাযুদ্ধেই ব্রিটিশদের পক্ষে থাকবার ফলে তাঁরা সামাজিক সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দেবার সুযোগ পান নি। ব্রিটিশগণও সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের ব্যাপারে যুদ্ধের পূর্বে যেরূপ উৎসাহী ছিল তাঁর পরে অধিক আগ্রহী হয় নি। বস্তুত ব্রিটিশগণ দেশকে করায়ত্ত রেখেও ১৯২০ সালে একতরফাভাবে এবং ১৯৩৬ সালে মিসরের সাথে চুক্তির মাধ্যমে মিসরের উন্নতি সাধনের দায়িত্ব পরিত্যাগ করে। এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কোনো বিশেষ মহলের সতর্ক পরিকল্পনা ছাড়াই বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতির দরুন গ্রামবাসী ও ছোট ছোট শহরের অধিবাসীবৃন্দ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া এবং অন্যত্র যেখানে সেনানিবাস বিদ্যমান ছিল সেখানে সমৃদ্ধিশালী ব্যবসা জমে উঠে। শহরে লোকজন প্রচুর লাভবান হয় এবং কর্ম ও খাদ্যান্বেষী কৃষকগণ শহরের দিকে ছুটে যায়। শহরগুলোতে জমির দাম বৃদ্ধি পায় এবং ঘরভাড়া ৬০ শতাংশ হতে ১০০ শতাংশে উঠে যায়। তুলার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং শহরগুলোতে দ্রুতগতিতে গৃহনির্মাণ কাজ চলতে থাকে। এসব কিছু দ্বারা একটি নব্য ধনী জন্মলাভ করে, যা পুরাতন বিত্তশালী লোকদের সাথে যোগদান করে এবং জমিদার, ব্যবসায়ী ও পেশাগত সংবলিত একটি রাজনৈতিক জোটের সৃষ্টি করে। এরা নিজেদের অর্থনৈতিক সুবিধাদি রক্ষা করার জন্য সম্মিলিত হয় এবং তৎসঙ্গে গ্রেট ব্রিটেন থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার প্রয়াস পায়।

যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের চাহিদা মিটাবার জন্য কিছুসংখ্যক শিল্পকারখানা গড়ে উঠে। ১৯২০ সালে মিসরে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই ব্যাংকের মাধ্যমে

www.pathagar.com

সুতা, সিল্ক, পশম, সিগারেট, সাবান, জাহাজ চলাচল, বীমা, চলচ্চিত্র ও অন্যান্য কারখানাও ক্রমশ গড়ে উঠে। ১৯২২ সালে মিসরীয় শিল্পসংস্থা (Egyptian Federation of Industries) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩৭ সাল নাগাদ সদস্য সংখ্যা ৪৩০-এ উন্নীত হয়। একটি নতুন বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হয় যা উন্নতিশীল এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প উন্নতিশীল কিন্তু মার্জিত রুচির শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত আরও সুসংগঠিত মধ্যবিত্তের সাথে মিলিত হয়। এই বাণিজ্যিক শ্রেণি ভূপতিশ্রেণিকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়নি বরং এর সাথে মিশে যায় এবং মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ সংরক্ষিত শাসক শ্রেণির জন্য দেয়। জনসংখ্যার বাকি ৮০ শতাংশ গ্রামে বাস করে, তাদের ৯০ শতাংশ অশিক্ষিত।

নতুন কল-কারখানা নিত্যনতুন চাহিদা সৃষ্টি করে এবং এই চাহিদা পূরণ করার দ্বারা জীবনের গতি ও মূল্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। সংবাদ সংস্থা, বেতার ও টেলিফোনের ন্যায় নতুন শিল্পকারখানাসমূহও এক নতুন ধরনের শিক্ষা দাবি করে। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এবং ১৯৫২ সালে বিপ্লব পর্যন্ত দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকে, প্রত্যেকটি অপরটি থেকে পৃথক এবং প্রত্যেকটি এর নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। পবিত্র আজহার বিশ্ববিদ্যালয় তখন সগৌরবে বিদ্যমান, যা এর চার দেয়ালের বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অবস্থায় পুরাতন ধর্মীয় শিক্ষা চালিয়ে যায়। আজহারের অধিকাংশ শেখ আধুনিকতা প্রত্যাখ্যান করেন এবং কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না। এমনকি নতুন অবস্থার সাথে খাপ খাবার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবর্তনে বিশ্বাসী মুহাম্মদ আবদুহুর ন্যায় ব্যক্তিও কোনো মৌলিক ধর্মতাত্ত্বিক পুনর্গঠনের আয়োজন করেননি। আজহারিগণ মতবাদের ওপর কোনো বিতর্কে অবতীর্ণ হন না। অপরদিকে আধুনিক স্কুলসমূহ আজহারের প্রতি বিরূপ এবং তারা নিজস্ব জীবনপদ্ধতি ও শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে। তারা যে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে তা নয়, কিন্তু তাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচি সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য থেকে ধার করা এবং সম্পূর্ণভাবে আজহারের প্রভাবমুক্ত, কারণ আজহার পুরোপুরিভাবে শরিয়তের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষার আগমন মিসরে তেমন ধীর গতিসম্পন্ন নয়। পুরুষগণ ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করে, মহিলাগণ পর্দা ছাড়া বাহির হয়ে আসে, ইউরোপীয় আইন জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং বাল্যবিবাহ বিলুপ্ত হয়। নব্য ধনীশ্রেণি যতই পাশ্চাত্যমুখী হয়ে উঠে, শেখগণ ততই আরও

www.pathagar.com

কঠোর হয়ে উঠেন এবং একটি মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী আবদুহুর ন্যায় ব্যক্তিবর্গ বিস্মৃত হন।

১৯৩৬ সালে স্বাধীনতার সময় বুদ্ধিমত্তা ও ধর্মীয় দিক থেকে মিসরে চারটি পৃথক শ্রেণি বিদ্যমান ছিল। এগুলোর দুটি দল অর্থাৎ আজহারের অতিগোড়া শ্রেণি এবং আবদুহুর ন্যায় মধ্যপন্থী সংস্কারবাদী শ্রেণির সাথে আমরা ইতোমধ্যে পরিচিত। তৃতীয়টি জঙ্গি মুসলিম শ্রেণি এবং চতুর্থটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উদ্যোক্তাগণ।

মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ (Muslim Brotherhood)

অন্ততপক্ষে তিনটি কারণবশত জঙ্গি মুসলিম শ্রেণিগুলোর জন্ম হয় যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেশ পরে পর্যন্ত মিসরে প্রবল বিস্তার করে। একটি হল ব্রিটিশদের উপস্থিতি এবং ভক্ত-মুসলমানদের মধ্যে খ্রিস্টানদের দ্বারা শাসিত হবার অপমানজনিত অনুভূতি। দ্বিতীয় কারণ হল মিসরীয় শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অতি দ্রুত ধর্মনিরপেক্ষতা এবং পাশাপাশি মুসলিম আইন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের অবনতি। তৃতীয় কারণ হল, তুরস্কভীতি এবং মিসরীয় দৃষ্টিতে সে দেশের ইসলামহীনতা। তুর্কিগণ কর্তৃক খেলাফত বিলোপের ফলে আজহারের শেখগণ এতই বিচলিত হয়ে পড়েন যে, তাঁরা ১৯২৬ খৃস্টাব্দের মে মাসে খিলাফতের উপর একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। ৩৮ জন প্রতিনিধির মধ্যে এক তৃতীয়াংশ আসেন মিসরীয়। সম্মেলন কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়, তবে এটি মিসরীয় ও অন্যান্য মুসলমানের নিকট অবস্থার জটিলতা প্রকাশ করে।

জঙ্গি মুসলমানগণ হল আরবের মৌলিক নীতিবাদী ওয়াহাবি ও জঙ্গী জামাল আল দ্বীন আফগানীর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। মিসরে দুটি যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সংগঠিত জঙ্গি দলগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, প্রভাবশালী ও সর্ববৃহৎ হল মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ (Muslim Brotherood) জমিয়ত আল-ইখওয়ান আল-মুসলিমিন। সুয়েজ খালের ইসমাইলিয়ানগরে ১৯২৮ সালে হাসান আল বান্না নামক ২২ বছরের একজন স্কুল শিক্ষক এটি আরম্ভ করেন। তিনি এবং ছয়জন যুবক সহকর্মী এই আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাঁদের পাথেয় হল শুধুমাত্র ইসলামের যথেষ্টতায় প্রবল বিশ্বাসে চরম আস্থা। অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে মিসর ও অন্যান্য মুসলিম দেশে এটি একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয় এবং ৪০ বছর পর বর্তমানেও তা গণ্য করার মতো একটি শক্তি। এর মিশনারি

www.pathagar.com

উৎসাহ ও সংগঠনের দিক থেকে বিচার করলে একে মধ্যযুগের অকপট ভাতৃসংঘ (Brethren of Sincerity) নামক ইসলামিয়া দলের সাথে তুলনা করা চলে। জঙ্গিপনা ও প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে এটি আরেকটি ইসমাইলীয় প্রতিষ্ঠান, আসাসীনদের অনুকরণ করে।

ভ্রাতৃসংঘের তেজস্বী ও সুদক্ষ যুবক নেতা ইসমাইলীদের ন্যায় শিয়া নয় বরং একটি কঠোর সুন্নি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, যে পরিবার ওয়াহাবিদের ন্যায় মৌলিক নীতিবাদী হাম্বলি প্রতিষ্ঠানের অনুসারী। অবশ্য তিনি ইসলামী সংগঠনের কৌশল ধার করেন। ভ্রাতৃসংঘের সর্বময় নেতা হিসেবে হাসান আল বান্নাকে মুর্শিদ আল-আম বা সাধারণ পথ-প্রদর্শক বলা হয়। তাঁর অধীনে কার্যরত বিশিষ্ট একট উৎসর্গীকৃত দলকে বলা হয় দায়ি বা ভক্ত। ইসমাইলিরাও একই নাম ব্যবহার করে। কায়রোতে অবস্থিত এই আন্দোলনের সাধারণ কেন্দ্রস্থলকে বলা হয় দার এবং এসব আধুনিক অফিসসমূহ হতে সর্বাধিনায়ক কর্তৃক ভ্রাতৃসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচি প্রচারিত হয়।

মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ একটি জঙ্গি মনোভাবাপন্ন দল। ইসলামের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বসময় কর্তৃত্ব এবং কোরআন ও সুন্নাহর অবিকল ব্যাখ্যায় এটি বিশ্বাস করে। এটি জিহাদ বা ধর্মীয় যুদ্ধের আদর্শ পুনর্জীবিত করার জন্য চেষ্টা করে। তবে ওয়াহাবিদের তুলনায় এটি সংস্কার এবং কিছু কিছু পাশ্চাত্য প্রথানুসরণে বিশ্বাস করে। আবদুহুর মতো ভ্রাতৃসংঘ ইসলামি মতবাদের পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না। এটি মুসলিম জীবনের ধর্মনিরপেক্ষ রূপদানের ঘোর বিরোধী এবং কোরআনী আইনের পুনঃস্থাপনের জন্য এ কাজ করে। এটি প্যান-ইসলামিপন্থী এবং সমস্ত মুসলমানদের সামরিক প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা প্রচার করে। একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী, নামাজ বা রোজার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে ভ্রাতৃসংঘ ঘোষণা করে। এটি মুসলমানদের জন্য আল্লাহর সরকার, তৎসঙ্গে সংখ্যালঘুদের জন্য কোরআনের সহিষ্ণুতার উপর জোর দেয়, তবে সংখ্যালঘুদেরকে ইসলামের প্রতি অনুগত হতে হবে।

উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য ও ভাবধারাসমূহ বিভিন্ন উপায়ে কার্যে পরিণত করা হয় ও শিক্ষা দেয়া হয়। মিসরের বিভিন্ন নগর ও শহরে অবস্থিত ভ্রাতৃসংঘের শাখাসমূহ বয়স্কদের জন্য সান্ধ্যস্কুল পরিচালনা করে ও ইসলামের উপর বক্তৃতা দেয়। বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য তারা দিনের বেলাও স্কুল খোলে। অতি

গোঁড়াদের মতো ভ্রাতৃসংঘ মহিলা শিক্ষার বিরোধী নয়, কিন্তু কখনও তারা সহশিক্ষায় বিশ্বাসী নয়। শহরে তারা জনহিতকর কাজ করে, পীড়িতদের শুশ্রূষার জন্য ডাক্তারখানা স্থাপন করে এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিনা পয়সায় খাদ্য বিতরণ করে। তাদের মিশনারিগণ মসজিদে প্রচারকার্য চালায়। প্রত্যেক সদস্যকে তার জীবনের পাপকার্য ত্যাগের শপথ করতে হয় এবং অন্যদেরকেও এ কাজ হতে বিরত রাখতে হয়। শরিয়তের এই গুরুত্বপূর্ণ নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে—জুয়াখেলা, নৃত্য, থিয়েটার ও চলচ্চিত্র, মদ্যপান ইত্যাদি। ভ্রাতৃসংঘের একটি যুব সংগঠনও থাকে। প্রায় ১৬ বছর বয়স্ক বালকগণ কাশ্‌শাফে যোগদান করে। এটি অনেকটা স্কাউটিং-এর ন্যায় এবং তাদের কাজও প্রায় এক রকম। অতঃপর যুবকদল একটি আধা-সামরিক সংগঠনে যোগ দেয় এবং গোপনে কুচকাওয়াজ ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা লাভ করে।

ভ্রাতৃসংঘের সদস্যপদ গোপন রাখা হয় বলে এর সঠিক কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। অনুমান করা হয় যে, ১৯৩৯ সাল নাগাদ ভ্রাতৃসংঘের প্রায় ৫০০ শাখার সদস্য সংখ্যা ছিল ৫,০০,০০০। ১৯৫৩ সাল নাগাদ এর শাখা ২০০০-এ দাঁড়ায় এবং সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২০,০০,০০০ এ। ভ্রাতৃসংঘের আয়ের উৎসও অনুরূপ অজ্ঞাত। প্রাথমিক সদস্যগণ ছিল অধিকাংশই দরিদ্র ছাত্র, কিন্তু ছয় বছরের মধ্যে তারা তাদের কেন্দ্রস্থল কায়রোতে স্থানান্তর করে তাদের সদস্যভুক্তির ভিত্তি বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়। তারা একটি ছাপাখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, যথা ইসলামি ট্রানজাকশান কোম্পানি (Islamic Transaction Company), ইখওয়ান স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং কোম্পানি (The Ikhwan Spinning and Weaving Company) এবং কমার্শিয়াল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি Commercial and Engineering Company)। মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের নীতিবাক্য হলো, "আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর" এবং তাদের প্রতীক হলো দুটি তরবারির মাঝখানে কোরআন। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ভ্রাতৃসংঘ একটি নিমজ্জিত বরফ খণ্ডের ন্যায় বিদ্যমান থাকে, কারণ এর অধিকাংশ কার্যাবলি গোপনীয় থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এটি আরও প্রকাশ্য রূপ লাভ করে এবং অন্য বিপ্লবীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া পরবর্তী অন্য একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্যোক্তাগণ

মিসরে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তাগণের মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের ন্যায় কোনো সংগঠন ছিল না। সম্ভবত নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুন তারা এরূপ কোনো সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। তদুপরি ধর্মনিরপেক্ষতা-বাদিগণ এমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক যে কোনো মতবাদ সৃষ্টি করতে তারা নারাজ এবং মতবাদমূলক কোনো সংগঠনের গণ্ডি অনুসরণ করতেও তারা পরান্মুখ। কেউ কেউ আবার অজ্ঞেয়বাদী এবং তাই ইসলাম বা কোনো ধর্ম সম্পর্কে তারা অতি অল্পই তোয়াক্কা করে। আবার অনেকেই খাঁটি মুসলিম, যারা মনে করে, ধর্ম একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সরকার থেকে এটি পৃথক হওয়া উচিত। অজ্ঞেয়বাদী হোক বা বিশ্বাসী হোক, দুটি ব্যাপারে তারা একমত। প্রথমত তারা ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথক সত্ত্বায় এবং রাষ্ট্রের মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। দ্বিতীয়ত মিসরীয় জীবনে তারা 'ইসলামি সংস্কৃতির' উপর জোর দেয়। জীবনের অন্যান্য ধারার সাথে ইসলাম এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, কোনো নাস্তিক যদি বলে যে, সে মুসলমান নয় তবে এর দ্বারা বুঝাবে যে, সে মিসরীয় নয়। ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো একে অপরের সাথে সহযোগিতা করে। কোনো কোনো ধর্মনিরপেক্ষবাদী ইসলামকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে। আবার কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে এটি পালন করে কিন্তু জাতির উপর এটি চাপাতে নারাজ।

দুটি যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে যে ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষতা ভাবধারার উন্মেষ সাধনে অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে তিনি সম্ভবত তাহা হোসেন (১৮৮৯)। এ অন্ধ প্রভাবশালী ব্যক্তি, শিক্ষক এবং মানবীয় গুণের অধিকারী আজহার ও ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করেন। বলতে গেলে তিনি আজহারের ধর্মীয় মৌলিকতাবাদী এবং পাশ্চাত্য কর্তৃক প্রাচ্যের উপর আধিপত্য করার ইচ্ছা, যেমন—ফ্রান্সে দেখা যায়, উভয়টিই প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য পাশ্চাত্যে সংস্কৃতি ও সভ্যতার ব্যাপারে তাঁর ভালোবাসা ও প্রশংসা অপরিসীম। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভালোবাসা হতেই তিনি প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে প্রশংসা করতে শেখেন। ফ্রান্সে থাকাকালে তিনি উত্তর আফ্রিকার ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন সম্পর্কে লেখেন। ১৯১৯ সালে এক ফরাসি স্ত্রী নিয়ে তিনি মিসরে প্রত্যাগমন করেন এবং তার সমস্ত উৎসাহ শিক্ষায় ব্যয় করেন।

শিক্ষার উপর তিনি উপন্যাস, ইতিহাস, জীবনচরিত ও বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখেন। তবে তাঁর অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'প্রাক-ইসলামী কবিতা' ১৯২৬ প্রকাশিত

www.pathagar.com

হয় এবং 'মিসরে সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ', ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথমটি মুসলিম বিশ্বকে মর্মাহত করে এবং তাঁকে ধর্মত্যাগী বলে আখ্যায়িত করে। দ্বিতীয়টি আধুনিক মিসরীয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কিছু কিছু বুদ্ধিমত্তার ভিত্তি স্থাপন করে।

তাঁর প্রাক-ইসলামি কবিতা গ্রন্থে তাহা হোসেন মোয়াল্লাকা নামে পরিচিত অনেকগুলো কবিতায় পাণ্ডিত্যে আধুনিক সমালোচনামূলক প্রক্রিয়া ব্যবহার করেন এবং এগুলো আদৌ প্রাক-ইসলামী কিনা এই ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইহা তুমুল আন্দোলন ও বিরোধিতার সৃষ্টি করে। ধর্মীয় সম্প্রদায় আশংকা করে, যে কোনো প্রাচীন মূল বচনের উপর সমালোচনামূলক পাঠে উৎসাহ প্রদান করা হবে এবং ঐশীবাণীর সঠিকতার উপর সন্দেহ আরোপ করা হবে। তদুপরি আরবি ভাষাকে এত পবিত্র জ্ঞান করা হয় এবং কোরআন পাঠ এত অলঙ্ঘ্য যে কোনো পরিবর্তনের দ্বারা ইমান বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। এর বিরুদ্ধে অনেক পুস্তক রচনা করা হয় এবং হোসেনের পুস্তক প্রত্যাহার করতে হয়। কিন্তু তাহা হোসেনই সম্ভবত প্রথম মুসলমান যিনি কোরআনের উপর সমালোচনামূলক প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে উৎসাহ প্রদান করেন।

'মিসরে সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ' গ্রন্থখানি রচনা করা হয় ১৯৩৬ সালে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের জন্য কিছু কর্মসূচি প্রদানের উদ্দেশ্যে। মিসরের ওপর ইউরোপীয়দের বিশ্বাস এবং ইউরোপের পদাংক অনুসরণ করবার মিসরীয় ওয়াদার নিদর্শনস্বরূপ ১৯৩৬ সালে যুক্তিকে তাহা হোসেন আদর্শ হিসাবে তুলে ধরেন। তাঁর মতানুসারে পাশ্চাত্য সভ্যতা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে এবং উপলব্ধি করা যায় যখন লক্ষ করা যায় যে ইহা মানুষের কার্যাবলিতে গতি সঞ্চারের জন্য যুক্তির স্বাধীনতা দান করে এবং মানুষকে কাজে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য ধর্মের স্বাধীনতা দান করে। এই চরম লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য মিসরকে তার স্বাধীনতার উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। তিনি বিশ্বাস করেন যে গ্রিক রোমান সভ্যতার সাথে মিসরের সম্পর্ক রয়েছে বিধায় মিসর ইউরোপের একটি অংশবিশেষ। তিনি তুর্কি সমাজবিজ্ঞানী জিয়া গোকালপের সমতুল্য। কারণ গোকালপের ন্যায় তিনিও বলেন যে, মিসরীয়দের উচিত ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করা, ধর্ম নয় এবং তাদের মিসরীয় সংস্কৃতির সাথে এর সামঞ্জস্য বিধান করা। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে ভাষা জাতীয়তাবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। আমরা

www.pathagar.com

ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি যে, তুর্কিগণ আরবি ও ফার্সি ভাষা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং পারস্যবাসিগণ আরবি ও তুর্কি ভাষা প্রত্যাখ্যান করেছে। তাহা হোসেন আরবির অতি প্রশংসা করেন, ধর্মের খাতিরে নয় এবং জাতির খাতিরে। এমন কি তিনি খ্রিস্টানদের ধর্মীয় রীতিনীতিতে ব্যবহৃত দুর্বল আরবিকে উন্নত করবার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন যাতে মিসরীয় খ্রিস্টানগণ বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় তাদের রীতিনীতি পালন করতে পারে।

সীমিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও বিভিন্ন মতাদর্শ নিয়ে মিসরীয়গণ মহাযুদ্ধ অতিক্রম করে। অজ্ঞেয়বাদী ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শী থেকে মৌলিক নীতিবাদী মুসলমান যারাই এই ব্যাপারে মাথা ঘামায় তারা মিসরের প্রতি অথবা ইসলামের প্রতি অথবা উভয়ের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবার বিষয়ে চিন্তা করে। তারা নিজদেরকে 'আরব' বলে বিবেচনা করেন এবং তাই ফারটাইল ক্রিসেন্টের জনগণের কার্যাবলিতে অনেকেই নিজেদেরকে জড়িত করেনি। যুদ্ধের শেষ বছরগুলোর ঘটনাবলি ইহুদিবাদের প্রেতাত্মা এবং যুব মিসরীয় নেতাদের একঘরে নীতির বিরোধিতা অবস্থার বেশ পরিবর্তন সাধন করে এবং মিসরকে 'আরব জাতীয়তাবাদের' কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়
ফারটাইল ক্রিসেন্টে সাম্রাজ্যবাদ

কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের স্বপক্ষে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) যোগদানের ফলে ভারতবর্ষের সাথে ব্রিটিশদের রাজকীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হয়। ফলে মিসর ও পারস্য উপসাগরে অবস্থিত তাদের বিভিন্ন ঘাঁটি হতে ব্রিটিশ এই জীবন-রক্ষাকারী যোগাযোগের নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করে। অপরদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং নীতি নির্ধারণে ওসমানীয় সেনাবাহিনীর প্রধান উপদেষ্টা জার্মানগণ ব্রিটিশদেরকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত তাদের সমস্ত উপনিবেশগুলোতে ব্যতিব্যস্ত করতে সচেষ্ট হয়। সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে জাহাজ চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ এবং আঁতাত পক্ষের বিরুদ্ধে একটি জিহাদ বা ধর্মীয় যুদ্ধের আহ্বান দেবার জন্য তারা তুর্কিদেকে উপদেশ দেয়। জিহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের আরবিভাষী মুসলমানদের আনুগত্য নিশ্চিত করা এবং ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে শত্রুভাব গড়ে তোলা। ১৯১৪ সালের ২৩শে নভেম্বর সমস্ত পবিত্রতা নিয়ে সুলতান খলিফা জিহাদ ঘোষণা করেন, কিন্তু তা নিষ্ফল হয়। ইয়ামান, দক্ষিণ আরবের কিছু গোত্রীয় শেখগণ এবং বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় প্যান-ইসলামী ছাড়া ফারটাইল ক্রিসেন্টের অধিবাসীবৃন্দ এই জিহাদে কোনো সাড়াই প্রদান করেনি। কেউ কেউ স্বয়ং খলিফার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আমরা ফারটাইল ক্রিসেন্টের আরবিভাষী লোকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ক্রিসেন্টের আরবিভাষী অধিবাসীদের ওসমানীয়বাদকে প্রচণ্ড আঘাত করা হয়। ১৯০৮ সালের নব্য তুর্কি বিপ্লব অ-তুর্কিদের ওপর তুর্কিদের প্রাধান্য পুনঃস্থাপিত করে। ওসমানীয় পার্লামেন্টে আরবিভাষী লোকদের প্রতিনিধিত্ব খর্ব করা হয়। তদুপরি তারা তুর্কি ভাষার খাতিরে আরবি ত্যাগ করতে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমান তাদের খ্রিস্টান বন্ধুদের প্যান-আরবি ভাবধারায়

www.pathagar.com

আকৃষ্ট হয়। প্রথমে তারা সম্পূর্ণ পৃথক মুসলিম সংস্থাসমূহ গঠন করে এবং এতে মুসলমান, খ্রিস্টান ও ডজেসগণ ধর্মীয় স্বাধীনতা সংবলিত একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করার দাবিতে একত্রিত হয়। বাগদাদ হতে বৈরুত পর্যন্ত এই ধরনের প্রায় এক ডজনেরও অধিক সংস্থা গঠিত হয়, আবার এদের কোনো কোনোটি গঠিত হয় ওসমানীয় সেনাবাহিনীর আরব অফিসারদের দ্বারা। ১৯১৩ সালের বলকান যুদ্ধের প্রাক্কালে গোপন জাতীয়তাবাদী সংস্থাসমূহের ২৪ জন প্রতিনিধি প্যারিসে একটি সম্মেলনে মিলিত হয় এবং ওসমানীয় শাসন থেকে স্বাধীনতার আহ্বান জানায়। যুদ্ধের প্রথম বছরগুলোতে তুর্কি ত্রিশজন-শাসকের একজন সদস্য জামাল পাশা সিরিয়ায় তুর্কি বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে কাজ করেন। আরবদের বিরুদ্ধে তাঁর নিষ্ঠুরতা গোপন সংস্থাসমূহের জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়ে তোলে।

ব্রিটিশগণ এইসব তুর্কি-বিরোধী আন্দোলনসমূহ সম্পর্কে সজাগ এবং স্বভাবতই তারা এই তুর্কিবিরোধী মনোভাবের সুযোগ গ্রহণ করে। তদুপরি ১৯১৫ সালে জেনারেল এল্লেনবির নেতৃত্বে সিনাই এলাকায় পরিচালিত অভিযানও তখন সুবিধা করতে অপারগ হয় এবং জেনারেল টপাউনসেন্ডের নেতৃত্বে ১৩,০০০ সৈন্যের একটি ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ১৯১৬ সালে মেসোপোটামিয়ায় আত্মসমর্পণ করে। ওসমানীয়গণ আরবদের কোনো বিদ্রোহ আশা করে নাই, কিন্তু ব্রিটিশগণ একটি বিদ্রোহ সংগঠিত করতে তৎপর হয়ে ওঠে। ফারটাইল ক্রিসেন্টের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত গোপন সংস্থাসমূহ শহর নিয়ন্ত্রণকারী তুর্কিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবার মতো শক্তিশালী ছিল। অবশ্য সে সময় তুর্কিদের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ পরিচালনা করবার মতো যথেষ্ট প্রভাব ও স্বাধীনতার অধিকারী ছিলেন দুজন আরব নেতা। তাঁদের একজন ওয়াহাবিদের নেতা আবদুল আজিজ ইবনে সউদ, যিনি পারস্য উপসাগরের পাড়ে আরব উপদ্বীপের পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত তাঁর পৈতৃক রাজ্য নজদ পুনর্দখল করে তথায় শাসনরত। অপরজন ১৯০৮ সালে সুলতান কর্তৃক মক্কার শরীফ পদে নিযুক্ত হোসেন। তিনি রসুলুল্লাহর (সঃ) বংশ হাশেমি গোত্রের একজন সদস্য এবং কার্যত লোহিত সাগরের পাড়ে আরব উপদ্বীপের পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত হেজাজের শাসক।

১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার কোম্পানি বিলোপ করে স্বয়ং নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। ভারতবর্ষের গুরুত্বের দরুন এটিকে একটি পৃথক বিভাগের মাধ্যমে শাসন করা হয়, এবং এটা ঔপনিবেশিক দফতরের আওতাধীন

www.pathagar.com

ছিল না। ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদে ভারতবর্ষের জন্য একজন সেক্রেটারি থাকেন এবং কালক্রমে যেসব ইংরেজ ভারতবর্ষ শাসন করেন তারা একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করেন যা দ্বারা প্রত্যেক নীতি ভারত প্রতিরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যে গ্রেট ব্রিটেনের একটি প্রধান আগ্রহ হল ভারতবর্ষের পথ পরিষ্কার রাখা। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারি ব্যক্তিবর্গ যেহেতু ঘটনাস্থলে উপস্থিত এবং ভারতীয় সমস্যাবলি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবি করেন, তাই তাঁরা মনে করেন যে 'নেটিভদের' (স্থানীয় অধিবাসী) কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তারা 'লন্ডন সরকারের' চাইতে ভাল জানেন। তবে লন্ডন দিল্লির নীতি নির্ধারণী ব্যাপারগুলো ছাড় দিতে নারাজ। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত লন্ডন সরকার ও 'ভারত সরকারের' মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। কখনো কখনো এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইরান ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের ব্রিটিশ নীতির সংশ্লিষ্ট।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ফারটাইল ক্রিসেন্টে অনুসৃত নীতি সম্পর্কে লন্ডন ও নয়াদিল্লির সাথে মত বিরোধ হয়। ভারতীয় মুসলমানগণ ইসলামের খলিফার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যিনি হলেন ওসমানীয় সুলতান এবং তিনি গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধরত। ভারত সরকার আশা করে যে, ভারতীয় মুসলমানদের ন্যায় ফারটাইল ক্রিসেন্টের মুসলমানগণও খলিফার প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল হবে। অতএব তারা আরবদের মধ্যে একটি বিদ্রোহ সংঘটিত করাবার বিরোধী। তারা পারস্য উপসাগরের শেখদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন করে এবং ইবনে সউদকে নজদের রাজা বলে স্বীকার করে। তারা এদের সবাইকে কর প্রদান করে এবং সমগ্র যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বন্ধুভাবাপন্ন থাকে।

অবশ্য লন্ডন সরকার তুর্কিদের বিরুদ্ধে আরবদের জাতীয়তাবাদী মনোভাব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং একটি প্রকাশ্য বিদ্রোহ সংঘটিত করাবার নীতি গ্রহণ করে। ব্রিটিশগণ হোসেনের ওসমানীয় বিরোধী মনোভাব সম্পর্কে এবং তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহ যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ মনোভাব জানবার জন্য মিসরে ব্রিটিশ উপ-রাষ্ট্রদূত লর্ড কিচেনারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৯১৫ সালে লর্ড কিচেনার যুদ্ধ সচিব হিসাবে মক্কার শরীফ হোসেনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মিসরের হাই কমিশনার স্যার হেনরি ম্যাকমাহনকে উপদেশ প্রদান করেন। ইতোমধ্যে শরীফ হোসেন তাঁর ওসমানীয় সমর্থক তৃতীয় পুত্র ফয়সালকে দামেস্ক প্রেরণ করেন। তাঁর আনুগত্য

www.pathagar.com

সম্পর্কে তুর্কিদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করা এবং সিরীয় নেতাদের মতামত গ্রহণ করাও ছিল এই দামেস্ক সফরের উদ্দেশ্য। এই সফরেই ফয়সাল ধর্মনির্বিশেষে আরব জাতীয়তাবাদী মত গ্রহণ করেন। তিনি ফাতাত গোপন সংস্থার একজন সদস্য হয়ে যান এবং এর নেতাদের সাথে তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সম্ভাব্যতা এবং ব্রিটিশ সহযোগিতার সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই নেতৃবৃন্দ ফয়সালকে 'দামাস্কাস প্রটোকল' নামক একটি দলিল প্রদান করেন। এই দলিলে বিদ্রোহ সংগঠিত করার শর্তাবলি উল্লেখ থাকে। শরীফ হোসেন এবং গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে পরবর্তী চুক্তিসমূহ এই দলিলের শর্তাবলির উপর ভিত্তি করে স্বাক্ষরিত হয়।

হোসেন-ম্যাকমাহন পত্রালাপ : ১৯১৫ সালে ১৪ই জুলাই হতে ১৯১৬ সালে ১০ই মার্চ পর্যন্ত ক্রিসেন্টের আরবদের পক্ষে শরীফ হোসেন এবং গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে স্যার হেনরি ম্যাকমাহন দশটি পত্র বিনিময় করেন যেগুলো 'হোসেন-ম্যাকমাহন পত্রালাপ' (Hussain McMahon Correspondence) নামে খ্যাত। এই পত্রালাপে এর প্রকৃতি ও সচরাচর চুক্তির ভাষায় দুটো বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয়। একটি বিষয় হল ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধ করতে হোসেন ওয়াদা করেন এবং গ্রেট ব্রিটেন জয়ী হলে 'আরবদের স্বাধীনতা সমর্থন' করতে ওয়াদা করে। তাঁর পত্রালাপে হোসেন সিরীয় জাতীয়তাবাদের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি প্রকাশ করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে, 'একজন মুসলমান ও খ্রিস্টান আরবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তারা উভয়ে একই পূর্বপুরুষের বংশধর।' অধিকন্তু হোসেন বা সিরীয় জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিতে 'আরব' বা 'আরবজাতি' বলতে মিসর, উত্তর আফ্রিকা অথবা দক্ষিণ ও নজদ বুঝায় না।

পত্রালাপের দ্বিতীয় বিষয়—'স্বাধীন আরব জাতির' সীমানা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই বিষয়ে পত্রালাপের ভাষা বিশেষত ম্যাকমাহনের পত্রের ভাষা অত্যন্ত বিদঘুটে। গ্রেট ব্রিটেন আরব জাতির সীমানা এই বলে সীমিত করে যে 'দামেস্ক, হোম্‌স, হ্যামা ও আলেপ্পো জিলার পশ্চিমে অবস্থিত সিরিয়ার অংশগুলোকে সম্পূর্ণ আরব বলা যায় না; এবং তাই দাবিকৃত এলাকা হতে এই অঞ্চলগুলো বাদ দেয়া উচিত।' শরীফ হোসেন এই এলাকা বলতে আধুনিক লেবানন এবং এর উত্তরের উপকূলীয় এলাকা বুঝেন, বিশেষত এই জন্য যে ম্যাকমাহন এই অঞ্চলে ফ্রান্সের স্বার্থের বিষয় উল্লেখ করেছেন। তদুত্তরে হোসেন বলেন উপরোল্লিখিত সীমা গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর সম্মতি সাময়িক মাত্র এবং

www.pathagar.com

আশা করেন যে, যুদ্ধের পর ফ্রান্সের সাথে তাঁর বুঝাপড়ার ব্যাপারে গ্রেট ব্রিটেন তাঁকে সাহায্য করবে।

যুদ্ধের পর হোসেন-ম্যাকমাহন পত্রালাপ এবং বিশেষত উপরোল্লিখিত সীমারেখার ভৌগোলিক ব্যাখ্যা এক তিক্ত বিতর্কের সূত্রপাত করে। প্রধান আলোচ্য বিষয় হল বর্ণনার 'দামেস্ক জিলার পশ্চিমে...' বলতে ফিলিস্তিনও অন্তর্ভুক্ত কিনা। আরবগণ জোরের সহিত বলে যে, ফিলিস্তিন ও আরব রাষ্ট্রের অংশবিশেষ এবং ১৯২২ সালের পর থেকে একের পর এক সমস্ত ব্রিটিশ সরকারগুলো স্বীকার করে যে, উপরোল্লিখিত বাক্য দ্বারা সিনাই হতে তুরস্ক পর্যন্ত সমগ্র উপকূলভাগ বুঝায় এবং তন্মধ্যে ফিলিস্তিনও অন্তর্ভুক্ত। অথচ ১৯৩৭ সালে স্বয়ং স্যার হেনরি ম্যাকমাহন বলেন যে, 'তিনি বাদশাহ হোসেনের প্রতি তাঁর ওয়াদায় ফিলিস্তিনকে অন্তর্ভুক্ত করেননি।' এই প্রসিদ্ধ বিতর্ক সম্ভবত ১৯৬৪ সালে 'ওয়েস্টারম্যান দলিল' (Westerman Papers) দ্বারা মীমাংসা হয়। স্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হুভার ইনস্টিটিউট এই দলিলের ওপর গবেষণা পরিচালনা করে। পত্র সংকলনের মধ্যে ব্রিটিশ বৈদেশিক অফিসের গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক প্যারিস শান্তি সম্মেলনে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত দুইটি দলিলও অন্তর্ভুক্ত। এই দলিলগুলো প্যারিসে শান্তি সম্মেলনে মার্কিন প্রতিনিধিদলের একজন সদস্য ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক উইলিয়াম ওয়েস্টারম্যানের হাতে পড়ে। তিনি এই দলিলগুলো হুভার ইনস্টিটিউটের নিকট হস্তান্তর করেন এবং উপদেশ দেন যে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে যেন এগুলো খোলা না হয়। দলিলগুলো দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করে যে, আরবদেরকে দেয়া ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতির মধ্যে ফিলিস্তিনও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রকৃতপক্ষে আরবদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি যে ব্রিটিশ ভঙ্গ করেছে তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য কাউকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি। হোসেন-ম্যাকমাহন পত্রালাপ বন্ধ হবার ছয়মাস পর সাইকস্-পিকট চুক্তি (Sykes-Picot Agreement) সম্পাদন করে ব্রিটিশ সরকার আরবদেরকে দেয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতিই প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু এটি হল গোপন ত্রিপক্ষীয় আঁতাতের অংশবিশেষ এবং যা সম্পর্কে আরবগণ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ম্যাকমাহনের প্রতিশ্রুতির জোরে আরবগণ ১৯১৬ সালের ৫ই জুন ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শাহজাদা ফয়সালের পরিচালনায় এবং প্রসিদ্ধ কর্নেল টি. ই. লরেন্সের উপদেশে আরব সৈন্যগণ তুর্কি সৈন্য সমাবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সমগ্র

www.pathagar.com

তুর্কি যোগাযোগ লাইনে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। আরব অফিসারদের অধিকাংশ ছিল সিরিয়ার ফাতাত গোপন সংস্থার এবং ইরাকের আহ্‌দ সংস্থার সদস্য। ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে তারা আকাবা বন্দর অধিকার করে, যা দ্বারা ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে জেনারেল এ্যালেনবি কর্তৃক জেরুজালেম অধিকার সহজতর হয়। ১৯১৮ সালের ১লা অক্টোবর ফয়সাল ও তাঁর সৈন্যগণ বিজয়ী বেশে দামেস্কে প্রবেশ করেন। সাইকস্‌-পিকট চুক্তি স্মরণ করে ব্রিটিশ সরকার জেনারেল এ্যালেনবিকে দামেস্কে গিয়ে ফয়সাল ও লরেন্সের কার্যাবলিতে বাধা প্রদান করতে আদেশ করে। তবে ফয়সাল একটি 'সম্পূর্ণ স্বাধীন আরব শাসনতান্ত্রিক সরকার' গঠনের কথা ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি তুর্কিদের পিছু ধাওয়া করেন এবং উত্তরে হোম্‌স ও হ্যামা অধিকার করেন। ১৯১৮ সালের ২৯শে অক্টোবর তুর্কিগণ মার্জদাবিকের প্রান্তরে আত্মসমর্পণ করে। এটি সেই একই প্রান্তর যেখানে ১৫০৮ খিস্টাব্দে সুলতান সেলিম সিরিয়া জয় করেন।

সাইকস্‌-পিকট চুক্তি

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধরত ত্রিপক্ষীয় (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া) আঁতাতের সদস্যদের মধ্যে তিনটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একটি হল ১৯১৫ সালের ১৮ই মার্চের কন্সটান্টিনোপল চুক্তি, যা দ্বারা উত্তর সিরিয়ার কিয়দংশ এবং এশিয়া মাইনরকে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বণ্টন করা হয়। দ্বিতীয়টি হল ১৯১৫ সালের ২৬শে এপ্রিলের লন্ডন চুক্তি। ইতালি যুদ্ধে যোগদান করে তার ভাগের যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি দাবি করলে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই দুই চুক্তি দ্বারা ফারটাইল ক্রিসেন্টকে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়।

১৯১৫ সালের ২১শে অক্টোবর ব্রিটিশ হোসেন-ম্যাকমাহন পত্রালাপের ব্যাপারে ফ্রান্সকে অবহিত করে এবং পরামর্শ দেয় যে, তাদের উভয়ের একত্রে বসে ফারটাইল ক্রিসেন্টে নিজ নিজ স্বার্থ সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত। তদনুসারে ব্রিটেনের স্যার মার্ক সাইকস্‌ এবং ফ্রান্সের চার্লস জর্জেস পিকট ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। পরে রাশিয়া ও ইতালি এই সিদ্ধান্ত নেয়। আরবদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি সামান্যতম সম্মানও প্রদর্শন না করে ফারটাইল ক্রিসেন্টকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। রাশিয়ার হস্তক্ষেপের দরুন পবিত্র স্থানগুলোর জন্য ফিলিস্তিনকে আন্তর্জাতিক করা হয়।

www.pathagar.com

অবশিষ্ট অংশ হাইফার উত্তরে ভূমধ্যসাগরের উপকূল থেকে একটি সরলরেখা উত্তর- পূর্বে পারস্য সীমান্তে মৌসুল পর্যন্ত টেনে ভাগ করা হয়। এই রেখার উত্তর অংশ ফ্রান্সের এবং দক্ষিণ অংশ গ্রেট ব্রিটেনের। তদুপরি উত্তর অংশকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। একটি সরাসরি ফরাসির আওতাধীন এবং অপরটি তার 'প্রভাবাধীন'। অনুরূপভাবে দক্ষিণ অংশকে দুইভাগে ভাগ করা হয়, একটি সরাসরি ব্রিটিশ আওতাধীন এবং অপরটি তার 'প্রভাবাধীন'।

সাইক্‌স-পিকট চুক্তি ছিল গোপন কিন্তু ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে বলশেভিকগণ তাদের বিজয়ের পর এটি সাধারণের মধ্যে ফাঁস করে দেয়। তুরস্কের জামাল পাশা বাদশাহ হোসেনের নিকট এই চুক্তি প্রেরণ করেন এবং পৃথক একটি তুরস্ক-আরব শান্তি চুক্তির প্রস্তাব করেন। হোসেন ব্রিটিশদের নিকট ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠান এবং তারা তিনবার তাঁকে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে একটি আরব রাষ্ট্র গঠনে তারা তাঁকে সাহায্য দান করবে। আরবগণ এই সকল নিশ্চয়তায় বিশ্বাস করে, সম্ভবত তারা বিশ্বাস করতে চেয়েছিল বলেই। প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে ওসমানীয়দের পরাজয়ের মুখে একটি তুরস্ক-আরব শান্তি চুক্তি নিরর্থক। আরবগণ ভালোর আশায় বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি।

ইহুদিবাদ ও বালফার ঘোষণা

ফারটাইল ক্রিসেন্টে সদ্যাগত আরব জাতীয়তাবাদ প্রারম্ভেই অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ন্যায় শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছাড়াও ফয়সাল ও তাঁর আরব জাতীয়তাবাদী উপদেষ্টাদেরকে অনেক অভ্যন্তরীণ সমস্যার মোকাবিলাও করতে হয়। সিরিয়া-লেবাননের খ্রিস্টানগণ, বিশেষত মেরোনাইটগণ মুসলমানদের নিকট থেকে পৃথক এবং একটি বিদেশী শক্তির আশ্রয় দাবি করে। উদারপন্থীদের 'আরববাদ' বিরোধী স্থানীয় ওলামাদের দ্বারা উৎসাহ প্রাপ্ত প্যান-ইসলামিগণ একটি ইসলামি রাষ্ট্র দাবি করে। আবার হেজাজ ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের বেদুইনগণ বিশেষ কোনো রাষ্ট্রেরই তোয়াক্কা করে না। আরব জাতীয়তাবাদ শান্তি ও সময় পেলে নিঃসন্দেহে এই সকল সমস্যার সমাধান করতে পারত, যদি না একে এক নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করতে হত। এই নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী হল ইহুদি জাতীয়তাবাদ। ১৯১৭ সালের শেষের দিকে এই জাতীয়তাবাদ দৃশ্যে অবতরণ করে।

www.pathagar.com

ইহুদি জাতীয়তাবাদ বা ইহুদিবাদের উৎপত্তি হিব্রু ধর্মীয় ইতিহাসে নিহিত। তিনটি ধর্মের মধ্যে ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম— যাদের একে অপরের সাথে ধর্মতাত্ত্বিক সম্পর্ক বিদ্যমান, একমাত্র ইহুদি ধর্মই পৃথক। ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে এর অনুসারিগণ জন্ম, ঐতিহ্য এবং ইব্রাহীম (আঃ) ও মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক এদের নিকট প্রদত্ত বিশেষ অঙ্গীকারের ফলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী হতে পৃথক। অধিকন্তু, প্রাচীনকালে কানান এবং আধুনিককালে ফিলিস্তিন নামে পরিচিত এই বিশেষ ভূখণ্ডটিকে আল্লাহ এদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যেখানে তারা অপরের সাথে আন্তঃবিবাহাদির সংশয় হতে মুক্ত থেকে তাদের ধর্মচর্চা করতে পারবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কানানে ইহুদিরা কখনও একমাত্র বসবাসকারী ছিল না। যশুহর সেনাবাহিনী কর্তৃক পরাজিত আদি অধিবাসিগণ নিশ্চিহ্ন হয়নি, বরং সে দেশেই থেকে গিয়েছিল।

শতাব্দীর পর শতাব্দীকালের মধ্যে ইহুদি ধর্মে দুটো ধারার সৃষ্টি হয়। একটি হল পুরোহিত ধারা যা রীতি ভিত্তিক, সাধারণত পৃথক থাকবার নীতিতে বিশ্বাসী এবং মুসা (আঃ)-এর আইন ব্যাখ্যায় অলঙ্কারবর্জিত। অপরটি হল প্রত্যাদিষ্ট ধারা, যা রীতিনীতি বিরোধী, সাধারণত সহঅবস্থানে বিশ্বাসী এবং মুসা (আঃ)-এর আইন ব্যাখ্যায় আধ্যাত্মিক পন্থা অবলম্বনকারী। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে বেবিলনীয় বন্দিদশা, বিশেষত শেষ রোমান যুগ হতে আরম্ভ করে ইহুদিগণ ক্রমশ বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। যেখানেই যায় তারা সেখানেই এই দুই চিন্তাধারা সঙ্গে যায়। প্রত্যাদিষ্ট ধারার ইহুদিগণ জেরেমিয়াহ্, ইসাইয়া, মিকাহ ও অন্যান্য প্রত্যাদিষ্ট মনীষীদের উপদেশ অনুসরণ করে। এরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইহুদিদেরকে যেখানেই থাকুক "ঘর নির্মাণ করতে ... বাগান তৈরি করতে, বিবাহ করে পুত্রকন্যা জন্ম দিতে" উপদেশ প্রদান করেন, "কারণ সেই শান্তির মধ্যেই তোমরা শান্তি পাবে।" কিন্তু পুরোহিত ধারার ইহুদিগণ ধর্মসঙ্গতি ১৩৭ (Psalm 137) -এর লেখকের ন্যায় মনীষীদের উপদেশ অনুকরণ করে। ধর্মসঙ্গতি ১৩৭-এর লেখক বলেন : "ওহে জেরুজালেম, আমি যদি তোমাকে ভুলে যাই তবে আমার ডানহাত নিশ্চিহ্ন হোক, আমার জিহ্বা তালুর সঙ্গে লেগে যাক, যদি আমি তোমাকে স্মরণ না করি, যদি আমি জেরুজালেমকে আমার সর্বোচ্চ আনন্দে স্থান দান না করি।" প্রত্যাদিষ্ট ধারার ইহুদিগণ মন্দিরকে "সব লোকের উপাসনা গৃহ" বলে মনে করে, কিন্তু পুরোহিত ধারার ইহুদিগণ একে শুধুমাত্র ইহুদিদের জন্য বলে মনে করে। এই শ্রেণি মনে করে মসিয়াহ্ আল্লাহর রাজত্ব সৃষ্টি করবেন;

www.pathagar.com

অপর শ্রেণি মনে করে তিনি দাউদের রাজত্ব সৃষ্টি করবেন।

এই আলোচনার প্রকৃত কথা এই যে পুরোহিত শ্রেণির অনুসারিগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বংশপরম্পরায় ইহুদিদেরকে এই শিক্ষা দেয়া হয় যে, যে দেশেই তারা বাস করুক না কেন সেখানে তারা "আগন্তুক"। একমাত্র ইয়ম কিপুর বা প্রায়শ্চিত্তের দিন (Day of Atonment) ব্যতীত সমস্ত ইহুদি পর্বগুলোই জাতীয় পর্বের ন্যায়। শুক্রবারের সন্ধ্যার প্রার্থনার পর প্রত্যেক ইহুদি পরিবার 'আগামী বছর জেরুজালেমে— এইরূপ কামনা করে মদ্যপান করে এবং প্রার্থনার সময় প্রত্যেক ইহুদি জেরুজালেমের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। কিন্তু পর্ব কামনা করে মদ্যপান কিংবা প্রার্থনায় জেরুজালেমের মুখ করবার অর্থ এই নয় যে অধিকাংশ ইহুদি কানান বা ফিলিস্তিনে গিয়ে বসবাস করতে চায়। এটা অনেকটা মুসলমানদের মক্কার দিকে মুখ করে নামাজ পড়বার ন্যায়। কেউ কেউ জেরুজালেম যায় তীর্থ পালনের উদ্দেশ্যে, আবার ফিরে আসে কিন্তু সেই নগর বা দেশকে কখনও তারা ভুলে যায় না। তাদের ওপর অনেক অত্যাচার হয়েছে এবং যখনই তাদের ওপর অত্যাচার হয়, তখনই "প্রত্যাবর্তন" এবং 'দাউদের রাজত্বের' কথা তাদের মানসপটে ফুটে ওঠে।

রাজনৈতিক ইহুদিবাদ

ইউরোপের নব জাগরণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব এবং ধর্ম থেকে রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নকরণের যুগে পশ্চিম ইউরোপে ইহুদিদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ইহুদি আস্তানাসমূহ বিলুপ্ত হয় এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও প্রক্রিয়ার আওতায় আগত ধর্মভীরু ইহুদিগণ প্রত্যাদিষ্ট শ্রেণিকে পুনর্জীবিত করে এবং শাশ্বত ইহুদিধর্ম প্রবর্তন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের শাশ্বত ইহুদিগণ "সত্যের রাজত্বের" কথা বলাবলি করে এবং নিজেদেরকে আর "একটি জাতি নয়, বরং একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচনা করে এবং এইজন্য ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তন, হারুনের পুত্রদের অধীনে কোরবানির পূজা পুনরারম্ভ বা ইহুদি রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় কোনো আইনের প্রত্যাশা তারা করে না।" অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে অধিকাংশ ইহুদি পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ায় তাদের বিভিন্ন আস্তানায় বসবাস করে, যেখানে নবজাগরণের ছোঁয়া কখনও প্রবেশ করে না। তারা সর্বত্র খ্রিস্টান ধর্মান্ধতা ও ইহুদি নিধন যজ্ঞের শিকারে পরিণত হয়। তাদের বেশ কিছুসংখ্যক লোক মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের প্রভাবে আসা সত্ত্বেও গোঁড়া ইহুদি

www.pathagar.com

থেকে যায় এবং আশা করে যে একদিন মসিয়াহ তাদেরকে প্রতিশ্রুত দেশ ফিলিস্তিনে নিয়ে যাবেন এবং পুনরায় একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে থিওডর হেরজেল নামে একজন ইহুদি বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক তাঁরা ভিয়েনা পত্রিকার জন্য প্রসিদ্ধ ড্রেফুস বিচার পর্যবেক্ষণ করেন। একজন ফরাসি অভিজাত কর্তৃক কৃত একটি অপরাধের দোষ সম্পূর্ণভাবে ফরাসি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন আলফ্রেড ড্রেফুসের ঘাড়ে চাপানো হয়, প্রধানত এই জন্য যে তিনি একজন ইহুদি। ড্রেফুসকে দোষী সাব্যস্ত করা এবং জেলে আবদ্ধ রাখবার ফলে সমগ্র ফ্রান্সে সেমিটিক-বিরোধী বিক্ষোভের ঢেউ খেলে যায়। কোনো কোনো উদারপন্থী এই জুয়াচুরি প্রকাশ করে ড্রেফুসকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করলেও থিওডর হেরজেল এই শিক্ষা ভুলে যাননি। নবজাগরণের কেন্দ্রস্থল ফ্রান্সে এরও অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও যদি এরূপ সেমিটিক-বিরোধী কার্যকলাপের গোপন ধারা চলতে থাকে তবে ইহুদিদের একমাত্র ভরসা হল ইউরোপ ত্যাগ করা এবং নিজেদের জন্য কটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এই মনোভাব তিনি তাঁর "ইহুদি রাষ্ট্র" (Der Judenstaat) নামক গ্রন্থে ব্যক্ত করেন এবং আধুনিক ইহুদিবাদ আন্দোলন আরম্ভ করেন।

প্রারম্ভ থেকে ইহুদিবাদ হল ঊনবিংশ শতাব্দীর দুটো চিন্তাধারার সংমিশ্রণ। একটি হল 'প্রতিশ্রুত দেশে প্রত্যাবর্তনের' ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষা—যা ইহুদি-বিরোধী কার্যকলাপ এবং অত্যাচার হতে পলায়নের প্রয়োজনের দ্বার জোরদার হয়। অপরটি হল ঊনবিংশ শতাব্দীর উদার ও বিচিত্র জাতীয়তাবাদ, যা রাষ্ট্রকে উঁচু করে দেখে এবং এর মধ্যে মানবতার দুঃখ-কষ্ট দূরীকরণের সোপান অবলোকন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের প্রচলিত চিন্তাধারা অনুসরণ করে ধর্মনিরপেক্ষ ইহুদিগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপন করবার দ্বারাই সেমিটিক বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করা যায়। এটি তৎকালীন কিছুসংখ্যক অ-ইহুদি উদারপন্থীদেরকেও অনুপ্রাণিত করে। সেমিটিক-বিরোধী কার্যকলাপে ইহুদিগণ ভয় পায়, আর এ সকল উদারপন্থিগণ লজ্জিত হয়।

ইহুদিবাদ সংগঠনের প্রথম দিকে গোঁড়া ও উদারপন্থী ইহুদিদের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ হয়। গোঁড়া ইহুদিদের মতে ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তনই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ, অথচ ধর্মনিরপেক্ষ ইহুদিদের মতে রাষ্ট্রই গুরুত্বপূর্ণ স্থান নয়। ধর্মনিরপেক্ষবাদী থিওডর হারজেল এবং তার কোনো কোনো সহকর্মী

আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা বা যেখানেই পাওয়া যায় এরূপ একটি দেশের পরামর্শ দান করেন। ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইহুদিবাদী সম্মেলনে প্রতিনিধিবর্গ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে খাঁটি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের নিকট ফিলিস্তিনের একটি আবেগময় আবেদন রয়েছে, যা অন্য কোনো স্থানের হয়নি। একবার ফিলিস্তিনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ধর্মীয় ও অজ্ঞেয়বাদী ইহুদিগণ উভয়ে একযোগে সেই একক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজ করে যায়।

ইহুদি উপনিবেশিকতা

ফিলিস্তিন ছিল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের একটি অংশ। একে একটি ইহুদি রাষ্ট্রে পরিণত করবার জন্য প্রয়োজনের খাতিরে ইউরোপ থেকে দলে দলে ইহুদি আনয়ন করে এখানে বসতি স্থাপন করতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ছিল সর্বস্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। অতএব ইহুদিদেরকে তাদের স্বদেশী বাকি ইউরোপীয়দের ন্যায় একই পন্থা অবলম্বন করতে দেখলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেয়। উদাহরণস্বরূপ ফিলিস্তিনে উপনিবেশ স্থাপন করার কাজ তদারক করা ও অর্থ জোগাবার জন্য ইহুদিবাদিগণ বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ প্রতিষ্ঠা করে, যথা— 'ইহুদি কলোনিয়াল ট্রাস্ট' (Jewish Colonial Trust) 'কলোনাইজেশন কমিশন' (Colonization Commission), ইহুদি ন্যাশনাল ফান্ড (Jewish National Fund), 'ফিলিস্তিন অফিস' (Palestine Office) এবং 'ফিলিস্তিন ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি' (Palestine Land Development Company)। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনার কথা শুনে হারজেল সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের সাথে একটি সাক্ষাতের আয়োজন করে এবং প্রস্তাব করেন যে সুলতান ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি উপনিবেশের অনুমতি দান করলেন। আবদুল হামিদ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, অবশ্য তিনি সীমিতসংখ্যক ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করবার অনুমতিদানের প্রস্তাব দেন, তবে তাদেরকে ওসমানীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে হবে। হেরজেল ও তাঁর বন্ধুগণ ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি সরকারের নিকট আবেদন করেন এবং ফিলিস্তিনে ইহুদি উপনিবেশের বিনিময়ে সমস্ত ইহুদিদের আনুগত্য প্রকাশের প্রস্তাব দেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইহুদিবাদীদের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, গ্রেট ব্রিটেনই একমাত্র শক্তি যে তাদেরকে সাহায্য দিতে পারে। হেরজেল ১৮৯৯

www.pathagar.com

খ্রিস্টাব্দে সেসিল রড্‌সকে এবং ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে জোসেফ চ্যাম্বারলিনকে সম্মত করাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। ১৯০৪ সালে হেরজেল পরলোকগমন করেন এবং কয়েক বছর পর ডাঃ চেইম ওয়াইজম্যান নামক একজন রসায়নবিদ ও মূল ব্রিটিশ নাগরিকের সুযোগ্য নেতৃত্বের ওপর ইহুদিবাদী আন্দোলনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। হেরজেল ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ কয়েকটি ব্রিটিশ সরকারকে তাঁদের অনুরোধে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হন, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহুদিবাদী ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির প্রথম ঘোষণা প্রকাশিত হয় বৈদেশিক সচিব লর্ড বালফার কর্তৃক অর্থ পরিবেশক লর্ড রথচাইল্ডের নিকট ১৯১৭ সালে ২রা নভেম্বর লিখিত একটি পত্রের দ্বারা। এই পত্রই 'বালফার ঘোষণা' নামে পরিচিত।

১৯১৫ সালে নভেম্বর থেকে বর্তমান ১৯১৭ সালের নভেম্বর এই দুটো সংক্ষিপ্ত বছরের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন তিনটি দলের সাথে মহৎ চুক্তি সম্পাদন করে, যেগুলো পরস্পরবিরোধী। গ্রেট ব্রিটেন বোকামি করে বা ইচ্ছাকৃত অসদুদ্দেশ্যে এইগুলো সম্পাদন করেছে বলে মনে করা সম্ভবত ঠিক নয়। যুদ্ধের দুর্বিপাকে একটি 'দুর্ভাগ্যজনক ভুল' বলে সমগ্র ব্যাপারটিকে উড়িয়ে দেয়াও সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সুবিবেচনার সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করার জন্য। কিন্তু কখনো অভাবিত কিছু ঘটে গেলে সাম্রাজ্যের মঙ্গলার্থে পরিবর্তন সাধন করা হয় এবং এই পরিবর্তনে কোনো পক্ষ বিরূপ হলে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করা হয় না। সাম্রাজ্যবাদী খেলার নিয়ম।

১৯১৫ সালে ব্রিটিশ নীতি ছিল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পরিবর্তে ফারটাইল ক্রিসেন্টে একটি আরব রাষ্ট্র সৃষ্টি করা, যদ্বারা ব্রিটেন বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়। অবস্থার পরিবর্তন না হলে গ্রেট ব্রিটেন হয়ত তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করত। কিন্তু অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিবর্গ, বিশেষত ফ্রান্সের নিকট হতে চাপ আসে। তারা ফারটাইল ক্রিসেন্টে স্বীয় অংশ নিয়ন্ত্রণ করার দাবি করে। ব্রিটেন এতদঞ্চলের দক্ষিণ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে শুধু ফ্রান্সকে উত্তর ভাগ দান করবার পর। এটিই ১৯১৬ সালের সাইসক-পিকট চুক্তির মূল কথা। ফিলিস্তিনকে আন্তর্জাতিকীকরণের দাবি তুলে রাশিয়া ব্যাপারটিকে আরও জটিল করে তোলে, কারণ, অত্র অঞ্চলে রুশ অর্থডক্স চার্চের স্বার্থ জড়িত। আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নে ফরাসিগণও জড়িত হয়, কারণ পবিত্র স্থানগুলোতে তাদের স্বার্থও নিহিত। এটি ব্রিটিশ নীতি নির্ধারকদেরকে বিশেষত ভারত সরকারকে

www.pathagar.com

ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, কারণ ফ্রান্সকে সুয়েজ খালের অত নিকটবর্তী অবস্থানে দেবার ব্যাপারে তারা নারাজ। ইহুদিবাদিগণ সর্বদা যুক্তি প্রদর্শন করে যে, ফিলিস্তিনে জাতীয় আবাসভূমি হলে অত্র অঞ্চলে গ্রেট ব্রিটেনের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে এবং ফিলিস্তিনে একটি কৃতজ্ঞ ইহুদিবাদী সরকার সর্বদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বন্ধু থাকবে।

ব্রিটিশ সরকারের সাথে এই সহজ চুক্তির কঠিন বাধা আসে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিবাদ-বিরোধী ইহুদিদের পক্ষ থেকে। বালফার ঘোষণার মূল বচন পরীক্ষা করলে এটি পরিষ্কার হয়ে পড়ে। 'মহামহিম সম্রাটের সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদি লোকদের একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠাকে সম্প্রীতির চোখে দেখে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের সমস্ত সহযোগিতা প্রদান করবে, তবে পরিষ্কারভাবে মনে রাখতে হবে যে, ফিলিস্তিনে বসবাসকারী অ-ইহুদি সম্প্রদায়ের বেসামরিক ও ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ন করে এরূপ কোনো কাজ করা হবে না অথবা অন্য যে কোনো দেশে বসবাসকারী ইহুদিদের অধিকার ও রাজনৈতিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হবে না।'

শেষ বাক্যটি সংযুক্ত করা হয় ইহুদিবাদ-বিরোধী ইহুদিদের ভয় দূর করার জন্য। ইহুদি সমস্যার সমাধান দেখতে পায় সংমিশ্রণের মধ্যে, পৃথকীকরণের মধ্যে নয় এবং তাই একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে তাদের স্ব স্ব জন্মভূমিতে তাদের জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ন হোক তারা চায় না। প্রথম বাক্যে জাতীয় 'আবাসভূমি' বলতে যে 'জাতীয় রাষ্ট্র' বুঝায় তা ইহুদিবাদিগণ এবং সম্ভবত বালফারও হৃদয়ঙ্গম করেন। ১৮৯৪ খিস্টাব্দে প্রথম বিশ্ব ইহুদিবাদী সম্মেলনে রাষ্ট্রের পরিবর্তে 'আবাসভূমি' ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ইহুদিবাদের একজন প্রসিদ্ধ নেতা ডঃ ম্যাক্স নরদও (Dr. Max Nordau)-এর ভাষায় 'সুবিধাবাদের স্বার্থে' এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইহুদিবাদিগণ সম্ভবত বিশ্বাস করে যে ফিলিস্তিনবাসীদের বেসামরিক ও ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ন না করেই তারা ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করতে পারবে। পরবর্তী ফয়সাল-ওয়াইজম্যান চুক্তির দ্বারা তা নিশ্চিত করা হয়।

বালফার ঘোষণা শ্রবণ করবার পর বাদশাহ্ হোসেন হতবুদ্ধি হয়ে যান। 'বর্তমানে বসবাসকারী লোকদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারলে' ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি বসতির অনুমতি দেয়া হবে—এই

www.pathagar.com

ব্যাপারে হোসেনকে নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য গ্রেট ব্রিটেন ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে আরব ব্যুরোর অধিনায়ক হোর্গাথকে কায়রো প্রেরণ করে। ব্রিটিশগণ ইহুদিবাদীদেরকে গ্রহণ করার ব্যাপারে বাদশাহ হোসেনকে উপদেশ প্রদান করে এই জন্যও যে 'আরবদের বিষয়ে বিশ্বের ইহুদিদের বন্ধুত্ব তাদের সমর্থনের সমান, বিশেষত যে সকল দেশে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান।' কিছুকাল পর একটি ইঙ্গ-ফরাসি যুক্ত ঘোষণা 'জনসাধারণের স্বাধীন নির্বাচিত' একটি সরকার গঠনের ব্যাপারে আরবদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করে। বাদশাহ হোসেন ও ফয়সাল উভয়ে এই সব প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রলুব্ধ হন এবং সাইক্স্-পিকট চুক্তির ন্যায় এইগুলোকেও গ্রহণ করেন।

প্যারিস শান্তি সম্মেলন

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলে তিনটি দল ফারটাইল ক্রিসেন্টের সর্বত্র বা কিয়দংশে প্রাধান্য বিস্তার করতে চেষ্টা করে। প্রথম ও শক্তিশালী দল হল ইঙ্গ-ফরাসি দল। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি ও যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বয়ে 'বৃহৎ চতুষ্টয়' গঠন করে এবং শান্তি সম্মেলন নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স ঐকমত্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। পূর্বাঞ্চলে ফ্রান্স যেহেতু কোনো যুদ্ধ করে নাই, তাই ব্রিটিশ সৈন্যগণ সমগ্র ফারটাইল ক্রিসেন্ট তাদের অধিকারে রাখে এবং কোনো এলাকা ছেড়ে দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। অপরদিকে ফ্রান্স সাইক্স্-পিকট চুক্তি বাস্তবায়নের ওপর জোর দেয়। তারা প্রায় ২০,০০০ ফরাসি সৈন্য লেবাননে আনয়ন করে এবং ব্রিটিশদেরকে এ স্থান ত্যাগ করার দাবি তোলে। এদিকে ব্রিটিশগণ তেল সমৃদ্ধ মৌসুল এবং ফিলিস্তিনের 'আন্তর্জাতিকীকরণের' ব্যাপারে চুক্তির কিছু রদবদল প্রত্যাশা করে। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তৃতা চলাকালীন বিবদমান দুই সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্তর্বিরোধের ফলে পরস্পরকে দোষী সাব্যস্তকরণ ও প্রতিশোধ গ্রহণের অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ফারটাইল ক্রিসেন্টের কিয়দংশে প্রাধান্য বিস্তারের প্রত্যাশী দ্বিতীয় দলটি হল ইহুদিবাদী সংগঠন। ইহুদিবাদিগণ আরবদের চাইতে অধিক শক্তিশালী, কারণ তাদের দাবি পূরণের ব্যাপারে সহায়তা প্রদানের জন্য 'বৃহৎ চতুষ্টয়ের' দেশগুলোতে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ রয়েছে। বালফার ঘোষণাকে তারা তাদের ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত চুক্তি হিসাবে রাখতে চায় না। তারা একে মধ্যপ্রাচ্যের নীতিনির্ধারক সমস্ত কিছুর মধ্যে স্থান দিতে চায়। অবশ্য অনেক

www.pathagar.com

ইহুদিও রয়েছে যারা এই ইহুদিবাদী পরিকল্পনার ঘোর বিরোধী। প্রায় ৩০০ নেতৃস্থানীয় আমেরিকান ইহুদি প্রেসিডেন্ট উইলসনের নিকট ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে একটি পত্র প্রেরণ করেন। ইউরোপে অনেক নেতৃস্থানীয় ইহুদিও রয়েছেন যাদের মতে ইহুদিবাদ তাঁদের মর্যাদাকে বিপদগ্রস্ত করছে এবং আরও ব্যাপক সেমিটিক-বিরোধী কার্যকলাপের সুযোগ করে দিচ্ছে।

ফারটাইল ক্রিসেন্টের প্রাধান্য প্রত্যাশী তৃতীয় ও দুর্বলতম দল হল ফয়সালের প্রতিনিধিত্বে অত্র অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ। আরবগণ গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিশ্রুত স্বাধীনতা দাবি করে। তারা তাদের আশা–আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রীভূত করে উড্রু উইলসনের ওপর এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আদর্শের ওপর—যে আদর্শ ইঙ্গ-ফরাসি জোট ও ইহুদিবাদিগণ নিজেদের উপর ছাড়া অন্য কোথাও প্রয়োগ করতে চায় না। দুর্বল আরবগণ নিজেদের অন্তর্বিরোধের দরুন আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। সাধারণভাবে খ্রিস্টানগণ এবং মেরোনাইটগণ একটি সংখ্যাগুরু মুসলিম রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু হতে ভয় পায়। মেরোনাইটদের পুরাতন রক্ষাকারী হিসাবে ফ্রান্স 'সিরিয়ান কমিশন' নামে একটি দল গঠন করে। এই কমিশন প্যারিস গমন করে এবং ফয়সাল ও তাঁর মুসলিম আরবদের ইউনিয়নের বিরোধিতা করে। অধিকন্তু বাগদাদ ও দামেস্কের আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান। কেউ কেউ একটি যুক্তরাজ্য চান, আবার কেউ কেউ সম্ভবত বাস্তব দিক বিবেচনা করে রাষ্ট্রের এক ফেডারেশন পছন্দ করেন।

ফয়সাল লন্ডন গমন করেন এবং প্রথমবারের মতো সাইক্স্-পিকট চুক্তি সম্পর্কে অবগত হন। ব্রিটিশগণ তাঁকে ফরাসিদেরকে গ্রহণ করতে বলে এবং ইহুদিবাদী নেতৃবৃন্দ তাঁর সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করেন। ফয়সাল আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে বলে যান, কিন্তু তিনি বুঝলেন যে, বাস্তব রাজনীতিতে এ সকল আদর্শের কোনো স্থান নেই। সম্ভবত এই বোধশক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ১৯১৯ সালের জানুয়ারিতে ইহুদিবাদী সংগঠনের পুরোধা ওয়াইজম্যানের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই দলিলে ফয়সাল 'ব্যাপকহারে ইহুদিদের ফিলিস্তিন আগমন' গ্রহণ করেন, তবে শর্ত হল "আরব কৃষক ও প্রজা-চাষিদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।" অপরদিকে ইহুদিবাদিগণ 'ফিলিস্তিনে বিশেষজ্ঞদের একটি দল প্রেরণ করে ফিলিস্তিনের তথা আরব রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা জরিপ করতে' সম্মত হয়। একটি 'আরব রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার শর্তসাপেক্ষে ফয়সাল স্বাক্ষর করেন, কিন্তু পরিণামে তা প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

করা হয় নাই। এই চুক্তি পরবর্তী অনেক রক্তপাত হয়ত এড়াতে পারত যদি না আরব রাষ্ট্রবিরোধী সাইকস্-পিকট চুক্তি মাঝখানে থাকত।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট উইলসন মনে করেন বৃহৎ শক্তিবর্গ তাঁর চৌদ্দ দফা গ্রহণ করে তাদের সমস্ত গোপন চুক্তিসমূহ বাতিল করেছে। উত্তেজনা প্রশমিত করবার জন্য জাতিপুঞ্জের হুকুমনামা প্রথার ভূমিকায় একটি আপস করা হয়। এর ভিত্তি হল এই যে, আরবগণ নিজস্ব সরকার গঠন করবার ন্যায় উপযুক্ততা অর্জন করেনি এবং একটি হুকুমনামা প্রাপ্ত শক্তি তাদেরকে এই বিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলবে। প্রেসিডেন্ট উইলসন এই আদর্শ গ্রহণ করেন, কারণ এটি আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার আদর্শ প্রত্যাখ্যান নয়, স্থগিত করা মাত্র। কিন্তু কোন শক্তি কোন কোন এলাকায় হুকুমনামা লাভ করবে তা নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। উইলসন ফারটাইল ক্রিসেন্টে একটি যুক্ত কমিশন প্রেরণ করে জনমত যাচাই করবার প্রস্তাব করেন। ফ্রান্স এতে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, ব্রিটেন কোনো মন্তব্য থেকে বিরত থাকে এবং ইহুদিবাদিগণ এর বিরোধিতা করে। কিন্তু ১৯১৯ সালের আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট উইলসন অত্র অঞ্চলে কিং-ক্রেন কমিশন প্রেরণ করেন। কমিশন তার রিপোর্ট নিয়ে প্রস্তুত হতে হতে উইলসন পরাজিত ও রুগ্নব্যক্তিতে পরিণত হন। শুধু একটি ছাড়া তাঁর চৌদ্দ দফার প্রত্যেকটি পরিবর্তন করা হয় কিংবা প্রত্যাখ্যান করা হয় অথবা কার্যকারিতা মুলতবি রাখা হয়। অবশিষ্ট একটি দফা, জাতিপুঞ্জে বাস্তব রূপ লাভ করে, কিন্তু তাঁর স্বীয় দেশ তা প্রত্যাখ্যান করে। তিন বছর অতিক্রান্ত হবার পূর্বে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি।

শান্তি সম্মেলন শেষ নাগাদ সাইক্স্-পিকট চুক্তি, ফিলিস্তিন ও হুকুমনামা নিয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়। ইহুদিবাদিগণ বালফার ঘোষণাকে একটি আন্তর্জাতিক ঘোষণা হিসাবে রূপদান করতে সক্ষম হয়। অবশ্য আরবগণ একটি তুর্কি মুসলিম প্রভুর—যার বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করে স্থলে দুটি ইউরোপীয় খ্রিস্টান প্রভুর পদসেবায় নিয়োজিত হয়।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়
হুকুমনামার (Mandate) অধীনে ফারটাইল ক্রিসেন্ট

হুকুমনামা প্রদানের একটি উদ্দেশ্য হল ইউরোপীয় শক্তিবর্গ যাতে একটি নতুন নামে তাদের পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ চালাতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এটি হল জাতিপুঞ্জের আশীর্বাদ নিয়ে 'শ্বেতাঙ্গ লোকের বোঝা' বৃদ্ধি। হুকুমনামা–প্রথা সাইক্‌স্‌-পিকটে চুক্তির প্রকৃতি পরিবর্তন করেনি। এনিয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স দুটি সমস্যায় উপনীত হয়। একটি হল ফিলিস্তিন, অপরটি হল তেলসমৃদ্ধ মৌসুল। উভয় সমস্যাই প্যারিস সম্মেলনের বাইরে সমাধান করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল স্যানরেমোতে নিস্পত্তি হয়। গ্রেট ব্রিটেনকে ফিলিস্তিনের ওপর হুকুমনামা প্রাপ্ত শক্তি বলে স্বীকার করা হয়। ইহুদিবাদীদের প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ, জাতিপুঞ্জ গ্রেট ব্রিটেনকে বালফার ঘোষণা কার্যকরী করতে আদেশ দেয়। মৌসুল অঞ্চলে তেল থাকার দরুন গ্রেট ব্রিটেন এই মর্মে সাইকস-পিকট চুক্তির রদবদল করবার জন্য অনিচ্ছুক ফ্রান্সের নিকট ধরনা দেয়। এই অঞ্চলের উপর তুরস্কের আধিপত্য দাবি করবার ফলে ব্যাপারটি আরও ঘোলাটে আকার ধারণ করে।

ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানি

প্রাচীনকালে দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের ন্যায় উত্তর ইরাকেও তেল রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাণিজ্যিক আকারে তেল লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে উপদেশ দেয়া হয়। একটি বিশেষ আদেশে ওসমানীয় সুলতান ও দ্বিতীয় আবদুল হামিদ মৌসুল ও বাগদাদ প্রদেশের অনুমতিপত্র 'বেসামরিক তালিকায়', অর্থাৎ নিজের নামে পরিবর্তন করেন।

www.pathagar.com

১৯০৪ হতে ১৯১২ সাল পর্যন্ত একনাগাড়ে অনেক বিদেশি তেল অনুসন্ধানকারী দল অনুমতি লাভের আগ্রহ প্রকাশ করে। জার্মানগণ ইস্তাম্বুলে প্রতিষ্ঠিত দুৎসে ব্যাংকের (Deutche Bank) মাধ্যমে জড়িত হয়। ডি' আর্কির ইঙ্গ-পারস্য তেল কোম্পানির মাধ্যমে বৃটিশের স্বার্থ জড়িত থাকে। রয়েল ডাচ শেল কোম্পানি এর সহায়তাকারী এ্যাংলো-স্যাকশন তেল কোম্পানির মাধ্যমে আগ্রহী হয়। শেষ পর্যন্ত তথাকথিত চেষ্টার গ্রুপের মাধ্যমে মার্কিনগণও কথাবার্তা চালায়। মধ্যপ্রাচ্যের তেল থেকে মার্কিনদিগকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ব্রিটিশ, জার্মান ও ডাচ ব্যবসায়িগণ ১৯১২ সালের তুর্কি পেট্রোলিয়াম কোম্পানি গঠন করে। এই কোম্পানির অংশসমূহের মধ্যে ব্রিটিশ ৫০ শতাংশ এবং জার্মান ও ডাচগণ প্রত্যেকে ২৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯১৪ সালে ওসমানীয়দের সাথে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করা হয় এবং ২৮শে জুন প্রধান উজির সাঈদ হালিম এক পত্রে জার্মান রাষ্ট্রদূতকে বলেন যে, তার সরকার 'তুর্কি পেট্রোলিয়াম কোম্পানিকে এগুলো (মৌসুল ও বাগদাদ) ইজারা দিতে এবং ... চুক্তির সাধারণ শর্তাবলি .. স্বয়ং নির্ধারিত করার অধিকার রাখতে রাজি।' প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার ফলে এই ব্যাপারে পরবর্তী কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। কোম্পানি একটি সম্মতিপত্র ছাড়া কোনো অনুমতিপত্র লাভ করেনি। পরবর্তী বছরগুলো এর বৈধতার ওপর প্রশ্ন তোলা হয়।

এইদিকে মার্কিনগণের প্রতিনিধিত্ব করে চেষ্টার গ্রুপ। ১৯০৯ সালের এডমিরাল কলবি এম. চেস্টার নামক একজন অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন নৌবাহিনীর অফিসার পূর্ব এশিয়া মাইনর ও উত্তর মেসোপোটামিয়ায় রেলপথ নির্মাণের জন্য মহামান্য দরবার থেকে একটি অনুমতিপত্র লাভ করেন। রেলপথ চুক্তির মধ্যে এও উল্লেখ ছিল যে, কিরকুক ও মৌসুল হয়ে পারস্য সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত রেলপথের উভয় পার্শ্বে ২০ কিলোমিটার পরিমিত এলাকায় তারা তেলসহ অন্যান্য খনিজদ্রব্যও অনুসন্ধান করবে। তুর্কি গণপূর্তমন্ত্রী এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং ১৯১১ সালের অনুমোদনের জন্য পার্লামেন্টে প্রেরণ করেন। কিন্তু বলকান যুদ্ধের ফলে অনুমোদন বিঘ্নিত হয় এবং ১৯১৪ সালের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা প্রথম মহাযুদ্ধের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনুমোদন না পাওয়ায় এই অনুমতিপত্র অকেজো হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এই অনুমতিপত্রের বৈধতার উপর প্রশ্ন তোলা হয়।

বাহ্যত সাইক্স্-পিকট কেউই ১৯১৪ সালে এই সকল চুক্তিপত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, ফলে যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার মধ্যে তাঁরা তেল

www.pathagar.com

সম্পর্কে বিবেচনা করেননি। তবে ব্রিটিশ কর্তকর্তাদের মধ্যে যাঁরা তেল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাঁদের ধারণা তুর্কি পেট্রোলিয়াম কোম্পানির অনুমতিপত্র কার্যকর। কিন্তু ফ্রান্সের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকায় তেলে অনুমতিপত্র বিসদৃশ্যকর। ব্রিটিশ বৈদেশিক সচিব স্যার এডওয়ার্ড গ্রে ১৯১৬ সালের ১৫ই মে এক গোপন পত্রে ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে এই অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত করেন। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেনসূঁ (Clemenceau) লন্ডন সফরে গমন করলে বিষয়টি পুনরায় উত্থাপন করা হয়। মোটামুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, মৌসুল তেলের একটি অংশ এবং রুহরে ফরাসি দাবির পক্ষে ব্রিটিশ সমর্থনের বিনিময়ে ফ্রান্স গ্রেট ব্রিটেনকে স্থান দিতেও পারে। এর ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যে পরবর্তী আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। নতুন চুক্তি অনুসারে তুর্কি পেট্রোলিয়ামের ২৫ শতাংশ শেয়ারের বিনিময়ে ফ্রান্স ব্রিটেনের নিকট মৌসুল প্রদেশ ছাড়িয়ে দেয়। এই ২৫ শতাংশের মূল মালিক ছিল জার্মানি। এই পরিবর্তন দেখাবার জন্য নতুন মানচিত্র তৈরি করা হয় এবং সমগ্র পরিকল্পাটিকে ১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল স্বাক্ষরিত স্যানরেমো চুক্তির অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তবে স্যানরেমো চুক্তি তেল সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান দেয়নি। মধ্যপ্রাচ্যের তেলে মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোর আগ্রহ এবং মৌসুলের উপর তুর্কি জাতীয়তাবাদীদের দাবির ফলে বিষয়টি ঘোরালো আকার ধারণ করে। স্যানরেমোতে উপস্থিত একজন মার্কিন পর্যবেক্ষক তেল অনুমতিপত্র সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সরকার মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোর জন্য এক সংস্থায় একটি অংশ দাবি করে। মার্কিন যুক্তির ভিত্তি হল সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা না করলেও যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অর্থ ব্যয় করেছে। তদুপরি, ব্রিটেন ও ফান্স কর্তৃক একটি তেল-অনুমতিপত্রের ওপর একচেটিয়া অধিকার লাভ মার্কিন অবারিত দ্বার নীতির পরিপন্থী। পরে যুক্তরাষ্ট্র চেস্টারের অনুমতিপত্র উত্থাপন করে এবং যুক্তি প্রদর্শন করে যে এটিও তুর্কি পেট্রোলিয়াম কোম্পানির ন্যায় বহাল রয়েছে।

১৯২৩ সালের পর্যন্ত এই বাদানুবাদ চলতে থাকে এবং ল্যুজ্যানের (Lausanne) সম্মলনে এটি একটি আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। এই সম্মেলনে আতাতুর্ক মৌসুল প্রদেশ দাবি করেন। এক সময় তুর্কি ও মার্কিনগণ একটি সমঝোতা নিয়ে আলোচনা করে, যদ্বারা মার্কিনগণ তুর্কিদেরকে মৌসুল লাভে

www.pathagar.com

সহায়তা করলে বিনিময়ে তুর্কিগণ মার্কিনদেরকে মৌসুল তেল দান করিবে। ইতোমধ্যে ব্রিটিশগণ বুঝতে পারে যে ইরানের ন্যায় ইরাকের তেল ব্যবসায়ে তারা মার্কিনিদের দূরে রাখতে পারবে না। জাতিপুঞ্জের পরিষদ মৌসুল প্রশ্নে গ্রেট ব্রিটেনের স্বপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করলে তুর্কিগণ ব্রিটিশদের সাথে সমঝোতায় আবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অতএব কিঞ্চিত সীমান্ত রদবদল এবং তেল থেকে সেলামি বাবদ ৯০ শতাংশ শেয়ার নিয়ে তুর্কিগণ মৌসুল থেকে তাদের দাবি প্রত্যাহার করে মৌসুল তেলের শেষ মীমাংসার কাহিনি এই স্থলে বিবৃত করবার পক্ষে খুবই জটিল। একটি নতুন পন্থা অনুযায়ী ইরাকি সরকার তুর্কি পেট্রোলিয়াম কোম্পানিকে ২৪ খণ্ড জমির অনুমতিপত্র দান করে। এই কোম্পানির পরিবর্তিত নাম 'ইরাক পেট্রোলিয়াম'। ব্রিটিশ, ফরাসি, ডাচ ও মার্কিন গ্রুপগুলোর প্রত্যেকে ২৩.৭৫ শতাংশ লাভ করে এবং অবশিষ্ট ৫ শতাংশ সার্কিশ গুলবেংকিয়ানের (Sarkis Gulbenkian) হাতে যায়। সার্কিশ ১৯১৪ মূল অনুমতিপত্রে একজন দালাল, যিনি যেভাবেই হউক পরবর্তী আলাপ-আলোচনায় নিজের স্থান করেন। এই বন্দোবস্ত যেহেতু শুধু ২৪টি খণ্ডের জন্য এবং ইরাকি সরকার অবশিষ্ট খণ্ডগুলো প্রতিযোগিতামূলকভাবে দিতে পারে তাই এতে খুব প্রতিযোগিতা চলে এবং অধিকারের কলহ অনেকদিন চলতে থাকে।

ফয়সাল এবং ফরাসিগণ

ইতোপূর্বে আমরা লক্ষ করেছি, প্যারিস শান্তি সম্মেলন ফারটাইল ক্রিসেন্টের ব্যাপারে কোনো পরিষ্কার সিদ্ধান্ত ছাড়াই মুলতবি হয়ে যায়। ফয়সাল এবং ক্ষুদ্র সংখ্যক আরব নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্ট উইলসনের কিং-ক্রেন কমিশনের ওপর তাদের আশার দৃষ্টি নিবন্ধ করেন। কমিশন ঐ এলাকা সফল করে এবং দুটি হুকুমনামার সুপারিশ করে; একটি ইরাকে এবং অপরটি সিরিয়ায়। আরও সুপরিশ করে যে, ব্রিটেনকে ইরাকের হুকুমনামা ও যুক্তরাষ্ট্রকে সিরিয়ার হুকুমনামা দেয়া হউক, সিরিয়ার বিভক্তিকরণ মওকুফ করা হউক এবং ফয়সালকে সিরিয়ার শাসনতান্ত্রিক বাদশাহ করা হোক। এই রিপোর্টে সঠিক এবং পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয় যে, ফ্রান্সকে সিরিয়ার উপর হুকুমনামা প্রদান করলে যুদ্ধ বাধবে। কিন্তু কেহই এই রিপোর্টের প্রতি কর্ণপাত করে নাই এবং এমনকি তিন বছর অতিক্রান্ত হবার পূর্বে ইহা প্রকাশও করা হয়নি।

www.pathagar.com

তবে ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-ফরাসি চুক্তির দ্বারা আরবগণ হতাশ হয়, যাতে দেখানো হয় যে, সাইক্স্-পিকট চুক্তি তখনও দাফতরিক নীতি। ফরাসি সেনাবাহিনী ব্রিটিশদের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং ফয়সালের প্রতিবাদ নিষ্ফল প্রতীয়মান হয়। ইঙ্গ-ফরাসি নীতির পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ফাতাত সোসাইটির নেতৃত্বে ১৯২০ সালের ২০শে মার্চ সিরীয় কংগ্রেস দামেস্কে মিলিত হয় এবং সিরিয়ার (তন্মধ্যে লেবানন এবং ফিলিস্তিনও শামিল) স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তারা ফয়সালকে রাজমুকুট গ্রহণ করতে আহ্বান করে এবং তিনি তা গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকারদ্বয় কংগ্রেসের কার্যাবলি অগ্রাহ্য করে এবং সানরেমোর সম্মেলনের প্রস্তুতি চালিয়ে যায় যা ফারটাইল ক্রিসেন্টের ভাগ্য নির্ধারণ করে।

তুরস্কের গোপন বিভক্তিকরণ ও সাইকস-পিকট চুক্তি ১৯১৫ সাল-১৯১৭ সাল

ফরাসি ও সিরীয়গণ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সিরিয়ায় নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত জেনারেল গোরোদ (General Gourand) ফয়সালের নিকট একটি চরমপত্র প্রেরণ করেন যাতে তিনি অনতিবিলম্বে ফরাসি হুকুমনামা গ্রহণ করতে, ফরাসি কাগজি মুদ্রা চালু করতে, ফরাসিদের আলেপ্পো অধিকার স্বীকার করতে, সিরীয় সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করতে, , বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগদান বন্ধ করতে এবং ফরাসিবিরোধী বিক্ষোভের জন্য দায়ী লোকদের শাস্তি প্রদানের দাবি করেন। সিরীয়গণ বাধা প্রদান করতে চায় কিন্তু তাদের গোলাবারুদের পরিমাণ ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার মতো। ফয়সাল চরমপত্র গ্রহণ করেন যা দ্বারা ফরাসি জেনারেল নিশ্চয়ই হতবাক হয়ে যান, কারণ তিনি আরও আটটি জটিল দাবি প্রেরণ করেন। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ফরাসিগণ সমগ্র সিরিয়া দখল করতে চায়। ফলে, যুদ্ধ কিছুতেই এড়ানো গেল না। ১৯২০ সালের ২৪শে জুলাই-এর সংঘটিত মাইসালানের যুদ্ধ অর্ধেক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং ফরাসি বাহিনীর আফ্রিকান, আলজেরীয়, মরক্কো ও সেনেগলি সৈন্যগণ দামেস্ক অভিমুখে অগ্রসর হয়। ২৫শে জুলাই তারা শহরে প্রবেশ করে এবং ১৯১৮ সালের ১লা অক্টোবর বিজয়ীবেশে প্রবেশের ২২ মাস পর ফয়সাল দামেস্ক ত্যাগ করেন। ফরাসিদের সাথে ব্রিটিশদের সুসম্পর্ক বিদ্যমান এবং আরবদের খাতিরে তারা ভঙ্গ করতে

www.pathagar.com

নারাজ। তবে তারা ফয়সালকে সসম্মানে তাদের এলাকায় গ্রহণ করে।

১৯২২ সালের জুলাই মাসে জাতিপুঞ্জের পরিষদ সিরিয়া-লেবাননের ওপর ফরাসি হুকুমনামা এবং ফিলিস্তিন ও ইরাকের উপর ব্রিটিশ হুকুমনামা অনুমোদন করে। ১৯২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র এই হুকুমনামাগুলো স্বীকার করে নেয়।

সিরিয়া-লেবাননের ওপর হুকুমনামা

শুধু সিরীয় ও লেবাননিদেরকে স্বীয় শাসন শিক্ষালাভ করতে সহায়তা করার উদ্দেশে ফরাসিগণ এত কষ্ট স্বীকার করে হুকুমনামা লাভ করেছে– এটা চিন্তা করা হাস্যাস্পদ। এখানে-সেখানে সম্ভবত কোনো কোনো ফরাসি কর্মকর্তা এরূপ চিন্তা করে, কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য লাভ। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে সম্ভবত ফ্রান্সই একমাত্র দেশ যাদের কঠোর পরহিতকর উদ্দেশ্য রয়েছে; অতীতে যেরূপ সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, এরা অপাশ্চাত্য বিশ্বের মধ্যে ফরাসি সাংস্কৃতিক ছোঁয়াচ বিতরণ করতে ইচ্ছুক। সম্ভবত সাংস্কৃতিক আধিপত্যের জন্য ফ্রান্স অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধাদি বিসর্জন দিয়েছে, যা গ্রেট ব্রিটেন কখনও করতে পারে নাই। এর সর্বোত্তম উদাহরণ মধ্যপ্রাচ্যে পাওয়া যায়, যেখানে মিসর ও ইরানের ন্যায় দেশে ব্রিটেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাদি ভোগ করে, অথচ তথায় ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতি প্রবল।

লেবাননে ফরাসি স্বার্থ সুদূরপ্রসারী। ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেসুঁ প্রেসিডেন্ট উইলসনকে নিশ্চিতভাবে বলেন যে, ফ্রান্সের সিরিয়ায় অবস্থান না করাটা 'জাতীয় অপমান যা একজন সৈনিকের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার শামিল।' এখানে উল্লেখ করা যায় যে, একই তেজস্বিতা প্রকাশ করে ১৯৪৬ সালে জেনারেল দ্য গল সিরিয়া-লেবানন হতে বহিষ্কৃত হন।

এরূপ জাতীয় ও সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য নিয়ে ফ্রান্স আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং যে সকল দল ফ্রান্সকে সমর্থন করে তাদের সহায়তা করে। এই সকল সমর্থনকারী ছিল সংখ্যালঘু খ্রিস্টান, আলাভি কুর্দ, আর্মেনীয় প্রভৃতি। সুপরিলক্ষিত বিভক্ত করার নীতি অবলম্বন করে ফরাসি রাষ্ট্রদূত জেনারেল গৌরোদ ক্ষুদ্র দেশটিকে পাঁচভাগে ভাগ করেন। এইগুলো হল :

১। বৃহৎ লেবানন, এর মধ্যে রয়েছে লেবানন ও এন্টি-লেবানন পর্বতমালা এবং ত্রিপলীর উত্তর হতে ফিলিস্তিন পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল ভাগ।

www.pathagar.com

২। লাতাকিয়া বা ত্রিপোলীর উত্তরাংশে আলাভি সমুদ্রোপকূল,

৩। আলেপ্পো

৪। দামেস্ক এবং

৫। জাবাল দ্রুজে বা দামেস্কের দক্ষিণে অবিস্থত দ্রুজে পর্বতমালা।

এই বিভক্তি প্রথম থেকেই অবাস্তব প্রমাণিত হয়। বিভিন্ন ফরাসি রাষ্ট্রদূতগণ বিভিন্ন প্রকারে রাষ্ট্রজোটের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুটি পৃথক প্রশাসনের উন্মেষ ঘটে, একটি বৃহৎ লেবাননের জন্য এবং অপরটি অবশিষ্ট চারটি ভাগের সম্মিলিত অংশের জন্য যাকে পরে সিরিয়া বলা হয়। এই দুটির মধ্যে শাসনকার্যের দিক থেকে লেবাননই ফ্রান্সের জন্য সহজতর হয় এবং তাও সহজতর হয় প্রধানত মেরোনাইটদের জন্য কারণ তারা সর্বদাই ফরাসিদের সাথে সহযোগিতা করে।

১৯২০ সালে ফয়সালের বহিষ্কার থেকে ১৯৪৬ সালের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত সিরিয়ার ইতিহাস হল দাঙ্গা, বিদ্রোহ যুদ্ধের ইতিহাস। এর পিছনে দুটি কারণ রয়েছে। একটি হল, আরবিভাষী বিশ্বের অন্য যে কোনো এলাকার তুলনায় সিরিয়ায় আরব জাতীয়তাবাদ তখনও এবং বর্তমানেও অতি শক্তিশালী। এই সিরিয়া-লেবাননেই আরববিবাদ প্রথম শুরু হয় এবং সেই হোসেন-ম্যাকমাহন পত্রালাপের সময় সিরিয়ায় ফাতাত সমিতিই প্রথম সম্মিলিত আরব রাজত্বের প্রস্তাব করে। ওসমানীয় প্রশাসনের সময় 'সিরিয়া' বলতে লেবানন ও ফিলিস্তিন বুঝাত। সিরীয়গণ কখনও পৃথক হতে ইচ্ছুক ছিল না বা সক্ষমও হয়নি। তদুপরি আরব ঐক্যের ব্যাপারে সিরীয়গণ একটি বিশেষ দায়িত্ব অনুভব করে, কারণ দামেস্ক ছিল প্রথম ও একমাত্র সম্মিলিত আরব সাম্রাজ্যের, অর্থাৎ উমাইয়াদের রাজধানী।

সিরীয়বাসীদের বিপত্তির দ্বিতীয় কারণ হল ফরাসিদের অযোগ্য প্রশাসন। মোটামুটিভাবে ফরাসিগণ হল গর্বিত, নীচমনা, অনুপোযোগী, বিনীতভাবে পুরুষানুক্রমিক ও কঠোর। ধর্মানুসারে জনসাধারণকে বিভক্ত করাই তাদের মূলনীতি। কিন্তু সামরিক রাষ্ট্রদূতগণ, যারা সম্ভবত ফরাসিদের ঐতিহ্যবাদী ধর্মযাজক শ্রেণি বিরোধী নীতি সমর্থন করে না এবং তাই রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রচারকার্যে সাহায্য করবার জন্য এবং ক্যাথলিক খ্রিস্টানদেরকে বাকি ধর্মাবলম্বীদের চাইতে অধিক সুবিধা প্রদান করবার জন্য বেশি বাড়াবাড়ি করে।

www.pathagar.com

একদিকে ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদ এবং অপরদিকে সিরিয়াবাসীদের স্বাধীনতার আগ্রহের ফলে ১৯২৫ সালে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এর তাৎক্ষণিক কারণ হল ক্যাপ্টেন কারবিলেটের নিবুর্দ্ধিতা, যিনি ড্রুজে নেতা সুলতান আল-আতরাশের পূর্ব অনুমতি ছাড়াই কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। আবার সমগ্র ব্যাপারটির উপর রাষ্ট্রদূত জেনারেল সারাইলের কঠোর ব্যবহার, যিনি ড্রুজে নেতৃবৃন্দকে একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করে কারারুদ্ধ করেন। আতরাশ ভোজসভায় উপস্থিত হননি এবং পরে ড্রুজে এলাকায় একটি ফরাসি সৈন্যদলকে আক্রমণ করেন। এই সংকেত পেয়ে দামেস্ক, হোমস্, হ্যামা ও অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই সকল শহরে ড্রুজে নেতা ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ষড়যন্ত্র হয়। জেনারেল সারাইলের পরিবর্তে জেনারেল গ্যামেলিনকে আনয়ন করা হয়। তিনি ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে দামেস্কের বিরুদ্ধে সাঁজোয়া বাহিনী ও বিমান সহযোগে অগ্রসর হন। তিনি নগর অধিকার করেন, কিন্তু প্রচুর প্রাণহানির বিনিময়ে। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত বিদ্রোহ চলতে থাকে। ফরাসিগণ একজন বেসামরিক রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করলে যুদ্ধ কিছুটা স্তিমিত হয়। সিরীয় জাতীয়তাবাদী দলগুলো আল-কুতলা-আল-ওয়াতানিয়্যা নামে একটি জাতীয়তাবাদী সংস্থা গঠন করে এবং স্বায়ত্তশাসন ও লেবানন ব্যতীত সমস্ত পৃথক প্রশাসনিক এলাকাগুলোর ঐক্য দাবি করে। মাঝে মাঝে ধর্মঘট ও বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আট বছর ধরে জাতীয়তাবাদী ও ফরাসিগণ একটি শাসনতন্ত্রের মূলনীতি, সরকারের বিন্যাস এবং স্বাধীনতার পরিমাণ নিয়ে টানাহেঁচড়া করে।

যে কারণে গ্রেট ব্রিটেন মিসরীয়দের সাথে সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ হিটলারের উত্থান ও ইথিওপিয়ায় মুসোলিনীর অভিযান, সেই একই কারণে ফরাসিগণও সিরিয়াবাসীদের সাথে সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়। ১৯৩৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর দুই দেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ধারাসমূহ একই বছরে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তির ধারাসমূহের ন্যায়। জাতীয়তাবাদিগণ নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং হাসিম আল-আতাশীকে প্রেসিডেন্ট ও জামিল মারদামকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মনোনীত করে। বাহ্যত ফ্রান্স ব্যাপারটিকে তেমন আমল দেয়নি কারণ সিরিয়ায় সে তার হুকুমনামার রাজত্ব এমনভাবে চালাতে থাকে যেন কোনো চুক্তিই স্বাক্ষরিত হয়নি। ফরাসি পার্লামেন্ট কখনও এই চুক্তি অনুমোদন করেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়ার ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতার অবসান হয়।

www.pathagar.com

ফরাসি সেনাবাহিনীর সদর দফতর এবং মেরোনাইটদের প্রতি ফরাসিদের সহানুভূতি থাকার ফলে লেবাননের অবস্থা সিরিয়ার ন্যায় তেমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেনি। লেবাননে জাতীয়তাবাদী খ্রিস্টান, মুসলমান ও দ্রুজে বিদ্যমান, যারা সিরীয় জাতীয়দলের (Syrian National Party) সদস্য এবং ঐক্য ও স্বাধীনতা চায়। তবে মোটের উপর জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভের সূচনা হয় সিরিয়ায়। সিরিয়ায় ১৯২৫ সালে যুদ্ধের ফলে লেবাননিগণ কিছুটা স্বাধীনতা লাভ করে। তারা একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং চার্লস আব্বাসকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে মনোনীত করে, কিন্তু ফরাসিগণ জোরালো কণ্ঠে বলতে চায় যে লেবানন স্বাধীন কিন্তু সার্বভৌম নয়। শীঘ্রই ফরাসিগণ 'স্বাধীনতা' ছিনিয়ে নেয় এবং শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করে। ১৯৩৬ সালে লেবাননের সাথে ফ্রাংকো-সিরিয়ান চুক্তির ন্যায় একটি চুক্তির আয়োজন করা হয়। কিন্তু ফরাসিগণ সিরিয়াবাসীদের সাথে যে ব্যবহার করে লেবাননিদের সাথে তার তুলনায় খুব ভালো ব্যবহার করেনি। তারা শুধু হুকুমনামা ত্যাগ করেনি এবং ফ্রান্সের 'সভ্যকরণের উদ্দেশ্য' কার্যে পরিণত করেনি।

ইরাকের উপর হুকুমনামা

সিরিয়ার ওপর ফরাসি হুকুমনামার তুলনায় ইরাকের ওপর ব্রিটিশ হুকুমনামা অনেকটা শান্তিপূর্ণ। এটি কতকাংশে অত্র অঞ্চলের ওপর ব্রিটিশ অভিজ্ঞতার দরুন সম্ভব হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল ব্রিটিশ আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে এবং ব্রিটিশ প্রতিনিধিবর্গ নিম্ন মেসোপোটামিয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে। তদুপরি বহুসংখ্যক ব্রিটিশ অফিসার হেজাজ সেনাবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এটি এমন এক অভিজ্ঞতা যা ফরাসি অফিসারদের ছিল না। সিরিয়ার দলসমূহের ন্যায় ইরাকি রাজনৈতিক দলসমূহ চরমপন্থীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। সিরীয়দের নীতি হল 'সমস্ত কিছু অথবা কিছুই না'—এমন এক নীতি যা আরবগণ বার বার ইহুদিবাদের ব্যাপারে প্রয়োগ করেছে। ইরাকিদের নীতি হল 'লও এবং আরও চাও'। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে ইরাকে চরমপন্থীও নেই সামরিক অভ্যুত্থানও নেই।

প্রথম দিকে ব্রিটিশগণ বেশ সমস্যার সম্মুখীন হয় কারণ ইরাকের কার্যাবলি প্রধানত ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। সেই ১৯১৮ সালে 'এ্যাংলো

www.pathagar.com

ইন্ডিয়ানগণ' ইরাকে আধিপত্য বিস্তার করার ব্যাপারে এমন নিশ্চিত হয়ে যায় যে তারা তাদের পরিবারবর্গও নিয়ে আসে এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা এমনভাবে হাতে নেয় যেন তারা চিরতরে এখানে থেকে যাবে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার আরনল্ড উইলসন একটি 'গণভোট' পরিচালনা করেন এবং তাতে দেখা যায় যে ইরাকিগণ গ্রেট ব্রিটেনকেই চায়, ভারত সরকারকে নয়।

ইরাকিগণ অবশ্য ব্রিটিশদেরকেও চায় না এবং তা ১৯২০ সালের জুলাই মাসে সংঘটিত বিদ্রোহের দ্বারা প্রমাণিত হয়। ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে স্বাক্ষরিত স্যানরেমো চুক্তি ঘোষণা এবং তৎসঙ্গে এ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মনোভাবের দরুন ১৯২০ সালের জুলাই মাসে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এটা প্রণিধানযোগ্য যে একই সময় মিসরীয় জাতীয়তাবাদিগণ ব্রিটিশদের আধিপত্যের মোকাবিলা করে, কামালপন্থিগণ আঁতাত কর্তৃক চাপানো 'শান্তি'কে বাধা দান করে এবং সিরিয়াবাসিগণ ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। প্রায় ৬৫,০০০ সৈন্য এনে দশ লক্ষ ডলার খরচ করে এবং উভয়পক্ষে প্রচুর হতাহতের পর লন্ডনের ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা দখল করে। অত্র অঞ্চলে পরিচিত ও সম্মানিত স্যার পার্সি কক্সকে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়। তিনি ব্রিটিশ কর্তৃক একটি জাতীয় ইরাকি সরকার প্রতিষ্ঠা করার কথা ঘোষণা করেন।

তদানীন্তন ঔপনিবেশিক সেক্রেটারি উইন্সটন চার্চিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৯২০ সালে কায়রো সম্মেলনের হাতে হঠাৎ এক জটিল সমস্যা এসে পড়ে। সাইক্স-পিকট চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে সাধারণ মত ছিল ফয়সাল সিরিয়ার বাদশাহ্ হবেন এবং আবদুল্লাহ ইরাকের বাদশাহ হবেন। বস্তুত সিরীয় জাতীয় কংগ্রেস ফয়সালকে সিরিয়ার বাদশাহ হিসাবে গ্রহণ করবার সময় আবদুল্লাহকে ইরাকের বাদশাহ মনোনীত করে। গ্রেট ব্রিটেন এর বিপক্ষে ছিল না। তবে ফরাসি সরকার ফয়সালকে বহিষ্কার করে ব্যাপারটিকে ঘোলাটে করে তোলে, যার ফল হল ব্রিটিশদের হাতে দুটি বাদশাহই এসে পড়ে। দুই ভ্রাতার মধ্যে ফয়সালই অধিক জনপ্রিয়, তাই গ্রেট ব্রিটেন তাঁকে ইরাকের বাদশাহ বানাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্যার পার্সি কক্স এমন আয়োজন করবেন যাতে ইরাকিগণ ফয়সালকে তাঁদের বাদশাহ হতে আহ্বান জানায়। ১৯২১ সালের ২৩শে আগস্ট তিনি অভিষিক্ত হন। আবদুল্লাহকে অতঃপর 'ট্রান্স-জর্ডানের' আমিরি প্রদান করা হয়। এই দেশ ব্রিটিশগণ সুবিধানুসারে জর্ডন নদীর পশ্চিম তীরে দক্ষিণ আকাবার উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করে সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

১৯১৮ সালে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পরবর্তী তিন বছর ফয়সালের নীতিবাদী জাতীয়তাবাদ বেশ খানিকটা ধাক্কা খায়। সিরীয়দের চরম জাতীয়তাবাদ এবং সম্পূর্ণ ব্রিটিশ আনুগত্যের মাঝামাঝি একটি পথ তিনি বেছে নিতে চেষ্টা করেন। গ্রেট ব্রিটেনও ভারত সরকারের প্রভাব থেকে মধ্যপ্রাচ্য নীতিকে মুক্ত করার পর কিছুটা আপোসমূলক হয়ে পড়ে। ১৯২২ সাল হতে ১৯৩০ সালের মধ্যে অনেকগুলো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় আবার বাদ দেয়া হয়। এক চরম টানাহেঁচড়ার মধ্যে ইরাকের জনসাধারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদিগণ যা দিচ্ছে তার চাইতে অধিক সুবিধাদি দাবি করেন। একজন আরব হিসাবে ফয়সালকে গ্রেট ব্রিটেন পুরাপুরি বিশ্বাস করে না, আবার বৃটিশের একজন বন্ধু হিসাবে তিনি জাতীয়তাবাদীদের চোখেও সন্দেহাতীত নন। কিন্তু ১৯৩০ সালে ইরাককে স্বাধীনতা দিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া পর্যন্ত তিনি উভয়পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা রক্ষা করে চলেন। এই চুক্তি ছয় বছর পর স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তির সাদৃশ্য এবং ফরাসিদের জন্যও এটি একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ। পারস্য উপসাগরের বসরায় একটি নৌঘাঁটি এবং বাগদাদের নিকটস্থ হাব্বানিয়া বিমানবন্দরে একটি বিমান ঘাঁটি রক্ষা করতে গ্রেট ব্রিটেনকে অনুমতি দেয়া হয়। যুদ্ধের সময় সমস্ত সম্পদ ব্রিটিশদের এখতিয়ারে তুলে দিতে ইরাক রাজি হয়। ইরাককে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হয় এবং হুকুমনামার শেষ চিহ্নও বিলুপ্ত হয়। ১৯২৩ সালে গ্রেট ব্রিটেন ও ইরাক উভয়ে চুক্তিটি অনুমোদন করে এবং জাতিপুঞ্জে আসন লাভের ব্যাপারে ইরাক প্রথম আরব রাষ্ট্রের সম্মান লাভ করে।

১৯৩০ সালের চুক্তি নিয়ে ইরাকি জাতীয়তাবাদিগণ সন্তুষ্ট হয় নাই। তাদের দৃষ্টিতে গ্রেট ব্রিটেনের সাথে সম্পর্ক রেখে ইরাক সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারে না। তারা সিরিয়ার জাতীয়তাবাদীদের সাথে একযোগে সংগ্রাম করতে চায়। অপরদিকে ইরাকে তেলের অনুসন্ধান লাভ এবং তেল অনুমতিপত্রের চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইরাক ধনী হয়ে ওঠে। অনুমতি পত্র ৭৫ বছরের জন্য প্রদান করা হয় এবং ইরাক প্রতি মেট্রিক টন অপরিশোধিত তেলে চারটি স্বর্ণমুদ্রা সেলামি হিসাবে লাভ করে। ইরাকদের অনেকেই এই সম্পদে বাকি আরবদেরকেও অংশ দিতে অস্বীকার করে। তদুপরি 'স্টার্লিং ব্লকের' সদস্য হিসাবে ইরাকি মুদ্রা নিশ্চিত হয় অথচ ফরাসি ফ্রাংকের সাথে সম্পর্কযুক্ত সিরিয়ার মুদ্রা ছিল অনিশ্চিত।

ইরাকের শাসকচক্র বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক দলে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ থাকে, যাদের ভাগ্য পার্লামেন্টে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা দ্বারা

www.pathagar.com

উঠানামা করে। মোটের ওপর তারা দুটি দলে বিভক্ত, একদল গ্রেট ব্রিটেনের সাথে সদ্ভাব রাখবার পক্ষে আরেক দল বিপক্ষে। প্রথমোক্ত দলে থাকেন ন্যাশনাল পার্টি প্রগ্রেসিভ পার্টি এবং হুকুমনামার পূর্বে গঠিত পুরাতন আহদ পার্টি, যার প্রধান ব্যক্তি হলেন জেনারেল নূরী আল-সাঈদ। যে সকল ব্যক্তিবর্গ গ্রেট ব্রিটেনের বিরোধিতা করে তারা ন্যাশনাল ব্রাদারহুড বা ইখা আল-ওয়াতানী দল গঠন করে, যার প্রধান ব্যক্তিবর্গ হলেন ইয়াসিন আল-হাশিমি ও রশিদ আল-জিলানি।

ইরাকের জনসাধারণের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাদির সমাধান আরও দুরূহ ব্যাপার হয়ে ওঠে। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশের মধ্যেই এটি রয়েছে এবং এইজন্য ঔপনিবেশিক শক্তিবর্গ দায়ী নয়। ইরাকের ৫০ লক্ষ সংখ্যাগুরু অধিবাসী মুসলমান, কিন্তু তারা শিয়া, সুন্নি ও কুর্দি নামক তিনটি বিবদমান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। শিয়া সংখ্যাগুরুদের শাসক সংখ্যালঘু সুন্নিগণ কখনও প্রথমোক্তদের আনুগত্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না, কারণ তাদের মধ্যে পারস্যপ্রবণতা বিদ্যমান। শিয়া ও সুন্নিগণ আরবি ভাষায় কথা বলে; কিন্তু ধর্মত সুন্নি কুর্দিগণ কুর্দি ভাষায় কথা বলে। তদুপরি তারা আধা-বেদুইন কুর্দদের অংশবিশেষ—যারা ইরান ও তুরস্কে বসবাস করে এবং জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষী। ইরাকের অতি দুর্ভাগ্য দল সম্ভবত প্রায় ৯০,০০০ সিরিয়ভাষী আসিরীয় খ্রিস্টান। তারা পশ্চিম এশিয়া মাইনরের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে। ব্রিটিশগণ আর্মেনীয়দের ন্যায় তাদেরকেও জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের আশা দেয় এবং তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উৎসাহ প্রদান করে। বলশেভিক বিপ্লবের দরুন রুশ সৈন্যদের প্রত্যাহারের ফলে আসিরীয়দেরকে দক্ষিণে মেসোপোটেমিয়ার দিকে ঠেলে দেয়া হয়। ১৯২০ সালে সংগ্রামের সময় ব্রিটিশগণ ইরাকিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আসিরীয় সৈন্যদেরকে তালিকাভুক্ত করে এবং ফলে ইরাকিদের সাথে তাদের শত্রুতা গড়ে ওঠে। পরবর্তী শান্তি আলোচনার সময় তুর্কিগণ আসিরীয়দেরকে তাদের আবাসভূমিতে ফিরে যেতে অনুমতি দেয়; যার ফলে তাদের বিরাট অংশ ইরাকে আটক হয়ে পড়ে। এগুলো ছাড়া ছিল ১ লক্ষ ইহুদি যারা খ্রিস্টীয় যুগের পূর্ব হতে মেসোপোটেমিয়ায় বসতি স্থাপন করেছিল, ক্ষুদ্রসংখ্যক আর্মিনীয় এবং সার্বিয়ান ও ইয়াজিদি নামে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল।

www.pathagar.com

১৯৩২ সালে ইরাকের স্বাধীনতা লাভের পর ফয়সাল বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্মীয় দলগুলোকে একটি জাতিতে পরিণত করতে চান। তিনি দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করা, সুন্নি ও শিয়াদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন, বিদ্যালয় স্থাপন, শিল্পকারখানায় উৎসাহ প্রদান, ভূমি সমস্যার সমাধান এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করতে মনস্থ করেন। তিনি নূরী আল-সাঈদকে প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তাফা দিতে বলেন এবং পরে ন্যাশনাল ব্রাদারহুড পার্টির রশিদ আল-জিলানিকে তা প্রদান করেন। এই দল ১৯৩২ থেকে সাল পর্যন্ত পার্লামেন্টে আধিপত্য বজায় রাখে। বেঁচে থাকলে ফয়সাল হয়ত সফলতা লাভ করতেন, কিন্তু তিনি ১৯৩৩ সালে পরলোকগমন করেন। তার ২১ বছর বয়স্ক পুত্র গাজীকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু রশিদ আল-জিলানি ও ইয়াসীন আল-হাশিমির নেতৃত্বে ন্যাশনাল ব্রাদারহুড-এর একনায়কত্বমূলক কার্যাবলিতে বাধা প্রদান করবার মত কোনো অভিজ্ঞতা বা সম্মান তাঁর ছিল না।

১৯৩৬ সালে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দল একত্রে মিলিত হয় এবং এক সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা সরকারকে উচ্ছেদ করে। ফয়সালের মৃত্যুর পর ইরাকের ইতিহাসে অনেকগুলো সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে এটি প্রথম। এই সকল দলের একটি হল আহলি দল। যুবক বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা গঠিত এই দল এক ধরনের সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আরেকটি দল সামরিক অফিসারদের নিয়ে গঠিত যারা জাতীয়তাবাদ চায় আবার তাদের নিজস্ব একনায়কত্ববাদও রাখতে চায়। এই দুই দল আহলি দলের হিকমত সোলায়মান ও সেনাবাহিনীর জেনারেল বকর সিদকীর মাধ্যমে মিলিত হয় এবং ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে সরকারকে উৎখাত করে। অনভিজ্ঞ যুবক বুদ্ধিজীবিগণ সেনাবাহিনীর সাথের এঁটে উঠতে ব্যর্থ হয় এবং ফলে জেনারেল সিদকীর অধীন সেনাবাহিনী ক্ষমতায় আসীন হয়। অতঃপর সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দ একে অপরের বিরুদ্ধে লেগে যায় এবং ফলে ১৯৩৭ সালে জেনারেল সিদকী নিহত হন এবং আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এক বছর পর আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা জেনারেল নূরী আল-সাঈদ পুনরায় ক্ষমতাসীন হন। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল ইরাকের সমস্যাসমূহের মধ্যে একটি। অন্যান্য সমস্যাও ছিল। একটি হল তেলসমৃদ্ধ কুয়েত নিয়ে গ্রেট ব্রিটেনের সাথে মত বিরোধ। ঐ অঞ্চলের উপর ব্রিটেন একটি হুকুমনামার অধিকারী অথচ ইরাকও তার মালিকানা দাবি করে ফিলিস্তিনের ভাগ্য নিয়ে ইহুদিবাদীদের সাথে যে সংঘর্ষ তাতেও ইরাক

www.pathagar.com

জড়িত। তাছাড়া ছিল সংস্কারের সমস্যা এবং একদিকে ইরাকি জাতীয়তাবাদ অপরদিকে বৃহৎ আরব জাতীয়তাবাদ।

এই সকলের মধ্যে ১৯৩৯ সালে ৪ঠা এপ্রিল যুবক বাদশাহ গাজী এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। তিনি যেহেতু জনপ্রিয় এবং সমস্ত ব্যাপারে সংস্কারপন্থী জাতীয়তাবাদের সমর্থক, তাই অনেকেই তাঁর মৃত্যুকে নিছক দুর্ঘটনা বলে বিশ্বাস করতে চান না। তাঁর চার বছর বয়স্ক পুত্র দ্বিতীয় ফয়সালকে বাদশাহ্ এবং মামা আবদুল ইলাহ্‌কে উপদেষ্টা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদীদেরকে দূরে সরিয়ে রেখে নূরী আল-সাঈদ প্রধানমন্ত্রীর পদে বহাল থাকেন।

ট্রান্সজর্ডানের ওপর হুকুমনামা

আবদুল্লাহ্‌কে যে ট্রান্সজর্ডানের আমির হতে বলা হয়, ২০ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত সেই ভূখণ্ডের অধিকাংশই মরুভূমি এবং অধিবাসিগণ প্রায়ই বেদুঈন। সেই শূন্য দেশে আবদুল্লাহর শাসন সহজতর করবার জন্য ব্রিটিশ তাঁকে মাসিক ৫,০০০ পাউন্ড ভাতা প্রদানের বন্দোবস্ত করে। ১৯২১ সাল হতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত অত্র অঞ্চলে গ্রেট ব্রিটেনের প্রভাব হুমকির সম্মুখীন হয়নি। এই অঞ্চলে থেকে ব্রিটিশ ইরাকের বিক্ষুব্ধ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এবং তা দমন করার আশা পোষণ করে; ফিলিস্তিনে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব লক্ষ করে এবং পারস্য উপসাগরের পথ পরিষ্কার রাখে। বার্ষিক এক লক্ষ পাউন্ড প্রদান করত—যা ১৯৪০ সালে ২০ লক্ষে দাঁড়ায়, ব্রিটিশগণ এক সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে, যা পরবর্তীকালে সমগ্র ফারটাইল ক্রিসেন্টের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহিনীতে পরিণত হয়। আরব লিজিয়ন (Arab Legion) নামে খ্যাত সেই বাহিনী ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ক্যাপ্টেন এফ.জি.পিক-এর পরিচালনাধীন থাকে এবং পরে উপাখ্যানের গ্লাব পাশার (স্যার জন গ্লাব) পরিচালনাধীন থাকে। ফারটাইল ক্রিসেন্টের সর্বাঞ্চলের স্বেচ্ছাসেবকদেরকে নিয়ে এই বাহিনী গঠন করা হয় এবং এর পুরোধা হল বেদুইন গোত্রসমূহের যুবকদল।

ট্রান্সজর্ডান সরকারের গঠন অতি সাধারণ। আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনের সর্বময় ক্ষমতা আমিরের হাতে। তাঁকে সহায়তা করার জন্য একটি কার্যকরী সংসদের সদস্যপদ বেদুইন ও অন্যান্য দলের মধ্যে সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে বন্টন করা হয়। আম্মানে (রোমান যুগের ফিলাডেলফিয়া) নিযুক্ত ব্রিটিশ

www.pathagar.com

অধিবাসিগণ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাজেট, সেনাবাহিনী ও বৈদেশিক কার্যাবলি পরিচালনা করে। ইরাকের বাদশাহ ফয়সালে মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ হাশেমী বংশের প্রধান হন এবং ইরাক ও ট্রান্সজর্ডান শাসন করেন। ক্রিসেন্টের আরবদের ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আবদুল্লাহ নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে হাশেমীয় বংশের নামে তুলে ধরেন এবং "বৃহৎ সিরিয়া আন্দোলনকে" (The Great Syria Movement) সমর্থন করেন। এর ভাবধারা হল হোসেন-ম্যাকমাহন পত্রালাপে উল্লেখিত বিষয়ের পুনরাবর্তন, যাতে হাশেমীয় বংশের অধীনে একটি সম্মিলিত ফারটাইল ক্রিসেন্টের বিষয় উল্লেখ করা হয়। সৌদি আরব ও মিসর এবং সিরিয়া ও ইরাকের কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক দলের সহায়তায় লেবাননের খ্রিস্টানগণ এর বিরোধিতা করে।

সৌদি আরব

যুদ্ধের ডামাডোল, প্যারিস শান্তি সম্মেলনে বিভিন্ন দাবি ও প্রতিবাদ এবং হুকুমনামা সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিদ্রোহের মধ্যে পাঠক সম্ভবত সমস্ত ঘটনার সূচনাকারী বাদশাহ হোসেনের কথা ভুলে গেছেন। বস্তুত বাকি সকলেই সম্মানিত মক্কা শরিফকে ভুলে গেছেন ও ত্যাগ করেছেন বলে মনে হয়। ১৯১৬ সালে যিনি নিজেকে 'আরব দেশসমূহের বাদশাহ' বলে ঘোষণা করেন এবং এই ধরনের একটি উপাধির অন্যান্য প্রত্যাশীর শত্রুতে পরিণত হন, তিনি শেষ পর্যন্ত একজন রাজ্যহীন রাজায় পরিণত হন। কিছুকাল তিনি ভান করে কাটান এবং নিজের অবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য কোনো প্রচেষ্টাই চালান নাই। বিভিন্ন ঘটনাবলি ও পরিক্রমা তাঁকে অতিক্রম করে যায়, অথচ তিনি নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করে যান। পরিবর্তিত অবস্থায় তিনি ব্রিটিশদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেননি এবং ভার্সাই, স্যানরেমো, লুজ্যানে ও জাতিপুঞ্জের ন্যায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রতিও দৃকপাত করেননি। ইসলামের খলিফার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তিনি ইতোমধ্যেই ভারতবর্ষের মুসলমান শ্রেণির বিরাগভাজন হন। রাগ, গর্ব ও নিরুৎসাহের বশবর্তী হয়ে ১৯২৪ সালের ৭ই মার্চ তিনি 'সমগ্র ইসলামের খলিফা' উপাধি গ্রহণ করেন।

তাঁর এই ঘোষণার দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী নজদের বাদশাহ আবদুল আজীজ ইবনে সউদ স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ লাভ করেন। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইবনে সউদ ভারত সরকারের বন্ধু এবং ব্রিটিশদের সহিত তাঁর

www.pathagar.com

সন্ধিসূত্র বিদ্যমান। ১৯২৪ সালের ২৪শে আগস্ট ইবনে সউদ তাঁর ওয়াহাবি যোদ্ধাদল নিয়ে নির্বান্ধব ও অর্থাভাবে সৈন্য সংগ্রহ করতে অক্ষম হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। হোসেনের পুত্রদ্বয় ফয়সাল ও আবদুল্লাহ্ তখন সম্ভবত তাঁকে সাহায্য করতে অসমর্থ এবং ব্রিটিশদের নিকট তাঁর প্রয়োজনও তখন শেষ। ওয়াহাবিগণ সম্মুখের সকল কিছু জয় করে অগ্রসর হয়। ১৯২৬ সালে জানুয়ারি নাগাদ ইবনে সউদ পবিত্র নগরীদ্বয় এবং উপদ্বীপের প্রধান প্রধান অংশগুলোর আধিপত্য অর্জন করেন। হোসেন সাইপ্রাসে পলায়ন করেন এবং তথায় ব্রিটিশগণ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানায় ও সেন্ট মাইকেল পদক দ্বারা ভূষিত করে।

সম্ভবত নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মহানবী হজরত মুহম্মদের (সঃ) উত্থানের পর আরব উপদ্বীপে আবদ আল-আজীজ ইবনে সউদের ন্যায় এরূপ ক্ষমতাশালী ও সুনিপুণ নেতার উদয় হয়নি। কিন্তু মক্কা ও মদিনার পবিত্র নগরীতে ওয়াহাবিদের আধিপত্যের ফলে ইসলামি বিশ্বে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়। ওহাবিগণ গোঁড়া ধর্মানুসারী এবং অবশিষ্ট মুসলমানদের উদার ধর্মচর্চার তারা বিরোধী এবং এই সকল মুসলমানদেরকে তারা 'পৌত্তলিক' বলে মনে করে। কিন্তু আরব সরকারের সর্বোচ্চ আয় হল হজযাত্রীদের নিকট হতে প্রাপ্ত রাজস্ব এবং এই আয় ত্যাগ করার কোনো ইচ্ছা ইবনে সউদের নেই। তাই ১৯২৬ সালের ৭ই জুন তিনি মক্কায় একটি ইসলামি সম্মেলন আহ্বান করে। তাঁর উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের ভয় দূর করা এবং তার ওয়াহাবি ওলামাদেরকে অন্যদের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ প্রদান করা। মুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দ এই সুদীর্ঘ অবয়ব বিশিষ্ট বাদশাহর ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানে মুগ্ধ হন। যুদ্ধের সময় কদাচ অনুষ্ঠিত হজব্রত পুনরায় নিয়ম মাফিক আরম্ভ হয়।

অতঃপর ইবনে সউদ গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন। উত্তরে ফিলিস্তিন, ট্রান্সজর্ডান, ইরাক ছাড়াও আরবের দক্ষিণ উপকূল এবং পূর্ব উপকূলের কিছু অংশে গ্রেট বৃটেনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আধিপত্য বিদ্যমান। একটি মৌলিক সমস্যা ট্রান্সজর্ডানকে ব্যতিব্যস্ত করে, যার আংশিক কারণ এই যে আবদুল্লাহর পুনর্বাসনের জন্য গ্রেট ব্রিটেন তাড়াতাড়িতে এই রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। আবদুল্লাহ ফয়সালের হাশেমীয় বংশের সাথে ইবনে সউদের বহুদিনের পুরাতন কলহ বিদ্যমান। এইগুলো এবং অন্য সমস্যাগুলো দুটি চুক্তির দ্বারা সমাধান করা হয়। একটি হল ১৯২৫ সালের ২রা নভেম্বর স্বাক্ষরিত হাদ্দা চুক্তি, যদ্বারা

www.pathagar.com

ট্রান্সজর্ডানের সাথে সীমান্ত নিষ্পত্তি করা হয়। অপরটি হল ১৯২৭ সালের ২০শে মে স্বাক্ষরিত জেদ্দা চুক্তি, যদ্বারা গ্রেট ব্রিটেন সৌদি আরবের স্বাধীনতা স্বীকার করে এবং ইবনে সউদ পারস্য উপসাগরের শেখ শাসিত রাজ্যসমূহে গ্রেট ব্রিটেনের বিশেষ স্বার্থের কথা বিবেচনা করতে স্বীকৃত হন। বস্তত সৌদি আরবই প্রথম অপেক্ষাকৃত স্বাধীন আরব রাষ্ট্র, যা রাজনৈতিক সুবিধাদি বা সামরিক ঘাঁটির কোনো বিশেষ শর্তে আবদ্ধ নয়। লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের উভয় তীরে ব্রিটিশ বাণিজ্য কিছুকালের জন্য চলতে থাকে।

মহানবী হজরত মুহম্মদের (সঃ) ন্যায় ইবনে সউদের প্রধান কাজ হল গোত্রপ্রথা এবং তাদের মধ্যে বিরাজমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধবিগ্রহ শেষ করা। ওয়াহাবিদেরকে তিনি ছোট ছোট ভ্রাতৃসংঘে বা ইখওয়ানে গঠন করেন এবং বিভিন্ন মরুদ্যানে তাদেরকে বসতি প্রদান করেন। প্রত্যেক বসতিতে তিনি চাষাবাদের ব্যবস্থা করেন এবং মসজিদ ও বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। এইসব বসতিসমূহ অনেকটা দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের সামরিক শহরসমূহের ন্যায়। এগুলো সামাজিক অর্থনৈতিক সংগঠনের ন্যায় সামরিক সংগঠনও বটে এবং সবগুলোই বাদশাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। কয়েক বছরের যুদ্ধবিগ্রহ, কঠোর প্রশাসন ও ন্যায় বিচারের দ্বারা তিনি এই কাজে সফলতা লাভ করেন।

আরবের ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে মুখ্য কারণ হল তেল আবিষ্কার। ১৯৩২ সালে বাহরাইন দ্বীপে তেল পাওয়া যায়। এক বছর পর, ২৯শে জুলাই বাদশাহ ইবনে সউদ কালিফোর্নিয়ার সান্ডার্ড অয়েল কোম্পানিকে ৬০ বছর মেয়াদি একটি অনুমতিপত্র প্রদান করেন। চুক্তি অনুসারে কোম্পানি শীঘ্রই কাজ আরম্ভ করবে এবং বাদশাহ্‌ সেলামি বাবদ প্রতি টন অপরিশোধিত তেলের চারটি সুবর্ণ শিলিং পাবেন। খননকার্যের প্রথম পর্যায়ে ব্যবসায়িক ভিত্তির অনুকূলে তেল পাওয়া না গেলেও কোম্পানি শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ইবনে সউদকে অতি প্রয়োজনীয় ৩০,০০০ পাউন্ড প্রদান করে। বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দাভাবের ফলে হজযাত্রার আয় ব্যাহত হয় এবং ইবনে সউদ এই অর্থ দিয়ে তা পূরণ করেন। ১৯৩৮ সাল নাগাদ পারস্য উপসাগরের দাহরানে প্রচুর তেল পাওয়া যায়। টেক্সাস তেল কোম্পানি স্টান্ডার্ড-এর সাথে যোগদান করলে নতুনভাবে এর নামকরণ হয় আরাবিয়ান আমেরিকান তেল কোম্পানি (আরামকো)। সাজসরঞ্জাম ও বিদেশি লোকজন আমদানি এবং রাস্তাঘাট ও তেল পরিশোধানাগার নির্মাণের ফলে বিভিন্ন গোত্রসমূহের যুবকদল শ্রম ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এর দ্বারা আরবের গোত্রসমূহের ইতস্তত ঘোরাফেরা ও বাদবিসংবাদের পরিসমাপ্তি ঘটে।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়
ফিলিস্তিনের সংগ্রাম

বালফার ঘোষণা, পরবর্তীকালে জাতিপুঞ্জে এর অনুমোদন এবং মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ আরব ও ইহুদিবাদী এই দুই জাতীয়তাবাদের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী আর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত করে। উভয়েই ফিলিস্তিনের উপর আধিপত্য দাবি করে। ফিলিস্তিনি আরবগণ এটি দাবি করে কারণ তারা এতে বসবাস করে। ইহুদিবাদিগণ এর দাবি করে কারণ তাদের প্রভু, ইয়াওয়েহ (Yahweh) তাদেরকে এই ভূমির ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন, যে প্রতিশ্রুতিটি পরে বালফার কর্তৃক পাকাপাকি হয়; জাতিপুঞ্জ, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘ (United Nations) কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে ইহুদিবাদিগণের নিকট এটি অতীন্দ্রিয় মহত্ত্বে পরিপূর্ণ একটি প্রত্যাবর্তন। আরবদের নিকট এটি আরেকটি বহিরাক্রমণ মাত্র। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উভয় পক্ষই ক্ষমতা প্রয়োগে বিশ্বাসী। ইহুদিবাদিগণ পাশ্চাত্যের ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে তাদের নিজস্ব যোগ্যতার সংমিশ্রণ করে যুদ্ধের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। অপরদিকে উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে অবস্থানরত আরবগণ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হতে অনেক দূরে এবং তাই যুদ্ধের আধুনিক মারণাস্ত্র সংগ্রহ করতেও তারা অক্ষম এবং অনেক ক্ষেত্রে এগুলোর সাথে পরিচিতও নয়। যতদূর দেখা যায় তারা শুধু এদিকে সেদিকে দুই একটি বিদ্রোহ করা, জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়া এবং দুর্বলতার দরুন "বিচারের" জন্য চিৎকার করা ছাড়া আর কিছুই করতে সক্ষম নয়। ইহুদিদের পক্ষে, যাদের অধিকাংশ লোক ফিলিস্তিনে বাস করেনি, সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে যে যা দিয়েছে তাই গ্রহণ করা সহজতর হয়। তবে ফিলিস্তিনবাসিগণ, যারা এই দেশ তাদের বলে মনে করে, কখনও আপস করতে রাজি নয়। তাদের মূলমন্ত্র হল 'সবকিছু অথবা কিছুই না' আর ইহুদিদের নীতি হল 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও এবং আরও চাও।'

www.pathagar.com

বালফার ঘোষণার পঞ্চাশতম বার্ষিকীতে ১৯৬৭ সাল নাগাদ ইহুদিবাদিগণ সমগ্র ফিলিস্তিন ও সিনাই উপদ্বীপ করায়ত্ত করে, কিন্তু সংগ্রামের পরিসমাপ্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। এই ৫০ বছরের ইতিহাস সাহসিকতা, ভীরুতা, সহানুভূতি, নিষ্ঠুরতা, ভয়, কুসংস্কার, কৃতিত্ব, হতাশা, সন্ত্রাসবাদ, রাজনৈতিক তৎপরতা, প্রচারণা ও দারুণ মতবিরোধের কাহিনিতে পরিপূর্ণ। সংগ্রামের মতানৈক্যের বিষয়গুলোর অধিকাংশই সমাধান করা হয়নি এবং এই বিষয়ের উপর শত শত খণ্ড গ্রন্থ লিখিত হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত উপাদান ঐতিহাসিকদের নিকট এখনও আসেনি। তাই একটি সম্পূর্ণ ও পক্ষপাতহীন বর্ণনা দান করা খুবই দুষ্কর। একজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক প্রধান প্রধান কার্যাবলির একটি রূপরেখা দিতে পারেন মাত্র কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি একপক্ষ বা অপরপক্ষ অথবা উভয় পক্ষের সমালোচনার সম্মুখীন হবেন।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, ইহুদিবাদের নিকট বালফার ঘোষণার 'জাতীয় আবাসভূমি'র অর্থ জাতীয় রাষ্ট্র। ১৯১৯ সালে এবং এর পর পুনঃ পুনঃ ইহুদিবাদী সংগঠনের প্রধান ড. চেইম ওয়াইজম্যান ও অন্য ব্যক্তিবর্গ বলেন, ফিলিস্তিন হবে—"ইংল্যান্ড বলতে যেরূপ ইংরেজগণ বুঝায় অনুরূপ একটি ইহুদি রাষ্ট্র। এরূপ একটি লক্ষ্যবস্তু অর্জনের জন্য দুটি জিনিসের প্রয়োজন। একটি হল ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ হতে ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিনে স্থানান্তর করা এবং অপরটি হল এসব বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বাসনের জন্য স্থান জোগাড় করা। বালফার ঘোষণার পূর্বেও ইহুদিবাদিগণ গ্রামাঞ্চলে ইহুদিদের পুনর্বাসনে উৎসাহ প্রদান করে এবং যতদূর সম্ভব জনবহুল নগরীসমূহে পুনর্বাসন করতে ইতস্তত করে। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলোতে ইহুদিবাদিগণ এ দুইটি লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়। উভয় কর্মসূচিতে তাদের সাফল্য লক্ষ করে ফিলিস্তিনি আরবগণ শঙ্কিত হয়।

কিং-ক্রেন কমিশন এই দুই কার্যসূচির গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং "ফিলিস্তিনকে শেষ পর্যন্ত একটি পুরোদস্তুর ইহুদি রাষ্ট্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে অসংখ্য ইহুদিদের বাস্তুত্যাগের ব্যাপারে গোঁড়া ইহুদিবাদীদের ফিলিস্তিনি কর্মসূচিতে আমূল পরিবর্তন সাধনের" সুপারিশ করে। পরিবর্তনের কারণ হিসাবে বলা হয় যে, "ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় ইহুদিবাদবিরোধী মনোভাব অতি প্রবল এবং অতি সহজে একে উড়ায়ে দেয়া যায় না।" কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ করেছি শান্তি প্রতিষ্ঠাকারিগণ কমিশনের রিপোর্টের ওপর তেমন গুরুত্ব আরোপ

www.pathagar.com

করেননি। ১৯২০ সালের ২৫শে এপ্রিলে অনুষ্ঠিত স্যানরেমো সম্মেলন গ্রেট ব্রিটেনকে ফিলিস্তিনের উপর হুকুমনামা প্রদান করে এবং দুই বছর পর জাতিপুঞ্জের পরিষদ এটি অনুমোদন করে। হুকুমনামার মূল বচনে শুধু বালফার ঘোষণাই অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি ইহুদি প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে, যারা 'ইহুদি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ক্ষতিকারক' সমস্ত কিছু দেখাশোনা করার জন্য প্রশাসনের সাথে কাজ করবে। 'এরূপ প্রতিনিধি হিসাবে' এটা ইহুদিবাদী সংগঠনকে স্বীকার করে। অধিকন্তু ইহুদি বাস্তুত্যাগে সহায়তা করার জন্য এবং সেদেশে এমনকি 'রাষ্ট্রীয় জায়গা এবং জনসাধারণের জন্য অপ্রয়োজনীয় পতিত জমিতে' পুনর্বাসনের কাজে সহায়তা করার জন্য ফিলিস্তিনের প্রশাসনকে আদেশ প্রদান করা হয়। ইহুদি প্রতিনিধি বা এজেন্সি হলে হুকুমনামার প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত বিস্তৃত দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী একটি সরকারের ন্যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনুরূপ কোনো নিয়ম ফিলিস্তিনি আরবদের জন্য করা হয়নি। বস্তুত হুকুমনামার ধারাগুলোর মধ্যে আরবদের বিষয়ে কোনো উল্লেখও নেই। শুধুমাত্র পরোক্ষভাবে তাদেরকে 'অ-ইহুদি বা জনসাধারণের অন্যান্য শ্রেণি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্যানরেমো সম্মেলনের অনতিকাল পরেই গ্রেট ব্রিটেন স্যার হার্বার্ট স্যামুয়েল নামক একজন প্রসিদ্ধ ইহুদিকে হাইকমিশনার নিযুক্ত করে। ২০০০ বছরের অধিককালের মধ্যে তিনিই ফিলিস্তিনের প্রথম ইহুদি শাসক। এর দ্বারা ব্রিটিশ কর্মকর্তাগণ আরবদেরকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিল কিনা জানা যায়নি। তবে প্রকৃতপক্ষে স্যার হার্বার্ট, সম্ভবত ইহুদি হবার দরুন, উল্টোভাবে আরব জনগণের প্রতি ন্যায় বিচার প্রদর্শন করেন। ইতিহাসের নির্মম অংশ হিসাবে স্যার হার্বার্টই হজ আমীন আল-হোসাইনীকে জেরুজালেমের মুফতি নিযুক্ত করেন। ইনি রাসুলুল্লাহর (সঃ) বংশধর বলে দাবি করেন, আজহারে লেখাপড়া করেন, যুদ্ধের সময় তুরস্কের পক্ষে যুদ্ধ করেন। মুফতি হিসাবে তিনি ধর্মীয় সম্পত্তির ওয়াকফ্‌র কর্মকর্তা হন, যার আয় ছিল বার্ষিক ৩০০,০০০ ডলার। তিনি সুপ্রিম কাউন্সিলের অধ্যক্ষ হন এবং পরে চরম ব্রিটিশ বিরোধী, ইহুদিবাদ বিরোধী ফিলিস্তিন উচ্চ কমিটির সভাপতি হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ তাঁর হত্যার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। তিনি তখন বার্লিন থেকে বেতারে মিত্রশক্তি বিরোধী ও ইহুদি বিরোধী বক্তৃতা প্রদানে লিপ্ত।

www.pathagar.com

প্রথম ইহুদিবাদী বিরোধী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় জেরুজালেমে ১৯২১ সালে। ফিলিস্তিনের প্রধান বিচারপতি স্যার থমাস হেক্রোফ্ট্-এর সভাপতিত্বে একটি স্থানীয় কমিশন এই মর্মে রিপোর্ট প্রদান করে যে ইহুদিবাদী কর্মসূচিতে ভীত হয়ে আরবগণ দাঙ্গা-হাঙ্গামায় উৎসাহ প্রদান করে। তবে ঔপনিবেশিক দফতরের প্রধান হিসাবে উইনস্টন চার্চিল একটি দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন, যাতে উভয়পক্ষ সন্তুষ্ট হয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন, গ্রেট ব্রিটেনের ইচ্ছা নয় যে, "ফিলিস্তিন ইংরেজদের ইংল্যান্ডের ন্যায় ইহুদি রাষ্ট্র হোক।" তিনি এটাও ব্যক্ত করেন যে, "ইহুদি জনগণ তাদের অধিকার নিয়ে ফিলিস্তিনে বাস করবে, যন্ত্রণা ভোগ করে নয়।" হুকুমনামার ৩০ বছরের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন বালফার ঘোষণার দুটি চরম বিপরীতমুখী উদ্দেশ্য কার্যকরী করতে চেষ্টা করে, তার একটি হল ইহুদিদের জন্য একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করা এবং অপরটি হল আরবদের বেসামরিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করা। উভয়টি যেহেতু একসঙ্গে সমাধা করা সম্ভব হয়নি, তাই প্রথমে তারা প্রথমটি সমাধা করে এবং অবস্থাভেদে অপরটিও সমাধা করতে চেষ্টা করে। ইহুদিবাদিগণ অবশ্য জোর দিয়ে বলে যে, 'সমান গুরুত্বের' কোনো দ্বিপক্ষীয় দায়িত্ব গ্রেট ব্রিটেনের নাই। তারা দাবি করে যে, অ-ইহুদি জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করাটা 'একটা গৌণ ও অপ্রধান ধারা' এবং তাই এই দলিলে প্রধান উদ্দেশ্যের ওপর সমান গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়। সেই প্রধান উদ্দেশ্য একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করা।

১৯২১ সালে প্রাথমিক দাঙ্গার পর প্রায় আট বছর শান্তভাবে কেটে যায়। হুকুমনামার সরকার ফিলিস্তিন আরব কার্যকরী কমিটি গঠন করার অনুমতি দান করে, যা আরবদের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে। ইহুদি এজেন্সির ন্যায় অনুরূপ সরকারি কোনো মঞ্জুরি এই কমিটির নেই। ইহুদি বাস্তুত্যাগী আনয়ন ও জমি দখলে ইহুদি এজেন্সি সক্রিয়ভাবে কাজ করে যায়। ইহুদি এজেন্সি ফিলিস্তিনে নতুন নতুন কলকারখানাও স্থাপন করে এবং ১৯৩৯ সাল নাগাদ ইহুদিগণ প্রায় ৯০ শতাংশ কারখানার মালিক হয়। কিন্তু কারখানা স্থাপন বাস্তুত্যাগী ও জমি দখলের ন্যায় এইরূপ সমস্যা সৃষ্টি করেনি।

ফিলিস্তিনি আরবগণ আশংকা করে যে দ্রুত ইহুদি বাস্তুত্যাগী পুনর্বাসনের ফলে তারা তাদের নিজস্ব দেশে হয়ত সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। অবশ্য এটি ছিল ইহুদিদের সত্যিকারের উদ্দেশ্য। ১৯২২ সালে অর্থাৎ যে বছর প্রথম লোকগণনা হয়, তাতে ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের সংখ্যা অনুমান করা হয়

www.pathagar.com

৭,৪৪০০০ তন্মধ্যে ৮৩,০০০ ইহুদি। ১৯২২ ও ১৯৩০ সালের মধ্যে আরবদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় ২৩ শতাংশ অথচ ইহুদিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় ১০০ শতাংশ। ১৯৩১ হতে ১৯৪০-এর লোক সংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও আশংকাজনক। আরব জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় ৩০ শতাংশ, অথচ ইহুদিদের লোক সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০ সালে এটা ৩০ শতাংশে বৃদ্ধি লাভ করে।

উপরোল্লিখিত সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান ও অন্যান্য সূত্র থেকে আমরা সহজেই কয়েকটি বিষয় অনুমান করতে পারি। প্রথমত হুকুমনামার তারিখ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত ইহুদি বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা তেমন বৃহৎ নয়। দ্বিতীয়ত অধিকসংখ্যক বাস্তুত্যাগী আসে পোল্যান্ড ও রাশিয়া থেকে। তৃতীয়ত ইহুদিবাদীদের শত প্রলোভন সত্ত্বেও এই বাস্তুত্যাগী অধিকাংশ ফিলিস্তিনের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে যেতে চায়। চতুর্থত সাধারণত অত্যাচার ও অন্যান্য অসুবিধার মধ্যেই শুধু ইহুদিগণ ফিলিস্তিনে যাবার বিষয়ে চিন্তা করে। উদাহরণস্বরূপ ১৯২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর বাস্তুত্যাগী আইনের ফলে সে দেশে ইহুদি বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা যেখানে ১৯২৪ সালে ৫০,০০০ ছিল সেখানে ১৯২৫ সালে মাত্র ১০,০০০-এ এসে দাঁড়ায়, ফলে দেখা যায় সে বছর ফিলিস্তিনে বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। উপসংহারে বলা যায় যে, হিটলারের ক্ষমতায় আরোহণ এবং ইউরোপে তাঁর নৃশংস ও ধারাবাহিকভাবে ইহুদি নিধন না হলে ফিলিস্তিন ইহুদিদের একটি দুর্যোগ সৃষ্টিকারী জাতীয় রাষ্ট্র না হয়ে বরং একটি শান্তিপূর্ণ জাতীয় আবাসভূমিই হতো।

ফিলিস্তিনে অতি দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে স্বভাবতই ইহুদি ও আরব উভয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক অভাব ও ব্যাপক বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। অবশ্য স্বীয় সদস্যদের দেখাশোনা করবার জন্য ইহুদিবাদীদের দেশের বাইরে বেশ মোটা তহবিল এবং ফিলিস্তিনে সুসংগঠিত দল বিদ্যমান। ইহুদিবাদীদের সংগঠিত অতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন হল ইহুদি শ্রমিক ফেডারেশন, হিস্তাদ্রাত (Jewish Federation of Labour)। এটি শুধু একটি ট্রেড ইউনিয়ন নয় বরং এটি উৎপাদন ও বাজারজাত, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, ব্যাংক ও বীমাসমূহও নিয়ন্ত্রণ করে। আরবদের এরূপ কোনো সংগঠন ছিল না এবং ফলে তারা অর্থনৈতিক সংকট আরও প্রবলভাবে অনুভব করে। নিঃসন্দেহে শ্রমিকদের পক্ষে হিসতাদ্রাতের কার্যকলাপ আরব শ্রমিকদেরকেও উপকৃত করে। বিশেষত

www.pathagar.com

রেলপথ বিভাগে এবং ফিলিস্তিনের বন্দরসমূহে কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে ৯০ শতাংশ ইহুদি মালিকানার কলকারখানায় আরব শ্রমিকগণকে সাদরে গ্রহণ করা হয়।

ইহুদি এজেন্সির ভূমিনীতি যেরূপ গ্রামীণ আরবদের ঘৃণার উদ্রেক করে, বাস্তুত্যাগে অনুরূপ করে নাই। 'ভূমি হস্তান্তরের' প্রশ্নটি দু'দলের মধ্যে কাঁটার রূপ ধারণ করে। ইহুদিবাদিগণ সঠিকভাবেই অনুধাবন করে যে, ইহুদি গ্রামীণ ও কৃষিপত্তনি ছাড়া একটি আদর্শ ইহুদি রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়। হুকুমনামার সরকার রাষ্ট্রীয় জমি তাদের হস্তান্তর না করলেও ইহুদিগণ আরবদের নিকট থেকে অতি উচ্চমূল্যে জমি ক্রয় করে। ফিলিস্তিনের ন্যায় শুষ্ক জমিতে কৃষকগণ প্রয়োজনের খাতিরে গ্রামের ছোট ছোট নদীর ধারে একত্রে বাস করে। গ্রামের চতুর্দিকে অবস্থিত জমির মালিক প্রায়শ একজন অনুপস্থিত আরব জমিদার, যিনি জেরুজালেম, বৈরুত বা দামেস্কে বাস করেন। জমিদার গোচারণ ভূমি ও পানির মালিক হলেও সমস্ত গ্রামের লোক এগুলো ব্যবহার করে। গ্রাম একটি সামাজিক ও কৃষি সংস্থা। বিক্রেতা আরব জমিদার হয়ত বেশ মুনাফা লাভ করল কিন্তু এই হস্তান্তরের সমস্ত বোঝা গিয়ে পড়ল আরব চাষাদের ঘাড়ে।

ইহুদিবাদীদের পরিকল্পনা হল কৃষিভূমি ক্রয় করা এবং ঐগুলোর ওপর ইহুদি বাস্তুত্যাগীদেরকে বসতিস্থাপনে উৎসাহ দান করা ও কৃষক হিসাবে গড়ে তোলা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইহুদিদের ভূমি ক্রয়ের ফলে আরব চাষিদেরকে উঠে যেতে হয়। ইহুদি এজেন্সির শাখা ইহুদি জাতীয় তহবিল (Jewish Natioal Fund) কর্তৃক ক্রীত জমিকে জাতীয় জমি' বলে ঘোষণা করা হয় এবং এগুলোকে অইহুদিদের নিকট হস্তান্তরযোগ্য নয় বলে আইন পাস করা হয়। অধিকন্তু, ইহুদি সমবায়সমূহ বা যে-ই চাষের জন্য জমি লাভ করে তার জন্য আরব শ্রমিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। আবাসচ্যুত আরব কৃষক কাজের সন্ধানে শহরে গিয়েও অসুবিধার সম্মুখীন হয়; কারণ ইহুদি কারখানাগুলো তাকে কাজ দিতে অসম্মত হয় অথবা কাজ দিলেও পারিশ্রমিক দেয় স্বল্প। অবশ্য এখানে উল্লেখ করতে হবে যে অধিকাংশ আরব শ্রমিক অশিক্ষিত এবং আধুনিক কারখানাসমূহের সাথে তাল রেখে কাজ করতে অক্ষম। যে সমস্ত কৃষক গ্রামে থেকে যায়, তারা শীঘ্রই তাদের গ্রামের নিকট আধুনিক আবাসস্থল অবলোকন করে, যেগুলোর সাথে তারা উঠতে ব্যর্থ হয়। এই নতুন আবাসগুলোর লোকজন শুধু পৃথক ভাষা ও ধর্মই অনুসরণ করে না বরং চাষাবাদের পৃথক পন্থা ও আলাদা সামাজিক রীতিনীতিও অবলম্বন

www.pathagar.com

করে। অতএব আরবগণ এসব নবাগতকে তাড়াতে চেষ্টা করবে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

ফিলিস্তিনে ইহুদি পুনর্বাসনের অদ্ভুত-প্রকৃতির একটি হইল, ইহুদি তহবিলের অর্থ প্রধানত পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি পুঁজিপতিদের নিকট থেকে যারা স্বাধীন ব্যবসায়ে খাঁটি বিশ্বাসী, আর এইসব অর্থগ্রহণ করেছে পোল্যান্ড ও রাশিয়া থেকে আগত সমাজবাদী ও মার্কসপন্থী ইহুদিগণ যারা সাম্যবাদে বিশ্বাসী। সাম্যবাদী পুনর্বাসনগুলোর মধ্যে প্রধান হল কিববুজ (Kibbutz) এবং মোসহাব (Moshav)। কিব্বুজ-এর ইহুদিগণ যৌথ চাষাবাদ ও যৌথ বসবাসের সাথে সাধারণ ভোজনালয় ও সাধারণ নার্সারি স্থাপন করে। সমস্ত মুনাফা জমা হয় যৌথ কোষাগারে এবং ব্যক্তিবিশেষ কোষাগার থেকে সাপ্তাহিক খরচ পত্রের জন্য অর্থ লাভ করে মাত্র। অপরদিকে মোস্হাব একটি রীতিমত সমবায়, যেখানে প্রত্যেক পরিবারের স্ব স্ব বাসগৃহ রয়েছে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক হতে যথেষ্ট স্বাধীনতা তারা লাভ করে।

ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য ইহুদিবাদী প্রতিষ্ঠানের এতসব উৎসাহ প্রদান সত্ত্বেও ১৯৪৩ সাল নাগাদ মাত্র ১৩.২ শতাংশ ইহুদি কৃষি কাজে যোগদান করে। তাদের প্রচেষ্টা সমধিক লক্ষ করা যায় শিল্পকারখানার ক্ষেত্রে। ১৯৪৪ সাল নাগাদ ইহুদিগণ ২০০০-এরও অধিক কারখানার মালিক হয় এবং প্রায় ৪৫০০০ শ্রমিক নিয়োগ করে। এদের মধ্যে প্রধান হল ফিলিস্তিন ইলেকট্রো কর্পোরেশন– জর্ডন ও ইয়ারমুক নদী নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং মৃত সাগরের (Dead sea) নিয়ন্ত্রণের জন্য ফিলিস্তিন পটাশ কোম্পানি।

ইহুদিবাদিগণ একটি সম্পূর্ণ হিব্রু শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে, যাতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ব্যবসা, চিত্রকলা ও সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং কারিগরি কলেজ ও হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত। ফিলিস্তিনে ইহুদিবাদীদের চমৎকার কৃতিত্বগুলোর মধ্যে একটি হল হিব্রু ওল্ড টেস্টামেন্টের পুনরূপায়ণ এবং আধুনিক শিল্পকারখানা ও কারিগরি সমাজে এর ব্যবহার।

ফিলিস্তিনে ইহুদিদের নিজস্ব সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রয়েছে নির্বাচিত পরিষদ দ্বারা গঠিত এবং সেগুলো কিছুটা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ভোগ করে। ফিলিস্তিনের ইহুদি বসতিস্থাপনকারীদের প্রতিনিধিত্বমূলক অনেকগুলো রাজনৈতিক দল এবং এদের মধ্যে সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদ এবং ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ সমস্ত দলই বিদ্যমান। আবার এক দলের মধ্যে অনেকগুলো দলের অস্তিত্ব রয়েছে

www.pathagar.com

উদাহরণস্বরূপ একজন ধর্মীয় সমাজবাদী ও একজন ধর্মনিরপেক্ষ সমাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যাপারে একমতের অধিকারী হলেও তারা দুই দলের অন্তর্ভুক্ত।

ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ নিয়ে ইহুদিদের মধ্যে যে মতের গরমিল তা আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইহুদিবাদিগণ (Zionists) হুকুমনামার প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। ইহুদিবাদিগণ তাদের পরিকল্পনায় আরবদেরকে বাদ দেয়। আধুনিক ইহুদিবাদীর প্রতিষ্ঠাতা হেরজেল তাঁর 'ইহুদি রাষ্ট্র' নামক গ্রন্থে আরবদের কথা মোটেই উল্লেখ করেননি। ১৯৪৬ সালে ইঙ্গ-মার্কিন কমিশনের (Anglo-American Commission of 1946) নিকট ইহুদি এজেন্সি এই কথা ব্যক্ত করে যে, একটি ইহুদি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 'যতটুকু সুসঙ্গত' ঠিক ততটুকু পরিমাণ ফিলিস্তিনের অইহুদি জনগণের অধিকার রক্ষা করা হবে। ইসরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেনগুরিয়ান তাঁর 'ইসরাইলে পুনর্জন্ম ও ভবিষ্যৎ' নামক গ্রন্থে বলেন, 'ইসরাইল রাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের অংশ বিশেষ শুধু ভৌগোলিক দিক হতে।' ইহুদিবাদীদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক (কারণ ইহা সত্য নহে) কিন্তু শক্তিশালী নীতি হল ইসরাইল জঙ্গভীলের প্রবাদ বাক্য 'দেশহীন একটি জাতির জন্য জনগণহীন একটি দেশ।'

ইহুদীবাদিদের প্রধান দল কর্তৃক অনুসৃত কাটছাঁটের নীতি রিভিশনালিস্ট (Revisionalist) নামে অভিহিত ইহুদিবাদীদের একটি দল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। তারা ব্রিটিশ হুকুমনামার বিরোধিতা করে এবং ১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত প্যারিস শান্তি আলোচনায় ইহুদিবাদিগণ কর্তৃক উত্থাপিত মূল দাবি অনুযায়ী সমগ্র এলাকায় একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। সে সময় তাদের পেশকৃত মানচিত্রে অধিকাংশ ট্রান্সজর্ডান এবং সিরিয়া লেবাননের প্রধান এলাকা অন্তর্ভুক্ত। ইহুদিবাদীদের আরেক দল আবার ইহুদ (ঐক্য) দল গঠন করে এর উদ্দেশ্য হল আরবদের সাথে ঐক্য প্রতিষ্ঠা কর। এই কর্মসূচির প্রবক্তা হলেন হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জুদাস্ ম্যাগনাস (Judes Magnas), দার্শনিক মার্টিন ব্যুবার (Martin Buber) এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবিগণ, যারা ফিলিস্তিনে একটি দ্বিজাতিত্বমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী।

বিশাল কৃষি, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রকল্পের সংগঠনকারী ইহুদি এজেন্সি আবার নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনীও পরিচালনা করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফিলিস্তিনের ইহুদি বসতিগুলো এবং আরব গ্রামগুলোও সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন ছিল। প্রত্যেক ইহুদি বসতির নিজস্ব রক্ষীবাহিনী

www.pathagar.com

ছিল। ১৯০৭ সালে এইসব প্রহরীদল হ্যাশোমার (Hashomer) নামক একটি সংস্থা গঠন করে এবং হুকুমনামার যুগেও সম্ভ্রান্ত প্রহরী দল হিসাবে কাজে নিযুক্ত থাকে। প্রত্যেক মহাযুদ্ধের সময় ফিলিস্তিনে প্রত্যাগত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ইহুদি সুদক্ষ সৈন্যগণ বিভিন্ন গোলযোগের সময় ইহুদি বসতিগুলো রক্ষা করবার জন্য হাগানাহ্ (Haganah) নামে একটি প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করে। তারা যত্রতত্র প্রশিক্ষণ দান করে এবং বেআইনিভাবে অস্ত্র বহন করে। হিস্তাদ্রাত ও ইহুদি এজেন্সি তাদের অর্থ জোগায়। ১৯৩৬ সাল নাগাদ হাগানাহ্ পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ স্বীকৃতি লাভ করে এবং তাদের কোনো কোনো সদস্য পুলিশ বাহিনীতে স্থান লাভ করে। আরেকটি আধা-সামরিক প্রতিষ্ঠান হল ইরগুন (Irgun)। এটা রিভিশনালিস্ট দলের যোদ্ধাদল, যারা ব্রিটিশ ও আরব উভয়ের সাথে যুদ্ধ করে। ইরগুনের চাইতেও অধিক জাতীয়তাবাদী দল হল স্টার্ন গ্রুপ বা 'ইসরাইলে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধকারী'। তারা অধিকাংশ সন্ত্রাসবাদী কাজে লিপ্ত থাকে। ইহুদি এজেন্সি ইরগুন ও স্টার্ন উভয় দলের সমালোচনা করে এবং তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক স্বীকার করে না। এই অবস্থা ১৯৪৮ সালে সংগঠিত আরব রাষ্ট্রবর্গের সাথে যুদ্ধ পর্যন্ত চলতে থাকে এবং তখন সমস্ত যোদ্ধাদলকে একই পরিচালনাধীন আনা হয়।

স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুদক্ষ ইহুদি সংগঠনের তুলনায় আরব জাতির সুসংহত কার্যাবলি বৈশিষ্ট্যহীন। প্রকৃতপক্ষে কোনো ক্ষেত্রে তুলনামূলক কোনো আরব দলই ছিল না। সুপ্রিম মুসলিম কাউন্সিল নামে একটি সংস্থা বিদ্যমান ছিল, বর্তমান দায়িত্ব হল মুসলমানদের ধর্মীয় বিচার-সালিশ ও ধর্মীয় দানসত্রগুলোর তত্ত্বাবধান করা, কিন্তু রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রশ্নে এর কোনো ভূমিকা ছিল না। আরবদের রাজনৈতিক কার্যাবলি আরব উচ্চ কমিটি (Arab Higher Committee) নামক বিভিন্ন দলের একটি ঐক্য সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত, কিন্তু এই সকল কার্যাবলি ছিল অবিন্যস্ত ও অকেজো। মুসলিম কাউন্সিল ও উচ্চ কমিটি এই অভয় সংগঠনের প্রধান ছিলেন গোঁড়া ব্রিটিশ-বিরোধী ও ইহুদি-বিরোধী ও ইহুদি-বিরোধী মুফতি হজ আমিন আল-হোসাইনী। আরবগণ হুকুমনামার সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত বিদ্যালয়ের ওপর নির্ভর করত এর বাইরে তারা কোনো সাহায্য লাভ করে না এবং ইহুদিদের দ্বারা প্রাপ্ত সমস্ত কিছুর জন্য গর্ব করতে পারত না। ক্রমবর্ধমান ইহুদি ক্ষমতার মুখে তাদের হতাশার মধ্যে তারা প্রতিবাদ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা ছাড়া আর কিছুই করতে পারত না।

www.pathagar.com

ইহুদিদের বিরুদ্ধে আরবদের প্রথম ও প্রধান প্রতিরোধের সূচনা হয় ১৯২৯ সালে আগস্ট মাসে। জেরুজালেম, হেবরন ও অন্য কেন্দ্রগুলোতে সংঘটিত এই সংঘর্ষে উভয়পক্ষে হতাহত হয়। স্যার ওয়াল্টার শ' একটি তদন্ত কমিটির প্রধান হন এবং তাঁর রিপোর্ট পরবর্তী বছরগুলোতে এই ধরনের অনেক রিপোর্টসমূহের মধ্যে প্রথম রিপোর্ট। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে মার্চ মাসে। এটি আরবদের নিন্দা করে কিন্তু ব্যাখ্যায় বলে যে, হতাশার মধ্য হতে তাদের আক্রোশ জন্ম লাভ করেছে। এটা সুপারিশ করে যে সরকারের উচিত, 'আরবদের ভীতি দূর করবার জন্য বাস্তুত্যাগ, ভূমি বিক্রয় এবং ভূমি হস্তান্তরের ব্যাপারে একটি পরিষ্কার নীতি ঘোষণা করা।' ইহুদিগণ শ' রিপোর্টের মর্মার্থের প্রতিবাদ করে। ফলে ভূমি সমস্যা পর্যবেক্ষণ করার জন্য গ্রেট ব্রিটেন স্যার জন হোপ সিম্পসনের নেতৃত্বে আরেকটি মিশন প্রেরণ করে। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত প্যাসফিল্ড শ্বেতপত্রের (Passfield white paper) মূল ভিত্তি এই রিপোর্ট ইহুদিদের ভূমি ক্রয়কে বিধিসম্মত বলে স্বীকার করে। তবে যে ধারায় ক্রয় করা জমিতে অইহুদি শ্রমিকদেরকে কাজে বাধা দান করে এবং অইহুদিদের নিকট উহা পুনরায় বিক্রয় নিষিদ্ধ করে তার সমালোচনা করে। অপরদিকে প্যাসফিল্ড শ্বেতপত্র চরমপন্থী ইহুদি ও আরব উভয়ের মতামত প্রত্যাখ্যান করে এবং সবাইকে সহযোগিতা করতে পরামর্শ প্রদান করে।

শ্বেতপত্র ইহুদিবাদীদের মধ্যে এরূপ ক্ষোভের সৃষ্টি করে যে, ওয়াইজম্যান ইহুদিবাদী সংগঠন ও ইহুদি এজেন্সি উভয় সংস্থার সভাপতির পদে ইস্তফা দান করেন। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিবাদীদের প্রতিবাদী কণ্ঠ এরূপ জোরালো হয় যে, গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড বাস্তুত্যাগ ও ভূমি ক্রয়ের ব্যাপারে ওয়াইজম্যানের ভীতি দূর করার জন্য তাঁর নিকট একখানি পত্র লিখতে বাধ্য হন। অতঃপর আসে আরবদের প্রতিবাদের পালা। তারা প্রধানমন্ত্রীর 'কৃষ্ণপত্রের' (Black Letter) প্রতিবাদ করে এবং পুনরায় বালফার ঘোষণার সমালোচনা করে।

১৯৩৩ সাল হতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত অসংখ্য বার আরব বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং এগুলোর অধিকাংশই ব্রিটিশ হুকুমনামার বিরুদ্ধে। ১৯৩৬ সালে বিভিন্ন আরব রাজনৈতিক দলসমূহ জেরুজালেমের মুফতি হজ আমিন আল-হুসাইনীর নেতৃত্বে আরব উচ্চ কমিটিতে (Arab Higher Committee) একত্রিত হয় এবং একটি সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। এই ধর্মঘটের সঙ্গে বোমা নিক্ষেপ,

www.pathagar.com

নাশকতামূলক কার্যকলাপ, ইহুদি সম্পত্তির ধ্বংস সাধন এবং ব্যাপক হাঙ্গামাও চলতে থাকে। পরস্পরবিরোধী ওয়াদার নিজস্ব ফাঁদে পড়ে গ্রেট ব্রিটেন কিছু করতে অপারগ হয় এবং লর্ড পীলের নেতৃত্বে ১৯৩৬ সালের শরৎকালে আরেকটি অনুসন্ধানকারী দল প্রেরণ করে। পীল কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আরবদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দান এবং ইহুদি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করা এই উভয় কাজ গ্রেট ব্রিটেন একত্রে করতে পারে না। অতএব এটি সুপারিশ করে যে, হুকুমনামার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে দেশকে জেরুজালেম ও বেথেলহেম সহকারে ইহুদি ও আরব এই দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হোক।

দেশভাগের এই প্রথম প্রস্তাবে ইহুদিবাদী আরবদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ওয়াইজম্যানসহ অনেক ইহুদিবাদী এর সমর্থন করে। কারণ এটা কার্যত ইহুদিদের স্বাধীন রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করে। তবে ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত বিংশতি ইহুদিবাদী কংগ্রেস এটাকে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ এটা বালফার ঘোষণার ওয়াদার পরিপন্থী। অবশ্য এটি ভবিষ্যৎ বিবেচনার পথ উন্মুক্ত রাখে। আরবদের মধ্যে শুধুমাত্র ট্রান্সজর্ডানের আমির আবদুল্লাহ্ এটা সমর্থন করেন। আরব উচ্চ কমিটি এর বিরোধিতা করে। ১৯৩৭ সালে সিরিয়ায় অনুষ্ঠিত প্যান-আরব কংগ্রেসে এই প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং বালফার ঘোষণার রহিতকরণ দাবি করা হয়।

সিরিয়া সম্মেলনের অনতিকাল পরে আরব বিদ্রোহ পুনরায় ফেটে পড়ে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত। এখানে সেখানে বিদ্রোহজনিত সংঘর্ষ চলতে থাকে। ব্রিটিশ সরকার জেরুজালেমের মুফতি এবং আরব উচ্চ কমিটির অন্যান্য চরমপন্থী সদস্যকে গ্রেফতার করার আদেশ দেয়, কিন্তু তাঁরা লেবাননে পলায়ন করেন এবং সেখান থেকে বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। ১৯৩৮ সালে গ্রেট ব্রিটেন অনেকটা অভ্যাসবশত দেশ ভাগ পরিকল্পনার ওপর রিপোর্ট প্রদান করার জন্য উড্‌হেড্ কমিশন প্রেরণ করে। কিন্তু সরকার এর রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে। অপরদিকে হিটলারের আবির্ভাব এবং জার্মান ইহুদিদের ফিলিস্তিনে প্রত্যাগমনের ক্রমবর্ধমান দাবির ফলে ইহুদিবাদীগণ প্রবল চাপের সম্মুখীন হয়।। ফিলিস্তিনে বস্তুত গৃহযুদ্ধই চলতে থাকে। হ্যাগানাহ দল অস্ত্র বহন করার জন্য হুকুমনামার সরকার হতে অনুমতি লাভ করে এবং গুপ্ত সংগঠন ইরগুনও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে সচল হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

আরেকটি কমিশন প্রেরণ করার পরিবর্তে গ্রেট ব্রিটেন ১৯৩৯ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি লন্ডনে আরব ও ইহুদিবাদীদের একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করে। মধ্যমপন্থী ও উগ্রপন্থী ফিলিস্তিনি আরবগণ ছাড়াও মিসর, ইরাক, সৌদি আরব ও ট্রান্সজর্ডানের নিকট হতেও প্রতিনিধি দল আহবান করা হয়। প্রথমবারের মত ফিলিস্তিনি সমস্যা সমাধানের জন্য অফিলিস্তিনি আরবদেরকেও আহ্বান করা হয়। অপরদিকে ইহুদিবাদী ও অ-ইহুদিবাদী ইহুদি এবং ইউরোপ ও যুদ্ধরাষ্ট্রের ইহুদিদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। আরবদের প্রত্যাখ্যানের ফলে সম্মেলন এমনকি প্রতিনিধিবৃন্দকে এক টেবিলে বসাতেও অসমর্থ হয় এবং দুটি পরস্পর বিরোধী মতামতের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

যুদ্ধের মেঘ পুনরায় ইউরোপীয় দিগন্তে পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং ব্রিটেনকেও জার্মান-হুমকি বিবেচনা করতে হয়। এটা কিছুতেই প্রত্যাশিত নয় যে, আরবগণ জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করুক। মিসরীয়গণ ও ক্রিসেন্টের আরবগণ বাহ্যত বৃটিশের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন কিন্তু ফিলিস্তিনের ব্যাপারে অসুখী এবং জার্মান অপপ্রচারের কি প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে সূচিত হয় তা কিছুতেই বলা যায় না। আরেকটি মহাযুদ্ধের কথা বিবেচনা করে গ্রেট ব্রিটেন ১৯৩৯ সালের ১৭ই মে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। এই শ্বেতপত্র পরিষ্কারভাবে আরবদের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে। এটি দশ বছরে একটি স্বাধীন দ্বি-জাতিত্বমূলক ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করে। এতে পাঁচ বছরে ৭৫০০০ বাস্তুত্যাগীর ফিলিস্তিনে প্রবেশের অনুমতির ব্যবস্থা রয়েছে এবং পরবর্তী বাস্তুত্যাগ আরবদের সম্মতির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। জমি বিক্রয় কোনো কোনো অংশে বৈধ ঘোষণা করা হয়। কোনো কোনো অংশে সীমিত করা হয় কিন্তু অধিকাংশ ফিলিস্তিনে এটা নিষিদ্ধ করা হয়। উভয় পক্ষ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং ইহুদিবাদিগণ এই ক্ষেত্রে আরবদের চাইতে উগ্র মনোভাবের পরিচয় দেয়। সমগ্র ফিলিস্তিনে ইহুদিবাদী বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং ইহুদি এজেন্সির চেয়ারম্যান বেনগুরিয়ান ব্রিটিশ নীতির বিরোধিতা করবেন বলে ওয়াদা করেন।

অদ্ভুত মনে হলেও এটা সত্য যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের বিবদমান দলগুলোকে কিছুটা শান্ত করে। ইহুদিবাদীদের অভিরুচি পরিষ্কার। গ্রেট ব্রিটেন ও হিটলারের জার্মানির মধ্যে সংঘটিত একটি যুদ্ধে ইহুদিবাদিগণ কোন পক্ষ অবলম্বন করবে তা প্রশ্নাতীত। বেনগুরিয়ানের ভাষায়, "আমরা শ্বেতপত্র নিয়ে

www.pathagar.com

এমনভাবে সংগ্রাম করব যেন কোনো যুদ্ধই নেই এবং আমরা এমনভাবে যুদ্ধ করব যেন কোনো শ্বেতপত্র নেই।" ইহুদিবাদিগণ একটি সম্পূর্ণ ইহুদি বাহিনী গঠন করবার সুযোগ গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্রিটিশগণ একটি ফিলিস্তিন পাইওনিয়ার বাহিনী গঠন করে এবং আরব ও ইহুদি উভয় স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত রাখে। অবশ্য ১৯৪৪ সাল নাগাদ ব্রিটিশগণ কিছুটা নরম হয় এবং ইহুদিদেরকে তাদের নিজস্ব চিহ্ন ও পতাকাবাহী ব্রিগেড গঠন করার অনুমতি দান করে। আরবগণ জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে ইহুদিদের ন্যায় তেমন উৎসাহী ছিল না। ৯,০০০-এর অধিক লোক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করেনি।

ইহুদিবাদী ও আরব উভয়েই জানত যে বৃহৎ শক্তিবর্গের এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। পার্থক্য শুধু এই যে ইহুদিবাদিগণ সম্ভাব্য সব উপায়ে ভাগ্যকে তাদের স্বপক্ষে আনয়ন করতে চেষ্টা করে, অপরদিকে আরবগণ সবকিছু আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিতে আগ্রহী হয়।

---

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়
ইরান–পাহ্‌লভী যুগ

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইরান তার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করলেও এদেশ আঁতাত এবং কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের অসংখ্য যুদ্ধের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রুশ ও তুর্কিগণ আজারবাইজানে যুদ্ধ করে, ব্রিটিশগণ দক্ষিণাঞ্চলে সাউথ পার্শিয়া রাইফেলস নামে একটি পারস্য আধাসামরিক বাহিনী গঠন করে এবং জার্মানগণ নাইদামায়ার (Niedar-mayer) ও ওয়াসমুসের (Wassmuss) ন্যায় দুঃসাহসিক অভিযাত্রী দালালদের মাধ্যমে আঁতাত পক্ষের বিরুদ্ধে গোত্রসমূহকে ক্ষিপ্ত করতে চেষ্টা করে। ইতোমধ্যে যুবক সম্রাট আহমদ শাহ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং তৎসঙ্গে ইরান কিছুটা সংসদীয় পদ্ধতির রূপ ধারণ করে। সরকার তখন রাজনৈতিক মধ্যপন্থী, গোত্রীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও জমিদার অভিজাতবর্গের একটি যুক্তফ্রন্টের হাতে থাকে, যাদের অধিকাংশ লোক কয়েক বছর পূর্বেও শাসনতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ছিল। ১৯১১ সালে শুস্তারের বরখাস্তের সঙ্গে মজলিস বন্ধ হয়ে গেলে উদার গণতন্ত্রীদল যেহেতু বিশ্বাস করে যে আঁতাত দল জয়লাভ করলে ইরানকে রাশিয়া ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে বিভক্ত করা হবে তাই তাদের অধিকাংশ বার্লিনে একত্রিত হয়। সেখানে উদার বিপ্লবীদের একজন পুরোধা তাব্রিজের হাসান তাকিজাদেহ ১৯২১ সাল পর্যন্ত কাভেহ (Dkaveh) নামে একটি পত্রিকা সম্পাদন করেন। উদারপন্থীদের মধ্যে যারা ইরানে থেকে যায় তারা ওসমানীয়দের কাঁধে কাঁধ মেলাবার জন্য সুদূর পথ অতিক্রম করে ইস্তাম্বুলে পৌঁছে।

জিলানের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র

বার্লিন বা ইস্তাম্বুলের উদারপন্থিগণ ইরানের ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবিত করেনি। তবে কিছুসংখ্যক উদারপন্থী কর্মধারা নিজেদের হাতে নেয়, একটি ছোটখাটো অস্ত্রধারী দল গঠন করে এবং ইরানে উত্তরাঞ্চলের প্রদেশসমূহ

www.pathagar.com

আজারবাইজান, জিলান ও খোরাসানে বিপ্লবী সরকার স্থাপন করে। এদের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভবত কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত জিলান প্রদেশে মির্জা কুচুক খান কর্তৃক পরিচালিত বিপ্লবী সরকার। তিনি ও তাঁর অনুসারিগণ এই মর্মে শপথ গ্রহণ করেন যে, ইরান হতে বিদেশি সৈন্য প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তারা দাড়ি ও চুল কাটবেন না। জিলানের বনে অবস্থান করায় তারা বন-জঙ্গলের লোক নামে পরিচিত হয় এবং রবিনহুডের কায়দায় তারা নিজেদের ভরণ-পোষণ করে। কিছুকালের জন্য জার্মান ও তুর্কি অফিসারগণ জংলি স্বেচ্ছাসেবকদেরকে ব্রিটিশ ও রুশ যোগাযোগ লাইন ধ্বংস করার কাজে প্রশিক্ষণ দান করে। রুশ বিপ্লবের পর ইহসানুল্লা নামক আজারবাইজানের এক কমিউনিস্ট এজেন্ট ও কুচুক খানের বন্ধুর মাধ্যমে বলশেভিকগণ জংলিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে।

জংলিদের সাথে মস্কোয় অবস্থিত কমিউনিস্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পর্ক কখনও জোরদার হয়নি। একিকে বলশেভিকগণ নিশ্চিত হতে পারে না যে, ইরান মতবাদের দিক হতে বিপ্লবের জন্য 'প্রস্তুত' কিনা, অপরদিকে জংলিদের মধ্যে একমাত্র ইহসানুল্লাহই খাঁটি কমিউনিস্ট এবং নেতা কুচুক খান মনেপ্রাণে বলশেভিকদের সাথে সহযোগিতার ব্যাপারে মনস্থির করতে অপারগ। এতদসত্ত্বেও ১৯২০ সালে বসন্তকালে ব্রিটিশ সৈন্যদেরকে জিলান ত্যাগে বাধ্য করার ব্যাপারে তিনি বলশেভিকদের সাহায্য গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সৈন্যগণ রুশ বিপ্লবের পর উত্তর ইরান দখল করে। প্রাদেশিক রাজধানী রাশ্‌ত-এ জিলানের একটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র স্থাপন করা হয়, কিন্তু শীঘ্রই জংলিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। একজন পারস্য জাতীয়তাবাদী হিসাবে কুচুক খান জিলানকে রাশিয়ার একটি অংশে পরিণত করার বিরোধী। আবার একজন মধ্যমপন্থী সমাজবাদী হিসাবে তিনি পারস্যের জমিদার ও ব্যবসায়ীদেরকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করারও বিরোধী।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে কোন নীতি গ্রহণ করবে সে ব্যাপারে মস্কো তখনও মনস্থির করতে পারেনি। তৎসঙ্গে জিলানে একটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠিত হবার ফলে মস্কো তেহরানের পারস্য সরকারের সাথে একটি বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করতে সচেষ্ট হয়। ফলে লেনিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, একটি মার্ক্সীয় বিপ্লব সংঘটিত হবার মত ক্ষেত্র ইরানে তৈয়ার হোক। তিনি জংলিদের প্রতি প্রদত্ত তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করেন এবং সোভিয়েত

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে আনেন। মির্জা কুচুক খান এভাবে একাকী পারস্য সরকারি বাহিনীর সাথে এঁটে উঠতে ব্যর্থ হন। তাঁর সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়। ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। জ্বিলানের পর্বতে পলাতক হিসাবে তিনি প্রচণ্ড শীতে মারা যান।

জ্বিলানের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং তৎসঙ্গে সম্ভবত সমগ্র উত্তর উপকূল অধিকার করার ব্যাপারে মস্কোর অনীহার কারণ অনুমান-সাপেক্ষ ও সুদীর্ঘ–যা এখানে বিবৃত করা যায় না। তবু নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।

১। ইরান মার্ক্সীয় মতবাদ গ্রহণ করার মত যথেষ্ট উন্নত কিনা এ ব্যাপারে বলশেভিকদের মধ্যে সন্দেহ ছিল।

২। বলশেভিকগণ তখনও সাম্রাজ্যবাদের কার্যক্রম হিসাবে অন্যের দেশ দখল করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করবার পক্ষে যথেষ্ট আদর্শবাদী।

৩। জ্বিলানের এই ঝুঁকি গ্রহণকারী মধ্যস্থতাকারী আজারবাইজানের সোভিয়েতের সাথে মস্কোর মতানৈক্য বিদ্যমান ছিল।

৪। গৃহযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন খুবই দুর্বল এবং এই বিষয়েও নিশ্চিত নয় যে, গ্রেট ব্রিটেন তাকে উত্তর-ইরানে অনুপ্রবেশ করতে দেবে কিনা।

৫। মস্কো সম্ভবত বিশ্বাস করে যে, শুধুমাত্র একটি বা দুটি প্রদেশের চাইতে বন্ধুত্ব ও প্রচারণার মাধ্যমে সে কোনদিন সমগ্র দেশ পাইতে পারে।

৬। সেই ভূখণ্ড দখল না করে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্ভবত শুধু ভুলই করেছে। শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ পর জ্বিলান পরিকল্পনার একজন উদ্যোক্তা জাফর পিশভেরি (Jafar Pishevari) পারস্যের আজারবাইজান প্রদেশে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন পরিচালনা করেন। এটি ছিল স্ট্যালিনের সময় এবং মস্কো পুনরায় তার সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পারস্য সরকারের হাতে কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদেরকে ধ্বংস হতে দেয়া।

ইঙ্গ-পারস্য চুক্তি

রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব ইরানকে বিভিন্নভাবে প্রভাবান্বিত করে। তাদের একটি হল এই যে এটা অন্ততঃপক্ষে দেশের মধ্যে বিদ্যমান ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটায়। এই বিপ্লব ১৯০৭ সালে ইঙ্গ-রুশ কনভেনশনকে অকেজো করে দেয়; যদ্বারা এই দুই দেশ ইরানকে নিজেদের প্রভাবের অংশে

www.pathagar.com

বিভক্ত করেছিল। রাশিয়ার অনুপস্থিতির ফলে গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে শূন্যস্থান পূরণ করা, সমগ্র ইরান নিজের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা এবং তদ্বারা ভারতবর্ষের জল স্থলপথ উন্মুক্ত রাখা ও সদ্য আবিষ্কৃত তৈলকূপগুলো নিয়ন্ত্রণ করা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। বৈদেশিক সচিব লর্ড কার্জনের স্বপ্ন ছিল, "ভূমধ্যসাগর থেকে পামির পর্যন্ত এক নাগাড়ে কতকগুলো অধীন রাষ্ট্রের গ্রন্থি" সৃষ্টি করা, তন্মধ্যে ইরান "অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র।" ১৯১৯ সালে পরাক্রান্ত ব্রিটিশ কূটনীতিজ্ঞ স্যার পার্শি কক্স (Sir Percy Cox) তেহরানে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন এবং তাঁকে উপরোল্লিখিত নীতি কার্যকর করতে বলা হয়।

১৯১৯ সালে আবার প্যারিস শান্তি সম্মেলনের বছর, যার প্রতি উডরু উইলসনের আত্মনিয়ন্ত্রণের মতবাদ অনেক ছোট ছোট জাতিকে আকৃষ্ট করে। একগুচ্ছ দাবি সহকারে ইরানও একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। ইরানকে সম্মেলনে গ্রহণ করার ব্যাপারে ব্রিটিশ বিরোধিতা করে। উইলসন সমস্ত প্রতিনিধিদলকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী এবং ইরানের ক্ষেত্রে ফ্রান্স এবং ইতালিও সম্মতি জ্ঞাপন করে, কিন্তু গ্রেট ব্রিটেন অসম্মত। ১৯১৯ আগস্ট নাগাদ ঘোষণা করা হয় যে, গ্রেট ব্রিটেন ও ইরান একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যে ব্যাপারে বেশ কিছুদিন যাবৎ আলাপ-আলোচনা চলছিল। এই অখ্যাত চুক্তিতে ইরানের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী হাসান ওসুক আল-দোলেহ্ এবং শাহজাদা ফিরুজ, যাঁকে তাঁর চাচাতো ভাই শাহ্ বৈদেশিক মন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

সেই চুক্তি পরিষ্কারভাবে গ্রেট ব্রিটেনের স্বপক্ষে স্বাক্ষরিত হয় এবং ইহা শুধু পারস্যের উদারপন্থীদের ভিতর নয় বরং যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের ন্যায় দেশেও ক্ষোভের সঞ্চার করে। পারস্যের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান প্রদর্শনের গতানুগতিক অঙ্গীকারের পর চুক্তি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পূর্ণ করার ওয়াদা করে :

১। পারস্যের যতগুলো বিভাগের জন্য প্রয়োজন গ্রেট ব্রিটেন ততজন উপদেষ্টা প্রদান করবে। ইরান উপদেষ্টাদের খরচপত্র ও "যথেষ্ট দক্ষতা" প্রদান করবে।

২। গ্রেট ব্রিটেন পারস্য সরকারের খরচে একটি পারস্য সেনাবাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণ দান করবে।

৩। উপরোল্লিখিত কার্যের জন্য ৭ শতাংশ সুদের হারে ২০ লক্ষ পাউন্ড ঋণ প্রদানের বন্দোবস্ত করা হয় এবং ঋণ প্রদানকারী ইরান "সমস্ত রাজস্ব ও শুল্ক আয়ের" মালিক হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

www.pathagar.com

৪। "রেলপথ নির্মাণ ও অন্যান্য যানবাহনের সাহায্যে" গ্রেট ব্রিটেন ইরানের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করবে।

চুক্তিটি এমনভাবে স্বাক্ষরিত হয় যে, ইরান গ্রেট ব্রিটেনের পদানত হয়ে যায়। অনেক দিক হতে এটি ১৯২২ সালের মিসরের উপর এককভাবে চাপিয়ে দেয়া চুক্তির ন্যায়। সঙ্গে সঙ্গে এই চুক্তির বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। পারস্যবাসীদের বিরোধিতার জন্য যতটুকু নহে তার চাইতেও বেশি যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার জন্য চুক্তিটি নাকচ হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করতে হবে যে, উডরু-উইলসনের আদর্শবাদের সাথে ইরানের তেলের অনুমতিপত্র লাভের ব্যাপারে মার্কিন তেল কোম্পানিগুলো আগ্রহও মিলিত হয়। চুক্তি দ্বারা গ্রেট ব্রিটেনের দেয়া এরূপ একচেটিয়া অধিকার কোম্পানিগুলো পছন্দ করেনি। অপরদিকে ব্রিটিশগণ এমন নিশ্চিত হয়ে যায় যে, তারা চুক্তিটি মজলিসের দ্বারা অনুমোদিত হবার পূর্বেই (কখনও এটি অনুমোদিত হয়নি) ইরানে তিনজন প্রধান উপদেষ্টা প্রেরণ করে দেয়। আর্মিটেজ স্মিথকে অর্থনৈতিক বিষয়াদির জন্য, জেনারেল ডিকসনকে সামরিক বিষয়াদির জন্য এবং হার্বার্ট স্মিথকে শুল্ক বিষয়াদির জন্য উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। এই চুক্তি কার্যকরী না হওয়ায় ব্রিটিশ সম্মানে আঘাত লাগে কিন্তু ইরানে তাদের প্রভাব অম্লান রাখবার জন্য তারা শীঘ্রই আরেকটি পরিকল্পনা লাভ করে। সরাসরি নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব বিধায় ইরানে একটি শক্তিশালী রুশ বিরোধী ও গ্রেট ব্রিটেনের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন সরকার সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্য সফল করবে—তারা অনুরূপ একটি পরিবর্তনের প্রতি মনোনিবেশ করে।

১৯২১ সালের অভ্যুত্থান

১৯২০ সালে ইরান বিশৃংখলার আবর্তে নিমজ্জিত হয়। শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র শক্তিশালীও ছিল না, শাসনতান্ত্রিকও ছিল না। মন্ত্রিপরিষদ এক শক্তিশালী ভূস্বামী হতে আরেকজনের হাতে হস্তান্তরিত হয় মাত্র। চুক্তির ব্যর্থতা এক শূন্যতার সৃষ্টি করে, আবার জ্বিলানে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে পারস্যের নেতৃবৃন্দ বলশেভিজম সম্পর্কে শংকিত হয়। এই বিশৃংখলা ১৯২১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল বেলায় সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা দূরীভূত হয়। কর্নেল রেজা খানের সেনাপতিত্বে এবং পত্রিকা সম্পাদক সৈয়দ জিয়া আল-দ্বীন তাবাতাবাইর সমভিব্যাহারে প্রায় ২৫০০০ কোসাক সৈন্য ৬০

www.pathagar.com

মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কাজভীন হতে তেহরানে উপস্থিত হয় ও রাজধানী অধিকার করে। বলতে গেলে কোনো বাধাবিঘ্ন ছাড়াই তারা রাজধানী করায়ত্ত করে। সকালে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দলের সুপরিচিত অনেক ব্যক্তিবর্গকে গ্রেফতার করা হয়। ভীতসন্ত্রস্ত শাহ বাধ্য হয়ে সৈয়দ জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং রেজা খানকে সরদার–এ সিপাহ্ বা সেনাবাহিনীর অধিনায়ক উপাধি প্রদান করেন।

সৈয়দ জিয়া একজন মধ্যমপন্থী জাতীয়তাবাদী ও মধ্যমপন্থী পত্রিকা রা'দ (বজ্র)-এর সম্পাদক। এটি ব্রিটিশ সমর্থক সম্পাদকীয়ের জন্যও পরিচিত। উদারপন্থীগণ তাঁকে ব্রিটিশ সমর্থনের জন্য সন্দেহের চোখে দেখে, আবার সামাজিক দিক হতে ভূস্বামীদের আস্থা অর্জন করার মত জনপ্রিয়ও তিনি নন। তাঁর রাজনৈতিক কার্যাবলি পুলাদ কমিটিতে (Pulad Committee) কেন্দ্রীভূত। ব্রিটিশগণ ইস্পাহানে এই কমিটি প্রতিষ্ঠা করে। সরকারের সাথে তাঁর একমাত্র সম্পর্ক হল ১৯১৯ সালে ককেশাশে প্রেরিত পারস্য প্রতিনিধিদলে তাঁর সদস্যভুক্তি। প্রতিনিধিদলটি বলশেভিক রাশিয়ার কবল হতে স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্রবর্গের সাথে একটি বন্ধুত্বের চুক্তি স্বাক্ষর করে।

অপরদিকে রেজা খান সুদীর্ঘ, কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কিন্তু স্বল্প শিক্ষিত একজন সামরিক লোক। সাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা তিনি রুশ পরিচালিত কোসাক বাহিনীর সেনাপতি পদে উন্নীত হন। বলশেভিক বিপ্লবের পর পারস্যের কোসাক রেজিমেন্টের রুশ অফিসারগণ যখন আটক হয়ে যান, রেজা খান তখন পারস্য অফিসারদের একটি দলের নেতা। রুশদেরকে বিতাড়িত করে তাঁরা পূর্ণ রেজিমেন্টের নিয়ন্ত্রণ হস্তগত করেন। সামরিক জীবনে লালিত পালিত হবার ফলে তাঁর জাতীয়তাবাদের ধারা একটি সম্মিলিত সামরিক সরকারের হাতে ইরানের গৌরব প্রতিফলিত করে। রুশ অধিনায়কদের হাতে তাঁর কঠোর অভিজ্ঞতার ফলে তিনি স্বভাবতই বিদেশি বিরোধী, বিশেষত বলশেভিক ও রুশ বিরোধী।

রেজা খান ও সৈয়দ জিয়া, এই দুই ব্যক্তিকে যতটুকু জানা যায় তাঁরা মেজাজ, শিক্ষা এবং প্রায় প্রত্যেক কিছুতে পরস্পর বিরোধী এবং একে অপরের নিকট অপরিচিত। তেহরানের কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত শাহ্আবাদে বিপ্লবের রাতে সম্ভবত প্রথমবারের মত তাঁরা মিলিত হন। তদুপরি বিপ্লবের সফলতার পর তাঁদের পরিকল্পনাসমূহ সমন্বিত হয়নি। বিপুলসংখ্যক লোক গ্রেফতার হয়, কিন্তু

www.pathagar.com

এটা পরিষ্কার যে, পূর্ব থেকে এর জন্য কোনো তালিকা প্রস্তুত করা হয়নি। তাঁরা উদারনীতিবাদী, মধ্যমপন্থী, রক্ষণশীল, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে গ্রেফতার করেন। কখনও কখনও জিয়া হয়ত একজনকে গ্রেফতারের হুকুম দেন আবার রেজা তাকে মুক্ত করে দেন। বিপ্লবের পূর্বে সৈয়দ জিয়া তাঁর মন্ত্রিসভাও বেছে নেয় নি। একটি তৃতীয় দল নিশ্চয়ই সমস্ত প্রাথমিক আয়োজন সম্পন্ন করে। সমস্ত প্রমাণ দ্বারা ব্রিটিশগণই এই তৃতীয় দল বলে অনুমান করা হয়।

গ্রেট ব্রিটেনের সামরিক প্রতিনিধি কর্নেল স্মিথ ও রাজনৈতিক প্রতিনিধি হাওয়ার্ডের সাথে জিয়ার বন্ধুত্বের দ্বারা ব্যাপারটি প্রশ্নাতীত হয়ে যায়। বিপ্লবের পূর্বে এই সকল লোক ও অন্যদের সাথে ঘন ঘন সাক্ষাৎ এবং "তাদের নিকট আধুনিক পারস্য কবিতা আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা" করার জন্য ব্রিটিশ বন্ধুদের সাথে তাঁর রাত্রিকালীন সাক্ষাৎকার থেকে আরও সপ্রমাণিত করে। অধিকন্তু কাজভীনে ছিন্নবস্ত্র পরিধানকারী এই সকল কোসাক সৈন্যগণ তেহরানে প্রবেশ করার সময় সুসজ্জিত ব্রিটিশ সামরিক পোশাক পরিধান করে। রাজধানীর দিকে কোসাক রেজিমেন্টের অগ্রাভিযান সম্পর্কে অবহিত তেহরান সরকার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার জন্য শাহ্আবাদে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। ঘটনাচক্রে ব্রিটিশ লিগেশনের দুজন প্রতিনিধিও সেই সঙ্গে গমন করেন এবং সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করার মত যথেষ্ট টাকাও তাঁদের সঙ্গে থাকে। তদুপরি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস এই মর্মে এক স্বীকারোক্তি প্রচার করে যে এই সামরিক অভ্যুত্থানে তাদের হাত ছিল।

সৈয়দ জিয়া ও রেজা খান পারস্য সরকারের ক্ষমতা দখলের সময় ব্রিটিশদের সাহায্য নিয়েছিলেন, এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা ইরানের স্বার্থ গ্রেট বৃটেনের স্বার্থের নিকট জলাঞ্জলি দিয়েছেন। এই ধরনের অভিযোগ ১৯১৯ সালে চুক্তি স্বাক্ষরকারী ওসুক আল-দোলেহ্-এর বিরুদ্ধে আনা যায়, জিয়া বা রেজার বিরুদ্ধে নয়। সৈয়দ জিয়ার সরকার তিন মাসের অধিক স্থায়ী হয়নি। তাঁর ধরপাকড়ের শিকার হয়ে উদারপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল উভয় মহলই তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়। শাহ হতে নিচের দিকে সব ধরনের লোকের ওপর তিনি কঠোর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন, কিন্তু এই তৎপরতাকে প্রতিষ্ঠিত করার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সামরিক বাহিনী তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রেজা খানের সমর্থক ছিল। ১৯২১ সালের ২৫শে এপ্রিল রেজা খান যুদ্ধমন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করেন। উভয়ের মধ্যে প্রথম বিরোধ আরম্ভ হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত একটি

www.pathagar.com

সামরিক বাহিনী গেন্ডারমারীর (Gendermeria) ভবিষ্যৎ এবং ব্রিটিশ সামরিক উপদেষ্টা দল নিয়ে। রেজা খান চান সশস্ত্র বাহিনীকে একত্রীভূত করতে ও ব্রিটিশদেরকে বরখাস্ত করতে। সৈয়দ জিয়া উভয় প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন ও পরাভূত হন। ১৯২১ সালের ২৪শে মে তিনি ইরান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি ফিলিস্তিনে বাস করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ও রুশ বাহিনী পুনরায় ইরানে প্রবেশ করলে এবং তঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পদত্যাগ করলে তিনি পুনরায় ইরানে আগমন করেন। সৈয়দ জিয়া মনে করেন, কোনো বিদেশি শক্তির সাহায্য ছাড়া ব্যাপক কোনো কিছু করা যায় না। বৃহৎ শক্তিসমূহের মধ্যে তিনি সর্বদাই গ্রেট ব্রিটেনের সমর্থক।

রেজা খান ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। বিদেশি প্রভাবমুক্ত একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সামরিক সরকার ছাড়া কোনো কিছু করা যায় না বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। ক্ষমতা দখলের সময় তিনি ব্রিটিশদের ব্যবহার করেন কিন্তু পরে একাধিকবার তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করেন। কর্মজীবনে তিনি বিদেশি উপদেষ্টাদেরকে কাজে লাগাতে বাধ্য হন; অথচ তাদের উপস্থিতিতে তিনি স্বস্তিবোধ করেননি এবং কখনও কোনো পরিকল্পনায় তাদেরকে কয়েক বছরের বেশি রাখেননি। এই ধরনের মনোভাব সুস্থ নয়। কিন্তু এটা ভাববার বিষয় যে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পারস্যবাসিগণ বিদেশি উপদেষ্টা ছাড়া একটি সেনাবাহিনী গঠন করতে পারত কি? কোনো বিদেশি ঋণ ছাড়া ক্যাস্পিয়ান সাগর হতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ সম্ভব ছিল কি?

ইরান-সোভিয়েত চুক্তি, ১৯২১

সামরিক বিপ্লবের পাঁচদিন পর প্রাক্তন পারস্য মন্ত্রিসভা ও মস্কোর মধ্যে স্থিরীকৃত একটি রুশ-পারস্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির তাৎক্ষণিক ফলাফল হল জ্বিলান থেকে সোভিয়েত সৈন্য অপসারণ। এর পরে জ্বিলানের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ধ্বংস হয়। মির্জা কুচুক খান জ্বিলানের পর্বতে পলাতক হন এবং পরে শীতে মারা যান। রুশগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রচারিত এই চুক্তির ভাষ্য মূলত বলশেভিক সরকারের একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও উপনিবেশবাদ বিরোধী নীতির ঘোষণা এবং সবেমাত্র বাতিল ১৯১৯ সালে ইঙ্গ-পারস্য চুক্তির প্রতিকূলে একটি নজির। এই চুক্তি অনুসারে রুশগণ ইরানকে সমস্ত রুশ সম্পত্তি, অনুমতিপত্র ও বিষয়-আশয় প্রদান করে, তবে শর্ত হল ইরান এই মর্মে

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতি প্রদান করে (ধারা-১৩) যে, 'পারস্য জনগণের উপকারার্থে এগুলো সংরক্ষণ করবে।' অবশ্য এই চুক্তি জার সাম্রাজ্যবাদের এবং ভবিষ্যৎ রুশ শ্রমিক সাম্রাজ্যবাদের কিছু চিহ্ন রেখে যায়।

উদাহরণ স্বরূপ, ১৮৬৭ সালে কাস্পিয়ান মৎস্য অনুমতিপত্র এবং মাসুলের আইন (Tarrif regulations) অপরিবর্তনীয় রয়ে যায়। রাশিয়ায় খাদ্য সরবরাহের জন্য মৎস্য প্রয়োজন এবং মাসুলও ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকূলে। ১৯২৭ সালে একটি নতুন ইরানি-সোভিয়েত মৎস্য কোম্পানি গঠন করা হয় এবং ২৫ বছর মেয়াদি একটি অনুমতিপত্রও প্রদান করা হয়। কিন্তু মাসুল আর পরিবর্তন করা হয়নি, ফলে পারস্যের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সোভিয়েতের একচেটিয়া ব্যবসার সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য ইরান রাষ্ট্রীয়ভাবে একচেটিয়া ব্যবসা আরম্ভ করে। মোটের ওপর স্ট্যালিন ও রেজা শাহের অধীনস্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইরানের ক্রমবর্ধমান কঠোরতা স্বাধীন ব্যবসার অনুকূলে নয়।

৬নং ধারা পরবর্তীকালে ইরানের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। এতে বলা হয়, কোনো তৃতীয় শক্তি "রাশিয়ার বিরুদ্ধে পারস্য ভূখণ্ডকে ঘাঁটি বানাতে চাইলে .... পারস্যের অভ্যন্তরে সৈন্য প্রেরণ করার অধিকার রাশিয়ার থাকবে....... ।" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অ-কম্যুনিস্ট দেশসমূহের সাথে ইরানের নিরাপত্তা চুক্তিসমূহে আপত্তি জ্ঞাপন করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং অন্যান্য সময় ইরান আক্রমণ করতে এই ধারা ব্যবহার করে।

পারস্যের তেল ঃ দ্বিতীয় পর্ব

অনতিকাল পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৩ নং ধারা রহিত করার সুযোগ লাভ করে। ১৯২১ সালের মে মাসে সৈয়দ জিয়া নির্বাচিত হলে রেজা খান প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেননি বরং গ্রেফতারকৃত সকলকে মুক্তিদান করেন। এদের একজন, ওসুক-আল-দোলেহ্-এর ভ্রাতা কাভাম আল সালতানেহ্ প্রধানমন্ত্রী হন। কাভাম পারস্য কূটনীতির সেই ভাবধারার অন্তর্ভুক্ত যারা বিশ্বাস করেন যে গ্রেট ব্রিটেন ও রাশিয়াকে নিরস্ত্র করার জন্য একটি তৃতীয় শক্তির প্রয়োজন। আধুনিক পারস্যের ইতিহাসে কাভামের নাম উত্তরাঞ্চলের তেল ও মার্কিন অর্থনৈতিক মিশনের সাথে সংযুক্ত।

www.pathagar.com

১৯২১ সালের ২২শে নভেম্বর পারস্য সরকার একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে যদ্বারা পঞ্চাশ বছরের মেয়াদে উত্তরাঞ্চলের তেল আহরণের জন্য স্টান্ডার্ড অয়েল কোম্পানিকে অনুমতি প্রদান করা হয়। ইঙ্গ-পারস্য অয়েল কোম্পানি এই মর্মে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে যে উত্তরাঞ্চলে তেল আহরণের জন্য খোসতারিয়াকে ১৯১৬ সালে অনুমতি প্রদান করা হয়। এক লক্ষ পাউন্ডের বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকার স্বত্ব ক্রয় করে নর্থ পার্শিয়া অয়েল নামে একটি কোম্পানি গঠন করেছিল। তারা এখন দাবি করে যে একই অঞ্চলে তেল আহরণের জন্য দুটি দলকে অনুমতিপত্র প্রদান করার কোনো অধিকার পারস্য সরকারের নেই। অপরদিকে উত্তর-ইরানে মার্কিন স্বার্থে বাধা প্রদানকারী রুশগণ এই মর্মে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে যে, চুক্তির ১৩নং ধারা অনুযায়ী সোভিয়েত সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত কোনো অনুমতিপত্র কোনো তৃতীয় পক্ষকে প্রদান করার ব্যাপারে ইরান চুক্তিবদ্ধ। উভয় পক্ষের নিকট ইরানের উত্তর হল, খোসতারিয়া চুক্তি যেহেতু মজলিস অনুমোদন করেনি তাই শাসনতন্ত্র মোতাবেক এটি অকেজো এবং এ কারণে কার্যকর বলে গ্রহণ করা যায় না।

এই বিষয় নিয়ে ব্রিটিশ ও মার্কিনিদের মধ্যে বেশ কিছুদিন বিতর্ক চলতে থাকে। এই ব্যাপারে ব্রিটিশগণ সুবিধা লাভ করে কারণ পারস্য উপসাগর এলাকায় ইঙ্গ-পারস্য তেল কোম্পানির তেল রফতানির একচেটিয়া অধিকার বিদ্যমান এবং তারা স্ট্যান্ডার্ডকে দক্ষিণের কোনো বন্দর দিয়ে তেল প্রেরণ করতে অনুমতি দান করেনি। ১৯২২ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ ও মার্কিন কোম্পানিগুলো একটি অংশীদারিত্বে রাজি হয়, যদ্বারা মার্কিনিগণ ভোটের অধিকার লাভ করে। অবশ্য পারস্যবাসীরা রাজি হয়নি কারণ উত্তরের কোনো ব্যাপারে ব্রিটিশ কোম্পানির কোনো অধিকার তারা চায় না এবং তাই সমগ্র পরিকল্পনাই তারা প্রত্যাখ্যান করে।

এ সময় সিনক্লেয়ার অয়েল কোম্পানি (Sinclair Oil Company) এই পরিকল্পনায় উৎসাহী হয়ে ওঠে। স্ট্যান্ডার্ডের উপর সিনক্লেয়ারের বিশেষ সুবিধা এই যে এটা সোভিয়েত ইউনিয়ন সাখালিন দ্বীপের তেল আহরণ ও বিশ্বে এটা বাজারজাতকরণের অনুমতি পত্র লাভ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সিনক্লেয়ারকে তার ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে উত্তরাঞ্চলের তেল রফতানি করার সুযোগ দান করবে বলে মনে করা হয়। পারস্য মজলিস ইতোমধ্যে যে কোনো স্বাধীন ও দায়িত্বশীল

www.pathagar.com

মার্কিন কোম্পানিকে উত্তরাঞ্চলের তেলের জন্য সরকারকে অনুমতিপত্র প্রদান করার ক্ষমতা অর্পণ করে। শর্তসমূহের একটি হল অনুমতিপ্রাপ্ত কোম্পানি পারস্য সরকারকে এক কোটি ডলারের একটি ঋণ প্রদান করবে। ঋণের সমস্যাটি সহজ নয়, কিন্তু মনে হয় সিনক্লেয়ার সোভিয়েত ইউনিয়নের আশীর্বাদ নিয়ে ইরানে আগমন করে এবং আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করে।

সিনক্লেয়ার অয়েলের আলাপ-আলোচনা এর সাথে সংযুক্ত ঘটনাবলি আন্তর্জাতিক দলাদলি, অপবাদ, লুট ও হত্যার উপাদান প্রদান করে। শুরুতেই ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে মজলিস যখন সিনক্লেয়ার অনুমতিপত্র অনুমোদন করে মজলিস ভবনের একাংশে আগুন ধরে যায়। রিপোর্ট অনুসারে একজন লুণ্ঠনকারী কর্তৃক এটা সংঘটিত হয়। এপ্রিল মাসে আমেরিকান ব্লেয়ার এন্ড কোম্পানি (American Blair and Company) ইরানের একটি ঋণের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য জনৈক জেমস ফর্বস্‌কে পাঠায়, কিন্তু ব্রিটিশগণ জোর দিয়ে বলে যে যুক্তরাষ্ট্রে কোনো ঋণের জন্য তারা দক্ষিণাঞ্চলের আবগারি শুল্ক হিসাবে প্রদানের অনুমতি দেবে না। তারপর ১৯২৪ সালে গ্রীষ্মকালে সিনক্লেয়ারের প্রতিনিধি ইরানে থাকাকালীন দু'টা ঘটনা দ্বারা তেহরান প্রকম্পিত হয়। প্রথমত অদ্ভুত ধর্মীয় আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং পরে জানা যায় যে, শহরের একটি পানির ফোয়ারায় একটি অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়। শত শত রোগী ঐ স্থানে আরোগ্য লাভের জন্য গমন করে এবং হাজার লোক এটা দেখার জন্য গমন করে। দ্বিতীয় ইঙ্গ-পারস্য তেল কোম্পানির একজন মার্কিন কর্মচারীর প্ররোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস কনসাল্‌ মেজর ইম্ব্রী ঐ অলৌকিক ঘটনাস্থলের ছবি তুলতে যান। তথায় জনতা কর্তৃক তিনি নিহত হন, অথচ তাঁর সঙ্গীর কিছু হয় নাই। সরকারি অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, পুলিশ ঘটনাটির অন্যভাবে বিচার করে এবং তারা মার্কিনিটিকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করে নাই। ১৯২৪ সালে আরেকটি কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয় যাকে আমেরিকান টিপট ডোম স্ক্যান্ডাল (American Teapot Dome Scandal) নামে অভিহিত করা হয়, যাতে সিনক্লেয়ার কোম্পানিও বিজড়িত। পরিকল্পনায় ব্যর্থতার ব্যাপারে এসব ঘটনাবলি কতটুকু দায়ী তা সহজেই অনুমেয়। তবে উল্লেখযোগ্য এই যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে উত্তরাঞ্চলের তেলের বিষয়টি আর উত্থাপিত হয়নি।

www.pathagar.com

রেজাশাহ্ পাহ্লভী

উত্তর-ইরানে মার্কিনিদেরকে জড়িত করার পারস্য সরকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তবে এতদ্বারা আমেরিকার রাষ্ট্রীয় বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. আর্থার মিল্স্ পাফ্কে ইরানের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিয়োগ করা সম্ভব হয়। ড. মিল্স্ পাফ্ ও তাঁর দল ১৯২২ সালে ইরান আগমন করেন এবং পাঁচ বছরের জন্য ইরানে কাজ-কর্ম সুসম্পন্ন করেন।

মিল্সপাফের অর্থনৈতিক নীতিমালার কল্যাণে যুদ্ধমন্ত্রী রেজা খান সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত ও প্রশিক্ষণ দান করার জন্য যথেষ্ট অর্থ লাভ করেন। বিদ্রোহ দমন, গোত্রগুলোকে নিরস্ত্রীকরণ এবং দেশের প্রত্যেক অঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাভুক্ত করার কাজে রেজা খান এই সেনাবাহিনী ব্যবহার করেন। এই কাজে নৃশংস পন্থা অবলম্বন করা হয়, তবে রাস্তাঘাট দস্যুমুক্ত হয় এবং বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে এই প্রথম পূর্ণ বোঝা নিয়ে কাফেলাসমূহ দ্বিধাহীন চিত্তে দেশের সর্বত্র বিচরণ করতে সক্ষম হয়। সারা জীবন দস্যুতস্করের ভয়ে সন্ত্রস্ত বসবাসকারী জনসাধারণের নিকট ভোটের নিরাপত্তা চাইতে জীবনের নিরাপত্তাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

১৯২৩ সালের অক্টোবরে রেজা খান প্রধানমন্ত্রী হন। বিপ্লবের পর এই প্রথম একজন সামরিক ব্যক্তি সরকারের প্রধান হন। বস্তুত এই সময় প্রদেশসমূহের অধিকাংশ গভর্নরই সামরিক ব্যক্তি এবং যারা বেসামরিক গভর্নর তাঁরা তাঁদের স্ব-স্ব এলাকার সামরিক অধিনায়কদের প্রভাবাধীন থাকেন। মজলিশের পঞ্চম বৈঠকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রায় সামরিক গভর্নর বা অধিনায়কের প্রভাবাধীনে। অনেক দিক হতেই এটা ইরানের আধুনিক ইতিহাসে অত্যন্ত ঘটনাবহুল বৈঠক। ১৯৪২ সালের পূর্বে এটিই শেষ বৈঠক যেখানে প্রতিনিধিগণ তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে সাহস করেন।

নিঃসংকোচে বলা যায়, পারস্য বিপ্লবে রেজা খানের ভূমিকা ছিল ফরাসি বিপ্লবের জন্য নেপোলিয়নের ন্যায়। রেজা খান বিপ্লবের সন্তান আবার এর সমালোচকও। তিনি বিপ্লবের অনেক উদ্দেশ্য বিশ্বাস করেন, কিন্তু এর প্রক্রিয়া নয়। পঞ্চম মজলিশে তিনটি দল দৃষ্ট হয় : সংস্কারবাদিগণ যাঁরা রেজা খানের কর্মসূচি ও প্রক্রিয়া উভয়ই সমর্থন করেন, সমাজতান্ত্রিক দল, যাঁরা তাঁকে সমর্থন করেন কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁকে প্রভাবান্বিত করতে চান এবং আলেম মদারেস-এর মতাবলম্বী অর্ধডজন 'সংখ্যালঘু' যাঁরা বিভিন্ন কারণে রেজা খানের বিরোধিতা করেন। অবশিষ্টগুলো স্বতন্ত্র।

www.pathagar.com

রেজা খান প্রধানমন্ত্রী হবার পরেই আহমদ শাহ তাঁর স্বাভাবিক সফরের একটা অংশ হিসাবে ইউরোপ গমন করেন। ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথাবার্তা ওঠে এবং সামরিক অধিনায়কদের প্ররোচনায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তারবার্তা আসতে থাকে, যদ্বারা মজলিশকে কাজার বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বলা হয়। কাজারের বিরুদ্ধে সমালোচনা যথেষ্ট শোনা যায়, কিন্তু প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বেশ মতবিরোধ দেখা দেয়। মজলিশে ভেতরে ও বাইরে প্রজাতন্ত্রের উদ্যোক্তা দেখা যায় উদারপন্থী, মধ্যমপন্থী, সামরিক লোকজন ও অন্য লোকদের মধ্যে। এই প্রস্তাবনার বিরোধী হলেন ওলামাগণ ও বাজারের দোকানদারগণ যারা সাধারণত ওলামাদের সমর্থন করেন। ওলামাদের সাথে একমত থাকেন আলেম-সমাজবিরোধী ক্ষুদ্রসংখ্যক উদারপন্থিগণ, যাঁরা আদর্শগতভাবে প্রজাতন্ত্রের সমর্থক কিন্তু গণতন্ত্র ও বেসামরিক শাসনের আদর্শের প্রতি যাঁদের একনিষ্ঠতার দরুন তাঁরা এই বিশেষ আন্দোলনের বিরোধী—কারণ এটা একজন 'একনায়ক ও একজন কোসাক' দ্বারা পরিচালিত।

তেহরানে জনসাধারণ আলেম সমাজের প্রভাবাধীন, তাই তারা প্রজাতন্ত্র ও রেজা খানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। যুবক ওলামা বিরোধী কবি ইশকীর হত্যা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেয়। এক কবি রেজা খানের একনায়কত্ব ও তাঁর 'বিন্যস্ত প্রজাতন্ত্রের" ওপর বিদ্রুপাত্মক কবিতা লেখেন। দেয়ালের লিখন বুঝবার মত যথেষ্ট জ্ঞান রেজা খানের ছিল। তিনি দ্রুত তেহরানের দক্ষিণে অবস্থিত দরগাহ নগরী কোমে গমন করেন এবং প্রধান ধর্মীয় নেতাদের সাথে বাক্যালাপ করে একটি ঘোষণা জারি করেন। ঘোষণায় বলা হয় যে পারস্য সরকারের কর্মসূচির ভিত্তি যেহেতু ইসলামের প্রতিরক্ষা, তাই তিনি ও ধর্মীয় নেতাগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাঁরা জনসাধারণকে "প্রজাতন্ত্রের আলোচনা বন্ধ করতে বলবেন এবং তৎপরিবর্তে .... ইসলামের ভিত্তি ও দেশের স্বাধীনতা মজবুত করতে আমাকে জনগণ সাহায্য করবে।"

প্রজাতন্ত্র আন্দোলনের ব্যর্থতার দ্বারা কাজার বংশ রক্ষা পায়নি। শাহ্ প্যারিস থেকে রেজা খানকে প্রধানমন্ত্রীর পদ হতে বরখাস্ত করেন এবং মজলিশকে আরেক জনের নাম সুপারিশ করার জন্য বলেন। মজলিশ শাহের ইচ্ছা অমান্য করে রেজা খানের জন্য সুপারিশ করেন। রেজা খান সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ ক্ষমতা করায়ত্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সদস্যবৃন্দকে তাঁর গৃহে

www.pathagar.com

আহ্বান করে আহমদ শাহ্কে বরখাস্ত ও রেজা খানকে সাময়িক রাষ্ট্রপ্রধান করে একটি প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেন। একটি স্থায়ী পরিষদ গঠনের জন্য গণপরিষদের সভা আহ্বান করার কথাও প্রস্তাবে উল্লেখ থাকে। সদস্যদের অধিকাংশই এই দলিলে স্বাক্ষর করেন। ১৯২৫ সালের ৩১শে অক্টোবর মজলিশ কাজার বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং একটি গণপরিষদের সভা আহ্বান করে।

মাত্র চারজন সদস্য সাহস করে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এদের মধ্যে ইয়াহ্ইয়া দৌলতাবাদী রাজনীতি ত্যাগ করেন। ড. মোহাম্মদ মোসাদ্দেক কিছুকালের জন্য ইরানের মধ্যেই রাজনৈতিক অন্তরীণাবদ্ধ থাকেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যথেষ্ট ক্ষমতা লাভ করেন; তাকীজাদা ও আলা নতুন শাহের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে তাঁদের বক্তৃতার মধ্যে কেউই আরামপ্রিয় আহমদ শাহ বা তাঁর ভ্রাতা শাহজাদাকে সমর্থন করেননি। সকলেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন শুধু এই জন্য যে এটা "শাসনতন্ত্র বিরোধী"। শুধু শাসনতান্ত্রিক বাদশাহ হবার চাইতে রেজার একজন কর্মক্ষম প্রধানমন্ত্রী হওয়া দেশের জন্য অনেক মঙ্গল। রেজা খান যদি কর্মক্ষম বাদশাহ হন তবে তিনি একজন একনায়ক হয়ে বসবেন, শাসনতান্ত্রিক বাদশাহ্ নন।

মজলিশের উদার ও সমাজতান্ত্রিক দলসমূহ প্রস্তাবে স্বাক্ষর প্রদান করলেও ড. মোসাদ্দেকের সাথে একমত হন কিন্তু তাঁরা সমস্যার যথাযথ সমাধান পেয়েছেন বলে মনে করেন। তাঁদের স্বাক্ষরের বিনিময়ে রেজা খান বাদশাহ্র পদকে নির্বাচনমূলক করার অঙ্গীকার করেন তাঁরা মনে করেন যে পশ্চাৎ-দ্বার দিয়ে হলেও তাঁরা একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠনে সক্ষম হয়েছেন এবং তারা এতেই সন্তুষ্ট। অবশ্য ডিসেম্বর মাসে গণপরিষদের সভা বসলে দেখা গেল নির্বাচনমূলক শাহের কোনো উল্লেখই নেই তৎপরিবর্তে একটি পাকাপোক্ত বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতন্ত্রীদের নেতা সোলাইমান ইস্কান্দরি রাগান্বিত হয়ে যান কিন্তু তখন এত বিলম্ব হয়ে গিয়েছে যে তাঁর আর কিছুই করার নেই। ১৯২৫ সালের ১২ই ডিসেম্বর ইরান একজন নতুন বাদশাহ লাভ করে—রেজা শাহ পাহলভী।

রেজাশাহ্ ও সংস্কার

রেজা শাহ সাধারণ্যে জনপ্রিয়, কারণ তাঁর সামরিক ক্ষমতা দেশে নিরাপত্তা আনয়ন করে। দস্যুদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য গ্রামের লোকদেরকে আর অস্ত্র

www.pathagar.com

বহন করতে হয় না। শাহের প্রচণ্ড আঘাত পড়ে গোত্রীয় নেতা ও উচ্চপদস্থ লোকদের ওপর, কৃষকদের ওপর নয়। শিক্ষিত সমাজ ও উদারপন্থীদের মধ্যেও তিনি জনিপ্রয়। কারণ তিনি একজন খাঁটি সংস্কারক এবং সর্বান্তকরণে ইরানকে পাশ্চাত্য সভ্যতায় গড়ে তুলতে আগ্রহী। তিনি প্রধানমন্ত্রী হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার আরম্ভ করেন এবং ১৫ বছরেরও অধিককাল তা চালু রাখেন।

সমগ্র জীবনে সেনাবাহিনী তাঁর বিশেষ আগ্রহের পাত্র হিসাবে বিরাজ করে। এর চাহিদা মেটাবার জন্য তিনি তেলের সালামির টাকা ব্যয় করেন এবং এর লোকবলের চাহিদা মেটাবার জন্য চালু করেন বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা। এই সেনাবাহিনীর মাধ্যমেই তিনি তাঁর অধিকাংশ সংস্কার চালু করেন। তিনি রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন, বেতার ব্যবস্থা স্থাপন করেন এবং ব্রিটিশদের নিকট হতে টেলিগ্রাফ কোম্পানির ব্যবস্থা হস্তগত করেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাঁর সর্বোচ্চ গৌরব হল কাস্পিয়ান হতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত একটি রেলপথ নির্মাণ। এই সুদৃঢ় পরিকল্পনা ১৯২৭ সালে আরম্ভ হয়ে ১৯৩৮ সালে সম্পূর্ণ হয়। চিনি ও চায়ের ওপর বিশেষ করের সাহায্যে তিনি এটি বাস্তবায়িত করেন এবং এর জন্য কোনো বিদেশি ঋণ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়নি। রেজা ব্যক্তিগত ব্যবসা রহিত করেননি, কিন্তু বিদেশী ব্যবসা একচেটিয়া করেন এবং প্রত্যেক বাণিজ্যকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে বাধ্য করেন। ১৯২৮ সালে তিনি ইরানের জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন এবং ব্রিটিশ ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক-এর নিকট হতে ব্যাঙ্ক নোট চালু করার সুবিধা প্রত্যাহার করেন। ১৯২৭ সালে তিনি রাষ্ট্রবহির্ভূত নীতি বিলোপ করেন।

বাদশাহ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওলামাদের ক্ষমতা খর্ব করেন। ধর্মীয় ওয়াক্ফসমূহ তাঁদের হাত থেকে কেড়ে নেয়া হয়, পাশ্চাত্য আইনের স্বপক্ষে কিছু কিছু ইসলামি আইন বিলোপ করা হয় এবং সরকারি বিদ্যালয়সমূহে ইসলামি শিক্ষা বাদ দেয়া হয়। ইসলামি চান্দ্রপঞ্জিকা রহিত করা হয় এবং তদস্থলে পুরাতন পারস্য-জরথুস্ত্রের সৌর পঞ্জিকা এর মাস ও বছরের পারস্য নাম সহকারে চালু করা হয়। রসুলুল্লাহর (সঃ) পৌত্র হোসেনের মৃত্যু উপলক্ষে উদযাপিত এক মাসের শোক পালন তিন সপ্তাহের সীমাবদ্ধ করা হয় এবং তাও ধর্মীয় শোভাযাত্রা ছাড়াই উদযাপন করা হয়। চেয়ার প্রবর্তন করে কিছু সংখ্যক মসজিদকে 'আধুনিকী' করা হয়। নামাজের আজানে বিরক্তি প্রকাশ করা হয় এবং মক্কায় হজ যাত্রায় নিরুৎসাহিত করা হয়।

www.pathagar.com

রেজা শাহ্ সমস্ত উপাধি বিলোপ করেন এবং জনসাধারণকে পারিবারিক নাম বেছে নিতে বলা হয়। তিনি স্বয়ং প্রাক-ইসলামি পারস্যর ইতিহাসে সম্মানিত পাহলভী নাম গ্রহণ করেন। তিনি আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন করেন এবং বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা করেন ও ১৯৩৪ সালে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইউরোপীয় পোশাকের স্বপক্ষে তিনি পারস্য পোশাক শিরস্ত্রাণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি পুরুষদের তালাক দেবার ক্ষমতা রহিত করেন এবং ১৯৩৫ সালে মহিলাদের পর্দা-প্রথা বিলুপ্ত করেন। তিনি ফার্সি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন, যার প্রধান দায়িত্ব হল ফার্সিভাষা হতে সমস্ত ধার করা আরবি শব্দ বাদ দেয়া। এই সকল কিছুতে এবং অন্যান্য সংস্কারে তিনি শক্তি প্রয়োগ করেন। সংস্কারে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার জন্য তিনি সমস্ত সমালোচনা বন্ধ করে দেন, পত্রিকার সংখ্যা মাত্র কয়েকটিতে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। হাত-পা বন্ধ মজলিশের সদস্যবৃন্দ মহামান্য শাহান শাহ্‌র স্তুতিগান করতে থাকেন মাত্র।

পারস্যের তেল : তৃতীয় পর্ব

পারস্য সরকার কর্তৃক উত্তর-ইরানের তেলের সাথে মার্কিনদেরকে জড়িত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর ইঙ্গ-পারস্য তেল কোম্পানি দেশের তেল আহরণ করার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। কারিগরি বিশেষজ্ঞগণ ছাড়া ইরানে কোম্পানির অধিকাংশ প্রশাসনিক কর্মকর্তা গ্রহণ করা হয় ভারত সরকারের নিকট থেকে। এ সকল ব্যক্তিবর্গ তাদের পৈতৃক আধিপত্যের মনোভাবও তাদের সঙ্গে নিয়ে আসে এবং ভারতীয়দের ন্যায় পারস্যবাদীর সঙ্গেও অনুরূপ ব্যবহার আরম্ভ করে। অনেক দিন যাবৎ কোম্পানির সমস্ত লেনদেন ভারতীয় টাকায় সম্পন্ন হয় এবং শ্রমিকদেরকেও ঐ মুদ্রা প্রদান করা হয়।

ইরানে রেজা শাহ্‌র অধীনে একটি শক্তিশালী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর তেল কোম্পানির এই প্রশাসন এবং সরকারের সাথে এ সম্পর্ক বেশিদিন টিকতে পারেনি। ১৯২৮ সালে একটি নতুন রাস্তা উদ্বোধন করার জন্য শাহ্ খুজিস্তান গমনকালে তিনি কোম্পানির তেল প্রতিষ্ঠানসমূহ সফর করার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। তৎপরিবর্তে তিনি তাদেরকে এই মর্মে এক বাণী প্রদান করেন যে, এ কোম্পানির বিরাট লাভের অংশ হতে ইরান যে 'যৎসামান্য দান' লাভ করে তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন এবং তাই তিনি ডি, আর্কির অনুমতিপত্র (D' Arcy Conession) পুনর্বিবেচনা করতে চান। ১৯৩১ সালে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা

www.pathagar.com

চলাকালে তেলের সালামি অনেক কমে যায় এবং পারস্য সরকার তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ১৯৩২ সালে ২৭শে নভেম্বর অর্থমন্ত্রী তকিজাদা কোম্পানির নিকট এক পত্রে ডি' আর্কির অনুমতিপত্র নাকচ ঘোষণা করেন। এর কারণ স্বরূপ বলা হয় যে শাসনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হবার পূর্বের কোনো অনুমতিপত্র মেনে চলতে এ সরকার বাধ্য নয়। পত্রে আরও উল্লেখ করা হয় যে, সরকার একটি নতুন অনুমতিপত্র বিবেচনা করতে ইচ্ছুক। ব্রিটিশ সরকার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানায় এবং বিষয়টি জাতিপুঞ্জে যায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ১৯৩৩ সালে শাহের অসময় হস্তক্ষেপের ফলে বিচারালয়ের বাইরেই ব্যাপারটির মীমাংসা হয়। তিনি অধৈর্য হয়ে ওঠেন এবং ব্যক্তিগতভাবে একটি নতুন চুক্তি সম্পাদন করেন, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইরানের জয় ঘোষণা করলেও শেষ পর্যন্ত ডি, আর্কির অনুমতিপত্রের চাইতেও নিকৃষ্ট বলে প্রমাণিত হয়। চুক্তির ফলাফল সম্পর্কে শাহ অনবহিত ছিলেন এবং কেউ তাঁকে বাধা দিতেও সাহস করেনি।

১৯৩৩ সালে অনুমতিপত্রে ইরানের জন্য দুটি বাহ্যিক সুবিধা পরিদৃষ্ট হয়, যদ্বারা রেজা শাহ্ সন্তুষ্ট হন। অনুমতিপত্রের সীমা বেশ ছোট করে দেয়া হয়, কিন্তু কোম্পানিও ঐ এলাকায় সম্পূর্ণ ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা চালায় এবং দেখে যে তাদের আওতাভুক্ত এক লক্ষ বর্গমাইলের মধ্যেই প্রায় সম্পূর্ণ তেল বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত উৎপাদিত প্রতি টন তেলের ওপর সালামি ধার্য করার ফলে মন্দা সময়ের জন্যও ইরানে একটি সুনির্দিষ্ট আয়ের বন্দোবস্ত হয়ে যায়, কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির সময়ও ইরান অন্যান্য সাধারণ শেয়ারের মালিকদের ন্যায় ২০ শতাংশ মুনাফাই ভোগ করবে। নতুন বন্দোবস্তে ইরানের বিপুল ক্ষতি হয় দুই দিক হতে। এক ধারা অনুযায়ী কোম্পানিকে সমস্ত কর থেকে রেহাই দেয়া হয় এবং অন্য ধারা অনুযায়ী অনুমতিপত্রের সময়সীমা ১৯৩৩ সাল হতে ৬০ বছরের জন্য ধার্য করা হয়; যা পূর্বের অনুমতিপত্রের চাইতে ৩০ বছর বেশি।

রেজা শাহের সংস্কারের পুনর্মূল্যায়ন

অনেক লেখক রেজা শাহের সংস্কারকে আতাতুর্কের সংস্কারের সাথে তুলনা করেন; আবার অনেকে এমনও বলেন যে, রেজা শাহ্ তুর্কি সংস্কারকের পদাংক অনুসরণ করেন মাত্র। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাই মনে হয় এবং সম্ভবত তিনি তুর্কি একনায়কের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। কিন্তু এর দ্বারা এই দুই ব্যক্তির পার্থক্য,

www.pathagar.com

বিশেষত দুই দেশের পার্থক্য বাধাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। বস্তুত রেজা শাহের কোনো শিক্ষাদীক্ষা নেই। পৃথিবী সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই এবং কোনো সুচিহ্নিত কর্মসূচিও নেই। তিনি কোনো দল গঠন করেননি, কোনো বক্তৃতা প্রদান করেননি এবং প্রচার করার মত কোনো মতাদর্শ তাঁর নেই। ইরানের সংস্কার, নির্বাচন, তাঁর উপদেষ্টাদের পরামর্শ, তাঁর ক্ষমতার প্রতি মোহ এবং তাঁর ব্যক্তিগত মনোভাবের উপর ভিত্তি করে রচিত।

অধিকন্তু, সম্পদের প্রতি, বিশেষত খাস জমির ওপর রেজা শাহের দুর্দমনীয় স্পৃহা ছিল। রেজা শাহ মারা যাবার সময়, তিনি দেশের ইতিহাসে শুধু সর্ববৃহৎ জমির মালিকই নন, বরং একজন হোটেল ও কারখানার মালিকও বটে। তিনি এই ব্যাপারে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যাই তিনি করেছেন তা দেশের মঙ্গলার্থেই করেছেন। এটি কতকাংশে সত্য, কিন্তু এ সব জায়গা জমির ব্যবস্থাপনার জন্য তাঁকে অন্যদের ওপর নির্ভর করতে হয়, যারা আবার নিজেদের জন্য ব্যবসা একচেটিয়া করে এবং জমি করায়ত্ত করে। রেজা শাহ কর্তৃক সেনাবাহিনীকে অতি প্রাধান্য দেবার ফলে বেশ কিছুসংখ্যক অত্যাচারী সামরিক অফিসারের সৃষ্টি হয়, যারা জনসাধারণের ওপর বিশেষত প্রদেশসমূহে নিজেদের সুবিধার্থে দমননীতি চালান। ১৯৩০ সালের শেষের দিকে যুদ্ধের ঘনঘটা পুঞ্জীভূত হতে আরম্ভ করলে যে সেনাবাহিনীকে তিনি লালন-পালন করেন তারাই শেষ পর্যন্ত তাঁর পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য, একনায়কত্ব আরও সুদক্ষ করার জন্য তিনি হিটলারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হিটলার সানন্দে উপদেষ্টা দল প্রেরণ করেন। সম্ভবত তাঁর কোসাক ব্রিগেডের অভিজ্ঞতা থাকার ফলে তিনি সমগ্র জীবন ধরে রুশদের ওপর বিরক্ত ছিলেন। তেল ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে ব্রিটিশদের সাথে তাঁর বিবাদ ছিল, কিন্তু সেগুলোর একটা সমাধান করা হত। ইরান ও তুরস্কের ভেতর পুরাতন শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও শাহের অধীনে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং তা বেশ স্থায়ী হয়। ১৯৩৭ সালে আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক ও তুরস্ক মিলে সা'দাবাদ চুক্তি স্বাক্ষর করে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেন্টোর (CENTO) অগ্রদূত হয়।

এতদসত্ত্বেও রেজা শাহ্ একজন সংস্কারক— যাঁর শিক্ষাহীনতা তাঁকে পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যের পূজারি করে তোলে, এর মূল তত্ত্বের নয়। ইউরোপে অসংখ্য ছাত্রকে অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করে তিনি তাঁর উপদেষ্টাদের

www.pathagar.com

পরামর্শ গ্রহণ করেন, কিন্তু শিক্ষার্থীগণ ফিরে আসলে তিনি তাদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন। গণতন্ত্রের বাহ্যিক খোলস তিনি রক্ষা করেন এবং গুটিকয়েক মজলিশের সদস্যই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবশ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাণিজ্য, শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ উন্নতি সাধিত হয়। একটি নতুন দলের সৃষ্টি হয় যারা নতুন যুগের ব্যবসায়ী ও কন্ট্রাক্টারে পরিণত হয়। পুরাতন খেতাবসমূহ বাতিল করা হয় এবং এ সকল খেতাবধারীদের অনেকেই গণজীবন ত্যাগ করেন। সদ্যোত্থিত নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাঁদের শিক্ষা দ্বারা 'ডক্টর' বা মোহান্দ' (ইঞ্জিনিয়ার) জাতীয় নতুন উপাধি ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত এ সকল লোকজন ইরানের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং ১৯৪১ সালে রেজা শাহকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে।

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্য

পূর্ববর্তী যুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অতি অল্প সংঘর্ষই মধ্যপ্রাচ্যে সংঘটিত হয়। তা সত্ত্বেও, এর সুকৌশল অবস্থান ও তেল সম্পদ একে সর্বদাই চরম অবস্থায় রাখে।

তুরস্ক

তুরস্ক তার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে এবং প্রায় শেষ পর্যন্ত তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বে ইউরোপকে দ্বিধাবিভক্তকারী আদর্শগত সংঘর্ষে তুর্কিগণ যোগদান করেনি। তারা কমিউনিস্ট নয় বা ফ্যাসিয়ায় বা তারা সমাজতন্ত্রী অথবা পুঁজিবাদীও নয়। তুরস্কের শাসকবৃন্দ সামরিক লোক, বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবী, যারা মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী। ইউরোপের প্রধান দেশসমূহের প্রতি তুর্কি মনোভাব তিনটি ধারায় ব্যাখ্যা করা যায়। ঐতিহাসিকভাবে তুর্কিগণ রাশিয়ার প্রতি আস্থাহীন, অর্থনৈতিক কারণে তারা জার্মানিকে তথা তাদের ব্যবসা পছন্দ করে এবং সাংস্কৃতিকভাবে তারা গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠানসমূহ ও জীবনধারায় প্রলুব্ধ হয়।

১৯৩৯ সালে রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সময় তুর্কিগণ প্রণালীর ভাগ্য নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ে। তুরস্কের বৈদেশিকমন্ত্রী শুকরু সারা জগলু মস্কো গমন করেন কিন্তু শূন্য হাতে ফিরে আসেন, কারণ রুশগণ চায় যে তুরস্ক প্রণালী বন্ধ করে দিক এবং জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার প্রতিশ্রুতি দিক। তুরস্ক এটা গ্রহণ করতে পারেনি এবং তৎপরিবর্তে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাথে একটি পারস্পরিক সহযোগিতামূলক চুক্তি সম্পাদন করে, যদ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বৈরীভাব পোষণ করার কোনো অভিপ্রায় তুরস্কের থাকে না। ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে তুরস্ক ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও, মুসোলিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তুরস্ক চুক্তির দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয় মনে করে।

www.pathagar.com

১৯৪১ সালে জার্মানি কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হলে তুরস্কে প্রায় প্রথম মহাযুদ্ধের ন্যায় একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়। এতে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে একত্রিত হয়। এ দিকে হিটলারের সেনাবাহিনী বলকান এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে এবং গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাথে সম্পাদিত সমস্ত চুক্তি বাতিল করার জন্য জার্মানি তুরস্কের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাব্য বিজয়ীর অসন্তোষ অগ্রাহ্য না করে তুরস্ক নির্লজ্জভাবে ১৯৪১ সালে জুন মাসে জার্মানির সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং তদ্দ্বারা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করে। কাঁচামাল বিশেষত আকরজাত ধাতু (Chrome ore) বিক্রয়ের জন্য একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।

প্রায় সমগ্র যুদ্ধকালে তুরস্ক গুপ্তচর ও কূটনীতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। কারণ বিবদমান দেশসমূহের নাগরিকবৃন্দ বিনা বাধায় এখানে যাওয়া-আসা করতে পারত। অর্থনৈতিক দিক হতে যুদ্ধ প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। তুরস্কের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য, যথা আকর, তেল, ছাগলোম, তামাক প্রভৃতির ক্রেতা পরস্পর-বিরোধী দেশসমূহে বিদ্যমান। বস্তুত এক পক্ষকে ক্রয় হতে নিবৃত্ত করার জন্য আরেক পক্ষ চড়া দামে এগুলো ক্রয় করে। দেশে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সমাগম হয়, কিন্তু আমদানির জন্য এ মুদ্রা ব্যবহারের উপায় নেই। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং বাজেটে ঘাটতি পড়ে যায়। তদুপরি তুরস্ককে এক বিরাট সেনাবাহিনী পালন করতে হয় এবং অর্থ সমাগমের জন্য ব্যক্তিবিশেষের আয়ের ওপর একটি বিশেষ কর ধার্য করতে হয়। প্রত্যেক প্রদেশে এই অর্থ নির্ধারণের জন্য বিশেষ কমিটিগুলোকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। মোটের উপর গ্রিক, আর্মেনীয়, ইহুদি ও বিদেশিদের ওপর এই করের বোঝা এবং কর আদায় না করলে অত্যাচারের আপৎ নিপতিত হয়। এই বর্ধিত কর এক বছরের অধিক স্থায়ী হয় নি। কিন্তু তুরস্কের অ-তুর্কি নাগরিকদের মধ্যে একটি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে কারণ, জরুরি অবস্থার মধ্যে এদের স্কন্ধে সমস্ত দায়িত্ব চাপানো হয়।

তুরস্কের নেতৃবৃন্দ তুরস্ককে যুদ্ধের আওতামুক্ত রাখবার জন্য যথেষ্ট উত্তম মনোভাব, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দান করেন। ১৯৪৪ সাল নাগাদ কোন পক্ষ জয়লাভ করেছে তা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং তখন তুর্কিগণ অবসর গ্রহণের সুযোগ লাভ করে। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতিসংঘ সনদের সদস্য হবার জন্য তারা জার্মানি, ইতালি ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

www.pathagar.com

মিসর

১৯৩৯ সালে ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তির তিন বছর পরও গ্রেট ব্রিটেন প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মিসর ত্যাগ করেনি। সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ আসলে ব্রিটিশগণ চুক্তির শর্তসমূহ ব্যবহার করে এবং আরও অধিকসংখ্যক সৈন্য দেশে প্রেরণ করে। যুদ্ধের সময় মিরসীয়গণ ব্রিটিশদের যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি কিন্তু চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার ব্রিটিশ দাবির প্রতি মিসরীয় সরকার মাথা নত করেনি। চক্রশক্তি জয়লাভ করবে এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তারা বিজয়ীদের বিরক্তির উদ্রেক করে এমন কিছু করতে চায়নি। এই নীরব বাধায় ব্রিটিশ অসন্তুষ্ট হয়। নিয়তির নির্মম পরিহাস ১৯৪২ সালে ব্রিটিশগণ ট্যাংক বহর নিয়ে কায়েরোর আবদিন প্রাসাদ অবরোধ করে এবং একজন পুরাতন ব্রিটিশ বিরোধী প্রবক্তা, ওয়াফ্দ পার্টির নাহাস পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ অথবা দেশত্যাগ করার জন্য বাদশা ফারুককে চাপ প্রদান করে। ফারুক যদি ব্রিটিশ দাবি প্রত্যাখ্যান করতেন তবে হয়ত আধুনিক মিসরের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক হয়ে উঠতেন। কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণ করেন। নাহাস পাশা অতঃপর ব্রিটিশদের সাথে সহযোগিতা আরম্ভ করেন।

নাহাস পাশা ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত এই পদমর্যাদায় থাকেন, কিন্তু বাহ্যত সরকারের মধ্যবর্তী দুর্নীতি দমন করতে অথবা বাদশাহ ও তাঁর প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বিদ্যমান অস্থির অবস্থা দূরীভূত করতে কোনো প্রচেষ্টাই নেননি। আল-আমীনের যুদ্ধে জেনারেল রোমেলের পরাজয়ের দ্বারা জার্মান বিজয়ের হুমকি দূরীভূত হলে এবং মার্কিনগণ উত্তর আফ্রিকায় অবতরণ করলে ব্রিটিশদের নিকট নাহাস পাশার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। বাদশাহ্ ফারুক এই সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করেন এবং তাঁকে বরখাস্ত করেন। তিনি ওয়াফ্দ বিরোধী নেতা সা'দ পার্টির আহমদ মাহেরকে বেছে নেন এবং সরকার গঠন করতে বলেন। ১৯৪৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি একজন মিসরীয় যুবক কর্তৃক মাহের নিহত হন। সা'দ পার্টির দ্বিতীয় নেতা নুকরাশী পাশা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। দুদিন পর তিনি জার্মানি ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। মিসরও পরে জাতিসংঘ সনদের সভ্য হয়।

ইরাক

১৯৩৯ সালে নূরী আল-সাঈদ ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হন। পরপর পাঁচটি সামরিক অভ্যুত্থানের শেষ অভ্যুত্থানে তিনি ক্ষমতায় আসেন। তিনি ব্রিটিশদের

www.pathagar.com

সাথে সহযোগিতা করার পক্ষপাতী এবং গ্রেট ব্রিটেন ও ইরাক প্রেট্রোলিয়াম কোম্পানি হতে ঋণ ও সালামির অগ্রিম বাবদ ৭০ লক্ষ পাউন্ড গ্রহণ করেন। এতদসত্ত্বেও তিনি জার্মানির সাথে শুধু কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন, কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা করেননি। ইরাকে ব্রিটিশ বিরোধী জনমত এবং জার্মানির সম্ভাব্য জয়লাভ এত প্রবল যে, ব্রিটিশ সমর্থক ইরাকি সরকারও নিজকে খুব বেশি জড়িত করতে সাহসী হয়নি।

স্থানীয় রাজনীতি ১৯৪০ সালে নূরী আল-সাঈদকে জাতীয়তাবাদী রশিদ আল জিলানির স্বপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য করে। ফিলিস্তিনের সংগ্রামে ইরাক জড়িত হয়ে পড়ে, কারণ একে তো একটি 'প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্র' একটি শত্রু জাতি কর্তৃক 'আক্রান্ত' হয়, তদুপরি ইরাকের রাজকীয় পরিবার হাশেমীয় বংশের নেতৃত্বে ফারটাইল ক্রিসেন্টের ঐক্য সৃষ্টিকারী 'বৃহৎ সিরিয়া আন্দোলন' তখন পুরাদস্তুর চলছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য গ্রেট ব্রিটেন ১৯৩৯ সালের সম্মেলনে ইরাককে আমন্ত্রণ করে। অধিকন্তু জেরুজালেমের মুফতি এবং ব্রিটিশ বিরোধী উচ্চ আরব কমিটির নেতা হজ্ব আমীন-আল হুসাইনী, যিনি লেবাননে পলায়ন করেন, তাঁকে বাগদাদে আশ্রয় দেয়া হয়। সিরিয়া ও ফিলিস্তিন বিদেশি নিয়ন্ত্রণাধীন বিধায় ইরাক প্যান-আরববাদের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। হজ্ব আমীন ইরাক সরকারের নিকট থেকে একটি মোটা অংকের বৃত্তিলাভ করেন এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন।

জাতীয়তাবাদী প্রধানমন্ত্রী রশিদ আল-জিলানি ব্রিটিশদেরকে বালফার ঘোষণা পরিত্যাগ এবং স্বাধীন আরব ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণা করার জন্য অকপটে চেষ্টা করেন। বিনিময়ে ইরাক মিত্রপক্ষে যোগদান এবং চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই অনুরোধ রক্ষা করতে ব্রিটেন অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে জিলানি ও তাঁর সহ-জাতীয়তাবাদিগণ দৃঢ় আশা পোষণ করেন যে, চক্রশক্তির সাথে সহযোগিতা করলে তাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারবেন। হজ্ব আমীন ইতিমধ্যে জার্মানির সাথে যোগাযোগ করেন। জিলানি তাঁর হাতে হাত মিলান এবং আংকারায় নিযুক্ত জার্মান প্রতিনিধি ফন প্যাপিনের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন।

ব্রিটিশগণ এ সকল কার্যকলাপ সহ্য করতে পারেনি এবং জিলানিকে বরখাস্ত করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক আব্দুল্লাহ্‌কে নির্দেশ প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী ইস্তফা

www.pathagar.com

দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে ইরাকি পার্লামেন্টে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। অবশ্য রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির ফলে জিলানি জেনারেল তাহা আল হাসেমীর স্বপক্ষে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯৪১ সালে ৪টা এপ্রিল চারজন সেনাবাহিনীর কর্নেলের সহায়তায় জিলানি একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান। তত্ত্বাবধায়ক আবদুল ইলাহ্ এবং নূরী আল-সাঈদসহ বেশ কিছুসংখ্যক মধ্যমপন্থী নেতা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাদশাহকে নিয়ে পলায়ন করেন।

এই অভ্যুত্থানে জার্মানিদের হাত থাকলেও তারা গ্রিসে এত ব্যস্ত ছিল যে এর কোনো সুবিধাই তারা গ্রহণ করতে পারেনি। এদিকে ইরাকিগণ হাব্বানিয়া বিমান ঘাঁটি অবরোধ করে রাখে, আর ওদিকে ব্রিটিশগণ বসরায় সৈন্য অবতরণ করায়। চক্রশক্তির সমর্থক ফরাসি ভিসি সরকারের অধীনস্ত সিরিয়ার মধ্য দিয়ে জার্মানগণ ইরাকে ৫০টি বিমান অবতরণ করতে সক্ষম হয়, কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। ব্রিটিশদের উদ্ধারের জন্য ট্রান্সজর্ডান হতে আরব বাহিনী তখন পৌঁছে গিয়েছে। 'ত্রিশ দিনের যুদ্ধের' পরিণামে রশিদ আল-জিলানি, জেরুজালেমের মুফতি হজ্ব আমীন এবং তাঁদের আরও অনেক সমর্থক পরাজিত হন। তাঁরা ইরানে পলায়ন করেন এবং সেখান হতে তুরস্কের মধ্য দিয়ে জার্মানি গমন করেন। যুদ্ধের পর জ্বিলানি ছদ্মবেশে একটি ফরাসি জাহাজে চড়ে বৈরুত গমন করেন এবং সেখান থেকে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে পৌছেন। তথায় বাদশাহ ইবনে সউদ তাঁকে আশ্রয় প্রদান করেন। যুদ্ধের পর মুফতি প্যারিসে গৃহবন্দি হয়ে থাকেন। ১৯৪৬ সালে মে মাসে তিনিও ছদ্মবেশে একটি মার্কিন সামরিক বিমান যোগে কায়রো গমন করেন। তথায় বাদশাহ্ ফারুক তাঁকে আশ্রয় প্রদান করেন।

যুদ্ধের শেষ নাগাদ নূরী আল-সাঈদ প্রধানমন্ত্রী থাকেন। চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে ইরাক জাতিসংঘের প্রথম সদস্য হবার গৌরব অর্জন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট যুদ্ধসামগ্রী প্রেরণ করার ব্যাপারে ইরাক অংশগ্রহণ করে। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের ন্যায় ইরাক বৈদেশিক মুদ্রায় সমৃদ্ধশালী। কিন্তু নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের অভাবে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

সিরিয়া-লেবানন

জার্মানগণ কর্তৃক ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত ক্রীড়নক ভিসি সরকার ফরাসি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ওপর কর্তৃত্ব দাবি করে। ১৯৪০ সালের নভেম্বরে ভিসি

www.pathagar.com

সরকার জেনারেল দেঁজকে হাইকমিশনার নিযুক্ত করে সিরিয়া-লেবাননে প্রেরণ করার পূর্বে বহুসংখ্যক ফরাসি অফিসার ও সৈন্য স্বাধীন ফরাসি বাহিনীতে যোগদান করার উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিনে পলায়ন করেন। জেনারেল দেঁজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়া-লেবানন চক্রশক্তির স্বপক্ষে ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের খোলাখুলি কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সিরিয়া ও লেবাননিগণ ফ্রান্সের পতনকে তাদের স্বাধীনতা লাভের একটি সুযোগ বলে বিবেচনা করে। ফরাসি ফ্রাংকের অবমূল্যায়ন এবং এর ফলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক বিপর্যয় সিরিয়া ও লেবাননিদিগকে হরতাল ও রাজনৈতিক বিক্ষোভ সহকারে স্বাধীনতা দাবি করার সুযোগ প্রদান করে। জেনারেল দেঁজ জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হননি।

ইরাকি বিদ্রোহে ব্রিটিশ অভিজ্ঞতার দ্বারা তারা সিরিয়া-লেবাননে জার্মান সমাবেশের রাজনৈতিক ভয়াবহতা ভালভাবে উপলব্ধি করে। ফলে ১৯৪১ সালের জুন মাসে ব্রিটিশ ও স্বাধীন ফরাসি বাহিনী যথাক্রমে জেনারেল উইলসন ও জেনারেল কেঁত্র-র (General Catroux) অধীনে লেবানন ও সিরিয়ায় প্রবেশ করে। জেনারেল দেঁজ প্রবল বাধার সৃষ্টি করেন কিন্তু মিত্র বাহিনীর বৈরুত ও দামেস্কে প্রবেশ রোধ করতে সক্ষম হননি। জুলাই-এ ভিসি ফরাসি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে; যারা ফ্রান্স যেতে চায় তাদেরকে যেতে দেয়া হয় এবং যারা থাকতে চায় তাদেরকে থাকতে দেয়া হয়।

স্বাধীন ফ্রান্সের অধিনায়ক জেনারেল দ্য গলের প্রতিনিধি হিসাবে জেনারেল কেঁত্র লেবানন ও সিরিয়ায় নতুন গভর্নর নিযুক্ত করেন। জাতীয়তাবাদীদেরকে এটা সন্তুষ্ট করতে পারে নাই, তারা জাতীয় স্বাধীনতা দাবি করে। ব্রিটিশগণ কায়রোয় অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্য সরবরাহ কেন্দ্রের (Middle East Supply Centre) মাধ্যমে সিরিয়া-লেবাননের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করে। তারা এখন মুদ্রা পুনর্বিন্যাস করে এবং এই দুটি এলাকাকে স্টার্লিং অঞ্চলের আওতাভুক্ত করে নেয়। এটা দিবালোকের মত সত্য হয়ে দাঁড়ায় যে, ব্রিটিশগণ স্বাধীনতার দাবিতে জাতীয়তাবাদীদেরকে উৎসাহ প্রদান করে। ১৯৪৩ সালের মে মাসে সিরীয়গণ একটি নির্বাচন পরিচালনা করে এবং জাতীয়তাবাদী নেতা শুকরি আল-কুয়াতলীকে নতুন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। আগস্ট মাসে লেবাননিগণও ঐ একই পন্থা অনুসরণ করে এবং তাদের জাতীয়তাবাদী নেতা বিশার আল-খুরিকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে বেছে নেয়।

www.pathagar.com

জেনারেল দ্য গলের অধীনে স্বাধীন ফরাসি জাতি অন্য ফরাসিদের মত ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অন্যথা করেনি। তারা ক্ষমতা ত্যাগে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে, ধর্মঘট ও বিদ্রোহের সৃষ্টি ফরাসিগণ লেবাননি প্রেসিডেন্টকে গ্রেফতার করে এবং লেবাননিগণ দেশের সমস্ত ফরাসি অধিকার বাতিল করে এর জবাব দেয়। গ্রেট ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র লেবাননি ও সিরীয়দেরকে সমর্থন করে। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দান করে এবং তারাও প্রত্যুত্তরে ১৯৪৫ সালে চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে জাতিসংঘ সনদের সদস্য হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও জেনারেল দ্য গল 'ফরাসি আধিপত্যের' ওপর জোর দেন। ফরাসি সেনাবাহিনী ১৯৪৬ সালের এপ্রিলের পূর্বে সিরিয়া ত্যাগ করেনি এবং একই বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত লেবাননে থেকে যায়।

ফিলিস্তিন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফিলিস্তিনের ইহুদিগণ যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে সর্বান্তকরণে ব্রিটিশদের সঙ্গে থাকে এবং ১৯৩৯ সালে শ্বেতপত্র কার্যকরী করার ব্যাপারে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে থাকে। ফিলিস্তিনের আরবদের ব্যাপারে এতটুকু বলা যায় যে, ব্রিটিশদের বিরাগভাজন বা যুদ্ধ প্রস্তুতি বানচাল করার ব্যাপারে তারা কিছু করেনি।

ফিলিস্তিনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সম্ভবত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটে যুক্তরাষ্ট্রে। ঘটনাটি হল ১৯৪২ সালে নিউইয়র্ক নগরীর হোটেল বিল্টমোরে অনুষ্ঠিত জরুরি ইহুদিবাদী কনফারেন্সে। এই কনফারেন্সে পরিবর্তিত অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য ইহুদিবাদী কর্মসূচি পুনর্নির্ধারণ করা হয় এবং এর পর থেকে একে 'বিল্টমোর কর্মসূচি' নামে আখ্যায়িত করা হয়। কনফারেন্সে বালফার ঘোষণার 'মূল উদ্দেশ্য' বাস্তবায়িত করার আহ্বান জানায়, যার অর্থ করা হয়, একটি স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এটা ১৯৩৯ সালের শ্বেতপত্র প্রত্যাখ্যান করে, এর নিজস্ব পতাকাতলে একটি ইহুদি সেনাবাহিনী গঠন সমর্থন করে, ফিলিস্তিনে সীমাহীনভাবে ইহুদিদের বাস্তুত্যাগ চায় এবং ফিলিস্তিনে ইহুদি বাস্তুত্যাগীদের ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রীয় ভূমির উন্নতি সাধনে ইহুদি এজেন্সিকে ক্ষমতা ও সুযোগ প্রদানের দাবি জানায়।

বিল্টমোর কর্মসূচির অধিকাংশ দাবি কোনো নতুন কথা নয়, অবশ্য কিছু নতুন অনুচ্ছেদ, বিশেষত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারগুলো পূর্বে এমন পরিষ্কারভাবে বলা হয়

www.pathagar.com

নি। অতঃপর ধুয়া ওঠে 'ইহুদি জাতীয় আবাসভূমির'।রাষ্ট্রের নয়। অবশ্য যা নতুন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তা হল, বিল্টমোর কনফারেন্সের পর ইহুদিদের মনোভার গ্রেট বৃটেনের ওপর আস্থাশীলতার পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আস্থাশীল হয়ে ওঠে। প্রায় ৩০ বছরের অস্থিরতা এবং অসম ব্রিটিশ-ইহুদি সহযোগিতা শেষ হয়ে আসে। যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদান এবং এর প্রচণ্ড অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি এমন বাস্তব যা ইহুদিবাদিগণ অবহেলা করতে পারে না। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর কোঠায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আংশিকভাবে ইহুদিবাদীদের উদ্দেশ্য সাধন করে। পরবর্তী যুগে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সমর্থনের জন্যে হাত বাড়ায়। বিল্টমোর কনফারেন্সে এই মনোভাব পরিবর্তনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদিবাদীদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। সে দেশের ইহুদি ও অ-ইহুদি সংগঠনগুলো বিল্টমোর কর্মসূচি বাস্তবায়নের দাবি জানায়। কংগ্রেসের উভয় পরিষদে এর ওপর প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং প্রধান জাতীয়, রাষ্ট্রীয় এবং এমনকি স্থানীয় পদের নির্বাচনে ইহুদি সমর্থক দেয়ালপত্র উভয় প্রধান দলের নির্বাচনী প্রচারণার অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

ইহুদিদের মধ্যে বিরুদ্ধ মতামতও দেখা যায়। ফিলিস্তিনে ইহুদ দলের (Ihud party) সদস্যবৃন্দ বিরুদ্ধ আওয়াজ উত্থাপন করে। এদের অধিকাংশ জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জুদাস ম্যাগনাসের (Judes Magnus) নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবীদল, দার্শনিক মার্টিন ব্যুবার অন্যান্যগণ, যাঁরা খাঁটি ইহুদি রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেন। তৎপরিবর্তে তাঁরা আরবদের সাথে আপস চান এবং একটি দ্বিজাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সমর্থন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি ধর্মের আমেরিকান পরিষদ (American Council for Judaism) বিল্টমোর কর্মসূচির বিরোধিতা করে। এর সদস্যবৃন্দ, যারা সকলেই ইহুদি, বিশ্বাস করেন যে ইহুদি ধর্মের লক্ষ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ন্যায় কোনো জাতীয়তাবাদ নয়, বরং এটা আধ্যাত্মিক মিলনের একটি ধর্ম। অ-ইহুদিদের মধ্যে ফিলিস্তিনের আরবগণ খ্রিস্টান ও মুসলমান—সকলেই বিল্টমোর কর্মসূচির বিরোধী। অবশ্য তাদের কোনো মুখপাত্র নেই, বিশেষত তাদের নেতা মুফতি একজন নাজি হয়ে গেছেন। ট্রান্সজর্ডানের আমির আবদুল্লাহ ১৯৪৪ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট আপিল করেন। আরবের বাদশাহ্ ইবনে সউদের সাথে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সাক্ষাতের এক বছর পর তিনি আমির আবদুল্লাহর নিকট যে পত্র লিখেন তা ব্যক্ত করেন। এতে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন যে, আরবদের ক্ষতি

www.pathagar.com

হয় এমন কোনো সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করবে না।

যুদ্ধকালীন ফিলিস্তিনের কোনো আলোচনার মাধ্যমে ইউরোপে ইহুদিদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। ইউরোপীয় ইহুদিদের নির্বংশ করার জন্য নাজিগণ যে ধারাবাহিক নীতি গ্রহণ করে তাতে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ইহুদি ও অ-ইহুদি সকলেই বিক্ষুব্ধ হয়। একদিকে পাশ্চাত্যের স্বাধীন দেশগুলো এই সকল ভাগ্যহতদের জন্য শুধু যেমন তাদের দ্বার উন্মুক্ত করেনি, আবার অন্যদিকে ইহুদিগণও তেমনি এ সকল বাস্তুত্যাগীদের ধুয়া তুলে তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র গড়ে তুলবার দাবিকেও জোরদার করে তোলে। কিছু ইহুদি এবং কিছু অ-ইহুদি গোপন সংস্থাসমূহ ইহুদি বাস্তুত্যাগীদেরকে ইউরোপ হতে বের করে ফিলিস্তিনে এনে বসায়। ব্রিটিশগণ যারা তাদের ভূমিকা ঈষৎ পরিবর্তন করতে পারত, ইহুদি বাস্তুত্যাগ বন্ধ করার জন্য জোর-জবরদস্তির আশ্রয় নেয়। এই বাস্তুত্যাগীদের হাজার হাজার লোককে ব্রিটিশ গ্রেফতার করে সাইপ্রাসের বিভিন্ন শিবিরে রাখে। এর সকল শিবির ইহুদিদেরকে নিশ্চয়ই নাজি বন্দি শিবিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

স্মরণ করা যেতে পারে যে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করার এই ঐতিহ্যবাহী ব্রিটিশ নীতি ত্রিমুখী। একটি হল রাশিয়ার দক্ষিণমুখী বিস্তৃতি বন্ধ করার জন্য একে একটি মধ্যম রাষ্ট্র (Buffer State) হিসাবে ব্যবহার করা, দ্বিতীয়টি হল ভারতবর্ষের রাস্তা কণ্টকমুক্ত রাখবার জন্য একে ব্যবহার করা। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল তেলগারগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভবত সমস্ত ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গ্রেট ব্রিটেন বাতিলকৃত ওসমানীয় সাম্রাজ্যের স্থলে ফারটাইল ক্রিসেন্টে একটি সম্মিলিত বা সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের দ্বারা তার পুরাতন নীতি বহাল রাখবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তথাকথিত হোসেন-ম্যাকমাহন পত্রালাপের মাধ্যমে সংঘটিত চুক্তি অনুরূপ নীতির সরাসরি ফল। সাইকস্-পিকট্ চুক্তি ও বালফার ঘোষণা অবশ্য এই নীতি বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ফারটাইল ক্রিসেন্টে একটি সম্মিলিত বা সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের পরিবর্তে সৌদি আরব এবং উপসাগরে শেখ রাজ্যগুলো ছাড়াও পাঁচটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে ব্রিটিশ সৈন্যগণ ১৯১৭ সালে সমগ্র ফারটাইল ক্রিসেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসন বন্ধ করার জন্য ব্রিটিশদের এখনও একটি মধ্যম রাষ্ট্র প্রয়োজন এবং ভারতবর্ষের

www.pathagar.com

রাস্তায় এখনও তাদের বন্ধুভাবাপন্ন লোকজনের প্রয়োজন। অতএব, গ্রেট বৃটেনের পুরাতন নীতি পুনঃপ্রয়োগের মধ্যে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

সেই ১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিনের ওপর একটি সম্মেলন আহ্বান করে এবং প্রথমবারের মত আরব রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দকে এর মধ্যে জড়িত করে। ১৯৪১ সালে ২৯শে মে ব্রিটিশ বৈদেশিক সচিব এন্থনি ইডেন আরব ঐক্যে প্রয়োজনের কথা ঘোষণা করেন এবং "বর্তমানে ঐক্যের চাইতে আরও শক্তিশালী ঐক্যর" গঠন করার ব্যাপারে তাদের আগ্রহের কথা বলেন। একই বক্তৃতায় তিনি প্রতিশ্রুতি দান করেন যে, "মহিমান্বিতের সরকার তাঁদের দিক থেকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত যে কোনো পরিকল্পনায় পরিপূর্ণ সমর্থন দান করবে।" ফারটাইল ক্রিসেন্টের আরবিভাষী লোকদের মধ্যে প্যান- আরবিদের ভাবধারা তখনও বিরাজমান বলে ইডেনের মন্তব্যগুলো বেশ গ্রহণযোগ্য হয়। এই আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তরে ইরাকের নূরী আল-সাঈদ ১৯৪২ সালে ইরাক, ফিলিস্তিন, ফ্রান্স জর্ডান, সিরিয়া ও সম্ভবত লেবাননের ঐক্যে প্রস্তাব করেন এবং আশা করেন যে, অন্যগুলো পরে যোগদান করবে। একে অনেকটা হাশেমীয় বংশের "বৃহৎ সিরিয়া আন্দোলনে"র ন্যায় মনে হয় এবং তাই এটা গ্রহণযোগ্য হয়নি। মিসরের নাহাস পাশা পূর্বে প্যান-আরবদের ব্যাপারে তেমন উৎসাহ প্রদান করেননি। তিনি এখন "আরব ঐক্যের ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য" একের পর এক আরব সরকারকে আমন্ত্রণ করতে শুরু করেন। এক বছর স্থায়ী পরামর্শের মাধ্যমে সিরিয়া ও ইরাক একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করে, ট্রান্স জর্ডান, ফিলিস্তিন, সিরিয়া এবং সম্ভবত লেবাননসহ একটি বৃহৎ আরব ঐক্যের কথা জোর দিয়ে উত্থাপন করে এবং মিসর, লেবানন, সৌদি আরব ও ইয়েমেন একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রের কথা বিবেচনা করতে পারে।

বিল্টমোর কর্মসূচি আরবদেরকে ঐক্যের পথে কতটুকু বাধা প্রদান করেছে বা ব্রিটিশদেরকে আরবদের ঐক্য আনয়নে কতটুকু উৎসাহ প্রদান করেছে তা নির্ধারণ করা যায় না, তবে এর যে কিছু অবদান রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ১৯৪৪ সালে ৭ই অক্টোবর উপরোল্লিখিত আটটি রাষ্ট্র আলেকজান্দ্রিয়া খসড়ায় (Protocal of Alexandria) দস্তখত করে। এই খসড়ায় তারা একটি আরব লীগ গঠন করতে সম্মত হয়। আরব রাষ্ট্রসমূহের একটি লীগ বা দলের চূড়ান্ত চুক্তি কায়রোয় স্বাক্ষরিত হয় ১৯৪৫ সালের ২২শে মার্চ। এটা একটি সংযুক্ত পরিকল্পনার সুপারিশ করে এবং অনেকাংশে জাতিসংঘ সনদ দ্বারা

www.pathagar.com

উৎসাহিত হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্র সার্বভৌম এবং লীগের সিদ্ধান্তসমূহ অবশ্য পালনীয় নয়। চুক্তি অন্তর্ভুক্ত তিনটি পরিশিষ্টের একটি ফিলিস্তিন সম্পর্কে। এটা আইনগতভাবে ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন আরব রাষ্ট্র বলে বিবেচনা করে, যে রাষ্ট্র তখনও এর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। ফিলিস্তিনের নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণ করার সময় না আসা পর্যন্ত এই চুক্তি লীগকে ফিলিস্তিনের জন্য একজন প্রতিনিধি বেছে নেবার ক্ষমতা প্রদান করে। যুদ্ধের শেষ নাগাদ এই প্রথমবারের মত আরব জাতীয়তাবাদ কঠোর ভিত্তিমূলক না হলেও ফিলিস্তিনে ইহুদিবাদী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একটি আইনানুগ সংগঠন লাভ করে।

ইরান

স্মরণ করা যেতে পারে যে রেজা শাহ্ তাঁর শেষের বছরগুলোতে হিটলারের সুযোগ্য একনায়কত্ব পছন্দ করেন। তিনি সম্ভবত চিন্তা করেন যে, নিজেকে ব্রিটিশ প্রভাব হতে মুক্ত করার জন্য জার্মানদেরকে ব্যবহার করতে পারেন। যা হোক, জার্মানি কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত কারিগরি সাহায্য ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ইরান তার কাজে লাগায়। ১৯৩৯ সাল নাগাদ ইরানের ৪১ শতাংশেরও অধিক বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য জার্মানির সাথে গড়ে ওঠে এবং বহুসংখ্যক জার্মান ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগর ইরানে আসেন। এগুলোর সঙ্গে সঙ্গে নাজি প্রচারণা আসে এবং ফন শিরাচের (Von Schirach) ন্যায় নাজি যুব নেতাও শুভেচ্ছা সফরে ইরানে আসেন। প্রথমবারের মত পারস্য সেনাবাহিনী সংখ্যালঘু ধর্মীয় দল হতে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে নিয়োগের বিরোধিতা করে এবং পারস্যের বয়স্কাউট আন্দোলন নাজি যুব আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। যুদ্ধের প্রারম্ভে পারস্যের প্রশাসনিক শ্রেণি বিশেষত সামরিক অফিসারবৃন্দ ছিলেন জার্মান সমর্থক। সোভিয়েত ইউনিয়নের মাধ্যমে তখন জার্মানির সাথে অল্পস্বল্প ব্যবসা চলতে থাকে।

জার্মানির রাশিয়া আক্রমণের ফলে ইরানের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সরবরাহের অসুবিধায় পড়ে। সরবরাহ প্রেরণ করার তিনটি রাস্তা, ইরান, মুরমানস্ক্ ও ভ্রাদিভস্তকের মধ্যে ইরানই একমাত্র সমস্ত মৌসুমের উপযোগী রাস্তা। ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে গ্রেট ব্রি টেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন নিরপেক্ষ ঘোষণাকারী

www.pathagar.com

ইরানকে এর ভূখণ্ড দিয়ে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রেরণ করার অনুমতি প্রার্থনা করে। রেজা শাহ্র প্রত্যাখ্যানের ফলে এই অনুরোধ আদেশে পরিণত হয়। ১৯৪১ সাল নাগাদ রেজা শাহ ও তাঁর সামরিক উপদেষ্টাবৃন্দ জার্মান বিজয় আশা করেন এবং তাই অন্য কোনো অনুরোধে রাজি হতে চাননি। আদেশ প্রত্যাখ্যান করা হলে গ্রেট ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একযোগে ইরান আক্রমণ করে এবং সেনাবাহিনী তাসের ঘরের ন্যায় উড়ে যায়। রুশ ও ব্রিটিশগণ ইরান অধিকার করে এবং প্রবল চাপে পড়ে রেজা শাহ তাঁর ২০ বছর বয়স্ক পুত্র মোহাম্মদ রেজা পাহলভীর স্বপক্ষে পদত্যাগ করেন। প্রাক্তন শাহ্কে মৌরিসাস দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে জোহানেসবার্গে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ১৯৪৪ সালের ২৬শে জুলাই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

রেজা শাহর প্রস্থান দেশে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যা ইতিপূর্বে আর কখনও পরিলক্ষিত হয়নি। শাহ্ দেশত্যাগ করার পূর্বেই তাঁর মজলিশের বেছে নেয়া গুণগানকারী সদস্যবৃন্দ তাঁর নিন্দা করতে আরম্ভ করেন। সাধারণ নাগরিকবৃন্দ তাদের পুরাতন জীবন ধারায় ফিরে যায়, যেন মাঝখানে কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। একইভাবে, এখানে একজন আজান দিচ্ছে, ওখানে একজন মহিলা মুখে পর্দা দিচ্ছে, ধর্মীয় লোকজন তাঁদের মাথায় পাগড়ি দিচ্ছেন এবং দরূদ শরীফ পাঠ করতে করতে রাস্তায় চলছেন।

মিত্রশক্তিও এমনভাবে কাজকর্ম আরম্ভ করে যেন প্রথম মহাযুদ্ধের পর কিছুই ঘটেনি। সোভিয়েত সৈন্যগণ উত্তরের প্রদেশসমূহ অধিকার করে এবং ব্রিটিশগণ দক্ষিণাঞ্চল অধিকার করে। উভয় দেশই তেহরানে দ্রুত তাদের সৈন্য প্রেরণ করে। পরে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করলে এর সৈন্যগণ ব্রিটিশদের সাথে দক্ষিণাঞ্চলে ভাগ বসায় এবং তেহরানে একটি ঘাঁটি স্থাপন করে।

১৯০১ সালে মিত্রশক্তির আগমন এবং একনায়কদের দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ইরানে স্বাধীনতার যুগ ও একটি শাসনতান্ত্রিক সরকার গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়, কিন্তু মিত্রশক্তি তখন ইরানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চাইতে যুদ্ধে জয়লাভে অধিক আগ্রহী। এরা গরম মস্তিষ্ক ও অনিশ্চিত যুবক জাতীয়তাবাদীর চাইতে পরিচিত ও পরীক্ষিত পুরাতন লোকদের সাথে কাজ-কারবার করতে অধিক উৎসাহী। অতএব পুরাতন লোকজন থেকে যায় এবং পুরাতন নিয়মে কাজ-কারবার শুরু করে। ১৯৪২ সালে কাভাম আল-সুলতানেহ্ ২০ বছর পর পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন। ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসনে তিনি একটি তৃতীয় শক্তির হস্তক্ষেপে বিশ্বাসী। ২০ বছর পূর্বে তিনি যা করেছিলেন এখন ঠিক তাই করেন। অর্থাৎ

www.pathagar.com

একজন মার্কিন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা আনয়নের ব্যবস্থা করেন। ১৯২২ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত যে মর্যাদায় ছিলেন, ১৯৪৩ সালের শুরুত ড. আর্থার মিল্‌স্‌পাফ একই মর্যাদায় ইরানে আগমন করেন। দুর্ভাগ্যবশত ড. মিল্‌স্‌পাফ্‌ও রেজা শাহ্‌র ইরান শাসন ভুলে যান এবং ১৯২৭ সালে তিনি যেখানে ফেলে যান সেখান থেকে কাজ আরম্ভ করেন। ফলে, তিনি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

অবশ্য যুব সমাজকেও অস্বীকার করা যায় না। ১৯৪২ সালে রাজনৈতিক দলগুলোর উত্তম ফসলের বছর; প্রত্যেক দল একাধিক পত্রিকা প্রকাশনার অনুমতি লাভ করে, যাতে আজ একটি পত্রিকা নিষিদ্ধ হলে সঙ্গে সঙ্গে আগামীকাল আরেকটি পত্রিকা প্রকাশ করা যায়। অধিকাংশ দলের কোনো জাতীয় কর্মসূচি নেই; হয়ত ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায় অথবা শ্রেণিগত স্বার্থ উদ্ধার করতে চায়। এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম তুদেহ্‌ (জনগণ) দল, যাহা একটি অতি উত্তম সংগঠন এবং জনসমর্থনের অধিকারী। এটি মার্কস্‌পন্থী কিন্তু এমন সব জাতীয়তাবাদীও এতে বিদ্যমান যাদের সমস্ত কথাবার্তা মস্কোর মনঃপূত নয়। এ দল কখনও একে কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেনি কিম্বা জাতীয়করণের কথা বলেনি। উত্তরাঞ্চলে এ দল অধিক শক্তিশালী। ইহা ছয়টি পত্রিকা সম্পাদনা করে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন, জনসভা অনুষ্ঠান ও ধর্মঘট পালন করে। ১৯৪৩ সালে নির্বাচনে মজলিশের একমাত্র ব্যতিক্রম হল, আটজন তুদেহ্‌ দলের সদস্য এতে স্থান লাভ করে। অবশিষ্টগুলো পুরাতনপন্থী।

উত্তরাঞ্চলে তুদেহ্‌ দলের মাধ্যমে সরাসরি সোভিয়েত রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য ব্রিটিশগণ ১৯২১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানকালীন প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ জিয়াকে পুনরায় আনয়ন করে। ইনি তখন ফিলিস্তিনে বাস করছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট বিরোধী ন্যাশনাল উইল দল (National Will Party) গঠন করেন। এই দল বিচার, খাসজমির পুনর্বণ্টন এবং ইসলামকে রক্ষা ও সরকারি বিদ্যালয়সমূহে ধর্মীয় শিক্ষার দাবি তুলে ধরে।

এ সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপ চলবার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী সৈন্যদের রাশিয়ায় যুদ্ধ সরবরাহ প্রেরণ এবং তাদের প্রচুর খরচপত্রের দ্বারা দেশে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ব্যবসায়িগণ এবং মিত্রশক্তির সরবরাহ জোগানকারী কন্ট্রাক্টরগণ সম্পদশালী হয়ে ওঠে; জমির দাম ও ঘর ভাড়া বেড়ে যায় এবং সাধারণভাবে ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ বেড়ে যায়। স্বল্প শস্য উৎপাদনের ফলে

www.pathagar.com

দেশ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। পারস্যবাসিগণকে এমন কি তেহরানে রুটি কিনবার জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয়।

পারস্যের বিক্ষোভ প্রশমিত করবার জন্য ১৯৪২ সালের ২৯শে জানুয়ারি ব্রিটিশ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরানের সাথে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করে। এটা যে ইরানে মিত্র বাহিনীর অবস্থানের অর্থ এই দেশ অধিকার নয় এবং যুদ্ধ সমাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে বিদেশি সৈন্য প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করে। পরে, এই চুক্তির জোরে ইরানে মার্কিন সৈন্য প্রবেশ করে। ১৯৪৩ সালে ডিসেম্বরে তেহরান কনফারেন্সের সমাপ্তিতে প্রেসিডেন্ট পরামর্শ দেন যে, তিনি চার্চিল ও স্ট্যালিন কর্তৃক ইরানের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যুদ্ধের ব্যাপারে ইরানের অবদানের স্বীকৃতি, অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি এবং অতলান্তিক সনদের আদর্শ স্মরণ করে একটি বিবৃতি প্রদান করবেন। পারস্যবাসিগণ তাদের ক্ষতির বিনিময়ে পুরাতন ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হবার ভয়ে একটি তৃতীয় শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতির ওপর তাদের আশা স্থাপন করে। যুদ্ধোত্তর যুগে এই নতুন সম্পর্ক অনেক সুখী ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়
ইরান-শ্বেত বিপ্লব

১৯০৬ সালে সংঘটিত পারস্য বিপ্লবের সময় হতে প্রায় প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত জার রাশিয়া পারস্যের প্রাচীনপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষাবলম্বন করে, আর গ্রেট ব্রিটেন পরিবর্তনকারী বিপ্লবীদের পক্ষে বলে মনে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উভয় দেশ ইরান দখল করলে দেখা যায় তাদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষী বিপ্লবীদের পক্ষে, আর গ্রেট ব্রিটেন প্রাচীনপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে। প্রাথমিক বছরগুলোতে ব্রিটিশগণ বিপ্লবীদেরকে সমর্থন করেছিল তাদের নিজেদের স্বার্থে, গণতন্ত্র বা স্বাধীনতার স্বার্থে নয়। ১৯০৭ সালের ইঙ্গ-রুশ কনভেনশনে দস্তখত করে বা শুস্তারকে বরখাস্ত করার জন্য রুশীয় চরমপত্র মেনে নিতে পারস্য মজলিশকে পরামর্শ দিয়ে ব্রিটিশরা পারস্য বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দ্বিধা করেনি। অনুরূপভাবে ১৯৪০ সালে এবং ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে রুশরা পারস্যের কমিউনিস্ট ও আমূল সংস্কারকামীদের পক্ষে ছিল নিজেদের স্বার্থে, জনগণ বা বিপ্লবের স্বার্থে নয়। ১৯৪৬ সালে তারাও তাদের কমরেডদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ১৯৫৩ সালে তাদেরকে একবারেই পরিত্যাগ করে।

পারস্যের তেল : চতুর্থ পর্ব

স্মরণ করা যেতে পারে, যুদ্ধের সময় ইরানে দুটো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। একটি হল তুদেহ্, যা সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক সমর্থিত। এদল প্রতিষ্ঠিত হয় এমন কিছু সংখ্যক যুবকের দ্বারা যাদেরকে রেজা শাহ্ ইউরোপে প্রেরণ করেন এবং ফিরে আসবার পর "কমিউনিস্ট" হবার অভিযোগে তাদেরকে গ্রেফতার করেন। আরেক দল হল ন্যাশনাল উইল, এটি সৈয়দ জিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রিটিশ কর্তৃক সমর্থিত। কিছুকালের জন্য এই দুদলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুই দলীয় ব্যবস্থার আশা দেখা দেয়। এই দুইদল যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ লাভ করত তবে ফলাফল কী হত তা বলা যায় না। কিন্তু

www.pathagar.com

ইরানে তেল বিদ্যমান। দক্ষিণাঞ্চলের তেল ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে এবং গোপন করার কিছু নেই যে, জার রাশিয়ার ন্যায় সোভিয়েত ইউনিয়নও উত্তরাঞ্চলে অনুরূপ সুবিধা চায়।

যুদ্ধের শেষের দিকে এমন সব লক্ষণ দেখা যায় যে, মার্কিন তেল কোম্পানিগুলো উত্তরাঞ্চলে তেলের অনুমতিপত্র লাভের আশায় ১৯২৪ সালের ব্যর্থ প্রচেষ্টা পুনরারম্ভ করতে চায়। ইঙ্গ-পারস্য তেল কোম্পানি ১৯২৪ সালের ন্যায় ১৯৪৪ সালে মার্কিন "অনুপ্রবেশ অপছন্দ" করে। অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর-ইরানের নিয়ন্ত্রণে থাকাতে তাদের পক্ষে যেকোন অভ্যাগতকে তেল ক্ষেত্রের বাইরে রাখতে সুবিধা হয়। পারস্য মজলিশে এই প্রশ্ন নিয়ে সুদীর্ঘ ও গরম বিতর্ক চলে। এজন্য স্বতন্ত্র সদস্য ড. মোহাম্মদ মোসাদ্দেক মজলিশ দ্বারা এক আইন পাস করাতে সক্ষম হন যারা মজলিশের সম্মতি ছাড়া কোনো তেল কোম্পানির সাথে অনুমতিপত্রের ব্যাপারে আলোচনা করতে পারস্য সরকারকে নিষেধ করা হয়। তবে তুদেহ্ দল "সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার" ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে উত্তরাঞ্চলের তেলের অনুমতিপত্র দানের পক্ষপাতী। তাদের যুক্তি হল দক্ষিণাঞ্চলের তেলের ব্যাপারে গ্রেট ব্রিটেনের যেহেতু অনুমতিপত্র রয়েছে, অতএব সোভিয়েত ইউনিয়নকেও উত্তরাঞ্চলে তেলের অনুমতি দেয়া উচিত।

১৯৫৪ সালের ২রা সেপ্টেম্বর, জাপান আত্মসমর্পণ করে। মহাযুদ্ধের শেষ দিবসে উত্তর-পশ্চিমের আজারবাইজান প্রদেশে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ সংঘটিত হয় এবং এর স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়। শীঘ্রই প্রমাণিত হয় যে, ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বীদের চাইতে অধিক প্রভাব প্রদর্শন করে উত্তরের তেলের অনুমতিপত্র লাভের আশায় সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তরে এর প্রাধান্য ব্যবহার করে। ডিসেম্বর নাগাদে তুদেহ্ দল তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মেধাবী নীতিবাগীশ খলিল মালেকীর নেতৃত্বে দলের জাতীয়তাবাদিগণ মস্কোর নিকট তুদেহ্র নতি স্বীকারের বিরোধিতা করে এবং তাদের নিজস্ব সমাজতন্ত্রী দল গঠন করে, যাকে কখনও কখনও তৃতীয় শক্তিও বলা হয়।

১৯৪৫ সালের ১২ই ডিসেম্বর তুদেহ্র আজারবাইজানি সদস্যবৃন্দ ডেমোক্র্যাট' নামে তাদের নিজস্ব দল গঠন করে; তাব্রিজের গভর্নরকে বরখাস্ত করে এবং স্বায়ত্তশাসিত আজারবাইজান প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। তারা লালবাহিনীর পূর্ণ সমর্থন লাভ করে। পারস্য সেনাবাহিনীর একটি দলকে বিদ্রোহ দমন করার জন্য আজারবাইজান প্রেরণ করা হলে লালবাহিনী তাদেরকে প্রদেশে প্রবেশ করতে বাধা দান করে। আজারবাইজন ডেমোক্র্যাটের নেতা হলেন

www.pathagar.com

কুখ্যাত জাফর পিশভেরী, যিনি ১৯২০ সালে জিলান স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি এবং তাঁর সহকর্মী প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং কমিউনিস্ট ভাবধারায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সম্পত্তি সংস্কার আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্ররোচনায় ইরানের কুর্দগণ মহাবাদে তাদের রাজধানী স্থাপন করে একটি নিজস্ব প্রজাতন্ত্র গঠন করে।

১৯৪২ সালে গ্রেট ব্রিটেন, ইরান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধাবসানের ছয় মাসের মধ্যে বিদেশি সৈন্যদের ইরান ত্যাগ করার কথা। ১৯৪৬ সালে ২রা মার্চ নাগাদ মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্যগণ দেশত্যাগ করে কিন্তু লালবাহিনী ত্যাগ করতে অস্বীকার করে। ইরান জাতিসংঘের নিকট আবেদন জানায়। শেষ পর্যন্ত রাশিয়া কর্তৃক ইরান ত্যাগের সিদ্ধান্তের পেছনে বিশ্বজনমতের চাপ এবং গ্রেট ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের দাবি বিশেষভাবে সহায়তা করেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু একটি তেলের অনুমতিপত্র লাভের নিশ্চয়তার পরেই শুধু এরা ইরান ত্যাগ করে।

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে পারস্যের প্রধানমন্ত্রী আহমদ কাভাম স্ট্যালিনের সাথে আলোচনার জন্য একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে মস্কো গমন করেন। উত্তর ইরানে তেল আহরণের জন্য একটি ইরানো-সোভিয়েত তেল কোম্পানি গঠনের ব্যাপারে কাভাম রাজি হন। কোম্পানিতে ইরানের অংশ থাকে ৫১ শতাংশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ৪৯ শতাংশ। অনুমতিপত্রের মেয়াদ নির্ধারিত হয় ২৫ বছরের জন্য। কাভাম স্ট্যালিনকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, নতুন নির্বাচনে গঠিত মজলিশের মাধ্যমে তিনি এই চুক্তি অনুমোদন করাতে চেষ্টা করবেন, তবে শর্ত হল রুশদেরকে ইরান ত্যাগ করতে হবে। স্ট্যালিন রাজি হন এবং কাভাম তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে অগ্রসর হন। জাতিসংঘে নিযুক্ত পারস্য প্রতিনিধি হোসাইন আলাকে তিনি ইরানের নালিশ প্রত্যাহার করতে বলেন, তবে আলা এটি পালন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং নালিশটি কার্যসূচির মধ্যে থেকে যায়।

১৯৪৬ সালের ৯ই মে লালবাহিনী ইরান ত্যাগ করে। পারস্য সেনাবাহিনী আজারবাইজান ও কুর্দিস্তান পুনর্দখল করে এবং ঐ দুই প্রদেশের কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করে। জাফর পিশভেরিসহ কতিপয় নেতা রাশিয়ায় পলায়ন করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু বিঘোষিত নীতি–বিশ্বের সর্বত্র 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে' সাহায্য করা সর্বত্র পালিত হয়। কিন্তু তেলের অনুমতিপত্রের বিনিময়ে এখানে এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

জাতিসংঘ হতে পারস্যের প্রতিবাদ প্রত্যাহারের ব্যাপারে আলাকে সম্মত করাতে না পারলেও প্রধানমন্ত্রী কাভাম স্বীয় দেশে অনেক শক্তিশালী ছিলেন। কমিউনিস্ট বিরোধী সৈয়দ জিয়াকে তিনি গ্রেফতার করেন এবং ন্যাশনাল উইল পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি ইরান-এ ডেমোক্রেটিক নামে তাঁর নিজস্ব দল গঠন করতে সচেষ্ট হন। এটি তুদেহ্‌সহ সমস্ত দলের আঁতাত। এ দলের সংগঠন খুবই ব্যাপক এবং এর নিজস্ব উর্দিপরা 'জাতীয় মুক্তি প্রহরীর' (Guard of National Salvation) সংখ্যায় বৃহৎ। শুভেচ্ছা প্রদর্শন করার জন্য কাভাম তাঁর মন্ত্রিসভায় তিনজন তুদেহ্ নেতাকে রাখেন।

১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মকালে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ মজলিশের নির্বাচনে কাভাম ক্ষমতাসীন হন এবং তাঁর দল সংখ্যাধিক্য আসনের অধিকারী হয়। তিনি ইরানো-সোভিয়েত তেলের অনুমতিপত্রের বিষয়টি মজলিশে উত্থাপন করেন, কিন্তু ১৯৪৭ সালের ২২শে অক্টোবর প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে ইহা নাকচ হয়ে যায়। মাত্র দু'জন সদস্য এর পক্ষে ভোট দান করেন। কাভাম পদত্যাগ করেন। তাঁর দল নিষিদ্ধ করা হয় এবং তুদেহ্ দলও দুর্নামের ভাগী হয়।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাভামের ভূমিকা পুনর্মূল্যায়ন করতে গিয়ে পারস্যে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, তিনি রুশদেরকে ঠকিয়ে ইরানের জন্য আজারবাইজান প্রদেশ রক্ষা করার ব্যাপারে বেশ সুচতুরভাবে কাজ করেছেন। আবার অনেকে মনে করেন যে আজারবাইজান রক্ষা করার জন্য ইরানো- সোভিয়েত তেল কোম্পানি প্রতিষ্ঠার মধ্যে তিনি ক্ষতিকর কিছু দেখেননি। কারণ ইরানো-সোভিয়েত মৎস্য কোম্পানি বেশ কিছুকাল হতে কার্যকর রয়েছে। ইরান ত্যাগের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর যে চাপ সৃষ্টি করে তাতে বাড়িয়ে বলার কিছুই নেই। স্ট্যালিনের নিকট বিশেষ পত্র এবং জাতিসংঘে প্রতিবাদের মাধ্যমে সে এই কাজ সম্পাদন করে। কাভামের ইরানো-সোভিয়েত তেল প্রস্তাবের ওপর মজলিশে ভোট গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ইরানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ জর্জ এ্যালেন অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ এক বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ইরান যেভাবে ইচ্ছা তার নিজস্ব সম্পদ বিলাতে পারে, তৎসহ তিনি দেশপ্রেমিক পারস্যবাসীদেরকে এই প্রতিশ্রুতিও দান করেন যে, "তাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার ব্যাপারে মার্কিন জনগণ তাদের পূর্ণ সমর্থন দান করবে।" শাহ

www.pathagar.com

একজন শাসনতান্ত্রিক নৃপতির ভূমিকা পালন করেন। আজারবাইজানের বিদ্রোহীদের দমন করার ব্যাপারে আপস মীমাংসা প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে তিনি সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দান করেন। তিনি সেনাবাহিনীর সাথে আজারবাইজানেও গমন করেন এবং জনসাধারণের প্রশংসা লাভ করেন।

যুদ্ধের পরিণাম (অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক উত্তেজনা)

উত্তরের প্রদেশসমূহ থেকে লালবাহিনীর অপসারণ এবং আজারবাইজানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতার দ্বারা ইরান খণ্ড-বিখণ্ড হবার হাত থেকে রক্ষা পায়নি কিন্তু এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোনো সংস্কারের দ্বার উন্মুক্ত করেনি। একনায়ক রেজা শাহের নির্গমনের দ্বারা দেশ মুক্ত হয়নি, বরং এটি হারানো মর্যাদা ও সম্পত্তি পুনরুদ্ধার এবং তদের পৈতৃক শাসন পুনরারম্ভ করার জন্য সংখ্যালঘু শাসনের হাত মুক্ত করে। সংখ্যালঘু শাসক বলতে তাদেরকে বুঝায়, যারা কখনও কখনও "এক সহস্র পরিবার" হিসাবে উল্লেখিত, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ দ্বারা শক্তিশালী এবং পুরাতন সেনাবাহিনীর অফিসারদের দ্বারা সমর্থিত। এই সমর্থনের উপর ভিত্তি করে তারা শাসনতন্ত্র ও তাদের মনগড়া গণতন্ত্রের প্রতি মৌলিক সমর্থন দান করে এবং পরিবর্তিত অবস্থার প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ না করেই দেশ শাসন করে।

যেহেতু সংখ্যালঘু শাসন (Oligarchy) সদস্য ও তাদের সমর্থন দ্বারা মজলিশ পরিপূর্ণ এবং তাদের নিকট হতে যেহেতু পূর্বাবস্থার পরিবর্তন আশা করা যায় না, তাই পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে বিভিন্ন দল পরিবর্তনের জন্য হৈ-চৈ করে। বিদেশি সৈন্য অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে অর্থনৈতিক মন্দা ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। দেউলিয়াপনা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রথমবারের মত ইরানে একটি বিরাট শিক্ষিত বেকার বাহিনী দৃষ্ট হয়। উচ্চ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ এবং এমন কি যেসকল ছাত্র ইউরোপ হতে প্রত্যাগমন করে তারাই উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। আমূল সংস্কারকামীদের ডান ও বাম উভয় দলগুলো যারা সীমাহীন বিক্ষোভ ও দাঙ্গা পরিচালনা করে তারা প্রায়ই বেকার শিক্ষিত লোকজন।

কিছু কিছু আমূল সংস্কারকামীদের মধ্যে ধর্মীয় ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। রেজা শাহের পদত্যাগের পর প্রাক্তন শাহ্ কর্তৃক বিলুপ্ত ধর্মীয় অনুশাসনগুলো সরকার ও ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। মহিলারা মুখে পর্দা দেবার

অনুমতি পায়, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাঁদের ধর্মীয় পোশাক পরিধান করেন, ধর্মীয় শোভাযাত্রা পুনরায় চালু হয়; বেতারে কোরআন তেলাওয়াত হয়, বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়, তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় অনুষদে পুরাতন ও বিলুপ্ত ধর্মীয় সিপাহসালার মসজিদ বিভাগ পুনরায় চালু করা হয় এবং হাজার হাজার লোককে মক্কায় হজ পালন করতে যাবার জন্য পাসপোর্ট দেওয়া হয়।

অবশ্য চরম ধর্মীয় কার্যাবলি তখন রাজনৈতিক সংগঠনের কাজে ব্যস্ত। এগুলোর একটি হল ফেদাইয়ানে-ইসলাম, "ইসলামের ভক্তদল"। এর নেতা একজন অপরিচিত ধর্মীয় নেতা, যিনি মিসরের মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের (Muslim Brotherhood) সংগঠনের পন্থা অবলম্বন করেন। বস্তুত তাদের সাথে যে এই নেতার সংযোগ রয়েছে তার বিভিন্ন প্রমাণ বিদ্যমান। আরেকটি দল হল আয়াতুল্লাহ আবুল-কাশেমের নেতৃত্বে মোজাহেদীন-এ ইসলাম, "ইসলামের যোদ্ধাদল"। ইনি একজন প্রভাবশালী আলেম, যিনি পরে মজলিশের সদস্য ও এর স্পিকার নিযুক্ত হন। এই দুদল পৃথকভাবে এবং কখনও কখনও একত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে। একটি গুরুত্বপূর্ণ ডানপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ দল হল ফ্যাসিস্ট প্যান-ইরানি দল (Fascist pan-Iranist Party) যারা জার্মান ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট ধরনের চরম বর্ণবাদী জাতীয়তাবাদ প্রচার করে।

বামপন্থীদের মধ্যে তেল ও আজারবাইজানের প্রচণ্ড আঘাত লাভ করার পরেও সুসংগঠিত তুদেহ্ পার্টি তখনও শক্তিশালী এবং সক্রিয় ছিল। এ ছাড়া আরও দুটি দল বিদ্যমান। একটি হল বুদ্ধিজীবী সদস্য ড. বাকাইর শ্রমিক দল (Toilers Party); একটি পূর্বোল্লিখিত খলিল মালেকির তৃতীয় শক্তি (Third Force)। এই সমস্ত দলও স্ট্যালিন বিরোধী কিন্তু এদের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মার্কসবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী বিদ্যমান। মধ্যখানে থাকে একদল যুবক বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, আইনবিদ, ডাক্তার ও শিক্ষক দ্বারা গঠিত ইরান দল (Iran Party)। এর সাধারণ নেতা একজন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ও মজলিশের সদস্য আল্লাহ ইয়ার সালেহ।

যুদ্ধোত্তর যুগের প্রথম দিকে যুবক শাহের অবস্থা আশাব্যঞ্জক মনে হয়। তিনি তখন, পুরাতন সেনাবাহিনীর অফিসারবৃন্দ ও অরাজনৈতিক কিন্তু গোঁড়া ধর্মীয় নেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে চলছেন। যুদ্ধের সময় তাঁর কম

www.pathagar.com

বয়স এবং ইরানে বিরোধী সৈন্যের অবস্থানের ফলে দেশ তাঁর অধীনে সংঘবদ্ধ হয়। আজারবাইজানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং তৎসহ সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে তাঁর সাহসিক ভূমিকার দ্বারা তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সম্ভবত এ সকল অভিজ্ঞতা তাঁকে আত্মবিশ্বাস প্রদান করে এবং আজারবাইজান ঘটনার পরে তাঁকে আরও কর্মঠ করে তোলে। তিনিও অতঃপর দেশের কার্যকলাপে আরও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। শাহের প্রথম কার্যাবলির মধ্যে একটি হল প্রথমবারের মত শাসনতন্ত্রের মধ্যে একটি সিনেটের সংবিধান করা। এর দ্বারা শাহকে ৩০ জন সিনেটের সদস্য নিযুক্ত করার ক্ষমতা দেয়া হয়। তাঁর নিযুক্ত লোকদের অধিকাংশই পুরাতন সামরিক অফিসার ও গোঁড়া বুদ্ধিজীবী হলেও শাহ দেশের কার্যাবলিতে বেশ প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেন।

মার্কিনগণ তাঁকে সাহায্য করতে চায় কিন্তু কিভাবে সম্ভব সেই বিষয়ে তারা অজ্ঞ। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বৃত্ত যুদ্ধসামগ্রী ক্রয় করার জন্য ইরানকে এক কোটি ডলারের একটি ঋণ দেয়। একটি সাতসালা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করার জন্য পারস্য সরকার মার্কিন সংস্থা ও বৈদেশিক উপদেষ্টা নিয়োগ করে। ফলে, উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনায় ৬৫ কোটি ডলার খরচের বন্দোবস্ত করা হয় এবং সামাজিক, শিক্ষা বিষয়ক, অর্থনৈতিক ও কারিগরি সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। ইঙ্গ-ইরানি তেল কোম্পানির সেলামি এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাহায্য হতে এই পরিকল্পনার অর্থ পাওয়া যাবে বলে আশা করা হয়। সরকার ব্রিটিশ তেল কোম্পানির (British Oil Company) সাথে চুক্তির ধারাসমূহ পুনর্বিবেচনার জন্য আলাপ-আলোচনা চালায়। আশা করা হয় যে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তেলের সালামি এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য দ্বারা স্বচ্ছন্দে উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু করা যাবে।

শাহ অনুসৃত কার্যকর কর্মপন্থার প্রমাণ সম্ভবত এই যে, তাঁর জীবনের ওপর পরিচালিত বিভিন্ন হামলার প্রথমটি পরিচালিত হয় ১৯৪৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। শাহের তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করার সময় খবরের কাগজের ফটোগ্রাফারের ছদ্মবেশে এক ব্যক্তি অতি সন্নিকট হতে তাঁর প্রতি পাঁচটি গুলি ছোঁড়ে। সৌভাগ্যবশত গুলি তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে আঁচড় কেটে যায় মাত্র এবং তিনি হাসপাতাল হতে বেতার মারফত জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে সক্ষম হন। সেই দুর্বৃত্তকে হত্যা করা হয় এবং তার ঘরে তল্লাশি চালিয়ে

www.pathagar.com

যে সকল কাগজপত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় তার সাথে তুদেহ্ ও মুসলিম দলগুলোর সম্পর্ক বিদ্যমান। ফলে, তুদেহ্ দল নিষিদ্ধ করা হয় এবং এর অনেক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। অবশ্য এতে গোলযোগ দূরীভূত হয়নি। আজারবাইজান ও তেল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন শাহ ও ইরানে অবস্থানকারী মার্কিনিদের বিরুদ্ধে বেতার প্রচার আরম্ভ করে।

সাতসালা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। অথচ, এ. আই. ও. সি-র (Anglor Ianian Oil Company) কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনাও ফলদায়ক হয়নি। এমতাবস্থায় শাহ স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্রে এসে অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য একটি ব্যক্তিগত আবেদন জানাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালের ১৬ই নভেম্বর তিনি আগমন করেন এবং সমগ্র দেশে খুব প্রভাব বিস্তার করেন কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ইরানের উন্নয়ন প্রকল্পে তেমন গভীরভাবে নিজেকে জড়াবার জন্য আগ্রহী নয়। সম্ভবত চীনের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার দ্বারা এরা এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে মার্কিন নেতাদের স্বল্প জ্ঞানের ফলে তাঁরা ভীত হন, পাছে ইরান আরেকটি চীন শাহ্ আরেকজন চিয়াং কাইশেক বলে প্রতীয়মান হন।

যাহা হোক, বিফল মনোরথে শাহ শূন্য হাতে ফিরে যান। কিন্তু তিনি সংস্কারের মনোভাব ত্যাগ করেননি। ১৯৫০ সালে শাহ্ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সংস্কারে জড়িয়ে ফেলেন। তিনি তাঁর পিতার নিকট হতে প্রাপ্ত বিশাল জমিদারিকে সামাজিক জনকল্যাণের রাজকীয় প্রতিষ্ঠানে (Imperial Organization for Social Welfare) রূপান্তরের পরিকল্পনার দ্বারা তাঁর কাজ আরম্ভ করেন। পরিকল্পনা মোতাবেক এ সকল জমি সুবিধাজনক শর্তে তিনি কৃষকদের মধ্যে বিতরণের বন্দোবস্ত করেন। ১৯৫০ সালের জুন মাসে তিনি রাজমারা নামক একজন জ্ঞানী সামরিক জেনারেলকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। রাজমারা যুবক শ্রেণির লোকদেরকে মন্ত্রিসভায় নিযুক্ত করেন এবং যে সকল কর্মকর্তা হয়ত অকেজো বা দুর্নীতিবাজ তাদেরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। শাহ্ এই সকল উন্নতিতে সহায়তা করেন, কারণ তিনিও এগুলো প্রয়োজন বলে মনে করেন। তা ছাড়া তিনি মার্কিনিদেরকে তাঁর কার্যকলাপ দেখাতে চান।

এ সকল কার্যকলাপ দেখে যুক্তরাষ্ট্র আমদানি রফতানি ব্যাংক (Export Import Bank) হতে আড়াই কোটি ডলার ঋণ গ্রহণ করে। প্রাক্তন মিত্রশক্তির দেশগুলোকে যুক্তরাষ্ট্র যে সকল উদার সাহায্য প্রদান করে তার তুলনায় এই স্বল্প অংকে পারস্যবাসিগণ ক্রুদ্ধ হয়ে যায় এবং প্রথমবারের মত দেশে মার্কিন বিরোধী

www.pathagar.com

বিক্ষোভ দেখা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন কালবিলম্ব না করে এর সুযোগ গ্রহণ করে এবং দুই কোটি ডলারে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে।

তেল জাতীয়করণ

স্মরণ করা যেতে পারে যে, সাতসালা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তেলের সালামি ব্যবহার করার আশা করা হয়। কিন্তু ইঙ্গ-ইরান তেল কোম্পানি পারস্যের দাবি পূরণ করেনি। মজলিশের তেল কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ মোহাম্মদ মোসাদ্দেক সততা ও জাতীয়তাবাদের জন্য সুনামের অধিকারী। ব্রিটিশদের মধ্যে চেতনার অভাব এবং মার্কিনিদের মধ্যে উৎসাহের অভাব দেখে ড. মোসাদ্দেক বলেন যে, নিজেদের তেলের মধ্যে আশানুরূপ অর্থ রেখে বাদশাহকে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে আমেরিকায় পাঠানো ইরানের জন্য অপমানজনক। তিনি তেল জাতীয়করণের ইঙ্গিত প্রদান করেন। ড. মোসাদ্দেকের নেতৃত্বে মজলিশের আটজন সদস্য, যাদের অনেকেই ইরান পার্টির সদস্য, ন্যাশনাল ফ্রন্ট নামে একটি কোয়ালিশন গঠন করেন এবং জাতীয়করণের জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। তাঁরা 'নেতিবাচক নিরপেক্ষতার' (Negative Neutralism) আদর্শ প্রচার করেন। তারা যুক্তি প্রদর্শন করেন– রুশদেরকে যখন উত্তরাঞ্চলের তেল দেয়া হয়নি, ব্রিটিশদের নিকট থেকেও দক্ষিণাঞ্চলের তেল ছিনিয়ে নেয়া উচিত।

১৯৫১ সালের জানুয়ারি নাগাদ খবর পাওয়া গেল যে, আরামকো (Aramco) সৌদি আরবের সাথে এর তেল চুক্তি পরিবর্তন করে আধাআধি মুনাফায় সম্মত হয়েছে। এই খবর জাতীয়করণের পরিকল্পনাকে জোরদার করে। ব্রিটিশ কোম্পানি অতঃপর প্রধানমন্ত্রী রাজমারাকে অনুরূপ ব্যবস্থার কথা বলতে আসে, কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। জেনারেল রাজমারা ইতোমধ্যে জাতীয়করণের বিরুদ্ধে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেন। ১৯৫১ সালের ৭ই মার্চ ইসলামের ভক্তদলের একজন সদস্য দ্বারা তিনি সিপাহসালার মসজিদে নিহত হন। ১৫ই মার্চ মজলিশ জাতীয়করণের নীতি অনুমোদন করে। ৩০শে এপ্রিল মজলিশ একটি নয় দফা আইন পাস করে এবং তাতে কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দানের আইনও অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্রিটিশ সরকার জাতীয়করণের প্রতিবাদ করে এবং বার বার উল্লেখ করে যে, এ ব্যাপারে ইরানের মধ্যস্থতা মানা উচিত। ইতোমধ্যে নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী হোসাইন আলা উত্তরে বলেন, ইরান ও একটি তেল কোম্পানির মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবার কোনো অধিকার

www.pathagar.com

ব্রিটিশ সরকারের নেই। ১৫ই এপ্রিল ব্রিটিশ আবাদানের তেল শোধনাগার বন্ধ করে দেয় এবং ২৭শে এপ্রিল আলা পদত্যাগ করেন। ২৮শে এপ্রিল মোসাদ্দেক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং একই দিন ইরানে অবস্থিত কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপারে মজলিশ সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাস করে।

ঘটনাবলি অতি দ্রুত সংঘটিত হয় এবং সমস্যার সাথে জড়িত প্রায় সকলকে হতচকিত করে তোলে। ব্রিটিশ আশ্চর্যান্বিত হয় যে, হুমকি প্রদর্শনে, পারস্যের সম্পত্তি বন্ধ করায়, এমনকি পারস্য উপসাগরে যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণেও ইরান ভীত হয়নি। পাশ্চাত্যের পর্যবেক্ষকগণ আরও আশ্চর্যান্বিত হয় যে, আবাদানের তেল শোধনাগার বন্ধ হয়ে তার রাজস্ব আগমন বন্ধ হলেও ইরান কাবু হয়নি। পারস্যবাসিগণ আহলাদে আশ্চর্যান্বিত হয় যে, তারা ব্রিটিশ সিংহের লেজ পাকিয়ে টেনে নিতে সক্ষম। এদের ভেতর সর্বাপেক্ষা বেশি বিস্মিত হন ড. মোসাদ্দেক এবং তা তাঁরা জনপ্রিয়তা দেখে। তবে মোসাদ্দেকের সবচাইতে বড় ভুল সম্ভবত এই যে, তিনি তাঁর জনপ্রিয়তা পরিমাপ করতে সক্ষম ছিলেন না।

দুই বছর স্থায়ী সংকটকালে অর্ধডজন বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা হয়, যেগুলোর অধিকাংশই জাতীয়করণে নীতি গ্রহণ করার প্রস্তাব, কিন্তু সমস্যার সমাধান আনতে ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশ জাতিসংঘে অভিযোগ উত্থাপন করে। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে ইরানের বক্তব্য পেশ করার জন্য ড. মোসাদ্দেক নিউইয়র্ক গমন করেন। তার বক্তব্য হল জাতীয়করণ একটি অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং আন্তর্জাতিক আওতায় পড়বার মত বিষয় নয়। বিষয়টি আন্তর্জাতিক আলোচনার আওতাভুক্ত কি-না তা যাচাই করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্ব কোর্টের শরণাপন্ন হয় কিন্তু কোর্ট ইরানের স্বপক্ষে মতপ্রকাশ করে। কোর্টের রায় হল সমস্যাটি অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং তাই এটি বিশ্ব কোর্ট অথবা জাতিসংঘের আওতার বাইরে।

দু'জন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, ট্রুমান ও আইসেনহাওয়ার এবং বিশ্বব্যাংকের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান হয়নি। মোসাদ্দেক আবাদানের তেল প্রকল্প বাজেয়াপ্ত করেন এবং গ্রেট ব্রিটেনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কিন্তু স্বদেশে তিনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, জাতীয় ফ্রন্ট (National Front) হল বিভিন্ন দল, স্বার্থান্বেষী মহল এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের সংমিশ্রণ, যারা শুধু জাতীয়করণের উদ্দেশ্যেই একত্রিত হয়। সমস্যা সমাধানের ব্যর্থতা চলতে থাকলে মতান্তরের সূচনা হয়।

www.pathagar.com

১৯৫২ সালে জুলাই মাসে মজলিশ এর দশ অধিবেশনে মিলিত হলে মোসাদ্দেক ছয় মাসের জন্য বিশেষ ক্ষমতা দাবি করেন। কিছুসংখ্যক সদস্য আপত্তি করলে তিনি পদত্যাগের হুমকি দেন। এই ধরনের হুমকির সাথে সাথে সাধারণত তুদেহ্ পার্টি এবং গোঁড়া মুসলিম দলগুলোর সদস্যরা গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে সমর্থন দিত।

সমস্যা যতই জটিল আকার ধারণ করে মোসাদ্দেকও তৎসঙ্গে আরও অধিক ক্ষমতা দাবি করেন। যতই তিনি ক্ষমতা দাবি করেন ততই তিনি বন্ধু হারাতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে তুদেহ্ পার্টির সদস্যদের ওপর অধিক নির্ভর করতে হয়। ১৯৫৩ সালের গ্রীষ্মকালে শাহ্ তাঁর প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে এবং প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভা ও মজলিশের মধ্যে মত বিনিময়ের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও মোসাদ্দেক তখনও এত জনপ্রিয় যে তাঁকে বহিষ্কার করতে শাহ্ পারস্যের সেনাবাহিনী এবং মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাকে (C.I.A) সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাতে হয়। ১৯৫৩ সালের ১৩ই আগস্ট মোসাদ্দেককে বরখাস্ত এবং জেনারেল ফজলুল্লাহ জাহেদীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে শাহ্ একটি আদেশ জারি করেন। মোসাদ্দেক আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন এবং আদেশ বহনকারী দূতকে গ্রেফতার করেন। 'রক্তপাত বন্ধ' করবার জন্য ১৬ই আগস্ট শাহ ও সম্রাজ্ঞী সুরাইয়া দেশত্যাগ করেন। তিন দিনের জন্য তেহরান মোসাদ্দেকের অনুসারীদের হাতে থাকে। কিন্তু তাঁদের ওপর তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। গোলযোগের দিন কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা হল মস্কোর ভূমিকা। তুদেহ্ পার্টির প্রথম প্ররোচনায় বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় প্রোথিত শাহ ও তাঁর পিতার সমস্ত মূর্তি ভাঙতে থাকে। তুদেহ্ পার্টির সদস্যগণ সম্ভবত সরকারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারত, কিন্তু মস্কোর কঠোর আদেশের ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে আবদ্ধ থাকে। এইরূপ নিষ্ক্রিয়তার জন্য তাদেরকে কঠোর দণ্ড পেতে হয়। কারণ অনতিবিলম্বে ক্ষমতায় আগত নতুন সরকার এদেরকে বিভিন্ন মহল থেকে খুঁজে বের করে এবং হত্যা করে। যারা নিষ্কৃতি পায় তারা দেশত্যাগ করে এবং কমিউনিস্ট দেশে অতি কষ্টে জীবন-যাপন করে।

১৯শে আগস্ট নাগাদ জেনারেল জাহেদী তেহরান প্রবেশ করেন এবং শাহের পক্ষে সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হন। তাঁর সৈন্যগণ মোসাদ্দেকের বাড়ি অবরোধ করে অংশত ধ্বংস করে ফেলে। রাত্রি নাগাদ তিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগসংবলিত শাহের আদেশ প্রকাশ করেন। ২২শে আগস্ট বিজয়ীবেশে শাহ

www.pathagar.com

তেহরান প্রবেশ করেন। মোসাদ্দেককে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে তাঁর বিচার হয়। জাহেদীর প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারাও মোসাদ্দেকের অনুসারিগণ কাবু হয়নি। জনসাধারণকে শান্ত করতে আরও কয়েক বছরের প্রয়োজন হয়, যার ফলে ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে মৃত্যুতে অল্প প্রতিক্রিয়া হয়।

মোসাদ্দেকের পুনর্মূলায়ন

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ড. মোহাম্মদ মোসাদ্দেকের মধ্যে পারস্যবাসিগণ এমন এক লোকের সন্ধান পায় যাকে তারা অবচেতন মনে খোঁজ করে– একজন চরিত্রবান, উদ্যোগী এবং অনুসরণ করার মত জনপ্রিয় নেতা। ইরানের আধুনিক ইতিহাসে ১৮৯০ সালে তামাক একচেটিয়াকরণের বিরুদ্ধে ধর্মঘট, ১৯০৬ সালে শাসনতন্ত্র প্রদানের জন্য ধর্মঘট, ১৯১১ সালে মর্গান শুস্তারের স্বপক্ষে মিছিল এবং ১৯২৪ সালের প্রথমদিকে বংশ পরিবর্তনের জন্য বিক্ষোভের তুলনায় অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে তেল জাতীয়করণ। ব্রিটিশ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ পারস্যের মূল বক্তব্য অনুধাবন করে কিনা সন্দেহের বিষয়। ব্রিটিশগণ প্রথমে 'যুদ্ধজাহাজ' কূটনীতি দ্বারা পারস্য সরকারকে কাবু করতে চেষ্টা করে। এতে এবং বিশ্বকোর্টে ব্যর্থ হবার পর ব্রিটিশ পারস্যের তেল উত্তোলন বন্ধ করে দেয় এবং পারস্যের তেল প্রত্যাখ্যান করার জন্য অন্যান্য ইউরোপীয়কে পরামর্শ দেয় এবং মার্কিনিদেরকে অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করতে বলে, কিন্তু তাতেও ফলোদয় হয়নি।

ইঙ্গ-ইরানি তেল কোম্পানির প্রতি ব্রিটিশ মুনাফা অর্জনকারী ব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে তাকায়। পেশকৃত সমস্ত পরিকল্পনায় ব্রিটিশ শুধু কোম্পানির সম্পত্তির মূল্যই দাবি করে নাই বরং ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত কোম্পানি যে মুনাফা লাভ করত তাও দাবি করে। পারস্য সরকার অবশ্য সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়। ব্রিটিশ কোম্পানি সর্বদা মনে করে যে, তেল উত্তোলন করে সে ইরানের বিরাট উপকার করেছে, কিন্তু পারস্যবাসীদের অকৃতজ্ঞতায় সে বিস্মিত হয়। এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির এই বিরাট লাভ সামঞ্জস্যহীন। কোনো কোনো বছর এই লাভ ১৫০ শতাংশে দাঁড়ায়। তাদের প্রকৃত মনোভাব এই যে ব্রিটিশদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যতীত পারস্য সরকার তেল হতে কোনো আয়ই পেত না।

www.pathagar.com

অপরদিকে পারস্যবাসিগণ মুনাফার এক বিরাট অংশ দাবি করে। পারস্যের পরিদর্শকদেরকে হিসাবের খাতা দেখাতে বার বার অস্বীকার করায় তারা অবাক হয়; বিদেশি কারিগরদের স্থলে পারস্যের কারিগর নিয়োগের ব্যাপারে ব্রিটিশদের অযথা বিলম্ব দেখে তারা হতাশ হয় এবং কোম্পানি কর্তৃক দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লঙ্ঘন করতে দেখে তারা ক্রুদ্ধ হয়। তেলের সমস্ত সেলামি যেহেতু পারস্যের সেনাবাহিনীর জন্য খরচ হয় এবং জনগণের নিকট আসেনি তাই মোসাদ্দেকের সমর্থক ছোট ছোট ব্যবসায়ী, বুর্জোয়া গোষ্ঠী ও ছাত্রগণ কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেলেও কোনো পরোয়া করে না।

গোলযোগের সময় পারস্যবাসীদের আশা ও গর্বের মূল প্রেরণা আসে ড. মোসাদ্দেক হতে। কিন্তু আন্দোলনের আংশিক ব্যর্থতা এবং পারস্যবাসীদের অপমানের জন্যও তিনিই দায়ী। মোসাদ্দেক তেল শিল্পের ব্যাপারে নিদারুণ উদাসীন থাকেন। তার জন্য প্রস্তুত নিখুঁত রিপোর্টগুলো হয়ত তিনি মোটেই পড়েননি অথবা পড়লেও তিনি তা লক্ষ করেননি বা অনুসন্ধান করে দেখেননি– এসব একজন নেতার দোষ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বিশ্বাস করেন, ইউরোপে তাঁর তেলের চাহিদা এত ব্যাপক যে তাঁর তেল ক্রয়ের জন্য সেখানে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে যাবে। তাঁর অবগত হওয়া উচিত ছিল যে গ্রেট ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র, বাহরাইন, কুয়েত ও সৌদি আরবের বিশাল তেল ক্ষেত্র থেকেও হতে পারে। কার্যত তাই তারা করে। অধিকন্তু, তেল পরিবহনের কোনো ট্যাংকার ইরানের নেই। ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় তেল কোম্পানিগুলো একে অপরের সাথে যোগসূত্র এবং তেল রফতানি ও বাজারজাত করার ব্যাপারে তারা কিরূপ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে তা চার্টের সাহায্যে তাঁকে দেখানো হয়। ব্রিটিশ কোম্পানি জাতীয়করণের মোকাবিলা না করলেও তেল বাজারজাত করবার ব্যাপারে ইরানকে অন্যান্য কোম্পানির ওপর নির্ভর করতে হত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায় মোসাদ্দেক ব্রিটিশদের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত ঘৃণার নিকট একজন দায়িত্বশীল নেতা হিসাবে তাঁর বিচার বিবেককে বলি দেন। প্রস্তাবিত অনেকগুলো প্রকল্পের মধ্যে বিশ্ব ব্যাংক প্রস্তাবিত প্রকল্পটিই সম্ভবত সর্বোত্তম। এটা পারস্যের জাতীয়করণ আইনের সমস্ত ধারার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। কিন্তু তবুও মোসাদ্দেক এটা প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ একটি নিরপেক্ষ সংস্থা হিসাবে ব্যাংক এর সরেজমিনে তদন্তের ব্যাপারে ব্রিটিশ ও অন্যান্য ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর জোর দেয়।

www.pathagar.com

সম্ভবত মোসাদ্দেকের সকলের চাইতে বড় অসুবিধা হল তিনি বিপ্লবী নন। জাতীয়করণের উপর তিনি এতই অভিভূত হয়ে যান যেন এটিই শেষ সংস্কারের জন্য একটি পদক্ষেপ নয়। তাঁর কোয়ালিশন দল জাতীয় ফ্রন্টের সদস্যবর্গ পাছে অসন্তুষ্ট হন তাই তিনি অভ্যন্তরীণ সংস্কারের ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। তিনি এমনকি শাহ্‌কে তাঁর নিজস্ব জমি বন্টনে বাধা দান করেন, পাছে কোয়ালিশনের সদস্যবর্গ আঘাত পান। এতদসত্ত্বেও পারস্যবাসীদেরকে একটি অতি গভীর বিষয়ে সচেতন করার নেতা হিসাবে ড. মোসাদ্দেকের নাম পারস্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

১৯৫৪ সালের আগস্টে জেনারেল জাহেদী তেলের ব্যাপারে একটি সমাধানে উপনীত হন। যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, হল্যান্ড ও ফ্রান্সের আটটি প্রধান তেল কোম্পানির একটি সংস্থা জাতীয় ইরানি তেল কোম্পানির তেল আধাআধি শেয়ারে উত্তোলন, পরিশোধ ও বাজারজাত করবে। এই ব্যবস্থা মোসাদ্দেক কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হয়নি, অবশ্য মোসাদ্দেকের প্রচেষ্টা না থাকলে এটাও হত না।

শাহ্ এবং শ্বেত বিপ্লব

১৯৫৩ সালের আগস্টে মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভী তাঁর আত্মনির্বাসন থেকে তেহরানে ফেরার সময় তাঁর নিজস্ব কর্মপন্থা নির্ধারণ করে আসেন। ১২ বছর পর্যন্ত তিনি সাংবিধানিক নৃপতি হিসাবে রাজত্ব করে আসেন, কিন্তু এতে তিনি বা দেশ কোনো উন্নতি লাভ করেনি। ১৯৫৩ সালে তাঁকে ফিরে আসবার সুযোগ দেয়া হলে তিনি নিজে শাসন করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আসেন। তিনি বারংবার বলেন যে, দরিদ্র-পীড়িত, রোগশোকে জর্জরিত লক্ষ লক্ষ লোকের ওপর বাদশাহ হবার পেছনে গৌরব নেই। তিনি তাঁর জমির একটি অংশ কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে জমিদারদের দ্বারা "বলশেভিক শাহ" উপাধিতে ভূষিত হন। সেই একই ভূস্বামীগণই ১৯৫৩ সালে মজলিশ নিয়ন্ত্রণ করেন, প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাঁদের পুরাতন ক্ষমতা ফিরে পান এবং মোসাদ্দেকের পরাজয়ে আশাহত যুবক শিক্ষিত জাতীয়তাবাদিগণ তাঁদের ভাবধারায় হতাশ মনোভাব গ্রহণ করেন।

কিছুসংখ্যক পুরাতন সামরিক অফিসারের দুর্নীতি ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের দরুন বেশ কিছু সংখ্যক যুবক অফিসার তুদেহ্ পার্টিতে যোগ দেন।

www.pathagar.com

তবুও বেশির ভাগ সামরিক লোক তখনও রাজভক্ত। শাহ সাবধানে অগ্রসর হন। প্রতিবেশীদের সাথে ইরানের সম্পর্ক উন্নত করার মাধ্যমে তিনি কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৫৪ সালের জুনে ইরান সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে একটি বাণিজ্য চুক্তি প্রণয়ন করে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর নতুন সোভিয়েত নেতৃত্ব তখন বন্ধু লাভ করিতে আগ্রহী। পরে ইরান বাগদাদ প্যাক্টে যোগদান করে। এটা ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, তুরস্ক ও যুক্তরাজ্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা চুক্তি। ব্রিটিশদের সদস্যভুক্তির ফলে এই চুক্তি পারস্যবাসীদের সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠে এবং রুশগণ প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করে। কিন্তু ইরাক এই প্রতিষ্ঠান ত্যাগের পর ইহার নাম পরিবর্তিত হইয়া সেন্টো (CENTO) হইলেও ইরান একজন শক্তিশালী সদস্য হিসাবে বিরাজ করে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, শতাব্দী পরিবর্তনের পর হইতে একের পর এক পারস্য সরকারসমূহ বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করিতে চেষ্টা করে। শাহ এই ঐতিহ্য ভঙ্গ করেন এবং "মার্কিন শিবিরে" যোগদান করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিবাদের মুখে ইরানে একটি মার্কিন সামরিক মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তির মাধ্যমে ইরানে শুধু ব্যাপক অর্থনৈতিক সাহায্যই নহে এবং বিপুল পরিমাণে সামরিক সাজ-সরঞ্জামও লাভ করে। অবশ্য ইরান-মার্কিন চুক্তির দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক শাহকে মস্কো ও দেশের অন্যান্য অংশে সরকারি অতিথি হিসাবে সফর করিবার আমন্ত্রণ জ্ঞাপনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে নি। ইরান ও তুরস্ক প্রমাণ করে যে, স্ট্যালিনোত্তর রাশিয়ার সুদৃষ্টিতে থাকবার জন্য নিরপেক্ষতার প্রয়োজন নেই।

শাহ কৃষকদের মধ্যে তাঁর জমি বন্টন অব্যাহত রাখেন। তাঁহার উৎসাহে মন্ত্রিসভা মার্কিন সাহায্য দ্বারা একের পর এক পাঁচসালা পরিকল্পনা উদ্বোধন করে। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির প্রতি লক্ষ রাখিয়া সরকার বাঁধ, সেচব্যবস্থা ও পাওয়ার হাউস নির্মাণ করে। তৈল-শিল্প বিস্তার লাভ করে এবং এই খাতে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ব্যয় করা হয়।

১৯৬১ সাল নাগাদ শাহ কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং জাতীয় ফ্রন্ট ও তুদেহ্ পার্টির কিছুসংখ্যক প্রাক্তন সদস্য ও অনুসারীর আস্থা অর্জন করেন। সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ রাজভক্ত হইয়া পড়ে এবং শাহ্ মনে করেন যে, তিনি এখন যেকোনো কাজে সক্ষম। তাঁহার অনুরোধে মজলিশে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় যদ্দারা জমির ব্যক্তিগত মালিকানার সীমা নির্ধারণ করা হয়। উদ্বৃত্ত জমি

www.pathagar.com

কৃষকদের মধ্যে বন্টনের জন্য সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে ভূস্বামীদের বাধ্য করা হয়। জমিদার সমর্থিত মজলিশ এই প্রস্তাবে এত অধিক সংশোধনী যুক্ত করে যে, শেষ পর্যন্ত ইহা অর্থহীন হইয়া পড়ে। শাহের ভাষায়, "আমি বুঝতে পারলাম নিজে উদাহরণ সৃষ্টি করিলে, উপদেশ দিলে .....বা প্রচলিত প্রাথমিক পন্থা অবলম্বন করলেও কাজ হবে না।" অতএব তিনি তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। ১৯৬১ সালের ৬ই মে তিনি মজলিশ ভেঙে দেন এবং নতুন নির্বাচন না দিয়া তিনি কার্যত সংবিধান স্থগিত রাখেন। একটি উদার মন্ত্রিসভা ভূমিসংস্কারের একটি রাজকীয় ফরমান কার্যকরী করে। ৪০০ সেচ ব্যবস্থাযুক্ত এবং ৮০০ সেচ ব্যবস্থাহীন হেক্টরের অতিরিক্ত জমি সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য করা হয়। জমির দাম স্বয়ং জমিদারগণ কর্তৃক দাখিলকৃত আয়করের বিবরণ অনুসারে নির্ধারণ করা হয়। যেহেতু আয়কর কম দিবার জন্য জমি অবমূল্যায়ন করেন নি এইরূপ জমিদারদের সংখ্যা অতি বিরল, তা একটি "অন্যায়ের" ধুয়া উপস্থাপন করা হয়, কিন্তু জমিদারদের করিবার মত কিছুই নেই। অবশ্য শাহও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এই বিষয়ের উপর তেমন গুরুত্ব দেননি।

ইতিহাসে ইরানের শাহই সম্ভবত প্রথম রাজা যিনি একটি কৃষক আন্দোলনের নেতা হন। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারিতে পল্লী সমবায়ের একটি সম্মেলন উদ্বোধন করিবার কালে তিনি একটি ছয় দফা বিপ্লবী কর্মসূচি পেশ করেন। পরে এর সঙ্গে আরও তিন দফা যোগ করা হয়। একটি জাতীয় গণভোটে শাহের এই "শ্বেত বিপ্লব" বিপুল ভোটাধিক্যে পারস্যবাসিগণ গ্রহণ করে। বিপ্লবের নয়টি লক্ষ্য হইল : ভূমিবন্টন, বনভূমি জাতীয়করণ, ভূমিসংস্কার সুনিশ্চিত করবার জন্য সরকারি মালিকানা কারখানাগুলোর শেয়ার বিক্রয়, কারখানার লভ্যাংশে জমি মালিকদের অংশ গ্রহণ, নির্বাচনের সংস্কার ও মহিলাদের ভোটাধিকার, গণশিক্ষা বাহিনী গঠন, জনস্বাস্থ্য বাহিনী গঠন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বাহিনী গঠন এবং সাম্যগৃহ স্থাপন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন বাহিনী পরিচালিত হয় এবং প্রধানত শিক্ষিত যুবকদের দ্বারা, যারা দুই বছরের সামরিক জীবনের পরিবর্তে এই সকল উদ্ভাবনী কাজে তাদের সময় ব্যয় করে।

এগুলো হল সুদূরপ্রসারী সংস্কার। ভূমিসংস্কার বাস্তবায়ন ও মহিলাদের ভোটাধিকারের ফলে জমিদার ও প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ক্রুদ্ধ হন। বিক্ষোভ ও রক্তপাত সংঘটিত হয়, কিন্তু শাহ অনমনীয় ভাব ধারণ করেন এবং অনেক বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ, এমনকি প্রসিদ্ধ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকেও তিনি

www.pathagar.com

কারাগারে বা নির্বাসনে প্রেরণ করেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে একটি সম্পূর্ণ ভিন্নমতের মজলিশ গঠিত হয়। এর সদস্যবৃন্দ আধুনিকতা এবং শাহের শ্বেত বিপ্লবের কর্মসূচি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। নতুন মজলিশে শাহ নবগঠিত নতুন ইরান দলের (New Iran Party) মাধ্যমে কাজ করেন। অন্যান্য দল ও এদের সদস্যবৃন্দ মজলিশে থাকলেও শুধু নিউ ইরানই তাদের মতামত কার্যকরী করে।

ইরানের সমস্যাবলির সমাধান হয় নি এবং এগুলো সমাধান করতে আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ভুলত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু সূচনা সাধিত হয়েছে। ১৯৪১ সালে যুবক শাহ্ তাঁর পিতার উত্তরাধিকারী হবার পর অনেকে আশ্চার্যান্বিত হয়েছে তিনি অভিষিক্ত হয়নি কেন। তিনি এই মন্তব্য করেছেন বলে শোনা যায় যে, তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েছেন, কিন্তু রাজমুকুট তিনি জয় করতে চান। অভিষেক অনুষ্ঠান হয় তাঁর আট চল্লিশতম জন্মবার্ষিকীতে, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে অক্টোবর। সেইদিন তিনি সম্রাজ্ঞী ফারাহকে অভিষিক্ত করেন—এটা মুসলিম ইরানে সম্পূর্ণ নতুন একটি ঘটনা। পারস্যবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উৎসব নিশ্চয় এই কথাই প্রমাণ করে যে, শাহ্ রাজমুকুট জয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

---

www.pathagar.com

ষোড়শ অধ্যায়
তুরস্ক–গণতন্ত্রের এক অগ্নিপরীক্ষা

জনগণের প্রতি কামাল আতাতুর্কের সমৃদ্ধ ও বিচিত্র কীর্তি দুভাগে ভাগ করা হয়। একটি হল, বিশ্বের অন্যান্য জাতির তুলনায় তুর্কিগণ নিজেদের প্রতি কী মনোভাব পোষণ করে। দ্বিতীয়টি হল, একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে তুর্কিগণ নিজেদের প্রতি কিরূপভাবে তাকায়। তুর্কিদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট আতাতুর্ক এই উভয় প্রশ্নের গভীর ছাপ রেখে যান। তাঁর ভাবধারা ও নীতি অনুসরণ করার জন্য ১৯২৩ সালে তিনি রিপাবলিকান পিপল্‌স পার্টি গঠন করেন। এ দল 'কামালবাদ' ও তাঁর আদর্শ কার্যকরী করার মাধ্যম হয়ে ওঠে।

আধুনিক তুরস্কের ওপর আমাদের আলোচনা এই প্রমাণ করে যে, আতাতুর্ক তুরস্কের মুক্তি নিজেদের এটিকে ইউরোপীয় বলয় ধারণা করবার মধ্যে নিহিত দেখতে পান। তাঁর অসংখ্য সংস্কারের মাধ্যমে তিনি অনিচ্ছুক ও গোঁড়া তুর্কিদেরকে প্রাচ্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে এবং পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি চালচলন ও ভাবধারা গ্রহণ করতে প্ররোচিত করেন। কমিউনিস্ট আদর্শ পাশ্চাত্য জগতে বিরাট ভাঙন সৃষ্টি করলে আতাতুর্ক ও তাঁর সহচরবৃন্দ পাশ্চাত্য সভ্যতার কমিউনিস্ট ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে পশ্চিম ইউরোপের প্রতিষ্ঠানাদি ও ভাবধারা দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করেন। স্মরণ রাখতে হবে যে তুর্কিদের নিকট কমিউনিজম গ্রহণযোগ্য হলেও তাদের চিরাচরিত শত্রু রাশিয়া যেহেতু কমিউনিস্ট তাই এই আদর্শ তুর্কিরা পছন্দ করতে পারে না।

ট্রুম্যান নীতি (The Truman Doctrine)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তুরস্ক যুদ্ধের প্রায় শেষ নাগাদ এর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। অবশ্য যুদ্ধের পরে পরেই তুরস্ক লক্ষ করে যে সে ইউরোপ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। গ্রিক ব্যতীত সমগ্র বলকান রাশিয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসনে চলে যায়। পারস্যের আজারবাইজানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং কুর্দিদের সম্ভাব্য

www.pathagar.com

স্বায়ত্তশাসন সফল হলে তুরস্ক নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার আওতামুক্ত দেখত। আধুনিক তুরস্কের প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার নীতি যে ওসামনীয় সাম্রাজ্যের প্রতি জার রাশিয়ার চাইতে ভিন্ন হবে না তা তুর্কিগণ বিশ্বাস না করবার পেছনে কোনো যুক্তি নেই।

বস্তুত এই নীতি প্রত্যক্ষ করবার জন্য তুর্কিদেরকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৯৪৫ সালের যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব তুরস্কের পার্বত্য অঞ্চল, কারস ও আর্দাহান দাবি করে। তৎসঙ্গে তারা প্রণালীতে ঘাঁটিও দাবি করে। তুরস্কের ইতিহাসে রাশিয়ার এই ধরনের দাবি নতুন নয় এবং তুর্কিগণও সর্বদা এ সকল দাবি করে আসছে। এর উত্তর প্রদান করার জন্য মস্কোতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত সেলিম সোপের তাঁর সরকারের সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেনি। উভয় দাবি যুগপৎ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁর সরকারের গোচরীভূত করেন।

কিন্তু রুশগণ সেই চিরাচরিত লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করে। প্রণালী তদারক করার জন্য ১৯৩৬ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রি কনভেনশনের (Motriux Convention) ২৯ নং ধারা মোতাবেক প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী প্রতি পাঁচ বছর শেষে এই চুক্তি পরিবর্তনের প্রস্তাব করতে পারেন। চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর ১৯৪৩ সালে যেহেতু দ্বিতীয় পাঁচসালার বিরতি শেষ হয়, তাই ত্রিশক্তি (সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য) চুক্তিটি পরিবর্তনে মনঃস্থির করে। ফলে, মন্ত্রি চুক্তি পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয় যুক্তরাষ্ট্র চারটি প্রস্তাব পেশ করে। এগুলো হল প্রণালীর মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশের বাণিজ্য জাহাজ চলাচলের অনুমতি দেয়া; কৃষ্ণসাগরীয় দেশসমূহের যুদ্ধ জাহাজগুলোকে সর্বদা চলাচলের অনুমতি দেয়া; কৃষ্ণসাগরীয় দেশসমূহের অনুমতি ব্যতীত অন্য কোনো দেশের যুদ্ধ জাহাজকে চলাচলের অনুমতি না দেয়া এবং চুক্তিটিকে সময়োপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা।

চুক্তিভুক্ত সমস্ত দেশ এ সকল পরিবর্তন সমর্থন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে প্রেরিত এক বার্তায় মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণ করে কিন্তু তার দুটি প্রস্তাবও বিবেচনার জন্য যোগ করে। প্রস্তাবগুলো হল প্রণালী এলাকা কৃষ্ণসাগরীয় শক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রণালী প্রতিরক্ষার দায়িত্ব কৃষ্ণসাগরীয় শক্তিবর্গের হাতে ন্যস্ত করা। রাশিয়া পুনরায় প্রণালীতে স্থান করার জন্য তার চিরাচরিত খেলা আরম্ভ করে। কৃষ্ণসাগরীয় শক্তিবর্গের মধ্যে রয়েছে তুরস্ক, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, উকরাইন

www.pathagar.com

সোভিয়েত এবং সোভিয়েত রাশিয়া। এর অর্থ হল একের বিরুদ্ধে চার ভোট এবং এর গ্রহণ করা হলে প্রণালীর কর্তৃত্ব যায় রাশিয়ার হাতে। স্বভাবতই তুরস্ক এতে সন্দেহ প্রকাশ করে। রাশিয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে তুরস্ককে সাহায্য করার মতো কোনো শক্তি বা উপায় গ্রেট বৃটেনের নেই। সোভিয়েত চাপ প্রতিহত করার জন্য তুরস্ককে প্রায় ১০ লক্ষ লোক সশস্ত্র অবস্থায় রাখতে হয়। তুরস্ককে অবরোধ করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন গ্রিসের উপর চাপ দেয়। ১৯৪৭ সালের ১২ই মার্চ মার্কিন কংগ্রেস একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব পেশ করে যাকে ট্রুম্যান নীতি (Truman Doctrine) বলা হয়। রুশ চাপ প্রতিহত করার জন্য তুরস্ক ও গ্রিসকে শক্তিশালী করতে যুক্তরাষ্ট্র ৪০ কোটি ডলার প্রদান করে। কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যের নিকট এর অর্থ হল "কমিউনিজমকে প্রতিরোধ" করা কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিবর্গের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং রাশিয়াকে ইস্তাম্বুল ও প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান করতে প্রস্তুত হয়। ১৯৫৮ সাল নাগাদ ২৫০ কোটি ডলারে উন্নীত মার্কিন সাহায্য তুর্কি সেনাবাহিনীর যান্ত্রিক উন্নতি, রাস্তা নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সাধারণভাবে রুশ হুমকির মোকাবিলায় তুরস্ককে সাহায্য করার কাজে ব্যয় হয়।

ট্রুম্যান নীতি তুরস্ককে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করে এবং তদ্‌সঙ্গে একটি "ইউরোপীয়" শক্তি হিসাবে একে পাশ্চাত্য দেশভুক্ত করার পথ উন্মুক্ত করে। ১৯৫০ সালে উত্তর দিক হতে কমিউনিস্ট আগ্রাসন থেকে দক্ষিণ কোরীয় প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী গঠন করলে অগ্রগামী দেশসমূহের মধ্যে তুরস্ক প্রথম ৫০০০ সৈন্য প্রেরণ করে। এ সব সৈন্য জেনারেল ম্যাক আর্থারের অধীনে যুদ্ধ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে তুর্কি সৈন্যদের বীরত্ব বিশ্ববাসীর প্রশংসা অর্জন করে এবং তাদেরকে পাশ্চাত্য শিবিরের দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে দেয়। বস্তুত ইউরোপীয় হিসাবে চিহ্নিত হবার তুর্কি আগ্রহ এত প্রবল যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু "এশিয়া কনফারেন্সে" প্রতিনিধি প্রেরণ করার আমন্ত্রণ জানালে তুর্কি সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো ও যুক্তরাষ্ট্র উত্তর আটলান্টিক চুক্তিসংস্থা (NATO) গঠন করলে তুরস্ক সদস্যভুক্তির আবেদন করেন। ন্যাটো (NATO) দেশগুলোর মধ্যে এমন সকল সদস্যও অবশ্য বিদ্যমান যারা তুরস্কের সদস্যভুক্তির বিরোধিতা করে, কারণ এটি আটলান্টিক দেশ নয়। কিন্তু ১৯৫১ সালে গ্রিসের সাথে একেও সদস্যভুক্ত করা হয়। ইজমির ন্যাটোর পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের

www.pathagar.com

লক্ষ্যসীমায় তুরস্কে গুরুত্বপূর্ণ নৌ ও বিমান ঘাঁটি স্থাপন করা হয়।

তুরস্কের ন্যাটো ও ইউরোপীয় পরিষদের (Council of Europe) ন্যায় পশ্চিম ইউরোপীয় জোটসমূহে যোগদানের পরেই শুধু এটা প্রাচ্যের দেশসমূহের সাথে বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সম্ভবত একটি "ইউরোপীয়" শক্তি হিসাবে প্রাচ্যের প্রতিবেশীদের সাথে সে পারস্পরিক আঞ্চলিক ও প্রতিরক্ষামূলক সমস্যাদি নিরসনের জন্য অনুরূপ চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে তুরস্ক পাকিস্তানের সাথে একটি পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি প্রদান করে এবং ১৯৫৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি প্রতিরক্ষার শূন্যতা পূরণ করার জন্য ইরানের সাথে বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উৎসাহিত অনেকগুলো পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তিসমূহের মধ্যে এটি একটি। এর সদস্যবৃন্দ হল ইরান, ইরাক, তুরস্ক, পাকিস্তান ও যুক্তরাজ্য। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই চুক্তি হতে ইরাকের পদত্যাগের পর এর নতুন নামকরণ হয় কেন্দ্রীয় চুক্তি সংস্থা (Central Treaty Organization বা CENTO)। মধ্যপ্রাচ্যের "উত্তর গোলকে" তুরস্ক হতে পাকিস্তান পর্যন্ত একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ সৃষ্টি করা হয়।

একাধিক দলীয় গণতন্ত্র

জাতির জন্য প্রদত্ত আতাতুর্কের আরেকটি ঐতিহ্য হল জাতির অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন। এটি কামালবাদের ছয় দফার মধ্যে রূপলাভ করে এবং তুরস্কের নিয়ন্ত্রক রিপাবলিকান পিপল্‌স পার্টির প্রধান পথ প্রদর্শকে পরিণত হয়। এই দফাগুলো হল: প্রজাতন্ত্রবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণবাদ, রাষ্ট্রবাদ, ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও সংস্কারবাদ। এগুলো তুর্কি সরকার ও সমাজের নিম্ন কাঠামো। বিভিন্ন সময় একটা বা আরেকটা দফার উপর জোর দেয়া হয়, কিন্তু কোনোটিই বাদ দেয়া হয় না।

আতাতুর্কের জীবদ্দশায় গণতন্ত্রের মতবাদ সংবলিত গণবাদের ওপর জোর দেয়া হয়, কিন্তু এটি চালু করা হয়নি। সংস্কারসমূহকে প্রয়োজনীয় বিবেচনা করা হয়, কিন্তু তুরস্কে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হবার পর গণতান্ত্রিক উপায়ে জনসাধারণের মতামত যাচাই করা হলে কোনো সংস্কার সাধনই সম্ভব হত না। প্রেসিডেন্ট আতাতুর্ক সরকারের "রাজভক্ত বিরোধীদল" হিসাবে কাজ করার জন্য আরেকটি দল গঠনের অনুমতি প্রদানের বিষয়টি পরীক্ষা করেন, কিন্তু এটা কার্যকরী হয়নি। রাজভক্ত বিরোধীদলের মতবাদটি নতুন, ফলে বিতর্ক গালাগালিতে রূপান্তরিত হয়। আতাতুর্ককে এ সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে একদল দ্বারাই শাসনকার্য চালাতে হয়।

www.pathagar.com

১৯৩৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পর শীঘ্রই তুরস্ককে যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং বিধ্বস্ত বিশ্বের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে হয়।

যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষতার জন্য তুরস্ককে মাসুল দিতে হয় ব্যাপক হারে। জনগণ খাদ্যাভাব, মুদ্রাস্ফীতি ও অব্যবস্থামূলক করভারে জর্জরিত হয়। আতাতুর্কের পার্টি হলেও জনগণ ক্ষমতাসীন দলকে এগুলোর জন্য দায়ী করে। নেতৃত্ব পড়ে ইসমত ইনুনুর হাতে। দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে ইনি আতাতুর্কের ন্যায় কঠোর নন। যুদ্ধ শেষে উদারতা দেখিয়ে প্রেসিডেন্ট ইনুনু ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি প্রদান করেন। আতাতুর্কের রিপাবলিকান পিপ্‌লস পার্টির চারজন নেতা সেলাল বায়ার, আদনান মেন্দারেস, ফুয়াত কপরুলু ও রফিক করালতান দল ত্যাগ করে ডেমোক্রেটিক পার্টি নামে একটি নতুন দল গঠন করে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করার তেমন সময় ছিল না। ৪৮৭ আসনের মধ্যে ডেমোক্রেটিক দল শুধু ৬০টি আসন লাভ করে। পরবর্তী চার বছররে বিরোধী দলসমূহ নিজেদের দলীয় সংগঠনের জন্য যথেষ্ট সময় লাভ করে। ডেমোক্রেটিক পার্টি হতে পদত্যাগ করে কিছু লোক ন্যাশন পার্টি নামে একটি নতুন দল গঠন করে। দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক কার্যকলাপ চলতে থাকে। তুরস্কের রাজনৈতিক কার্যকলাপ লক্ষ্যকারী অনেকে অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে, একটি একদলীয় একনায়কত্ববাদী দল এর নীতিমালা সমালোচনা করার সুযোগ প্রদান করে নির্বাচনে প্রায় পরাজয় বরণ করার মুখোমুখি হয়ে পড়ে। এই ধরনের ঘটনা ইতিহাসে বিরল।

সুদীর্ঘকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবার ফলে রিপাবলিকান পার্টি বেশ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। প্রকৃত ও কাল্পনিক দুর্নীতির অভিযোগ ছাড়াও যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণের দরুন তুরস্কের ব্যবসায়িগণ অসন্তুষ্ট হয়; উচ্চমূল্যের দরুন শহরে লোকজন অসুখী হয়; ১৯৪২ সালে বাজেয়াপ্ত করের দরুন অমুসলমানগণ নি[illegible]ষিত হয় বলে মনে করে এবং চাষিগণ তাদের উৎপাদনের বিনিময়ে শিল্পোন্নয়নের দ্বারা নিজেদেরকে অবহেলিত বোধ করে। অবশ্য জাতিকে বিভক্তকারী প্রধান বিষয় হল আতাতুর্কের ছয় দফার দুই দফা। এই দুটি হল অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারক রাষ্ট্রবাদ এবং ধর্মীয় বিষয়ের ধর্মনিরপেক্ষতা।

আতাতুর্ককে বিপ্লবে সাহায্যকারী এ সকল বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ এই নীতিসমূহের বিরোধিতা করেন না, তবে তাঁদের বক্তব্য হল রিপাবলিকান পার্টি এগুলোর অপব্যাখ্যা করে। রিপাবলিকান পার্টির সমালোচনার কারণ হল এটি

www.pathagar.com

রাষ্ট্রবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষবাদকে জাতির সমৃদ্ধি ও উন্নতির লক্ষ্য মনে করে, উন্নতির উপায় নয়। নগরীর কেন্দ্রস্থলসমূহে ব্যবসায়িগণ আরও অধিক ব্যক্তিগত ব্যবসা দাবি করে এবং আংকারার বুর্জোয়াগণ কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধের আরও শিথিলতা চায়। ডেমোক্রেটিক দল ধর্মনিরপেক্ষবাদের বিরূপ ব্যাখ্যার জন্য এবং 'ধর্মের প্রতি বৈরীভাব পোষণের' কর্মসূচি প্রচার করার দায়ে সরকারকে দোষী করে। ১৯৪৭ সালে রিপাবলিকান দলের মধ্যেই এই মর্মে সন্দেহের উদ্রেক হয় যে তারা ধর্মনিরপেক্ষবাদ কার্যকরী করতে গিয়ে হয়ত বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে এর ফলে এই ব্যাপারে আগ্রহী কৃষকদেরকেও শত্রুতে পরিণত করে ফেলেছে। ফলে মাতাপিতার লিখিত অনুরোধে সরকার বিদ্যালয়সমূহে ধর্মীয় শিক্ষার অনুমতি প্রদান করে। সরকার সীমিত সংখ্যক লোককে মক্কায় হজ্ব করতে যাবার অনুমতি প্রদান করে, ইমাম প্রশিক্ষণের বিশেষ পাঠ্যসূচি গ্রহণ করে, আংকারা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ধর্মীয় অনুষদ প্রতিষ্ঠা করে এবং ওসমানীয় সুলতান ও ওসমানীয় যুগের অন্যান্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমাধিসমূহ খুলে দেয়। অবশ্য এ সকল পন্থাসমূহ রিপাবলিকান পার্টিকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়। ১৯৫০ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেট দল বিপুল ভোটে জয় লাভ করে; ৪৮৭টি আসনের মধ্যে ৪১৬টি আসন এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকার হাত পরিবর্তন করে।

ডেমোক্রেটিক পার্টির হাতে তুরস্ক

নতুন ন্যাশনাল এসেম্বলি ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান সেলাল বায়ারকে প্রেসিডেন্ট এবং আদনান মেন্দারেসকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে। নতুন সরকার পশ্চিম ইউরোপীয় গণতন্ত্রের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা লাভ করে এবং নবাগত জাতিসমূহের জন্য একে আদর্শ বলে গণ্য করা হয়। এখানেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে গণতন্ত্রের পথে শিক্ষিত একটি জাতি কিভাবে কোনো বিপ্লব ও রক্তপাত ছাড়া সরকার পরিবর্তন করার মতো সুপরিপক্ব হয়। আবার এমন অনেকও রয়েছে যাদের ধারণা, পরবর্তী ১৯৬০ সালে সামরিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে এ কথাও বলা যায় যে, এরূপ বিশ্বাস ও উৎসাহ অসময়োচিত। কিন্তু তুর্কি ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তুরস্কের গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করাও উচিত নয়।

১৯৫৪ ও ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে আসনের সংখ্যা কম হলেও ডেমোক্রেটিক পার্টি বেশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৯৫০ হতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তাদের এই

www.pathagar.com

শাসনের যুগে প্রধান কর্মসূচি ছিল ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও রাষ্ট্রবাদের পুনঃব্যাখ্যা করা এবং নতুন ব্যাখ্যা কার্যকরী করা। অবশিষ্ট চারটি নীতির মধ্যে প্রজাতন্ত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদ এমন পাকা আসন গ্রহণ করে যে তুর্কি সমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশ ব্যতীত কেউই এগুলো নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেনি। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বাহক গণবাদের নীতি—যা রিপাবলিকান পিপল্স পার্টির শাসনামলে অবহেলিত হয়, তা সেই পার্টির ইচ্ছানুযায়ীই এখন কার্যে পরিণত হয়। অবশ্য এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে গণবাদের নীতির ওপর ভিত্তি করে ক্ষমতায় আগত ডেমোক্রেটিক পার্টির বিরুদ্ধে বিরোধী দল সৃষ্টি হবার আংশিক কারণ হল এই দল বারংবার এই নীতি ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের জন্য গঠিত একাধিক দলীয় প্রথার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কারবাদের নীতি, অর্থাৎ সরকার কর্তৃক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা সংস্কার সাধন করার অধিকার যেমন অপ্রয়োজনীয় তেমন অবাস্তব হয়ে পড়ে। অতঃপর বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া আতাতুর্কের ন্যায় তুরস্কে সংস্কার চাপিয়ে দেয়া বোধহয় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যে দুটি বিষয়ে জাতীয় ভিত্তিতে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং ভবিষ্যতেও কিছুকাল এরূপ চলবার সম্ভাবনা এই দুটি বিষয় হল ধর্ম ও অর্থনীতি।

তুর্কি ধর্মনিরপেক্ষতা

আতাতুর্কের বিপ্লবের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। আতাতুর্কের নিকট এর অর্থ হল জনজীবন হতে ধর্মের প্রভাব একরকম উঠিয়ে দেয়া। আতাতুর্কের অনেক সহচর জনজীবনে ধর্মীয় হস্তক্ষেপের বিরোধী হলেও তাঁরা আতাতুর্কের এই পন্থা পছন্দ করেন নি, কারণ এর দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে তাদের ধর্মচর্চা করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ১৯২৪ সালে আতাতুর্ক একটি 'রাজভক্ত বিরোধী দল' হিসাবে প্রগ্রেসিভ রিপাবলিকান পার্টি নামে একটি দল গঠন করার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি এটি পরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন প্রধানত এই জন্য যে এই দল ব্যক্তিগত ধর্মীয় স্বাধীনতা সীমিত করার ব্যাপারে সরকার 'বাড়াবাড়ি' করছে বলে সমালোচনা করে। দীর্ঘদিন যাবত তুরস্কের অত্যন্ত বিতর্কমূলক আলোচনা সম্ভবত সীমা নির্ধারণ নিয়ে। সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করলে তুর্কি সংস্কার আন্দোলন কর্তৃক বিলুপ্ত ওলামা, ইসলামী আইন ও সমস্ত পুরাতন অভ্যাস পুনরায় চালু হবার সমূহ সম্ভাবনা। আতাতুর্কের নিকট সমাধান অতি সাধারণ—তিনি দলবদ্ধভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে

www.pathagar.com

প্রকাশ্যে ধর্মচর্চা বন্ধ করতে চেষ্টা করেন। আতাতুর্ক যদিও জনসাধারণকে মসজিদে নামাজ পড়া বা নামাজের জন্য আজান দেয়া নিষেধ করতে পারেননি, কিন্তু তুর্কি ভাষায় আজান দিতে বাধ্য করে এবং যারা আরবি ভাষা ব্যবহার করে (ইসলামী নীতি অনুযায়ী) তাদেরকে শাস্তি দিয়ে প্রকারান্তরে তিনি আযান একরূপ বন্ধ করে দেন।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে একাধিক দলীয় ব্যবস্থা চালু হবার পর ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে আতাতুর্কের ব্যাখ্যা অনুসরণকারী রিপাবলিকান পিপল্স পার্টি বিশেষত গ্রামাঞ্চলে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। অতএব তাঁরা এই আইন শিথিল করেন এবং বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা, মক্কায় হজ্বে যাওয়া এবং অন্যান্য রীতিনীতি পালন করার অনুমতি প্রদান করেন। অবশ্য ১৯৫০ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টি নির্বাচনী প্রচারণার মধ্যে পবিত্র মানবিক অধিকার হিসাবে 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' অন্তর্ভুক্ত করে। নির্বাচনের সময় ডেমোক্রেট দল আবিষ্কার করে যে ধর্মীয় ব্যাপারে সরকারের বিরুদ্ধে গ্রামের লোকদের প্রবল বিক্ষোভ বিদ্যমান।

ডেমোক্রেটিক পার্টির অধীনে নতুন সরকারের প্রায় প্রথম কাজ হলো আজানে আরবি ভাষা ব্যবহারের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা। এর পর আসে রমজান মাসে রোজা পালন, ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা, ধর্মীয় আদেশ সংক্রান্ত আইনসমূহ শিথিল, ইমাম প্রশিক্ষণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং মসজিদ নির্মাণ করা। এক সমীক্ষায় দেখা যায় দশ বছরের শাসনামলে ডেমোক্রেটিক দলের সরকার ৫০০০ মসজিদ এবং সমসংখ্যক সাধারণ স্কুল নির্মাণ করে। আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষবাদের ব্যাখ্যার অনুসারিগণের নিকট, যারা মসজিদ নির্মাণের বিরোধী, সমসংখ্যক বিদ্যালয় ও মসজিদ নির্মাণের অর্থ হল এই নীতির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। তুর্কি ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের রোষের কারণ হল এই যে সরকার বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে পূর্ববর্তী আইনের বিপরীত কাজ করে। সমস্ত বিদ্যালয়ে এই ধর্মীয় শিক্ষা চালু করে এবং যে সকল অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষা চায় না তাদেরকে লিখিতভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করার বন্দোবস্ত করা হয়।

এতদসত্ত্বেও, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করা বা তুর্কি প্রজাতন্ত্র গঠিত হবার পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে আনার কোনো উদ্দেশ্য ডেমোক্রেটিক দল পোষণ করেনি। কোনো কোনো দল ও ব্যক্তিবিশেষ অনুরূপ ভাবধারা চালু করার চেষ্টা

www.pathagar.com

করলে সরকার ঐগুলোকে বন্ধ করার চেষ্টা করে। ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের সমালোচনার বিষয়বস্তু হল, ধর্মকে গণ্ডিভূত করার আইন শিথিল করলে পুরাতন রীতিনীতি পুনঃপ্রবর্তনে উৎসাহ প্রদান করা হয়। বস্তুত ১৯৪৮ সালে গঠিত ন্যাশন পার্টি এই ব্যাপারে ডেমোক্রেটিক পার্টির তুলনায় এগিয়ে যায়। এটি জাতির ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রত্যাশা করে এবং প্রত্যেককে যে কোনো ভাষায় ধর্মপালন করার স্বাধীনতা প্রদানের দাবি জানায়। এটা ধর্মীয় দানসমূহ বা ওয়াক্‌ফ্‌ সম্পত্তি ওলামাদের নিকট ফেরত প্রদানের দাবিও উত্থাপন করে। লুক্কায়িত ধর্মীয় সংস্থা পুনরায় জনসমক্ষে বের হয়, কেউ কেউ পাশ্চাত্যকরণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লেখে ও বক্তৃতা প্রদান করে। কেউ কেউ আবার এইরূপও বলে যে, 'তুরস্ককে ফিলিস্তিনে আরবদের স্বপক্ষে যুদ্ধ করা উচিত।' এ সকল দল বা লোকজনদের অধিকাংশকে স্তব্ধ করে দেয়া হয়, কিন্তু বিতর্ক চলতে থাকে। ধর্মের এই পুনঃপ্রকাশের গূঢ় অর্থ সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারে না। এটার অর্থ কি রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক উপযোগিতামূলকভাবে ধর্মের ব্যবহার, নাকি পুরাতন ব্যবস্থার পুনর্বহাল, নাকি ধর্মীয় স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ, নাকি একটি নতুন ও সংস্কার সাধিত ইসলামের পুনর্জাগরণ।

নতুন রাষ্ট্রবাদ

ধর্মনিরপেক্ষবাদের চাইতেও অতি জরুরি ও অধিক জটিল হল নতুন সরকারের অর্থনীতি। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, মুদ্রাস্ফীতি এবং ১৯৫০ সালের পূর্ববর্তী দশকে অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্বের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাতে জনগণ একটি পরিবর্তনের জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। তদুপরি পঁচিশ বছরের স্থিতিশীল সরকারের আমলে তুরস্কে এক নতুন শ্রেণির ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, পুঁজিপতি ও ম্যানেজারের সৃষ্টি হয় যারা ডেমোক্রেটিক পার্টি কর্তৃক প্রতিশ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে স্বাগত জানায়। যুদ্ধোত্তরকালের তুরস্কের অবস্থা, ট্রুম্যান নীতি এবং বিপুল আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও প্রত্যাশার দ্বারা তুরস্কের নেতৃবৃন্দ অতি দ্রুত শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সাধনের এই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

মধ্যপ্রাচ্যে, বিশেষত তুরস্ক ও ইরানে মার্কিন সাহায্যের স্বরূপ হল সামরিক এবং এর উদ্দেশ্য হল স্নায়ুযুদ্ধে উস্কানি দেয়া। অধিকন্তু, উভয় দেশে সাহায্য

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণকারী মার্কিন প্রতিষ্ঠানসমূহ মার্কিন সামরিক লোকজন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও উপদিষ্ট হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস বার্ষিক ভিত্তিতে অর্থ মঞ্জুর করে এবং এটি সর্বজনবিদিত যে এক বছর মঞ্জুরিকৃত অর্থ কাজে লাগাতে না পারলে পর বছর মঞ্জুরি অর্থ কমিয়ে দেয়া হয়। অতএব নিত্য নতুন কলকারখানা স্থাপন ও শিল্প বিস্তৃতির মাধ্যমে দ্রুত সে অর্থ খরচ করার প্রবণতা দেখা দেয়। মার্কিন সংস্থাসমূহের নিকট এই ধরনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল "মধ্যপ্রাচ্যে কমিউনিজম রোধ করা," তুর্কি জনগণের নিকট কলকারখানার অর্থ হল "উন্নয়ন" এবং ক্ষমতাসীন দলের নিকট এর অর্থ হল আরও অধিক ভোট।

অবশ্য উন্নয়ন একটি দীর্ঘকালীন পন্থা। সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিবেশে একটি কারখানা নির্মাণে বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায় হতে কমপক্ষে পাঁচ বছর সময়ের প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে কারখানা নির্মাণ সমাপ্ত হবার পর উৎপাদন আরম্ভ করার মতো যথেষ্ট পুঁজি তুর্কি সরকারের ছিল না। অতএব বিদেশি সাহায্যের আশায় মেন্দারেস সরকার ঘাটতি খরচের কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৬০ সাল নাগাদ এই ঋণের পরিমাণ ১৩০,৪৬,০৪,৬৩৬ ডলারে দাঁড়ায়।

তবে এর অর্থ এ নয় যে কিছুই করা হয়নি। রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়, কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয় এবং অনেক কারখানার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মোটামুটিভাবে, দ্রুত শিল্পায়ন ও অতিরিক্ত পূর্ত কর্মসূচির ফলে অর্থনীতির ওপর প্রবল চাপ পড়ে। প্রধানমন্ত্রী মেন্দারেস পরিকল্পনা অপছন্দ করেন, অর্থনৈতিক বাস্তবতা অবহেলা করেন, অনুৎপাদনমূলক প্রকল্পে অর্থ ব্যয় করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্মাণ কার্য চালান এবং দেশকে অর্থনৈতিক দেউলিয়ার সম্মুখীন করেন। তুর্কি অর্থনীতির শিক্ষানবিশগণ বলেন যে, এই সকল অপরাধের জন্য যারা অর্থ প্রদান করে তারাও কিয়দাংশে দায়ী।

১৯৬০ সালের সামরিক অভ্যুত্থান

ধর্মীয় শক্তির পুনরাগমনে ধর্মনিরপেক্ষবাদিগণ শঙ্কিত হয়, ব্যবসায়িগণ বহির্গত ও ভেতরগত মূল্যে হতাশ হয়, কারণ এর ফলে রপ্তানিতে মুনাফা হয় স্বল্প অথচ আমদানিতে খরচ পড়ে বেশি এবং তুর্কি জনগণ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবের ফলে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতিতে বিক্ষুব্ধ হয়। যে কোনো সরকারের পতনের জন্য এই কারণগুলো যথেষ্ট, কিন্তু সামরিক বিপ্লবের কারণ হল গণবাদ দমন, যদ্দারা ডেমোক্রেটিক পার্টি ক্ষমতায় আগমন করে। এই দল ক্ষমতাসীন

www.pathagar.com

হবার সঙ্গে সঙ্গে একে ক্রমশ দেশের একমাত্র দল হিসাবে রাখতে চেষ্টা করে। ক্ষমতাসীন দল একটি রাজভক্ত বিরোধী দলের ব্যাপারে অভ্যস্ত। ১৯৫৩ সালে সরকার ২৫ বছর বা ততোধিক কাল হতে কর্মরত সমস্ত জজবৃন্দকে অবসর প্রদান করে এবং রাজনৈতিক নিয়োগের সুযোগ দান করে। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের জন্য রাজনীতি নিষিদ্ধ করে এবং রিপাবলিকান পিপল্স্ পার্টির আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সরকার "রাজনৈতিক প্রচারণা" বন্ধ করে দেয়, বিধিনিষেধের আইন চালু করে এবং সরকারের প্রতি 'জনসাধারণের আস্থা বিনষ্ট' করার অপরাধে সরকার বিরোধী পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে দেয়। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে সরকার একটি আইন পাস করে বিভিন্ন দলের কোয়ালিশন নিষিদ্ধ করে এবং কোনো দল যে প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করে সে দলকে সে প্রদেশের সমস্ত সদস্যের আসন প্রদান করে। এই সকল কৌশল অবলম্বন করেও তারা ৪৭.৭ শতাংশ ভোটের অধিক লাভে ব্যর্থ হয়। অথচ রিপাবলিকান পার্টি ৪০.৯ শতাংশ ভোট লাভ করে।

তুরস্কের বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার সুযোগে মেন্দারেস সরকার দমননীতির দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে উৎসাহিত হয়। ১৯৫৯ সালে প্রথম হাঙ্গামা শুরু হয় এবং রিপাবলিকান পিপল্স্ পার্টির নেতা ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইসমত ইনুনু মাথায় আঘাত পান এবং অনুরূপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিদ্রোহ দমন করার জন্য সরকার একটি সৈন্যদল প্রেরণ করতে বাধ্য হয়। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিরোধী দল সরকারের অনেকগুলো অনিয়মিত কার্যাবলির বৈধতার ওপর প্রশ্ন তোলে। ২ এপ্রিল পুলিশ ইনুনুকে কায়সারী শহরে প্রবেশকালে বাধা প্রদান করতে চেষ্টা করে। তিনি আদেশপত্র ছিন্ন করে ট্রেনে বসে থাকেন। জনসাধারণ এই খবর শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে আগমন করে এবং তাঁর হস্ত চুম্বন করে। আরেকটি ঘটনায় সৈন্যগণ একটি পুলের ওপর তাঁর গাড়ির গতিরোধ করে। ইনুনু গাড়ি থেকে বের হয়ে সৈন্যদের নিকট হেঁটে যান। সৈন্যগণ সম্মানসূচকভাবে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে যেতে দেয়।

প্রথম ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয় ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮-২৯শে এপ্রিল এবং শীঘ্রই এটি আঙ্কারায় ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রগণ ব্যারিকেড সৃষ্টি করে, প্রস্তর নিক্ষেপ করে এবং "স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, মেন্দারেস পদত্যাগ কর"—এই মর্মে শ্লোগান দেয়। মে মাসে ইস্তাম্বুলে ন্যাটোর সম্মেলন চলাকালে ছাত্ররা সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য বিক্ষোভের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ২০শে মে ভারতের

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী নেহেরু একটি রাষ্ট্রীয় সফরে আগমন করলে আঙ্কারায় জনতা মেন্দারেস-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। প্রকৃত সামরিক অভ্যুত্থান যাকে কখনও কখনও বিপ্লব বলা হয় তা সংঘটিত হয় ১৯৬০ সালের ২৭শে মে এবং মাত্র চার ঘণ্টা স্থায়ী হয়। রাজধানীর কৌশলের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলো তারা অধিকার করে এবং প্রেসিডেন্ট সেলাল বায়ার ও প্রধানমন্ত্রী মেন্দারেসকে গ্রেফতার করে। সামরিক অভ্যুত্থান পরিচালিত হয় স্থলবাহিনীর প্রাক্তন অধিনায়ক জেনারেল কামাল গুর্শেলের নেতৃত্বে। ন্যাশনাল ইউনিটি কমিটি নামক একটি সামরিক সরকারের তিনি নেতা নিযুক্ত হন। তাঁদের প্রাথমিক কার্যাবলির একটি হল ইস্তাম্বুল ও আঙ্কারার বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইন বিভাগের অধ্যাপকদেরকে একটি সংবিধান রচনার কাজে নিয়োগ করা। সামরিক সরকার ১৭ সদস্যের একটি মন্ত্রিসভা গঠন করে, যাদের ১৫ জনই বেসামরিক লোক এবং একটি ১৫ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। এই কর্মসূচির মধ্যে থাকে অর্থনৈতিক বিষয়াদি, ধর্ম, সাংবাদিক স্বাধীনতা, কফি আমদানি, বিদেশ ভ্রমণ সহজকরণ, সম্পত্তি হস্তান্তর ও অর্থনৈতিক লেনদেনসহ সমস্ত বিষয়।

১৭ মাসের শাসনামলে ন্যাশনাল ইউনিটি কমিটি ৫০০০ অফিসার ও ১৪৭ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে চাকরি থেকে অবসর প্রদান করে এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রায় ৬০০ সদস্যক কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। বিচার ১১ মাস স্থায়ী হয়। কোর্ট ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন, ৩১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন, ১৩৮ জনকে অব্যাহতি প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট লোকদেরকে বিভিন্ন মেয়াদি কারাবাস প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী মেন্দারেস, বৈদেশিক মন্ত্রী জরলু ও অর্থমন্ত্রী পোলাটকান ব্যতীত বাকি সকলের মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। এই বিচারের উদ্দেশ্য হল তুর্কিদেরকে এই ধারণা প্রদান করা যে, যে কোনো সরকারের অপরাধীকেই শাস্তি পেতে হবে। পর্যবেক্ষকগণের বিশ্বাস, এই বিচারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফলাফল যাই থাক না কেন, এর দ্বারা মেন্দারেস ও ডেমোক্রেটিক পার্টির জনপ্রিয়তা, বিশেষত কৃষকদের মধ্যে কোনো অংশে ক্ষুণ্ন হয়নি। কোনো কোনো নতুন রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ডেমোক্রেটিক পার্টির অনুসারীদের ভোট পাবার জন্য প্রকাশ্যে এই পার্টির নীতিমালা গ্রহণ করে।

সংবিধান রচনা করা হয় এবং ১৯৬১ সালের জানুয়ারিতে এটা অনুমোদন করার জন্য গণপরিষদের বৈঠক হয়। ৯ই জুলাই নতুন সংবিধান গণভোটে দেয়া

www.pathagar.com

হয় এবং ৬০ শতাংশেও অধিক লোক এটা সমর্থন করে। ১৯২৪ সালের সংবিধান ছিল প্রজাতান্ত্রিক যদ্বারা ন্যাশনাল এসেম্বলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এতে যথেষ্ট ভারসাম্য ছিল না, নতুন সংবিধানে তুর্কিগণ বিভিন্ন চোরাপথ বন্ধ করতে চেষ্টা করে, যে পথে কোনো ব্যক্তিবিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠিতে পারে। এতে অধিক দল গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং বেশ ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। আতাতুর্কের ছয়টি নীতিমালার মধ্যে শুধু চারটি রাখা হয়। বিপ্লববাদ ও রাষ্ট্রবাদ বাদ দেয়া হয়। সংবিধান ঘোষণা করে যে, "তুর্কি প্রজাতন্ত্র একটি জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ ও সামাজিক রাষ্ট্র।" মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষাই সর্বাপেক্ষা বিতর্কমূলক। একে "ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির" উপর ছেড়ে দেয়া হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে রাষ্ট্রবাদ ত্যাগ করা হলেও একটি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সংস্থা গঠনের মধ্যে এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যে কোনো সংবিধানের ন্যায় এর কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় একে যাচাই করা হলে।

দ্বিতীয় তুর্কি প্রজাতন্ত্র

বিচার চলাকালে ও সংবিধান রচনার সময় নতুন রাজনৈতিকদলসমূহ গঠিত হয় এবং তারা প্রতিশ্রুত নির্বাচনের প্রস্তুতি আরম্ভ করে। প্রায় ১১টি দল তালিকাভুক্ত হয় ও প্রাণবন্ত প্রচারণা শুরু করে। ১৯৬১ সালের ১২ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মাত্র চারটি দল পরিষদে আসন লাভ করতে সমর্থ হয়। রিপাবলিকান পিপল্‌স্ পার্টি ১৭৩টি আসন লাভ করে, জাস্টিস পার্টি ১৫৮টি, নিউ টার্কি পার্টি ৬৫টি এবং রিপাবলিকান পেজেন্টস ন্যাশনাল পার্টি ৫৪টি আসন লাভ করে। রিপাবলিকান পিপল্‌স্ পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে ব্যর্থ হওয়ায় তারা জাস্টিস পার্টির সাথে কোয়ালিশন করে। পরিষদ জেনারেল গুর্শেলকে প্রেসিডেন্ট ও ইসমত ইনুনুকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে। এক বছর পর কোয়ালিশনের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দিলে পিপল্‌স্ পার্টি অন্য দুই দলের সাথে কোয়ালিশন করে এবং জাস্টিস পার্টিকে সরকার হতে বহিষ্কার করে।

রিপাবলিকান পিপল্‌স্ পার্টি অন্যান্য পার্টি হতে অধিক ভোট লাভ করায় কেউ আশ্চর্যান্বিত হয়নি। আতাতুর্কের দল হওয়া ছাড়াও এটা ডেমোক্রেটিক পার্টির বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে বিরোধিতায় নেতৃত্ব প্রদান করে। তবে পর্যবেক্ষকগণ আশ্চর্যান্বিত হন জাস্টিস পার্টির শক্তি প্রদর্শনে। সাধারণত এটি রক্ষণশীল

www.pathagar.com

মনোভাবাপন্ন লোকদের নিয়ে গঠিত, যারা স্বল্প কর এবং শিল্পকারখানায় রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া নীতি বেসরকারি লোকদের হাতে ছেড়ে দেবার পক্ষপাতী। দল সরকারি নিয়ন্ত্রণের বিলোপ চায় এবং এটা সমস্ত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরোধী। জাস্টিস পার্টি মোটামুটিভাবে ডেমোক্রেটিক পার্টির অনুসারীদের ভোট লাভ করে।

নিউ টার্কি (নতুন তুর্কি দল) অর্থনৈতিক, উদার ও রাজনৈতিক প্রগতিশীল লোকজনদের সমন্বয়ে গঠিত, যারা রিপাবলিকান পিপল্স্ পার্টির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। তারা কঠোর ধর্মনিরপেক্ষবাদী এবং শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার দাবি করে। রিপাবলিকান পেজেন্ট্স্ ন্যাশনাল পার্টি (Republican Peasants National Party) সামাজিক রক্ষণশীলতা দাবি করে এবং তাদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষবাদ বিরোধী মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। এটা জাস্টিস পার্টি গ্রামাঞ্চলের লোকদের সমর্থন লাভ করে, অপরদিকে রিপাবলিকান ও নিউ টার্কি পার্টি শহুরে লোকদের মধ্যে অধিক জনপ্রিয়।

তুরস্ক একটি পাশ্চাত্য দেশ নাকি প্রাচ্য এ প্রশ্নে সহজেই বলা যায় যে গ্রামাঞ্চলের লোকজন দেশকে প্রাচ্যের দিকে টানে, অপরদিকে শহুরে লোকজন টানে পাশ্চাত্যের দিকে। এ ব্যাপারে মূল নিষ্পত্তির বিষয় সম্ভবত ধর্ম। ধর্মনিরপেক্ষবাদীগণ আতাতুর্ককে অনুসরণ করতে চায়—যার অর্থ হল স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষা চলবে না এবং ধর্মীয় রাজনীতিতে আরবি ভাষা ব্যবহার চলবে না। অপরদিকে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষা চান, নামাজে আরবি ভাষার ব্যবহার চান এবং ধর্মীয় সমস্ত দানখয়রাতের তহবিল ওলামাদের হাতে হস্তান্তর দাবি করেন। এই উভয় দলের মধ্যবর্তী স্থানে মধ্যমপন্থী দল যারা ইসলামের "আংশিক" রীতিনীতি প্রবর্তন চায় কিন্তু এই প্রবর্তনকে কার্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মধ্যমপন্থী আশঙ্কা করে যে, এই প্রথা প্রবর্তিত হলে ধর্মীয় শিক্ষার স্বাধীনতা, আরবি ভাষা, পর্দাপ্রথা, বহুবিবাহ, খেলাফত ইত্যাদি পুনরায় চালু হবে। অতএব শেষ সিদ্ধান্ত নেয়া হবে হুকুমের দ্বারা নয়, বরং শিক্ষা চালুর মাধ্যমে এবং যত শীঘ্র গ্রামাঞ্চলের লোকজন পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে এর মাধ্যমে।

---

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

ইসরাইল রাষ্ট্রের সৃষ্টি

১৯৪৫ সালে জার্মানির পরাজয়, তৎসঙ্গে নির্বাচনে ব্রিটিশ শ্রমিক পার্টির জয়লাভ ইহুদিবাদীদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। শ্রমিকদলের সদস্যবৃন্দ সাধারণত 'ইহুদিবাদী সমর্থক' এবং ১৯৩৯ সালে শ্বেতপত্র প্রকাশের জন্য রক্ষণশীল সরকারকে আক্রমণ করে আসছে; শ্বেতপত্রের দ্বারা ফিলিস্তিনে ইহুদিদের আগমন সীমিত করে। তবে এ ক্ষেত্রে ইহুদিবাদীগণ হতাশ হয়। বিরোধী দলের সদস্য মিসরের সমাজতান্ত্রিক আর্নেস্ট বেভিন ইহুদিবাদীদের অধিকার সংরক্ষণে তৎপর থাকেন, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের নতুন বৈদেশিক সচিব হিসাবে তিনি আরবদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ হন। তুরস্ক ও গ্রিসের ওপর সোভিয়েত রাশিয়ার প্রবল চাপের মুখে, পারস্য আজারবাইজানের পৃথকীকরণের আন্দোলন, কুর্দদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেট ব্রিটেন আরবদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের ঝুঁকি নিতে পারে না। ফলে বেভিন তাঁর পূর্বসূরির নীতিই চালিয়ে যান।

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান অবিলম্বে ফিলিস্তিনে ১০০,০০০ ইহুদি উদ্বাস্তু গ্রহণ করবার জন্য প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এট্‌লিকে আদেশ দেন। বিনিময়ে এট্‌লি ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে মার্কিনিদের অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান। যুক্তরাষ্ট্র এটি গ্রহণ করে এবং সমস্যাটি পর্যালোচনার জন্য একটি ইঙ্গ-মার্কিন কমিশন লন্ডন, জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ফিলিস্তিনে প্রেরণ করে। ইতোমধ্যে ইউরোপ, পশ্চিম জার্মানিতে ইহুদি বাস্তুত্যাগীদের দুরবস্থা চরম আকার ধারণ করে। ইহুদি বাস্তুত্যাগীদের দুরবস্থাকে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির মহাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য ইহুদিবাদীদের যথার্থভাবেই দায়ী করা হয়। পাঁচ বছর পর, প্রায় একইভাবে ইসরাইলের ওপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আরব বাস্তুত্যাগীদেরকে ব্যবহার করার জন্য আরব রাষ্ট্রবর্গকে দায়ী করা হয়।

ব্রিটিশ শ্রমিক সরকারের মনোভাবে ইহুদিবাদীকে হতাশ করলেও এটা ফিলিস্তিনের ইরগুন, স্টান ও অন্যান্য ইহুদি চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী সংস্থাসমূহের

www.pathagar.com

ক্রোধের উদ্রেক করে। সন্ত্রাসবাদীগণ অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করার জন্য এবং আধা-সরকারি ইহুদিবাদী শক্তি হ্যাগানাহ্ (Haganah)-এর সাথে তাদের কার্যাবলি যোগসূত্র রক্ষা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র হতে অর্থ লাভ করতে সমর্থ হয়, অপরদিকে ইহুদিবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে তাদের কার্যকলাপের নিন্দা করেন। যা হোক, ১৯৪৪ সাল হতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এ সকল গোপন ইহুদি দলসমূহের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ আরম্ভ হয়। তারা ব্রিটিশ পুলিশ ফাঁড়িসমূহে বোমাবর্ষণ করে এবং সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদেরকে হত্যা করে। ১৯৪৪ সালের নভেম্বরে চরমপন্থী দলের একজন সদস্য ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ময়েনকে (Lord Moyne) কায়রোতে হত্যা করে।

ইঙ্গ-মার্কিন কমিশন

ইঙ্গ-মার্কিন কমিশন একটি বিবদমান পরিবেশ ও সাধারণ নিরাপত্তাহীন অবস্থায় তার অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে যায়। ১৯৪৫ সালের শীতকালে, এমনকি হ্যাগানার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা দলও (পালমাখ) ব্রিটিশবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত হয়ে পড়ে। অক্টোবর মাসে তারা একটি শিবির আক্রমণ করে ২০০ উদ্বাস্তুকে মুক্ত করে। এ সকল উদ্বাস্তু দলকে ১৯৩৯ সালের শ্বেতপত্রের আইন ভঙ্গ করে অন্যায়ভাবে আনা হয়। ঐ মাসের শেষের দিকে তারা তিনটি ব্রিটিশ জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। ১৯৪৫ সালের অবশিষ্ট মাসগুলোতে ইরগুন ও স্টার্নের চরমপন্থী গোপন সংস্থাসমূহ রেল লাইন উপড়িয়ে ফেলে, তেল শোধনাগারসমূহ উড়িয়ে দেয়, অস্ত্রাগারসমূহে হানা দেয়, ব্যাংক লুট করে, সেতু ধ্বংস করে এবং ব্রিটিশ সৈন্যদেরকে হঠাৎ আক্রমণ করে। ব্রিটিশ প্রতিশোধ গ্রহণ করে, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করে উঠতে ব্যর্থ হয়, কারণ গোপন সংস্থাসমূহ ইহুদি জনসাধারণের সাহায্যপুষ্ট। ইরগুনের সাহসিকতামূলক কার্যাবলির মধ্যে প্রসিদ্ধ হল জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেলে অবস্থিত ব্রিটিশ সামরিক সদর দপ্তরে বোমা বর্ষণ, যাতে ৯০ জনের অধিক লোক নিহত হয়।

ইঙ্গ-মার্কিন কমিশন ১৯৪৬ সালের ৩০শে এপ্রিল এর রিপোর্ট পেশ করে। এর উপসংহার পূর্ববর্তী কমিশনসমূহের রিপোর্ট থেকে তেমন পার্থক্যমূলক কিছু নয়। এর সুপারিশ হল, ফিলিস্তিন কোনো ইহুদি বা আরব রাষ্ট্র হবে না। দেশভাগের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি করে রিপোর্টে বলা হয়, আরব ও ইহুদিদের অধিকারসমূহ সমভাবে রক্ষা করতে একটি দ্বিজাতিত্ব ও দ্বিভাষী রাষ্ট্র গঠনই

www.pathagar.com

সমস্যার সমাধান। স্বাধীনতা দান করার মতো সুপরিপক্ব অবস্থা এটা পায়নি। এ সুপারিশ করে যে, 'জাতিসংঘের অধীনে একটি জিম্মাদারি চুক্তি (Trusteeship Agreement) কার্যকরী হওয়া সাপেক্ষে ফিলিস্তিনকে বর্তমানের ন্যায় হুকুমনামার অধীনে রাখা হোক।' ইউরোপের ইহুদি উদ্বাস্তুদের দুরবস্থা নিরসনের জন্য কমিশন ১০০,০০০ ইহুদিকে ফিলিস্তিনে প্রবেশাধিকার দানের সুপারিশ করে। রিপোর্ট প্রকাশের দিন বিকালে তাঁর পছন্দমত শুধু একটি সুপারিশ উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান অনুরোধ করেন যে ১০০,০০০ ইহুদিকে বিলম্বে গ্রহণ করা হোক প্রধানমন্ত্রী এটলি অনুরোধটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, রিপোর্টটি 'সামগ্রিকভাবে এবং সমস্ত মর্মার্থ সহকারে বিবেচনা করতে হবে।'

এই সমস্যার সমাধান লাভের আশায় ব্রিটিশ ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে আরব ও ইহুদিবাদী প্রতিনিধিবর্গকে লন্ডনে একটি সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানায়। সম্মেলনে কোনো চুক্তির আশা পরিলক্ষিত হয়নি, তবে ব্যর্থতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করার উদ্দের্শ্যে বৈদেশিক সচিব বেভিন একটি মোক্ষম সুযোগ লাভ করেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৪৬ সাল হল যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের সাল এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রচারাভিযানের মধ্যে একটি হল নিউইয়র্কের গভর্নর পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নীরবতা অবলম্বনের জন্য একটি ব্রিটিশ অনুরোধ সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান নিউ ইয়র্কে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন এবং ১০০,০০০ ইহুদিকে অবিলম্বে ফিলিস্তিনে গ্রহণের দাবি জানান। পরদিন রিপাবলিকান গভর্নর পদপ্রার্থী থমাস দিউই (Thomas Dewey) আরেক ধাপ অগ্রসর হন এবং বলেন যে ১৫০,০০০-ই বাস্তব সংখ্যা। কয়েক দিন পর রিপাবলিকান সিনেটর রবার্ট ট্যাফট এই সংখ্যাকে ১৭৫,০০০-এ উন্নীত করেন।

ব্রিটিশ দোটানায় পড়ে যায়। আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাদের একমাত্র বন্ধু সম্ভবত ট্রান্সজর্ডানের আবদুল্লাহ। ১৯৪৬ সালের ১৭ই জানুয়ারি ব্রিটিশ হুকুমনামা বিলুপ্ত করে তাঁকে ব্রিটিশগণ 'জর্ডানের হাশেমী রাজত্ব' নামক সার্বভৌম রাষ্ট্রের বাদশাহর পদে উন্নীত করে। ইরগুন ও চরমপন্থী স্টার্ন দলসমূহ ফিলিস্তিনে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তদুপরি, ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে বেসেল-এ আহূত বিশ্ব ইহুদিবাদী কংগ্রেসে ব্রিটিশ সমর্থক চেইম ওয়াইজম্যান কংগ্রেসের সভাপতির পদ হারাবার উপক্রম হয়। রব্বি হিল্লাল সিলভারের নেতৃত্বে মার্কিন ইহুদিবাদীগণ ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ শাসনকে 'অবৈধ' বলে সমালোচনা করে এবং ওয়াইজম্যানকে একজন মন্থরকর্মী এবং সুযোগ-সুবিধার

www.pathagar.com

মাধ্যমে শান্তকারী ও এমনকি একজন 'বিদ্রোহী' বলে কটূক্তি করে। একটি ক্ষীণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ওয়াইজম্যান সভাপতি নির্বাচিত হন কিন্তু মার্কিন ইহুদিবাদীগণ নেতৃত্ব দখল করে এবং বেনগুর্কিয়ানের নেতৃত্বে ইহুদি এজেন্সির আরও চরমপন্থী সদস্যদের সাথে সহযোগিতা করে।

জাতিসংঘ কমিশন

এ ধরনের অবিশ্বাস, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হত্যাকাণ্ডের পরিবেশে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে অন্য কারও পক্ষে সম্ভব না হলেও ব্রিটিশগণ এই সমস্যা সমাধানে অক্ষম। প্রথম মহাযুদ্ধে কপটতা ও ওয়াদার বরখেলাপ শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ নীতিপ্রণয়নকারীদেরকে চেপে ধরে। ১৯৪৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি বৈদেশিক সচিব বেভিন ফিলিস্তিন সমস্যাটিকে জাতিসংঘে অর্পণ করার ব্রিটিশ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সেপ্টেম্বরে সাধারণ পরিষদ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট প্রদান করার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করে। ফিলিস্তিনের ওপর জাতিসংঘের বিশেষ কমিটি (The United Nations Special Committee on Palestine বা UNSCOP) গঠিত হয় ১১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ নিয়ে। এই রাষ্ট্রগুলো হল অস্ট্রিয়া, কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, গুয়াতেমালা, ভারত, ইরান, নেদারল্যান্ডস, পেরু, সুইডেন, উরুগুয়ে ও যুগোশ্লাভিয়া। কমিটি ফিলিস্তিনে অবস্থানকালে ইরগুন আক্রার বন্দিশালায় এক দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে অনেক ইহুদি বন্দি মুক্ত করে। সম্ভবত জাতিসংঘের বিশেষ কমিটির উপকারার্থে ইহুদিবাদীগণ প্রায় ৪৫০০ ইহুদি উদ্বাস্তু নিয়ে এক্সোডাস জাহাজের (SS Exodus) আগমনের সময়ও নির্ধারণ করে। ব্রিটিশ এটি অবরোধ করে এবং ফ্রান্সে পুনরায় ফেরত পাঠায়।

জাতিসংঘের বিশেষ কমিটি (UNSCOP) একটি সর্বসম্মত রিপোর্ট পেশ করতে ব্যর্থ হয়। ভারত, ইরান ও যুগোশ্লাভিয়া এই তিনটি দেশ একটি সংখ্যালঘু রিপোর্ট পেশ করে ও একটি সংযুক্ত ফিলিস্তিনের সুপারিশ করে। অবশিষ্ট দেশ ফিলিস্তিনকে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে বিভক্ত করার প্রস্তাব পেশ করে। ইহুদিবাদীগণ বিভক্তি পছন্দ করে, অপরদিকে আরবগণ উভয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে জাতিসংঘের রাজনৈতিক কমিটিকে বিভক্তির পরিকল্পনা বিবেচনা করতে হয়। এটা ফিলিস্তিনকে ছয়টি অংশে ভাগ করে, তিন ভাগ আরবদের জন্য ও তিন ভাগ ইহুদিদের জন্য। বিভক্তি প্রত্যেক দলের সন্নিবেশনের ভিত্তিতে

www.pathagar.com

করলেও প্রকৃতপক্ষে আরব রাষ্ট্রে পড়ে ১০০,০০০ ইহুদি (৯৬ শতাংশ) এবং ইহুদি রাষ্ট্রে পড়ে প্রায় ৫০০,০০০ আরব (৪৮ শতাংশ)। সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিনের ৫৬ শতাংশ এলাকা ছেড়ে দেয়া হয় এবং ৪৩ শতাংশ এলাকা দেয়া হয় আরবদেরকে। অবশিষ্ট ১ শতাংশ এলাকা, জেরুজালেম ও বেথেলহাম, আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

দশ বছরের জন্য একটি অর্থনৈতিক ঐক্য পরিকল্পনার শর্ত প্রদান করে বিভক্তির উদ্যোক্তাগণ আরেকটি সারল্যের প্রমাণ দেয়। এই অর্থনৈতিক ঐক্য অনুসারে ইহুদি রাষ্ট্র আরব রাষ্ট্রকে সহায়তা করতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু পরে তুমুল বিতর্কের মুখে বিভক্তির প্রধান যৌক্তিকতা সেই অর্থনৈতিক ঐক্যই চাপা পড়ে যায়। জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের সুপারিশের জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট বিভক্তি নীতির জন্য পাওয়া যাবে—এরূপ কোনো নিশ্চয়তা নেই। কোনো কোনো দেশ এর বিরোধিতা করে, বিশেষত ফিলিপাইন। এর প্রতিনিধি জেনারেল কারল্‌স রোমিউলো (Carls Romulo) এর বিরুদ্ধে তুখোড় বক্তৃতা দেন। চূড়ান্ত ভোটের তারিখ নির্ধারিত হয় ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৭ সালে। কিন্তু এর বিলম্ব করা হয়, অংশত এই জন্য যে ২৭শে নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ধন্যবাদের দিন (Thanks giving day)। এ সময়ে মার্কিন কর্মকর্তাগণ যারা বিরুদ্ধে ভোট দেবে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন বলে জানা যায়। একের পর এক অনিচ্ছুক দেশগুলোকে লাইনে আনা হয়, শেষ পর্যন্ত এমনকি ফিলিপাইনের প্রতিনিধিও ভোট পরিবর্তনের আদেশ লাভ করেন। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের মধ্যে তিনজনই এই পরিকল্পনার স্বপক্ষে থাকায় ইহুদিবাদীদের সুবিধা হয়। অপর দুই সদস্য গ্রেট বৃটেন ও চীন ভোট দানে বিরত থাকে।

২৯শে নভেম্বর পরিষদের বৈঠক বসলে এটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে বিভক্তির পরিকল্পনা পাস হবে। অতঃপর আরব প্রতিনিধিবর্গ সংখ্যালঘু রিপোর্ট বিবেচনার প্রস্তাব করে, অবশ্য ইতোপূর্বে তারা এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছিল। আরবদের এই ধরনের অভ্যাস অনেক বছর ধরে চলতে থাকে। কোনো একটি প্রস্তাব বা আয়োজন তারা প্রবলভাবে বাধা দেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা গ্রহণের আশা ফুরিয়ে গেলে তারা আবার একে সমর্থন করে। বিভক্তিকরণের পরিকল্পনা ৩৩ ও ১৩ ভোটে গ্রহণ করা হয়, ১১ জন সদস্য ভোটদানে বিরত থাকে। গ্রেট ব্রিটেন ঘোষণা করে যে ১৯৪৮ সালের ১৫ই মে সে হুকুমনামা বিলুপ্ত করবে এবং ১লা আগস্টের পূর্বে ফিলিস্তিন ত্যাগ করবে।

www.pathagar.com

ফিলিস্তিনে গৃহযুদ্ধ

জাতিসংঘের ভোটের অব্যবহিত পরেই ফিলিস্তিনি আরব ও ইহুদিবাদীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ব্রিটিশ সৈন্যগণ এতে হস্তক্ষেপ করেনি। তারা নিজেদের সুশৃঙ্খলভাবে অপসারণ ও অতি দ্রুত শক্তিশালী ঘাঁটিসমূহ ত্যাগ করার ব্যাপারেই প্রধানত ব্যস্ত থাকে। আরবগণ প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রসমূহ হতে অস্ত্র লাভ করে এবং ইহুদিবাদিগণ অস্ত্র ক্রয় করে যুক্তরাষ্ট্র ও চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে। হাগানাহ, ইরগুন ও স্টার্নদলসমূহ আরও অস্ত্রের জন্য ব্রিটিশ অস্ত্রাগারসমূহে হানা দিতে থাকে। অনুমান করা হয় যে আরবদের সৈন্য সংখ্যা হল প্রায় ৫০০০ যারা অনভিজ্ঞ এবং বহুদূরে অবস্থানরত জেরুজালেমের প্রাক্তন মুফতি দ্বারা পরিচালিত যিনি তখন কায়রোতে নির্বাসিত। অপরদিকে ইহুদিবাদিগণ আরও উত্তম অস্ত্রে সজ্জিত এবং উত্তম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাদের অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।

উভয়পক্ষই সন্ত্রাসমূলক কাজ করে। ইহুদিগণ ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে জেরুজালেমে অবস্থিত আরব মালিকানাধীন সেমিরাসিম হোটেল বোমার আঘাতে উড়িয়ে দেয় এবং আরবগণ ইহুদি মালিকানাধীন জেরুজালেম পোস্টভবন তোপের আঘাতে উড়িয়ে দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ফেব্রুয়ারিতে রামলার জনবহুল বাজারে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। দু'দিন পর তেলআবিবের জনসমাগম কেন্দ্রে একটি বোমা বিস্ফোরণ করে প্রতিশোধ নেয়া হয়। অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ঘটনা হল দিয়ার ইয়াসির নামক আরব গ্রামে হত্যাকাণ্ড। ২৯শে এপ্রিল হাগানাহ এই গ্রামটি দখল করে এবং ইরগুন-স্টার্ন দলের হাতে এর পাহারা দেবার ব্যবসা ছেড়ে দেয়। কিন্তু ইরগুন-স্টার্নদলসমূহ ২৫৪ জন আরব পুরুষ, মহিলা ও ছেলেমেয়েকে হত্যা করে। এর কয়েকদিন পর আরবগণ জেরুজালেমের হাদ্দাসাহ্ হাসপাতালের দিকে গমনরত একটি ইহুদি গাড়ির বহর হঠাৎ আক্রমণ করে প্রায় ৮০ জন ডাক্তার, নার্স ও ছাত্রদলকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আরব ও ইহুদি উভয়পক্ষের বেসামরিক লোকদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়, কিন্তু হাগানাহর অনুমতি ছাড়া কোনো ইহুদি তাদের ঘর ত্যাগ করতে পারত না, অথচ আরবদের অনুরূপ কোনো রক্ষামূলক ব্যবস্থা ছিল না। ১৫ই মে হুকুমনামা বিলুপ্তির সময় পর্যন্ত প্রায় ১৫০,০০০ আরব উদ্বাস্তু যুদ্ধক্ষেত্র ও রক্তারক্তির স্থান হতে পলায়ন করে।

এ সকল রক্তপাত চলাকালীন হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানে দুটি অত্যন্ত অসঙ্গত কাজ চলতে থাকে। নিউইয়র্কের জাতিসংঘের হলঘরে যুক্তরাষ্ট্রের মত

পরিবর্তিত হয় বলে মনে হয়। এটা প্রস্তাব করে যে বিভক্তির পরিকল্পনা কার্যকর করতে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় জাতিসংঘ কর্তৃক ফিলিস্তিনের জিম্মাদারি নেয়া উচিত। ১৬ই এপ্রিল ও ১৫ই মে'র মধ্যে ইহুদিবাদী ও তাদের সমর্থকদের কঠোর সমালোচনার মুখে এই প্রস্তাব বিবেচনার জন্য সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন বসে। একদিকে জাতিসংঘে প্রতিনিধিবর্গ বিভক্তি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন, অপরদিকে বেনগুরিয়ান এবং ফিলিস্তিনের ইহুদি রাষ্ট্রের ন্যাশনাল কাউন্সিল ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে তেলআবিবে মিলিত হয় ও ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান নতুন রাষ্ট্রের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করেন, অথচ তাঁর দেশের প্রতিনিধিবর্গ তখনও জাতিসংঘে জিম্মাদারির ওপর বিতর্কে লিপ্ত। ড. চেইম ওয়াইজম্যানকে নতুন প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং ডেভিড বেনগুরিয়ানকে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মনোনীত করা হয়।

আরব-ইসরাইল যুদ্ধ

১৫ই মে প্রভাতে ছয়টি আরব রাষ্ট্র (মিসর, ইরাক, জর্ডান, লেবানন, সৌদি আরব ও সিরিয়া) ইসরাইল আক্রমণ করে। ৬৫০,০০০ লোক অধ্যুষিত একটি জাতি ৪,০০০০,০০০ লোকের সম্মিলিত আরব রাষ্ট্রকে পরাজিত করলে ব্যাপারটিকে অলৌকিক বলেই মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত সৈন্য সংখ্যা বিবেচনা করলে ব্যাপারটিক ভিন্নরূপ মনে হবে। ছয়টি সম্মিলিত আরব রাষ্ট্রের সৈন্য সংখ্যা ৭০,০০০ এর অধিক হয়নি। এদের মধ্যে মাত্র ১০,০০০ সৈন্য সঠিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং তন্মধ্যে ৬০০০ হল জর্ডানের আরব বাহিনীর লোক। আরব বাহিনীর মোকাবিলায় ইসরাইলের পক্ষে দেখা যায় কমপক্ষে হাগানাহ্র ৬০,০০০ যোদ্ধাদল। এই সেনাবাহিনীতে থাকে ব্রিটিশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩০০ অফিসার, প্রায় ২০,০০০ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদল এবং ৩০০ বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা বাহিনী (পালমাখ্)। ইরগুন ও স্টার্ন দলসমূহের কর্মক্ষম যোদ্ধার সংখ্যা এক হাজারের অধিক নয়। তদুপরি ইসরাইলিদের সাহসিকতা ও তৎপরতা অবহেলা করবার মতো নয়। তাদের মনোবল অতি উঁচু, কারণ তারা যুদ্ধ করে টিকে থাকবার তাগিদে। অপরদিকে আরবদের একনিষ্ঠ কোনো লক্ষ্যও নেই, সেনাপতিও নেই। অধিকাংশ আরব সৈন্য কেন যুদ্ধ করছে তাও জানে না এবং তাদের নেতৃবৃন্দও কোনো না কোনো জাতীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই যুদ্ধে লিপ্ত।

www.pathagar.com

প্রারম্ভে উভয় বাহিনীর সাজসরঞ্জাম ছিল অপ্রতুল, কিন্তু আমেরিকা ও ইউরোপের ইহুদিবাদিগণ ইসরাইলের প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরবরাহ করে এবং ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার ইহুদি স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদের বিমান চালনা করে। এতদসত্ত্বেও প্রথমদিকে আরবগণ বেশ সফলতা অর্জন করে, মিসরীয়গণ নেগেভ অধিকার করে, জর্ডান পুরাতন জেরুজালেম নিয়ন্ত্রণ করে এবং ইরাকি সৈন্যগণ হাইফার ১৫ মাইলের মধ্যে পৌঁছে। ১১ই জুন জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত প্রথম শান্তি চুক্তির সময় দেখা যায় যে বিবদমান পক্ষগুলো মোটামুটি জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত ভূখণ্ডই আঁকড়ে রয়েছে। যুদ্ধ বিরতির শর্ত হল বিবদমান পক্ষদ্বয় যেখানে আছে সেখানেই থাকবে এবং নতুন কোনো সৈন্য বা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা নিজদেরকে শক্তিশালী করবে না। উভয়পক্ষই চুক্তির দ্বিতীয়াংশ ভঙ্গ করে। আরবগণ অবশ্য অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার দরুন সমগ্র এলাকা পরিবৃত করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু ইসরাইলিগণ চেকোশ্লোভাকিয়া হতে বিপুল পরিমাণ প্রথম শ্রেণির অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করতে সক্ষম হয়। যুক্তরাষ্ট্র হতে উড়ন্ত দুর্গরাজি এবং ব্রিটেন হতে ব্যু-ফাইটার জঙ্গি বিমান ইসরাইলে পাচার করা হয়।

সুইডেনের কাউন্ট ফোক বার্নাডটকে জাতিসংঘের তরফ হতে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে প্রেরণ করা হয়। ফিলিস্তিন ও জর্ডান উভয় দেশের অর্থনৈতিক ঐক্য ও একটি স্বায়ত্তশাসিত ইহুদি রাষ্ট্রের ভিত্তিতে সন্ধি স্থাপনের জন্য তিনি তাঁর নিজস্ব প্রস্তাবাবলি পেশ করেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী জেরুজালেম ও নেগেভ পড়ে আরবদের ভাগে এবং সমগ্র গ্যালিলি পড়ে ইসরাইলের ভাগে। আরব ও ইসরাইল উভয়পক্ষ এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে এবং পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পরবর্তী দশদিনের যুদ্ধে ইসরাইলিগণ বেশ এলাকা দখল করে। ১৯শে জুলাই জাতিসংঘ দ্বিতীয় শান্তি চুক্তি আরোপ করে। আরব বাহিনী পুরাতন জেরুজালেম এবং ইসরাইলিগণ নতুন জেরুজালেম দখল করে। কাউন্ট-বার্নাডট তবুও এই সমস্যার একটি সমাধান লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান, কিন্তু ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর স্টার্ন দলের এক গুলির আঘাতে তিনি নিহত হন।

দ্বিতীয় সন্ধি অনেকটা প্রথম সন্ধির ন্যায়। ইসরাইলিগণ নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করে এবং সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে নেগেভ ও গ্যালিলি অঞ্চলে দুটি আক্রমণ পরিচালনা করে। ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বিমানবাহিনী নিয়ে ইসরাইলি সোনাবাহিনী মিসরীয়দেরকে নেগেভ হতে এবং 'আরব মুক্তিবাহিনীকে' উত্তর গ্যালিলি হতে হটিয়ে দেয়। ইতোমধ্যে ফিলিস্তিন

www.pathagar.com

বিষয় নিয়ে জাতিসংঘে বিতর্ক চলে। জাতিসংঘ সচিবালয়ের রাল্‌ফ্ বাঞ্চকে ভারপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারী হিসাবে মনোনীত করা হয়। রড্‌স দ্বীপে তাঁর সদর দফতরে তিনি আরব ও ইসরাইল প্রতিনিধিবর্গকে বিভিন্ন কক্ষে একত্রিত করেন (আরবগণ ইসরাইলিদের সাথে একই কক্ষে বসতে অস্বীকার করে) এবং উভয় কক্ষে বারংবার আসা-যাওয়া করে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি ইসরাইল ও মিসরের মধ্যে প্রথম সন্ধি স্থাপন করতে সক্ষম হন। পরে অন্যান্যদের সঙ্গেও সন্ধি হয়। লেবাননের সাথে ২৩শে মার্চ, জর্ডানের সাথে ৩রা এপ্রিল এবং সিরিয়ার সাথে ২০শে জুলাই একটি সন্ধি স্থাপিত হয় এবং রাল্‌ফ্ বাঞ্চ তাঁর প্রচেষ্টার জন্য শান্তির নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, যদিও কোনো শান্তি তথায় প্রতিষ্ঠা হয়নি।

তিনটি জটিল সমস্যা অমীমাংসিত থেকে যায়। প্রথমটি হল সীমান্ত প্রশ্ন। প্রত্যেক সন্ধি চুক্তিতে মিসর-ইসরাইল সন্ধির পাঁচ নম্বর ধারার ন্যায় একটি বাক্য সংযোজন করা হয়; তাতে বলা হয়, 'সন্ধির সীমান্ত রেখাকে কিছুতেই রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক সীমান্ত হিসাবে ব্যাখ্যা করা হবে না এবং ফিলিস্তিন সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসাকালে এই সন্ধি মোতাবেক উভয়পক্ষের কোনো অধিকার, দাবি ও অবস্থান বিবেচনা না করে সীমান্ত নির্ধারিত হবে।' ইসরাইলকে তার মূল সীমারেখায় ফিরে যাবার জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক পীড়াপীড়ি না করার অর্থ এই যে সম্ভবত জাতিসংঘে অনেক দায়িত্বপূর্ণ কর্মকর্তা এটা চান না। ইসরাইলিগণ তাদের নতুন সীমান্তে যেরূপ দ্রুতগতিতে ইহুদিদের 'বসতি' স্থাপন করে তাতে প্রমাণ করে যে কখনও একটি 'চূড়ান্ত মীমাংসার' আয়োজন করা হলেও তারা ঐ অবস্থান হতে ফিরে যাবার ইচ্ছা পোষণ করে না। 'অস্থায়ী' সীমান্তের অতি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বিবদমান সৈন্যদের অবস্থান। অসামরিক অঞ্চল সৃষ্টি করা হয় ভবিষ্যতের যুদ্ধ এড়াবার জন্য। ফলে গাজা অঞ্চলটি দেয়া হয় মিসরকে, লেবাননের সীমান্তের যুক্তিসম্মত কোনো পরিবর্তন সাধন করা হয়নি এবং হুলাহ্ হ্রদের জলাভূমি ব্যতীত, তাহাও অসামরিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র গ্যালিলি সাগর ও জর্ডান নদীর উপরিভাগ ইসরাইলের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। জর্দানের বাদশাহ আবদুল্লাহর সেনাবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর তাঁর হাতে দেয়া হয়। এতে পুরাতন জেরুজালেম অন্তর্ভুক্ত। কায়রোতে অবস্থানরত প্রাক্তন মুফ্‌তি হজ্ব আমিন আল হুসাইনী বাদশাহ আবদুল্লাহ কর্তৃক ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড অধিকার স্বীকার করেননি, কিন্তু বিরোধিতা কার্যকরী করার মতো কোনো ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এভাবে

www.pathagar.com

'অস্থায়ী' সীমান্ত মীমাংসায় ইসরাইলকে বিভক্তি পরিকল্পনার চাইতে ২০ শতাংশ অধিক ফিলিস্তিন ভূখণ্ড ছেড়ে দেয়া হয়।

জেরুজালেম

দ্বিতীয় অমীমাংসিত সমস্যা হল পুরাতন ও নতুন জেরুজালেম প্রশ্ন। নিকটস্থ বেথেলহেমসহ এই নগরীকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রস্তাব করে। যুদ্ধের ফলে এই নগরের অবস্থা আন্তর্জাতিক নগরী হতে কাঁটাতার ঘেরা একটি বিভক্ত নগরীর রূপ ধারণ করে। জর্ডানিগণ পুরাতন জেরুজালেম ও বেথেলহেম নিয়ন্ত্রণ করে, যেখানে খ্রিস্টান, ইসলাম ও ইহুদি ধর্মের অধিকাংশ পবিত্র দরগাহসমূহ বিদ্যমান। ইসরাইলিগণ নতুন জেরুজালেমের বৃহদাংশ অধিকার করে। জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক জেরুজালেমের নীতি ত্যাগ না করলেও শান্তি প্রতিষ্ঠাকারিগণ সন্ধির চুক্তিতে যে সীমান্ত রেখা চিহ্নিত করেন তাতে জেরুজালেমকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে ইসরাইল ও জর্ডান কর্তৃক অধিকৃত এলাকা পৃথক ভূখণ্ডে পরিণত হয় এবং জেরুজালেম একটি বিভক্ত নগরী হিসাবে থেকে যায়।

জেরুজালেমের আন্তর্জাতিকতার বিষয়টি জাতিসংঘের আলোচ্য বিষয়ে থেকে যায় এবং ইসরাইলের অস্তিত্বের প্রথম ২০ বছরের প্রত্যেক বছর প্রতিনিধিবর্গ জেরুজালেমের মর্যাদা নিয়ে প্রস্তাব পাস করেন, কিন্তু ইসরাইল বা জর্ডান কেহই এগুলির প্রতি কর্ণপাত করে না। ১৯৪৯ সালে ইসরাইল জেরুজালেমকে এর রাজধানী বলে ঘোষণা করে এবং নেসেট (Knesset) বা পার্লামেন্টসহ অনেক মন্ত্রিসভা তথায় নিয়ে যায়। অবশ্য ইসরাইলে নিযুক্ত কূটনীতিবিদগণ এটা স্বীকার করেন না এবং তাঁদের দূতাবাস তেলআবিবেই রাখেন। অধিকন্তু ইসরাইল এটাও ভুলে যায় যে জেরুজালেমকে অসামরিকী করার কথা, অথচ তবুও সে তার বাৎসরিক স্মরণযোগ্য সামরিক কুচকাওয়াজ এই নগরেই সম্পন্ন করে। ১৯৬৭ সালের জুন মাসের 'ছয় দিনের যুদ্ধে' ইসরাইল পুরাতন জেরুজালেম অধিকার করলে এই নগরীর আন্তর্জাতিকীকরণের সম্ভাবনা চিরতরে তিরোহিত হয়ে যায়।

আরব উদ্বাস্তু দল

ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরিত যুদ্ধ বিরতি চুক্তির পর উত্থিত তৃতীয় ও অত্যন্ত বিরক্তিকর সমস্যা হল আরব উদ্বাস্তুদের ভাগ্য। ১৯৪৯ সালের

www.pathagar.com

প্রথমদিকে যুদ্ধ শেষ হলে দেখা যায় প্রায় ৭৫০,০০০ আরব উদ্বাস্তু মিসর (গাজা অঞ্চল), জর্ডান, লেবানন ও সিরিয়ায় ইতস্তত ছড়ানো। উদ্বাস্তুদের সংখ্যা এত অধিক হবার কারণ নিয়ে পরস্পর বিরোধী মতামত পেশ করা হয়। ইসরাইল ও তার সমর্থকগণ সাধারণত দাবি করে যে আরব রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক বেতারের মাধ্যমে আরবদেরকে তাদের ঘরবাড়ি ত্যাগ করে আক্রমণকারী বাহিনীতে যোগদান করে ইসরাইলকে পরাজিত করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়। এতে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না যে তারা তাদের দারাপুত্র পরিবারও কেন সঙ্গে নিয়ে যায়। উত্তরে শুধু এতটুকু বলা হয় যে তারা তাদের শত্রুদের মধ্যে পরিবারবর্গকে রেখে যেতে চায়নি। আরব লেখকবর্গ দাবি করেন যে, ইসরাইলে সদ্যাগত ইহুদি উদ্বাস্তুদের জন্য জায়গা করার উদ্দেশ্যে ইসরাইলি সৈন্যগণ আরব নারী-পুরুষ ও শিশুদেরকে বেয়নেটের মুখে 'বিতাড়িত' করে। ফিলিস্তিনে নিযুক্ত ইউরোপীয় দেশসমূহের বেতার বার্তা সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা হলে ইসরাইলের দাবির সত্যতা প্রমাণিত না হলেও এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে অনেক আরব তাদের বেতারে অতি আশাব্যঞ্জক 'আরব বিজয়ের' খবর শুনে মনে করে যে তাদের বরং দেশ ত্যাগ করে বিজয়ীদের দেশে ফেরাই উত্তম কাজ। অপরদিকে এটাও প্রমাণিত হয় যে হাইফা ও অন্যান্য বড় বড় শহরে ইহুদি মাইকের দ্বারা আরবদেরকে দেশত্যাগে উৎসাহ প্রদান করা হয়, কোনো কোনো গ্রামে ইসরাইলি সৈন্যগণ আরবদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে এবং কোথাও কোথাও আরবদেরকে বহিষ্কারও করা হয়। এতদসত্ত্বেও, অধিকাংশ আরব অসংখ্য যুদ্ধ কবলিত লোকদের ন্যায় জীবনের ভয়ে যুদ্ধ হতে পালাতে চায় এবং গোলাগুলি শেষ হলে পুনরায় ফিরে আসার আশা পোষণ করে। অবশ্য যুদ্ধ শেষে ইসরাইলি বাহিনী তাদেরকে আর ফিরে আসতে দেয়নি। ইউরোপ হতে আগত লক্ষ লক্ষ ইহুদি তাদের ঘরবাড়ি দখল করে এবং বিজয়ীগণ তাদের ক্ষেত খামারের ফসল ঘরে তোলে।

বস্তুত প্রত্যেক বছর জাতিসংঘ আরব উদ্বাস্তুদের তাদের ঘরবাড়িতে ফিরবার অধিকারের আদর্শ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে, কিন্তু ইসরাইল আরব উদ্বাস্তুদেরকে প্রবল গৃহশত্রু বলে বিবেচনা করে এবং তাদেরকে ফিরতে দেয় না। এইদিকে আরব দেশসমূহ একটি প্রাঞ্জল শান্তি চুক্তি সম্পাদন না করলে তাদের ঘরবাড়ি ও ক্ষেতখামারের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতেও ইসরাইল নারাজ। অধিকাংশ উদ্বাস্তু শিবিরে বাস করে এবং জাতিসংঘ রিলিফ ও ওয়ার্ক এজেন্সি (United Nations Relief and Work Agency or UNRWA), ফ্রেন্ডস সার্ভিস কমিটি,

www.pathagar.com

ওয়ার্ল্ড চার্চ সার্ভিস ও অন্যান্য জনহিতকর সংগঠন দ্বারা তাদের ভরণপোষণ চলে। মিসর অধিকাংশ উদ্বাস্তুকে গাজা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখে এবং তাদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে নিরুৎসাহ প্রদান করে। সিরিয়া, লেবাননে উদ্বাস্তু দল বিদেশির ন্যায় বাস করে, কিন্তু তাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকজন চাকরির সংস্থান করে এবং নাগরিকত্বও লাভ করে। বহু সংখ্যক শিক্ষিত উদ্বাস্তু শিক্ষক হিসাবে কুয়েত ও সৌদি আরব গমন করে। ফিলিস্তিন নামের এক ফালি ভূখণ্ড দখলকারী একমাত্র জর্ডানই উদ্বাস্তুদেরকে পরিপূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা দান করে। তা সত্ত্বেও, যারা শিবিরে বাস করে তারা নিরুদ্দিষ্ট জীবন যাপন করে এবং বছরের পর বছর এইভাবে বাস করে তারা ফারটাইল ক্রিসেন্টের সাধারণ এলাকার দুঃখপূর্ণ একটি অংশ হিসাবে বিরাজ করে।

একটি ইহুদিবাদী রাষ্ট্র

বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে ইসরাইল সম্ভবত অদ্বিতীয়, এই জন্য যে একে ইচ্ছাকৃতভাবেই একটি আশ্রয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। একদিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং এ ধরনের যে সকল দেশ উদ্বাস্তুদের নিয়ে সমস্যায় পড়েছে তারা ইহুদিদের আশ্রয়ের স্থান হিসাবে এই রাষ্ট্রকে বিবেচনা করে। কিন্তু ইসরাইলের অদ্বিতীয় হবার কারণ হল একটি বিশেষ শ্রেণির লোকদের আশ্রয়স্থল, অর্থাৎ ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য পরিশ্রম করে। তাই ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে পৃথিবীর সমস্ত ইহুদিদের 'একত্রীকরণের' জন্য ইসরাইল প্রস্তুত থাকবে। ইসরাইল এই রাষ্ট্রে অ-ইহুদিদের প্রবেশ কখনও অস্বীকার করে নি কিন্তু এর 'ইহুদিপনার' ওপর এমন জোর দেয়া হয় যে অ-ইহুদিগণ সর্বদা নিজদেরকে জলবহির্ভূত মৎস্যের ন্যায় মনে করে। ইহুদিবাদিগণ ইহুদিদেরকে শুধু আমন্ত্রণই জ্ঞাপন করে নাই, বরং তারা এদেরকে আনয়নে সাহায্যও করে। নতুন রাষ্ট্রে তাদেরকে স্থান করে দেয় এবং কর্মসংস্থানও করে দেয়। বিশ্বের যে কোনো অংশের ইহুদি ইসরাইলে যেতে পারে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পূরণ করার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকত্ব লাভ করে। অ-ইহুদিগণ এরূপ পারে না।

ফলে ইসরাইলে একটি বিতর্কের বিষয়, পূর্বেও ছিল এবং এখনও বিদ্যমান। তা হল "ইহুদি কে?" মোটামুটিভাবে অন্তত আইনগতভাবে ইসরাইলিগণ একমত যে একজন ইহুদি হবার জন্য আস্থা, বিশ্বাস বা আদর্শের কোনো প্রয়োজন নেই। ইসরাইলে খোদা ও তৌরাতে খাঁটি বিশ্বাসী অনেক লোক

www.pathagar.com

বিদ্যমান, আবার অনেক অজ্ঞেয়বাদী ও আদর্শহীন লোকও বিদ্যমান, কিন্তু সকলেই ইহুদি। একজন ইহুদি হবার অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল (সম্ভবত একমাত্র শর্ত) জন্ম। ইসরাইলের বিচারালয়ের রায় হল যার মাতা "ইহুদি বংশের" তাকেই ইহুদি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। "ইহুদিপনার" ওপর এরূপ জোর দেয়াটা ইহুদিবাদের দাবি ও কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু একটি আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এটি অসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হয়। যে ধর্মেরই হোক, ইসরাইলে আগত কোনো উদ্বাস্তু সে যে ইহুদি বংশোদ্ভূত এ কথা প্রমাণ করতে না পারলে তাকে ইহুদি বলে বিচেনা করা হয় না এবং তাই সে কোনো সুবিধাদি ভোগ করতে পারে না ও "একত্রীকরণের" প্রয়োজনীয় আইনের আওতায় পড়ে না। সমালোচকের দৃষ্টিতে এরূপ একটি রাষ্ট্র বর্ণগত, একান্ত ও আত্মকেন্দ্রিক।

প্রধানমন্ত্রী বেনগুরিয়ান ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পঞ্চবিংশতি ইহুদিবাদী সম্মেলনে পৌরাণিক ইহুদিবাদী আদর্শ ব্যক্ত করেন। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইহুদি "তাহার সমগ্র পার্থিব ও রাজনৈতিক জীবনে সে একটি অ-ইহুদি আধিপত্যের দাস;" একমাত্র ইসরাইলে "–যে মাটিতে আমরা বিচরণ করি যে বৃক্ষের ফল আমরা ভক্ষণ করি ... যে স্কুলে আমাদের ছেলেমেয়ে শিক্ষা পায়—যে দেশের দৃশ্য আমরা অবলোকন করি এবং যে বৃক্ষতরুরাজি দ্বারা আমরা পরিবৃত এর সকলগুলোই ইহুদি।" রাষ্ট্র এরূপ সর্বাঙ্গীণ ইহুদিপনায়– এমনকি প্রচলিত গণতন্ত্রের মধ্যেও কোনো অ-ইহুদি পরিচিত পরিবেশ অনুভব করতে পারে কিনা সন্দেহ। ইসরাইলে একটি "অ-ইহুদিবিরোধী" মনোভাব সর্বত্র পরিস্ফুট, যা অন্যান্য দেশে অনেকটা ইহুদিবিরোধী মনোভাবের সমতুল্য।

ইসরাইলি সরকার

ইসরাইলের নাগরিকদের মধ্যে যে গণতন্ত্র বা স্বাধীনতা নেই তা নয়। বরং বেশ সভ্যতার সাথেই বলা হয় যে ইসরাইলি সমাজ "বিশ্বের অত্যন্ত আইনানুগ সমাজগুলোর অন্যতম।" ইসরাইল সরকার গণতান্ত্রিক আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাথমিক ইহুদি উদ্বাস্তুগণ পূর্ব ইউরোপের রাজনৈতিক বিভিন্নতা সঙ্গে নিয়ে আসে এবং এগুলোকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সাথে সংমিশ্রিত করে। ১৯৪৯ সালের প্রথম নির্বাচনে নেসেটের (পার্লামেন্ট) ১২০টি আসনের জন্য ২১টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। জনগণ কোনো একটি দলকে ভোট প্রদান করে, ব্যক্তিবিশেষকে নয়। দলগুলো নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে নেসেটে

www.pathagar.com

প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ১৯৪৯ সালে ২১টি দলের মধ্যে মাত্র নয়টি দল নেসেটে অন্তত একটি আসন লাভ করার মতো ভোট পায় (৫ শতাংশ)। উল্লেখযোগ্য দলগুলোর মধ্যে থাকে মাপাই, ম্যাপাম, জেনারেল জিওনিস্ট, হিরুত ও মিজরাখী।

মাপাই বা ইসরাইল শ্রমিক দল দেশের অত্যন্ত প্রভাবশালী দল এবং ১৯৪৮ সাল হতে এ দল প্রধানমন্ত্রীর পদ নিয়ন্ত্রণ করে। এটি মার্কসীয় সমাজবাদী আদর্শ সংবলিত শ্রমিক দল। এর কোনো কোনো নেতা, যথা বেনগুরিয়ানের মতো ব্যক্তি, হুকুমনামার সময় ইহুদি এজেন্সির (Jewish Agency) সদস্য থাকেন। সম্ভবত বিরাট শ্রম ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, হিস্তাদ্রোত (Histadrut)-এর ওপর এর আধিপত্যের দ্বারা ভোটারদের মধ্যে এর ক্ষমতা বোঝা যায়।

মাপাইর পরে আরো বামপন্থী সম্মিলিত শ্রমিক দল বা ম্যাপাম। এটা মার্কসীয় আদর্শ-সংবলিত এবং ইহুদিবাদকে এটি সমাজবাদের পদানত মনে করে। এটি একটি দ্বি-জাতিত্বমূলক (আরব-ইহুদি) রাষ্ট্র দাবি করে। এটি বিল্টমোর কর্মসূচি বিরোধী ছিল। এ দল নীতিগতভাবে গ্রামীণ, যৌথ ব্যবস্থাবাদী, পুঁজিবাদ বিরোধী ও নিরপেক্ষবাদী।

উপরোল্লিখিত দলসমূহের মধ্যে ডানপন্থী দল হল লিবারেল পার্টি, যা বিভিন্ন শ্রেণির একটি সংমিশ্রণ। তারা ইহুদিবাদ ব্যতীত অন্য কোন মতবাদ স্বীকার করে না এবং সময় সময় এদেরকে জেনারেল জিওনিস্ট বা সাধারণ ইহুদিবাদীও বলা হয়। শহুরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ দলের সমর্থক বেশি এবং ব্যক্তি মালিকানায় ব্যবসা-বাণিজ্যে এটি আস্থাশীল। প্রজাতন্ত্রের প্রথমদিকে এটা ছিল ইসরাইলের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে এটা হিরাত দলের দিকে ঝুঁকে যায়। হিরাত পার্টি জেনারেল জিওনিস্টদের ডানপন্থী শাখা। হিরাত দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে রয়েছে ইরগুন গ্রুপের কিছু কিছু নেতা। এটা রিভিশনিস্টদের উত্তরাধিকারী, যারা ১৯২৩ সালে ফিলিস্তিন হতে ট্রান্সজর্ডানের পৃথকীকরণের বিরোধিতা করে। এ দল অন্ধ দেশহিতৈষী এবং আরব রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে এটা ইসরাইলের রাজ্য বিস্তারমূলক ও প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের পক্ষপাতী।

ধর্মীয় দলগুলো... মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল মিজরাখী ও মিজরাখী ওয়ার্কা...। তাদের আদর্শ হল ইহুদিবাদ (Zionism) ইহুদি ধর্মের মধ্যে নিহিত এবং তাই ইহুদি ধর্মকে ইহুদি জাতীয়তাবাদ হতে পৃথক করা যায় না। তারা ধর্মীয় শিক্ষা ও রীতিনীতির কঠোর উদ্যোক্তা। নেসেটে কোনো দল যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ

www.pathagar.com

করতে পারে না তাই কোয়ালিশন সরকারের প্রয়োজন হয়। সম্ভবত যেহেতু ধর্মীয় দলসমূহ অন্যান্য দলসমূহের অর্থনৈতিক আদর্শের ওপর কোনো প্রশ্ন তোলে না তাই সাধারণত ইসরাইলের প্রত্যেকটি কোয়ালিশন সরকারে তাদের সদস্যও থাকে। ধর্মীয় দলসমূহের সহযোগিতা লাভ করার জন্য ম্যাপাই দল তাদের বিভিন্ন দাবি সমর্থন করে, যা– ধর্মীয় শিক্ষা, আহার ও সাব্বাথের আইন পালন, বিবাহ ও তালাক নিয়ন্ত্রণ এবং শূকর পালবার ওপর নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি।

সামাজিক অখণ্ডতা

ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা প্রতিষ্ঠিত তার দরুন এটা কতকগুলো বিশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার আবর্তে নিমজ্জিত। ১৯৪৮ সালে ইসরাইলের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৬,৫০,০০০। এটা প্রতিষ্ঠিত হবার প্রথম ১৮ মাসের মধ্যে লোকসংখ্যা ৩,০০,০০০ লক্ষেরও বেশি বেড়ে যায়। প্রায় সমস্ত উদ্বাস্তু যেহেতু কোনো অর্থনৈতিক সম্পদ ছাড়াই আসে তাই তাদের গৃহ নির্মাণ কর্মের সংস্থান ও সাধারণ সামাজিক একত্রীকরণ এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে। ১৯৫০ সালের পর ইউরোপীয় ইহুদিদের (আশকেনাজিম, Ashkenazim) আগমন হ্রাস পেলে আরবিভাষী দেশসমূহ, ইরান, তুরস্ক, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থান হতে 'প্রাচ্য দেশীয় ইহুদিদের (সেপাহ্রাদিম, (Sephardim) আনয়ন করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতে হয়। 'ম্যাজিক কার্পেট' নামক এক প্রচেষ্টায় ৪৫০০০ হাজার ইয়ামানি ইহুদি আনয়ন করা হয়, আবার 'আলীবাবা' নামক এক প্রচেষ্টায় ইরাক হতে ১১৪০০০ ইহুদি স্থানান্তর করা হয়। ১৯৬২ সাল নাগাদ প্রাচ্য দেশীয় ইহুদি ইসরাইলের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশে দাঁড়ায়।

উদ্বাস্তুগণ নিজেদের সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং এমনকি আকৃতিও নিয়ে আসে। তাদেরকে এক নতুন ভাষা শিক্ষা করে এক জাতি হিসাবে বাস করতে হয় ও কাজ করতে হয়। তাদের স্ব স্ব দেশে তারা 'ইহুদি' হিসাবে পরিচিত ছিল, কিন্তু ইসরাইলে তারা হয় জার্মান, পোল, রুমানীয়, ইরাকি, ইয়ামানি, মিসরীয় বা মার্কিন। জার্মানগণ পোলদেরকে অপছন্দ করে, আবার ইউরোপীয়গণ প্রাচ্য দেশীয়দেরকে ঘৃণা করে। একত্রীকরণের জন্য ইসরাইলি সরকার মিশ্র সমবায় প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু এগুলো পরে ত্যাগ করতে

www.pathagar.com

হয়, কারণ সামাজিক বিভিন্নতার ফলে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়, এমনকি কোনো কোনো সময় গোলাগুলোও চলে।

মোটামুটিভাবে, বিলম্বে আগমনকারী স্বল্প শিক্ষিত, স্বল্প কারিগরিবিদ্যায় পারদর্শী এবং শুধু 'প্রাচ্য দেশীয়' হবার দরুন ইচ্ছাকৃতভাবে ও ঘটনাচক্রে এ সকল ইহুদিকে অন্যান্য ইহুদি হতে পৃথক চোখে দেখা হয়। প্রায় সমস্ত উচ্চ বেতনের চাকরি ইউরোপীয়গণ করায়ত্ত করে। ইউরোপীয় ইহুদিগণ এই বিষয়ে সজাগ যে বছরের পর বছর ধরে পরিশ্রম ও আত্মদানের দ্বারা তারা এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। অতএব তারা মনে করে, প্রাচ্য দেশীয় ইহুদিদেরকেও অনুরূপ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং তাই তাদের সমান ব্যবহার আশা করা উচিত নয়। ইউরোপীয় ইহুদিদের নিকট এটা হয়ত যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু দুর্দশাগ্রস্ত প্রাচ্য দেশীয়দের জন্য এটা হজম করা খুবই কষ্টকর। ফলে, অনারব ও অ-ইউরোপীয় অনেক ইহুদি ইসরাইল ত্যাগ করে চলে যায়।

নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণি হতে বাধ্যতামূলকভাবে সংগৃহীত লোকজন নিয়ে গঠিত ইসরাইলি সেনাবাহিনী সংমিশ্রণের সর্ববৃহৎ স্থান। আবার আরব রাষ্ট্রসমূহের সাথে যুদ্ধ বাধবার ফলে ইসরাইলের বিভিন্ন ভেদাভেদ এক হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও এই স্বল্প ভৌগোলিক পরিসরে সামাজিক অখণ্ডতা একটি সুদীর্ঘ ও কঠিন কাজ।

ইসরাইলি অর্থনীতি

ইসরাইলের অর্থনীতি সর্বদা দুর্বিষহ অবস্থায় বিরাজ করে। এদেশটি প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক হতে বন্ধ্যা। নতুন উৎস অথবা সমুদ্রের পানি লবণাক্তহীন করে যথেষ্ট পানির বন্দোবস্তু করা হলে বড়জোর ৫০,০০,০০০ লক্ষ একর জমি চাষ করা যায়। ৪০,০০,০০০ লক্ষ অধিবাসীর জন্য এটা মোটেই যথেষ্ট নয়। প্রতিষ্ঠিত হবার ২০ বছরের মধ্যে দেখা যায় ইসরাইলের রপ্তানির তুলনায় আমদানি আড়াই গুণ বেশি। ইসরাইল বহির্বিশ্বের ঋণ ও দানের ওপর নির্ভর করে আসছে। এগুলো এসেছে যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের দান, ইহুদি সম্পত্তি বিনষ্টের জন্য পশ্চিম জার্মানি হতে 'ক্ষতিপূরণ', মার্কিন ইহুদিদের নিকট থেকে চাঁদা এবং তমসুক বিক্রয় দ্বারা। অন্যান্য দেশের তুলনায় ইসরাইলে যুক্তরাষ্ট্রের দানই সর্বোচ্চ। এ ক্ষেত্রে সংযুক্ত ইহুদি আবেদনের (United Jewish

www.pathagar.com

Appeal) লক্ষ্য হল ২৫ কোটি ডলার। কিন্তু এই ধরনের সাহায্য চিরকাল থাকবে এরূপ কোনো নিশ্চয়তা নেই।

এই ধরনের ব্যাপক অর্থনৈতিক অসুবিধা কাটিয়ে উঠার জন্য ইসরাইলিগণ দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ইতোমধ্যে তারা বেশ উন্নতি লাভ করে। গ্যালিলি হ্রদ হতে তারা পানি নিষ্কাশন করে ও ১০৮ ইঞ্চি পাইপ দ্বারা সেই পানি নেগেভে নিয়ে যায়। প্রায় ৯০০০ শিল্প স্থাপন করে অন্যূন ১০০,০০০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করে। এশিয়ার সাথে বাণিজ্য করার জন্য আকাবা উপসাগরে তারা আইলাত বন্দরের উন্নয়ন করে এবং সেখান থেকে ভূমধ্যসাগরের হাইফা পর্যন্ত একটি তেলের পাইপ লাইন বসায়। ইউরোপের বাজারে তারা জম্বীর ফল, টকবেগুন, জলপাই ও শশা রপ্তানি করে। তারা পর্যটনের উন্নয়ন সাধন করে এবং ১৯৬৭ সালে জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর অধিকার করে তারা বস্তুত 'পবিত্র ভূমির' পর্যটন ব্যবসা একচেটিয়া করে ফেলে। ভবিষ্যতের জন্য তাদের অনেক পরিকল্পনা রয়েছে, কিন্তু অন্ততপক্ষে যতদিন ইসরাইল আরব রাষ্ট্রসমূহের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে ততদিন এটা একটি দুর্দশাগ্রস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে থাকবে।

ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্রবর্গ

ইসরাইলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী এর প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রবর্গের সাথে সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে যাতায়াতের সমস্যা বা আকাবা উপসাগর ব্যবহারে সমস্যা বা উদ্বাস্তুদের মর্যাদার সমস্যা মূল সমস্যার লক্ষণ মাত্র, অর্থাৎ অ-ইহুদি অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা। সম্ভবত আরবগণ যদি ইসরাইলকে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে কোনো দুরভিসন্ধিহীন ও বন্ধুভাবাপন্ন একটি 'ক্ষুদ্র জাতি' হিসাবে জ্ঞান করতে পারত তবেই একটি আপোস মীমাংসা করা যেত। কিন্তু বিশ্ব ইহুদি গোষ্ঠীর সাথে ইসরাইলের সম্পর্ক এবং 'সমস্ত' ইহুদিকে ইসরাইলে আনয়নের ব্যাপারে ইহুদিবাদীদের প্রকাশ্য আশাবাদ এই রাষ্ট্রকে আরবদের চোখে এক বিশালাকার রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেছে। আরবদের নিকট বিশ্ব ইহুদিবাদ কমিউনিজমের চাইতেও মারাত্মক। তাই তারা এর সাথে যুদ্ধ করে, একে একঘরে করে এবং একে তারা ভয় করে। ২০ বছরে তিনটি যুদ্ধের দ্বারা ইসরাইলে সমগ্র ফিলিস্তিন, সিনাই উপদ্বীপ এবং সিরিয়ার একটি কৌশলগত জেলা দখল করার ফলে বোঝা

www.pathagar.com

যায় আরবগণ কেন একে একটি 'ক্ষুদ্র' জাতি মনে করে না। অপরদিকে, তিন দিক হতে আরবগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকায় ইসরাইল একটি দুর্বিষহ রাজনৈতিক অবস্থায় নিপতিত, যা তার বর্তমান অর্থনৈতিক অস্থিরতাকে আরও বিষময় করে তুলেছে।

আধুনিক সভ্যতার কারিগরি বিদ্যার দ্বারা ইসরাইল আফ্রিকার অনেক নতুন নতুন সৃষ্ট দেশসমূহের ন্যায় প্রতিবেশী মধ্যপ্রাচ্যে দেশগুলোর জন্যও এক বিরাট আশীর্বাদ স্বরূপ হতে পারে। এরূপ আশা পোষণ করার পূর্বে দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। একটি হল ইহুদিবাদী মতাদর্শের পরিবর্তন, যদ্বারা একটি সম্পূর্ণ ইহুদি রাষ্ট্র হতে ইসরাইল একটি বহুজাতি সংবলিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হবে। যেখানে 'বর্ণ' বা 'ধর্ম' নাগরিকত্ব লাভের চাবিকাঠি হবে না। দ্বিতীয় হল শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব পরিত্যাগ করা, যা একটি ইউরোপীয় প্রোথিত জাতি হিসাবে ইসরাইল এতদিন 'প্রাচ্য দেশীয়' আরবদের প্রতি প্রদর্শন করে আসছে।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ অধ্যায়
নতুন মিসর

১৯৫২ সালের ২৩শে জুলাইয়ের বিপ্লবের ফলে একটি নতুন মিসর আত্মপ্রকাশ করে। রোম কর্তৃক মিসর দখলের পর হতে এই প্রথম মিসরীয়রা দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পেল—আরব, মামলুক, তুর্কী বা ব্রিটিশেরা নয়। বছরের পর বছরব্যাপী যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলতে থাকে তার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসাবে সুদূরপ্রসারী সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের সুযোগ এসে পড়ে। আধুনিক মিসরের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, যে সরকার বিদেশি শক্তি বিরোধী শ্লোগানের পরিবর্তে দুর্নীতি বিরোধী শ্লোগান প্রদান করে। এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল কিছুসংখ্যক তরুণ অফিসার এবং মিসরের মধ্যবিত্ত শ্রেণির সন্তানদের দ্বারা। এই বিপ্লবটির একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রয়েছে যার মূল সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মিসরের নব্য মধ্যবিত্ত সমাজের সরকার-বিরোধী অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বছরের পর বছর ধরে মিসরে জাতীয়তাবাদের মুখপাত্ররা মিসরের মূলভূমির শতকরা ৩৭ ভাগ আবাদি ভূখণ্ডের মালিকে পরিণত হয়েছিল। ১৮৫০ হতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত মিসর নিয়ন্ত্রণকারী এই দলটি মোট জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগের অর্ধেক মাত্র। এই মালিক গোষ্ঠীর আনুগত্যে ছিল ক্ষুদ্র ভূস্বামী এবং তাদের পরিবারেরা —যারা আমলাতান্ত্রিক ব্যাপারে যথেষ্ট শিক্ষিত। তারা গণপরিষদ, সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন করত। তারা এমন সব রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করত যাদের বিভক্তির কারণ ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কোনো প্রকার সংস্কার পরিকল্পনা বা মতবাদ নয়। কৃষক, ছোট দোকানদার এবং ক্ষুদ্র কর্মচারী যাদের সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ তাদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করতে হত।

www.pathagar.com

ই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদানত অন্যান্য দেশের ন্যায় মিসরকেও দুটি বিপ্লবের ।। এগিয়ে যেতে হয়েছে একটি স্বাধীনতা, অপরটি সমাজসংস্কার। অতএব ণ শতাব্দীর শেষার্ধে সমগ্র জাতি কেন স্বাধীনতার জন্য আওয়াজ তোলে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। প্রত্যেকটি আত্মসম্ভ্রমশীল জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলকেই এ কারণে এই নীতির পরিপোষকতা করতে হয়েছে। স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতা বা রাজা কেউই এই কথা উপলব্ধি করতে পারেনি যে ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত ভূমিহীন মিসরবাসী স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারও কামনা করে। দুটো মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এ ধারণা অধিকতর গতি লাভ করে। সময় মিসরে শিক্ষা এবং অহমিকা বৃদ্ধি পায় যা সভ্য লোকদেরকে নিজে ভাগ্য সম্পর্কে অসন্তুষ্ট করে তোলে। এই অসন্তোষের কারণ রয়েছে। মিস জনসংখ্যা খাদ্য উৎপাদনের তুলনায় অনেক গুণ বেড়ে যায়। ১৯১৩ সাল জনসংখ্যার গতি ক্রমবর্ধমান। কিন্তু যে সকল অভিজাত ভূস্বামী এই ব্যা কিছু করতে পারে তারা ব্যাপারটিকে একেবারেই গুরুত্ব প্রদান করেনি। ১ সালে মিসরীয় কৃষকদের গড় আয় ছিল ৬০ ডলার। ১৯৫১ সাল নাগাদ এই ।য় দ্রুতগতিতে ৩০ ডলারে নেমে আসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৌর অঞ্চলে সাধারণ বেকারত্বের অভিশাপ নেমে আসে।

এ জাতীয় সংকটের মুখে রাজনৈতিক দলসমূহ শুধু স্বাধীনতার কথাই বলতে থাকে। যে ওয়াফদ্ পার্টি স্বাধীনতার কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছিল এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, তারাও মধ্যযুগীয় ভাবধারায় অভিষিক্ত হয় এবং সংস্কারের কর্মসূচি ব্যতীতই সন্তুষ্ট থেকে যায়। যে সকল ব্যক্তি ক্ষমতার দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত তাদের ভেতরে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং উন্নত জীবনযাত্রার প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই থাকে। রাজার করণীয় হল একটি রাজনৈতিকদলকে আরেকটির বিরুদ্ধ লেলিয়ে দিয়ে ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধার সিংহভাগ আদায় করা। রাজা ফারুকের পূর্বপুরুষদের ভেতর খেদিব ইসমাইলের মতো অমিতব্যয়ী এবং সাঈদের মতো পেটুক এবং লোভী ছিলে—যাদের সমস্ত দুর্বলতা তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অমিতব্যয়ী, লোভী, নারী লোলুপ, সৌখিন নৌকা বিশেষজ্ঞ, দামি ও দুষ্প্রাপ্য টিকেট এবং নগ্ন ছবি সংগ্রহকারী। যে পৃথিবী প্রলয়ংকরী মহাযুদ্ধ দেখেছে, যে এশিয়া আফ্রিকার দ্রুত রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন দেখেছে সেই পৃথিবীর অধিবাসী হয়ে স্বাভাবিকভাবেই মিসরের শিক্ষিত সমাজ রাজার নিকট থেকে বেশি কিছু আশা করে।

www.pathagar.com

ফ্রি অফিসার্স ক্লাব

সৈন্যবাহিনীতেও একজাতীয় তরুণ মিসরীয় ছিল। কোনো এ মিসরীয় সৈন্যবাহিনী সাধারণ লোকের আওতার বাইরে ছিল। ১৯৩৬ সা বাহিনীকে সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের জন্য উন্মুক্ত করা হয় কারণ সমাজ এ আকৃষ্ট হয় এই জন্য যে, এই স্থানে সুশিক্ষা এবং পদোন্নতির সুযোগ-সুবিধ বেশি। এই তরুণ অফিসারদের ভেতর জামাল আবদ আল-নাসের অন্যতম। ডাক বিভাগের একজন কেরানির পুত্র নাসের ১৯১৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। হাইস্কুলে ছাত্র থাকাকালে তিনি স্বাধীনতার জন্য পরিচালিত বহু মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। তরুণ অফিসার হিসাবে তিনি মিসরীয় বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার জন্য বহু অফিসারকে একত্রিত করেন। এই তরুণেরা মিসরের সেই শক্তির উত্তরাধিকারী যারা শতাব্দীর পর শতাব্দীর কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় দীক্ষিত। তারা মোহাম্মদ আলী সম্পর্কে পাঠ করেছেন, আরাবী, জগলুল ও অন্য জাতীয়তাবাদীদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, মোহাম্মদ আবদুহুর ভাবধারা পর্যালোচনা করেছেন এবং রুশ বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এই অফিসারদের ভেতর অন্তত দুজন কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন, চার বা পাঁচজন মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত—যারা কোনো বিশেষ মতাদর্শের অনুসারী নয়।

ফালুজা অবরোধ

এ কথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, এসব অফিসার তখন শুধুমাত্র ১৯৪৮ সালের ইসরাইল বিরোধী যুদ্ধের কথাই আলোচনা করত না। স্মরণ করা যেতে পারে যে মিসর নেগেভ দখল করেছিল এবং জর্ডানের আরব বাহিনীর সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য উত্তর দিকে চাপ সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধবিরতির সময় ইসরাইলিরা সদ্য সংগৃহীত নতুন অস্ত্র ও বিমানের সাহায্যে পাল্টা চাপ প্রদান করে এবং মিসরের সৈন্যবাহিনীর একটা বিরাট অংশকে ফালুজায় অবরোধ করে ফেলে। মিসরও তখন নতুন অস্ত্র লাভ করেছিল। কিন্তু রাজার দুর্নীতি এবং লোভের কল্যাণে সংগৃহীত অস্ত্রগুলো খারাপ, পুরাতন এবং অপ্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত হয়।

নাসের এবং তাঁর বহু সংখ্যক বন্ধু তখন ফালুজায়। তারা তখন ফিলিস্তিনের যুদ্ধের পরিবর্তে সঙ্কটাপন্ন মিসরের কথাই বেশি আলোচনা করে, যা তখন

www.pathagar.com

নেকড়ের কুক্ষিগত। যুদ্ধে নিহত তার এক বন্ধুর শেষ কথা ছিল 'মিসরই আমাদের কাজের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র'। ফিলিস্তিনের পরাজয়ই তরুণ অফিসারদেরকে এই শিক্ষা প্রদান করে যে তাদের প্রথম কাজ হল মিসরকে দুর্নীতি এবং লোভের গ্রাস হতে মুক্ত করা। মিসরে ফিরে আসার পর নাসের 'সিক্রেট ফ্রি অফিসার্স সোসাইটি' গঠন করেন—যার কাজ শুধু আলোচনা নয় বরং কাজ।

ওয়াফ্দ্ ও ব্রিটিশ

তরুণ অফিসাররা যখন বিপ্লবের পরিকল্পনা করতে ছিলেন তখন মিসরীয় সরকার কর্মকুশল ওয়াফ্দ্ নেতা নাহাস পাশার নেতৃত্বে ব্রিটিশদেরকে সুয়েজ খাল ত্যাগ এবং সুদানকে মিসরের হাতে অর্পণ করার জন্য চাপ প্রদানে ব্যস্ত। ব্রিটিশ চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী এত ধীরে অগ্রসর হয় যে মিসরের চোখে তা অগ্রসর না হওয়ারই শামিল। ব্রিটিশের দাবি ১৯৩৬ সালের চুক্তির একটি ধারা অনুযায়ী কুড়ি বছর পর্যন্ত সুয়েজের ওপর তাদের আধিপত্য থাকে। অর্থাৎ মিসরকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সুদানের ব্যাপারে ব্রিটেনের মতামত হল তাদের সম্পর্কে কোনো প্রকার সিদ্ধান্তের আগে সুদানবাসীদের সাথে আলোচনা করতে হবে। এই আলোচনা ১৯৫১ সালে চলতে থাকে। অবশেষে নাহাস পাশা সম্ভবত ইরানের ড. মোসাদ্দেকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একতরফাভাবে ১৯৩৬ সালে চুক্তি বাতিল এবং ফারুককে সুদানের রাজা বলে ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি উচ্ছৃংখল জনতাকে খালের পাড়ে এবং অন্যত্র অবস্থানরত ব্রিটিশ সৈন্যদের হত্যার উস্কানি প্রদান করেন। সুয়েজ খালের মিসরীয় শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে পরিচালিত গেরিলা যুদ্ধের অবস্থার সেদিন অবনতি ঘটে। ১৯৫২ সালে জানুয়ারি মাসে ব্রিটিশ সরকার এই অবস্থার প্রতিশোধ গ্রহণ করার উদ্দেশে তাদের নিয়ন্ত্রণে গ্রামে গ্রামে সামরিক আইন জারি করে। এ সময় কায়রোর জনতা উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং তারা শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে ধাবিত হয়। সরকারি প্ররোচনায় তারা পশ্চিমা ব্যবসাকেন্দ্র এবং বসতির উপর হামলা চালায়। তারা থিয়েটার, সিনেমা, হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও দোকানে লুণ্ঠন চালায়—আর অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় উত্তেজিত জনতা কোনো প্রকার বাছ-বিচার করেনি কিন্তু যখন লুণ্ঠন কাজ সমাধা হয় তখন দেখা গেল যে, এই কাজের ফলে প্রায় ১২০০০ মিসরীয় গৃহহারা হয়েছে। কথিত আছে যে, এই ব্রিটিশবিরোধী কার্যে মুসলিম ব্রাদারহুডের ভূমিকা ছিল মুখ্য। ওয়াফ্দ্ পার্টির

www.pathagar.com

কার্যক্রম ব্যর্থ হলে পর নাহাস পাশাকে পদত্যাগ করতে হয়। এর পর কয়েক মাস যাবৎ শুধু সরকারই পরিবর্তন হয়—কেউই টিকে থাকতে পারে না।

সামরিক অভ্যুত্থান

ইতোমধ্যে ফ্রি অফিসাররা তাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ফারুকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় তিনি কায়রোর এই ক্লাব বন্ধ করে দেবার নির্দেশ প্রদান করেন—প্রায় সমস্ত তরুণ সামরিক কর্মকর্তাগণ এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২৩শে জুলাই তরুণ অফিসাররা আঘাত হানেন। যেহেতু তাঁরা সকলে ছিলেন তরুণ (গড় বয়স ৩৪) ও অজ্ঞাত সেই জন্যে তাঁরা জনপ্রিয় সম্মানিত এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠ অফিসার জেনারেল মোহাম্মদ নাজিবকে নেতা হিসাবে কাজ করার জন্য বেছে নেন। জেনারেল এই পরিকল্পনার গুরুত্ব একটু দেরিতে উপলব্ধি করলেও সময়মত প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে ২৩শে জুলাই সকাল বেলা নাসের টেলিফোনযোগে নাজিবকে বিপ্লবী পরিষদের কেন্দ্রীয় অফিসে আসতে বলেন। 'আমরা যদি ব্যর্থ হই,' 'তা হলে মনে করব আপনি আমাদেরকে দমন করেছেন।' আমরা যদি কৃতকার্য হই, আপনি নতুন মিসরের নেতা।' রাত একটা হতে দুপুর পর্যন্ত সময়ে কোনো বাধা-বিপত্তি ছাড়াই নাসের রাজধানী দখল করেন। ফারুক ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের আশা করেছিলেন কিন্তু কিছুই হয়নি। আধুনিক মিসরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো ব্রিটিশবিরোধী বা বিদেশী বিরোধী ধ্বনি ছাড়া মিসর হতে দুর্নীতি ও উৎকোচ দূর করার ওয়াদা নিয়ে একটি নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে।

এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের কোনো পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা যুবক অফিসারদের ছিল না। তাঁরা দুর্নীতি দূর করার সংকল্প করে এবং আশা করে, যে কোনোও উপায়ে একটি উদ্দীপনাপূর্ণ বেসামরিক সরকার গঠিত হবে। তাঁদের মতে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রধান হলেন বাদশাহ্ যাকে ২৬শে জানুয়ারি তাঁরা অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের স্বপক্ষে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। ফারুক চিরতরে মিসর ত্যাগ করেন। এক বছর পর মিসরকে প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। নাসের ও তাঁর বন্ধুদের নিকট আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, এই বিপ্লবে জনতা উৎসাহজনকভাবে সাড়া দেয়নি। 'অগ্রবাহিনী এর কর্তব্য পালন করেছে।' তাঁর 'ফিলসফি অব দি রেভল্যুশন' গ্রন্থে নাসের বলেন, 'এটা অত্যাচারের দুর্গের প্রাচীর ধ্বংস করেছে..এবং ইহা জনতার সংস্থাগুলো তাদের মূল লক্ষ্যে পৌঁছাবার আশায় অপেক্ষা করে থাকে।' কিন্তু

www.pathagar.com

তারা শুধু বিশৃঙ্খলা, মতভেদ ও অলসতাই লক্ষ্য করে। অতঃপর তারা নিজেরাই ক্ষমতায় থাকবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং দিন দিন বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তি

যুবক অফিসারগণ শুধু ব্রিটিশ-বিরোধী জিগিরের বলে ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে নি। সম্ভবত এজন্যই তারা ব্রিটিশদের সাথে উদ্দেশ্যমূলক পরিবেশে একটা সমঝোতায় আসতে সক্ষম হয়। সুদানের ব্যাপারে ব্রিটিশগণ সর্বদাই বলে আসে যে সুদানিগণ নিজেরাই তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বেছে নেবে। স্বয়ং আধা-সুদানী জেনারেল নজীবের সুযোগ্য সহায়তায় মিসরীয় সরকার সমস্ত সুদানি দলগুলোকে মিসরের ন্যায় একই শিবিরে একত্রিত করতে সমর্থ হয়। সুদানীগণ সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক হয়, কারণ নতুন মিসরীয় সরকার নমনীয় এবং সুদানী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল। ১ ৯৫৩ সালে ১২ই ফেব্রুয়ারি মিসর ও বৃটেন সুদানকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দিতে একমত হয়। মিসরের সাথে সুদানের সম্পর্ক নির্ধারণ করার জন্য তিন বছরের মধ্যে একটি গণভোট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নতুন মিসরীয় সরকারের জন্য এই চুক্তি একটি বিরাট কৃতিত্ব। কারণ এর দ্বারা গ্রেট বৃটেনের মধ্যে মিসরের জনপ্রিয়তা যেমন সৃষ্টি হয় ঠিক তেমনি সুদানী জাতীয়তাবাদীদের গভীর সহযোগিতাও মিসর লাভ করে।

পরবর্তী সমস্যা হল সুয়েজ খাল এলাকা দখল করা। এখানেও একটি সরল পরিবেশে আলোচনা চলতে থাকে। অনেকগুলো কারণ শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশদেরকে এই প্রত্যয় প্রদান করে যে সুয়েজ খাল এলাকায় একটি ঘাঁটি রক্ষা করার আর কোনো অর্থ নেই। ফিলিস্তিনে তাদের এই অভিজ্ঞতা হয় যে একটি শত্রুভাবাপন্ন অঞ্চলে ঘাঁটি রাখা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। তদুপরি হাঙ্গামার ফলে সমগ্র ব্যাপার ব্রিটিশ জনগণের গোচরীভূত হয়, যারা এই ধরনের ব্যাপারে তাদের স্বীয় সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। ইতোমধ্যে স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতবর্ষ এখন আর কোনো সমস্যা নয়। উপরন্তু এটম বোমা আবিষ্কারের ফলে সম্ভবত এই ধরনের ঘাঁটি রাখা নিরর্থক। এ ব্যাপারে মার্কিন চাপ কতটুকু সৃষ্টি করা হয়েছিল তার কোনো নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু ১৯৫৪ সালে গ্রেট বৃটেন খাল এলাকা ছেড়ে দিতে সম্মত হয়। একমাত্র শর্ত হল এই যে, তুরস্ক বা অন্য

www.pathagar.com

কোনো আরব দেশের ওপর কখনও আক্রমণ হলে তাদের জন্য খাল এলাকা পুনরায় দখল করার অনুমতি থাকবে।

সুদান নিয়ে ইঙ্গ-মিসরীয় দ্বন্দ্ব এবং সুয়েজ খাল এলাকার আপোস-নি□ত্তি হবার ফলে যুবক অফিসারগণ মিসরের অভ্যন্তরীণ সমস্যার প্রতি মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়। যুবক অফিসারদের উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে কলুষমুক্ত করা এবং একটি খাঁটি বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা। সরল বিশ্বাসে তারা একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আলী মাহেরকে সরকার গঠন করার জন্য বেছে নেয়। ইনি দুর্নীতিহীন ও প্রগতিশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু এটা সন্তোষজনক প্রতিপন্ন হয়নি। আমূল পরিবর্তন সাধন করার ব্যাপারে বৃদ্ধ লোকজন অতি গোঁড়া। এদের অধিকাংশই যেহেতু জমির মালিকানার ব্যাপারে প্রবল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সেহেতু এদের দ্বারা সামাজিক বিপ্লব আশা করা যায় না। এ সমস্ত কিছু বিবেচনা করে যুবক অফিসারগণ রেভল্যুশনারি কমান্ড কাউন্সিল (Revolutionary Command Council, R. C. C.) গঠন করে এবং জেনারেল নজীবকে প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রদান করে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করান। আর. সি. সি. সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ হতে প্রায় ৮০০ বেসামরিক লোক বরখাস্ত করে এবং ১০০ পুরাতন সামরিক অফিসারকে অবসর প্রদান করে। তারা মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ ব্যতীত সমস্ত দল নিষিদ্ধ করে দেয়।

আর. সি. সি. ও সংস্কার

অবাঞ্ছিত লোকজন হতে সরকারকে মুক্ত করে আর. সি. সি. প্রথমটায় দ্বিধাগ্রস্তভাবে সামাজিক বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতরণ করে। মধ্যপ্রাচ্যে সামাজিক পরিবর্তনের অপরিহার্য অঙ্গ হল ভূমি সংস্কার। একমাত্র জমিদারগণ ছাড়া প্রায় সকলেই এর স্বপক্ষে। অপেক্ষাকৃত গোঁড়া মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের মতে সর্বোচ্চ জমির মালিকানা ৫০০ ফেদ্দান বা একরে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত এবং এর বাড়তি জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া উচিত। মিসরের চরমপন্থীদলগুলো জমির সর্বোচ্চ মালিকানা ৫০ হতে ১০০ ফেদ্দানে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত মনে করে। আর. সি. সি. ২০০ ফেদ্দানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মিসরে প্রতি একরে জমির ফলন যেখানে উচ্চ, ২০০ ফেদ্দান সেখানে যথেষ্ট ফলে এই বন্টনের দ্বারা শুধু বড় বড় জমিদারগণই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাদশাহর বিশাল জমিদারি যেহেতু বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং ঐ জমি বন্টন করা হয়নি, সেহেতু সরকার মিসরের

www.pathagar.com

সর্ববৃহৎ জমির মালিকে পরিণত হয়।

ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

নতুন সরকার শত্রুহীন থাকেনি বরং এর বিপ্লবী হবার সিদ্ধান্তে আরও শত্রুর উদ্ভব হয়। সরকারের শত্রুদেরকে চার শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রথম হল পুরাতন রাজনীতিবিদগণ, যাদেরকে রাজনৈতিক কার্যাবলি হতে বিরত রাখা হয়। দ্বিতীয় হল মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ, যাদের দৃষ্টিতে আর. সি. সি. অতি ধর্মনিরপেক্ষ ও চরমপন্থী। তৃতীয় হল কমিউনিস্টগণ যাদের দৃষ্টিতে আর. সি. সি. চরমপন্থীও নয়, যথেষ্ট আদর্শবাদীও নয়। চতুর্থ হল ধনী ভূস্বামীগণ যাদের নিকট হতে ১৯৫২ সালে ভূমি সংস্কার আইনের দ্বারা জমি কেড়ে নেয়া হয়েছে। এই শ্রেণিগুলো অর্থশালী এবং পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যুবক মিসরীয়দের সমর্থন লাভ করে। কিন্তু আর. সি. সি. পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র খর্ব করে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারে বিশ্বাস করে। বিরোধী দলগুলোর কোনো একক কর্মসূচি না থাকার ফলে এরা সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি। ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তারা এই একক কর্মসূচি লাভ করে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, জেনারেল নজীবকে নতুন শাসনের নামে মাত্র প্রধান হবার জন্য আনা হয়। প্রকৃত ক্ষমতা থাকে আর. সি. সি-র হাতে, যার পুরোধা হলেন নাসের। কিন্তু জেনারেল নজীব মিসরীয়দের নিকট খুবই জনপ্রিয় হয় ওঠেন এবং তাঁকেই বিপ্লবের প্রকৃত নেতা বলে ধরা হয়। ১৩ সদস্যবিশিষ্ট আর.সি.সি. কর্তৃক প্রদত্ত এক ভোটের মালিক হবার চাইতে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আরও ক্ষমতা প্রত্যাশা করেন। নজীব ও আর. সি. সি-র মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির মূল কারণ হল বয়স। আর. সি. সি-র যুবক অফিসারদের বিশ্বাস, রাজনীতিবিদগণ বৃদ্ধ, দুর্নীতিবাজ ও কল্পনাবিহীন। তবে ৫১ বছর বয়স্ক নজীব এই রাজনীতিবিদদের কর্মক্ষম, কল্পনাপূর্ণ যৌবনের অগ্নিমূর্তির কথা স্মরণ করেন। তাঁর নিজস্ব বয়ঃসীমার এই সকল রাজনীতিবিদদেরকে নজীব সম্মান করেন এবং সম্ভবত এই সকল লোক তাঁকে আরও ক্ষমতা দাবি করতে উৎসাহিত করে। যাই হোক পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য নজীব আরও ক্ষমতা দাবি করেন, যার অর্থ হল পুরাতন সেই রাজনীতিবিদগণের পুনরায় ক্ষমতায় আগমন।

১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আর. সি. সি. জেনারেল নজীবের পদত্যাগের

www.pathagar.com

কথা ঘোষণা করে। এতে ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি হয়, যা আর. সি. সি. মোটেই আশা করেনি। বিরোধী দলগুলো জেনারেলকে ঘিরে জমায়েত হয় এবং তাঁর স্বপক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। আর. সি. সি. কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করে সম্ভবত এটা তখনকার একমাত্র করণীয় কাজ এবং জেনারেল নজীবকে পুনর্বহাল করে। সমসাময়িক মিসরের ইতিহাসে পরবর্তী কয়েক মাস দুর্যোগ ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। জেনারেল নজীব আর. সি. সি. কর্তৃক সম্পাদিত কিছু সংস্কার বিলোপ করতে অগ্রসর হন এবং জুলাই নাগাদ একটি পুরাদস্তুর বেসামরিক সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেন।

ইতোমধ্যে নজীবকে কোণঠাসা করে আর. সি. সি-র ক্ষমতা পুনর্বহাল করার জন্য নাসের পর্দার অন্তরালে কাজ করে যান। এপ্রিল নাগাদ আর. সি. সি-র সমর্থনে একটি সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়, সেনাবাহিনী ধর্মঘট করে, রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় এবং আর. সি. সি. জেনারেল নজীবকে প্রেসিডেন্টের পদে 'উন্নীত' করে ও নাসেরকে মিসরের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে। ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের একজন সদস্য নাসেরের জীবননাশের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। এর ফলে আর. সি. সি. ভ্রাতৃসংঘকে বেআইনি ঘোষণা করা, জেনারেল নজীবকে গৃহবন্দি করা, এবং স্বীয় প্রতিষ্ঠানকে কমিউনিস্ট ও ভ্রাতৃসংঘের সদস্যমুক্ত করার প্রয়োজনীয় অজুহাত লাভ করে। ১৯৫৪ সালে শেষ নাগাদ নাসের বিপ্লবের প্রকৃত নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং ১৯৫৬ সাল নাগাদ দেশকে তিনি একটি সংবিধান প্রদানের ওয়াদা করেন।

নাসের ও আরব জাহান

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের একটি কঠিন কর্মসূচিতে জড়িত যে কোনো জাতি বৈদেশিক ব্যাপারে কিছুটা একাকিত্ব ও স্বতন্ত্র থাকবার প্রয়োজন বোধ করে, যাতে সে নিজের দেশে শৃঙ্খলা আনয়ন করতে ও বিপ্লবকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। মধ্যপ্রাচ্যে আরবিভাষী দেশগুলোর পক্ষে কোনো বিশেষ দেশের ওপর তাদের চিন্তা ও কর্মধারা কেন্দ্রীভূত করা খুবই কঠিন। পূর্বে আমরা লক্ষ করেছি, তুরস্কের পক্ষে এর জাতীয়তাবাদকে শুধুমাত্র তুর্কিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সহজতর হয়। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ হতে তাদের ভাষা পৃথক। তারা অবশ্য মুসলমান, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির দ্বারা তারা সরকারিভাবে প্রতিবেশীদের সাথে ধর্মীয়

www.pathagar.com

একাত্মতা ছিন্ন করে এবং এর ফলে নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে তারা অধিকতর মাথা ঘামাতে সক্ষম হয়। এমনকি পারস্যবাসীদের পক্ষেও প্রতিবেশী দেশসমূহের প্রলোভন ত্যাগ করে নিজেদের জাতীয়তাবাদের তেজস্বিতা রক্ষা করা সহজ হয়। ভাষা ও ধর্মীয় দিক দিয়ে তারা তাদের পশ্চিমা প্রতিবেশী হতে ইতোমধ্যেই পৃথক এবং আফগানিস্তানের ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করে না, যদিও ফার্সি সেখানকার সরকারি ভাষা।

মিসরের জন্য এটা সহজতর নয়। স্বাধীন অফিসারগণ মিসরকে মুক্ত করার জন্য বিপ্লবের পরিকল্পনা করে—এটা যেরূপ সত্য অপরদিকে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে 'আরব স্বার্থ' প্রতিরক্ষার জন্য ফিলিস্তিনে যুদ্ধরত অবস্থায় পরিকল্পনার কিয়দংশ প্রণয়ন করা হয়। ভাষা ও ধর্মীয় বন্ধনে তারা ফারটাইল ক্রিসেন্ট ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর সাথে আবদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত এ কথা সত্য যে, মিসরীয় জাতীয়তাবাদিগণ নিজেদেরকে 'আরব' বলে মনে করত না; কিন্তু যুদ্ধের পর অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। মোটের ওপর রাষ্ট্রসমূহের লীগ প্রতিষ্ঠা করার জন্য গ্রেট ব্রিটেনই নাহাস পাশাকে ব্যবহার করে, কায়রো লীগের সদর দফতর হয় এবং মিসরীয়গণ ফিলিস্তিনে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করে।

তবে, শুধু জাতীয়তাবাদের জন্য মিসর আরবিভাষী দেশসমূহের কার্যকলাপে জড়িত হয়নি। নাসেরের নীতি নির্ধারণে অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণসমূহ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফেরাউনের সময় হতে সিনাই ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের মধ্য দিয়ে মিসর বহির্বিশ্বের সাথে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন করে। ক্রিসেন্টের ভাগ্য অনেকাংশে মিসরের ভাগ্যও নির্ধারণ করে। এ পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত ইসরাইল সেই ঐতিহাসিক যোগসূত্র ছিন্ন করে এবং তাই একে মিসরের হুমকি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মধ্যমপন্থী জেনারেল নজীবের বক্তব্য হল দক্ষিণ নেগেভের মধ্য দিয়ে মিসর ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের সংযোগ থাকলে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা লাভে তাঁর কোনো আপত্তি নেই।

উপরোল্লিখিত কারণসমূহ ছাড়াও আরবিভাষী দেশসমূহের জাতীয়তাবাদিগণের মধ্যে নাসেরের জনপ্রিয়তার ফলেও মিসর এ সকল দেশের রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত হয়ে পড়ে। এ সকল ব্যাপারে নিরাসক্ত থাকতে চাইলেও নাসের তা পারেননি। ফিলিস্তিনে পরাজয়ের পর মিসরই প্রথম দেশ, যে নিজের আত্মশুদ্ধি করে নিজ পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। নাসের এই বিপ্লবের পুরোধা এবং আরবিভাষী দেশসমূহের জাতীয়তাবাদীদের মধ্যমণি। মিসর একটি আদর্শ দেশ এবং নাসের সেই দেশের আদর্শ নেতায় পরিণত হন।

www.pathagar.com

তাঁর 'ফিলসফি অব দি রেভল্যুশন' (Philosophy of the Revolution) গ্রন্থে নাসের মিসরীয় বিপ্লবের ভূমিকা তিন ভাগে ভাগ করেন। প্রথম হল আরব ভাগ, যা 'আমরা যেরূপ এর অংশবিশেষ, এটিও আমাদের অংশবিশেষ....।' দ্বিতীয় হল' আফ্রিকা, নিয়তির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যার এলাকায় পড়েছি...; এবং যে সংগ্রামে এটি লিপ্ত 'তাতে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা জড়িত হই।' তৃতীয় হল ইসলামী ভাগ 'যার সাথে আমাদের সংযোগ শুধু ধর্ম বিশ্বাসের দ্বারা নয়, বরং ইতিহাসগতভাবেও আমরা সংযুক্ত।' নাসেরই সম্ভবত প্রথম মিসরীয় জাতীয়তাবাদী নেতা, যিনি প্যান-আরববাদ ও প্যান-ইসলামাবাদ উভয়ের সংমিশ্রণের চেষ্টা করেন, যা মূলত পরস্পরবিরোধী। প্যান-আরবদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসাবে ইসলাম ধর্ম বা অন্য কোনো ধর্মের স্থান নেই। অপরদিকে প্যান-ইসলামী মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ এবং ধর্মনিরপেক্ষ প্যান-আরবিদের মধ্যে বিদ্যমান বৈরীভাবের ফলে এই ধরনের সংমিশ্রণ কার্যকর কিনা তা বিবেচনা করার সময় এখনও আসেনি।

নাসের আবার প্রথম মিসরীয় নেতা যিনি মিসরের ভাগ্য আফ্রিকা মহাদেশের সাথে সংযুক্ত করেন। এটি একটি অলিখিত পন্থা, ইতিহাসে যার কোনো নজীর নেই। নাসেরের বিভক্তিকরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই যে তিনি 'মিসরীয় ভাগকেই বাদ দিয়েছেন। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন যুদ্ধে নাসের ও তাঁর বন্ধুগণ ফিলিস্তিনে যুদ্ধ করেন কিন্তু (তাঁদের) স্বপ্ন ছিল মিসর।' ১৯৫৫ সাল নাগাদ নাসেরের ন্যায় প্যান-আরবিদের চিন্তাধারায় ফিলিস্তিন, মিসর ও অন্যান্য আরব দেশসমূহ একটি 'আরব জাতিতে' পরিণত হয়। এতদসত্ত্বেও, 'দি ফিলসফি অব দি রেভল্যুশন'-এর মতে এবং পরবর্তীতে নাসেরের কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সমস্ত ভাগের কেন্দ্রস্থল কায়রো। আফ্রিকাবাসিগণ ও অনারব মুসলমানগণ সম্ভবত এরূপ একটি আদর্শে তেমন মনোযোগ দেয়নি; কিন্তু আপামর আরবিভাষী লোকদের মধ্যে এই আদর্শ হারিয়ে যায়নি। ইরাকি ও সিরীয়গণ বিশেষত উন্মত্ত হয়ে ওঠে, কারণ তারা নিজেদের রাজধানী, বাগদাদ বা দামেস্ককে প্যান-আরববাদ অথবা প্যান-ইসলামবাদের কেন্দ্রস্থল বলে বিবেচনা করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশ

১৯৫৫ সালে সুয়েজ খাল কোম্পানি জাতীয়করণের ঘটনাবলি কিয়দংশে মিসরের ওপর বাইর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়। প্রথম ঘটনা সম্ভবত ১৯৫৫ সালে বাগদাদ চুক্তি দ্বারা সম্পাদন। এই চুক্তিতে ইরাকের সদস্য হওয়াটাকে নাসেরের

www.pathagar.com

পক্ষে হুমকি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাগদাদ চুক্তিকে নাসের পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের নবরূপায়ণ বলে মনে করেন। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরাককে অস্ত্র প্রদানের দ্বারা মিসর শঙ্কিত হয়। দুই দেশের মধ্যে শুধু জাতীয়তাবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নয়, বরং ইরাক এর রাজতন্ত্র, জমিদারি আভিজাত্য ও গোঁড়ামি নিয়ে নাসের বিরোধিতার কেন্দ্রস্থলও হয়ে উঠতে পারে, অতএব এই চুক্তির বিরুদ্ধে তিনি তাঁর প্রচারণার সর্বশক্তি ব্যয় করেন।

তদুপরি, মিসরীয় সীমান্তে ইসরাইলের বেশ কিছু আক্রমণের দ্বারা মিসরীয় বাহিনীর প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয় এবং এটা নাসেরের সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির আগ্রহ প্রবলতা করে তোলে। তিনি পাশ্চাত্যের নিকট হতে অস্ত্র ক্রয় করতে চান কিন্তু ব্যর্থ হন। যুক্তরাষ্ট্র তাঁর নিকট অস্ত্র বিক্রয় করতে নারাজ এবং তা আংশিকভাবে ইসরাইলের জন্য এবং আংশিকভাবে মিসরের নিরপেক্ষতা ও চীন প্রজাতন্ত্রের প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের জন্য। অন্যান্য আরব নেতৃবৃন্দের ন্যায় নাসের ইসরাইলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হন এবং মিসরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা উচিত বলে বিশ্বাস করেন। পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গ হতে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা খেয়ে মিসর শেষ পর্যন্ত ১৯৫৫ সালে সেপ্টেম্বরে চেকোশ্লোভাকিয়া হতে অস্ত্র লাভের বন্দোবস্ত করেন। মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্র সরবরাহের ওপর পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রণ ভঙ্গ হয় এবং এটা অত্র অঞ্চলের দেশগুলোর জন্য সোভিয়েত জোট হতে অস্ত্র ক্রয়ের পথ সুগম করে।

আসওয়ান বাঁধ

এ সকল পরিক্রমা সত্ত্বেও রেভল্যুশনারি কমান্ড কাউন্সিলের (Revolutionary Command Council) প্রধান কর্মসূচির মধ্যে থাকে অভ্যন্তরীণ সংস্কার। মিসরের প্রধান সমস্যা নির্ণয় করা খুবই সহজ, অবশ্য এর সমাধান যদিও তত সহজ নয়। মিসরের প্রয়োজন বুভুক্ষু জনতার জন্য আরও খাদ্য, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আরও জমি এবং বাড়তি জমিতে জল সেচের জন্য আরও পানি। উচ্চ মিসরের উঁচু আসওয়ান বাঁধকে আরও উঁচু করলে আরও পানি পাওয়া যায় কিন্তু এই বাঁধ নির্মাণ করতে কোটি কোটি ডলারের প্রয়োজন। এই অর্থের জন্য মিসর যুক্তরাষ্ট্রের শরণাপন্ন হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র গ্রেট ব্রিটেন ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় এই অর্থ প্রদানের আয়োজন করে।

তবে মিসর এই চুক্তি স্বাক্ষর করতে বিলম্ব করে, সম্ভবত এই আশায় যে সে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিদ্যমান শীতল যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ গ্রহণ করে অধিকতর সুবিধা আদায় করবে। নাসের দাবি করেন যে,

www.pathagar.com

'কোনো শর্ত ছাড়াই' সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁকে আরও অধিক অর্থ ঋণ দিতে উচ্ছুক, অবশ্য এ দাবি রুশগণ অস্বীকার করে। নাসের চীনের সাথে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন করেন এবং 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের' বিরুদ্ধে দীর্ঘ বাদানুবাদে লিপ্ত হন, যাতে মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দ অসন্তুষ্ট হন। তদুপরি ইসরাইলে গোপন আক্রমণ চালাবার জন্য তিনি বিশেষ গেরিলা দলের (ফেদাইয়ান) প্রশিক্ষণ আরম্ভ করেন। ব্যাপারটি ১৯৫৬ সালের জুলাই পর্যন্ত গড়িয়ে চলে। অতঃপর নাসের মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত হন কিন্তু স্বরাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস সমগ্র পরিকল্পনাটি হঠাৎ বাতিল করে দেন। এই বাতিল করার জন্য ডালেস মিসরীয় অর্থনৈতিক অযোগ্যতাকে দায়ী করেন। কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় প্রতীয়মান হয় যে তিনি নাসেরকে অপমানিত করার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এর এক সপ্তাহ পর ১৯৫৬ সালের ২৬শে জুলাই, নাসের সুয়েজ খাল কোম্পানি জাতীয়করণ করে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

সুয়েজের জাতীয়করণ

স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সুয়েজ খাল কোম্পানি সুয়েজ খাল পরিচালনা করে। এটা মিসর ও ফ্রান্সে তালিকাভুক্ত (Registered) এবং মিসর ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে বিদ্যমান কোনো রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তির সাথে জড়িত নয়। এই খাল পরিচালনার জন্য কোম্পানি ৯৯ বছরের অনুমতিপত্র লাভ করে এবং ১৯৬৮ সালে এটি মিসরীয় সরকারের নিকট হস্তান্তরের কথা। ১৯৩৬ সালে ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তি অনুযায়ী এই খালকে মিসরের সম্পত্তি বলে স্বীকার করা হয় এবং ১৯৫৪ সালে সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষার দায়িত্ব মিসরের হাতে ন্যস্ত করা হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আসওয়ানের ঋণ বাতিল করার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯৫৬ সালে ২৬শে জুলাই নাসের খালটি জাতীয়করণ করেন। কিন্তু নাসেরের নেতৃত্বে একটি জাতীয়তাবাদী সরকার কোম্পানিকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত খাল পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান করত কিনা তাও সন্দেহের বিষয়।

সুয়েজ খাল কোম্পানি জাতীয়করণের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ নেতিবাচক এবং এটা সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক লালিত প্রাচ্যের প্রতি ইউরোপীয়দের মধ্যে বিদ্যমান মনোভাবের পরিচয় প্রদান করে। ১৯৫০ সালে ইঙ্গ-ইরানি তেল কোম্পানি জাতীয়করণ করা হলে পাশ্চাত্য জগৎ পারস্যের প্রতি যে মনোভাব ব্যক্ত করে, মিসরের প্রতিও এখন অনুরূপ মনোভাবই প্রদর্শন করে। দ্বিমুখী পেরেকের ন্যায় এই মনোভাব প্রাচ্যের যোগ্যতা ও সাধুতা উভয়ের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

প্রয়োগ করা হয়। খাল পরিচালনার ব্যাপারে মিসরীয়দের যান্ত্রিক যোগ্যতা ও জ্ঞান উভয়ের অভাব রয়েছে বলে বলা হয়। তদুপরি, ইউরোপীয়গণ মনে করে যে খাল নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মিসরীয়দেরকে বিশ্বাস করা যায় না। 'ইউরোপের প্রয়োজনীয় তেলের অর্ধেকেরও অধিক তেল খালের মধ্য দিয়ে যায়, ফলে 'ইউরোপের বায়ুনলের ওপর মিসরের বৃদ্ধাঙ্গুলী থাকবে' বিধায় বিভিন্ন জাতির এই কোম্পানিতে মিসর দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে পারে না বলে মন্তব্য করা হয়।

মিসরকে নিরস্ত্র করার জন্য গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাদের সর্বশক্তি ব্যয় করে। তারা মিসরের সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াপ্ত করে, তাদের রিজার্ভবাহিনী তলব করে, নৌবাহিনীকে ভূমধ্যসাগরে ডেকে আনে এবং সাইপ্রাসে অবস্থিত তাদের ঘাঁটির স্থল ও বিমান বাহিনী শক্তিশালী করে। খাল কোম্পানির কার্যে নিয়োজিত তাদের পাইলটদেরকে তারা ফিরিয়ে নিয়ে যায় এবং অন্যান্য অ-মিসরীয় পাইলটদেরকেও পদত্যাগ করতে উৎসাহ প্রদান করে। খাল ব্যবহারকারী ১৮টি দেশের একটি সম্মেলন তারা আহ্বান করে এবং খাল পরিচালনার ব্যাপারে একটি "ব্যবহারকারীদের" কোম্পানি দ্বারা মিসরকে "সহযোগিতা" করার প্রস্তাব করে। জাতীয়করণকৃত কোম্পানিকে ব্রিটিশ ও ফরাসি জাহাজসমূহ নিয়মিত ভাড়া প্রদানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শদাতাগণ এ ব্যাপারে বিভক্ত হয়ে যায়। মার্কিনিগণ এই সকল সভা ও প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু সর্বান্তকরণে নয়। ১৯৫৬ সালের ৫ই অক্টোবর এ বিষয়টি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করা হয়, কিন্তু পারস্যের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করবে বলে কম লোকেই বিশ্বাস করে। অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদ খালের কার্যাবলি পরিচালনার জন্য ছয়টি নীতি ঘোষণা করে, যা বিজড়িত সকল দল কর্তৃক গৃহীত হয়।

ইসরাইলের মিসর আক্রমণ

আসলে ইঙ্গ-ফরাসি কর্তৃক জাতিসংঘের সুপারিশকৃত নীতি গ্রহণের ব্যাপারটি নিছক একটি ধাপ্পাবাজি। ১৯৫৬ সালের ২৯শে অক্টোবর ফ্রান্স ও ব্রিটেনের জ্ঞাতসারে ইসরাইল সিনাই আক্রমণ করে। পরদিন নাগাদ ইসরাইল ৭৫ মাইল অগ্রসর হয়। একই দিন ফ্রান্স ও ব্রিটেন উভয় পক্ষের নিকট যুদ্ধ বন্ধ করে স্ব স্ব বাহিনীকে খালের দশমাইল দূরে সরিয়ে নেবার জন্য একটি চরমপত্র প্রেরণ করে। নাসের এটা মান্য করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় ইঙ্গ-ফরাসি বিমান ও নৌবাহিনী মিসর আক্রমণ করে ও পোর্ট সাঈদ দখল করে। ইঙ্গ-

www.pathagar.com

ফরাসি-ইসরাইলি আঁতাত অতি উত্তম পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং অতি দ্রুত খাল দখল করে নাসেরের ক্ষমতাচ্যুতির আশা করে।

সোভিয়েত রাশিয়া হতে তারা আপত্তির আশঙ্কা করে, কিন্তু আক্রমণকারী বাহিনীসমূহ আশ্চর্য হয় যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হতে কঠোর নিন্দা লাভ করে। খুব সম্ভবত এই আক্রমণের সময় নির্ধারিত হয় মার্কিনিদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঠিক এক সপ্তাহ পূর্বে এবং আশা করা হয় যে, কোনো প্রার্থী স্থির মস্তিষ্কে ৫০ লক্ষ ইহুদির ভোট হারাবার জন্য ইসরাইলকে দোষী করবে না। পুনঃনির্বাচনের জন্য প্রার্থী প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার, বোধহয় তাঁর রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের উপদেশে কর্ণপাত না করে ইসরাইল ও এর দোসরদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, এই দুই বৃহৎ শক্তির মিলনকে হেলা করা যায় না। ডিসেম্বর নাগাদ ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনীদ্বয় মিসর ত্যাগ করে এবং ১৯৫৭ সালের মার্চ নাগাদ ইসরাইলি সৈন্যগণ সিনাই, গাজা অঞ্চল ও তিরান প্রণালী ত্যাগ করে। ইসরাইলি-মিসরীয় সীমান্তের উভয় পার্শ্ব এবং তিরান প্রণালীর প্রবেশ দ্বার পাহারা দেবার জন্য একটি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করা হয়। ইসরাইল জাতিসংঘ বাহিনীকে এর মাটিতে পদার্পণে আপত্তি জ্ঞাপন করে কিন্তু মিসর কোনো আপত্তি করেনি।

১৯৫৭ সালে এপ্রিল নাগাদ সুয়েজ খালের পথ বন্ধ করার জন্য মিসর যে সকল জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিল ঐগুলো পরিষ্কার করা হয়। মিসরীয়গণ অতি দক্ষতার সাথে খাল পরিচালনা করে এবং বস্তুত দ্বিমুখী জাহাজ চলাচলের জন্য একে প্রশস্ত করার বন্দোবস্ত করে। সাঈদ বন্দরের ধ্বংসলীলা, সিনাইয়ে পরাজয় এবং খাল হতে হৃত রাজস্বের মাধ্যমে মিসর বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক ফল লাভের দ্বারা এই ক্ষতি 'পরিশোধ' হয়। আরবগণ বিমোহিত হয় যে মাত্র কয়েক বছর পূর্বে সমগ্র মিসর ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের প্রভু ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন উভয়কে মোকাবিলা করে নাসের জয়যুক্ত হন। তাকে সত্যিকারের আরব জাতীয়তাবাদের নেতা এবং বৈদেশিক আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি হতে আরব জনগণের মুক্তিদাতা হিসাবে গণ্য করা হয়।

---

www.pathagar.com

উনবিংশ অধ্যায়
আরব জাহানে একতা ও বিভিন্নতা

আরব ঐক্যের রহস্য

আরবিভাষী জনগণ অনন্য অস্তিত্বের খোঁজে লিপ্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হতে তারা একতার বিষয়ে আলোচনা চালায়, অথচ পূর্ববত পৃথকই থেকে যায়; তারা একটি 'আরব জাতির' কথা বলে, অথচ একডজন ভিন্ন জাতির ন্যায় কাজ করে। তাদের একমাত্র অভিন্ন বিষয় হল ভাষা ও ধর্ম। এসব পরিচয় ইংরেজি ভাষী লোকজনকে একত্রিত করেনি, বা স্প্যানিশভাষী লোকদের মধ্যে এক জাতি হিসাবে নিজদেরকে পরিচয় দেবার মতো আগ্রহের জন্ম নেয়নি। বস্তুত মধ্যপ্রাচ্যের আরবিভাষী দেশগুলোর চেয়ে ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলোর মধ্যে সাদৃশ্যতা অনেক বেশি, অথচ শুধু মধ্যপ্রাচ্যের আরবিভাষী দেশগুলোই এক জাতিত্বের কথা বলে।

আরবিভাষী দেশসমূহের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী কারণগুলোর একটি হল সরকারের স্বরূপ। এখানে রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, একনায়কত্ব, আধা-একনায়কত্ব এবং সর্বশ্রেণি হতে পৃথক পারস্য উপসাগরের শেখতন্ত্র পর্যন্ত বিদ্যমান। অন্যান্য অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদের মধ্যে রয়েছে শিক্ষার মান এবং আধুনিক বিশ্বের প্রতি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউরোপীয় দোষ ও গুণাবলির দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ লেবানন ও মিসরের এখনও পঞ্চদশ শতাব্দীর অবস্থায় বসবাসকারী সৌদি আরব ও ইয়েমেনের চাইতে ফ্রান্স ও ইতালির সাথে অধিক ভাবের মিল পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। সৌদি আরব, কুয়েত ও ইরাকের ন্যায় 'বিত্তশালী' দেশগুলো মিসর, সিরিয়া ও অন্যান্য 'বিত্তহীন' দেশগুলোকে কেন তাদের সম্পদের ভাগ দেবে তা তারা বুঝতে পারে না। এসব কারণের সাথে হবু 'সংযুক্ত আরব জাতির' নেতৃত্ব নিয়ে মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যে বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেও শামিল করা যেতে পারে।

এই ঐক্যের ভাবধারা সাধারণ লোকদের মধ্যে কতদূর গভীর তা নিশ্চিত বলা দুষ্কর, তবে প্রশ্নাতীতভাবে শিক্ষিত সমাজ এর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে

www.pathagar.com

প্রভাবান্বিত। ফলে প্রত্যেক আরবিভাষী দেশের ইতিহাস পৃথকভাবে বর্ণনা করা দুরূহ ব্যাপার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দুটি বিষয়, আরেকটি নেতিবাচক ও অপরটি ইতিবাচক, আরব দেশসমূহের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনা জীবিত রাখে।

নেতিবাচক বিষয় ইসরাইল। এর প্রতিষ্ঠা সমস্ত আরবিভাষী দেশসমূহকে রাগান্বিত করে, এর উপস্থিতি তাদেরকে হতাশ করে, এর বাস্তব ও কাল্পনিক আগ্রাসনী নীতি তাদেরকে সন্ত্রস্ত করে। কিন্তু এই রাগ, হতাশা ও ভীতি আরবদেরকে মৌখিক ঐক্যের চাইতে অধিক কিছু দান করেনি। প্রায়ই অভিন্ন শত্রুর প্রতি ঘৃণা ও ভীতির দরুন বিভিন্ন দেশ একত্রিত হয়, যদিও তারা তাদের মতবাদ, সরকারের স্বরূপ ও নীতির দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই ব্যাপারে হিটলারের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মিলন একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইসরাইলের বিরুদ্ধে সমস্ত আরবদের ভীতি ও ঘৃণা থাকতে পারে, কিন্তু এই ধরনের মনোভাব তাদেরকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে একত্রিত করতে ব্যর্থ হয়। এর দ্বারা যে কেউ নিশ্চয়ই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে ইসরাইলের ব্যাপারে তাদের ঘৃণা ও ভীতি আরব দেশগুলোকে একে অপরের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী কোনো কোনো মতভেদের ন্যায় গভীর নয়।

আরব ঐক্যের ইতিবাচক বিষয় হল জামাল আবদ আল-নাসেরের ন্যায় জনপ্রিয় ও করিৎকর্মা নেতার উদয়। সালাহ আল-দ্বীন কর্তৃক ক্রুসেডারদেরকে (খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধা) পরাজিত করে জেরুজালেম দখল করার পর ফারটাইল ক্রিসেন্ট মিসরের জনগণ সম্ভবত তাঁর চাইতে অধিক জনপ্রিয় বা সত্যিকারের ক্ষমতাশালী নেতা লাভ করেনি। ইয়েমেন হতে মরক্কো পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক আরব বাজারে নাসেরের ছবি দেখা যায়। তিনি ব্রিটিশ সৈন্যদেরকে সুয়েজ ত্যাগের বন্দোবস্ত করেন, তিনি একজন দুর্নীতিপরায়ণ বাদশাহর কবল হতে মিরসকে মুক্ত করেন; তিনি সম্মিলিত ইঙ্গ-ফরাসি-ইসরাইলি যৌথ আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান; তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার সম্মান লাভ করেন এবং তিনিই ছিলেন আরব ঐক্যের আশাভরসা। এত কিছু সত্ত্বেও নাসের আরবদের ঐক্য সাধনে ব্যর্থ হন, কারণ তিনিও তাদের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী কারণগুলোর উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হননি।

সিরিয়া ও আরব ঐক্য

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সিকি শতাব্দীর ফারটাইল ক্রিসেন্টের আরবিভাষী দেশসমূহের ইতিহাস আংশিকভাবে আরব দেশসমূহের মধ্যে বিদ্যমান স্নায়ুযুদ্ধের

www.pathagar.com

পরিপ্রেক্ষিতে ইসরাইল ও নাসেরের নেতৃত্বের প্রতি প্রত্যেক দেশের প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস। আরব ঐক্যের আগ্রহ এবং তা লাভে অসুবিধার ব্যাপারে সিরিয়া একটি অতি উত্তম উদাহরণ। সিরিয়া যথার্থভাবে নিজেকে আধুনিক আরব জাতীয়তাবাদের আবাসস্থল হিসাবে দাবি করতে পারে। ওসমানীয় 'সিরিয়ার' চারটি স্বাধীন দেশে বিভক্তি (সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান ও ইসরাইল) এবং তন্মধ্যে একটি বিজাতীয় সত্তা খাঁটি সিরীয় জাতীয়তাবাদিগণ কখনও স্বীকার করেনি। এতদ্‌সত্ত্বেও, সিরিয়াবাসিগণ কখনও এক সুরে কথা বলতে পারেনি, কারণ তারা ধর্মীয়, জাতিগত ও আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত। ৮৫ শতাংশ মুসলমানগণ সুন্নি, শিয়া, আলাভি, ড্রুজেস, ইসমাইলিয়া ও ইয়াজিদী শ্রেণিতে বিভক্ত। স্বল্প সংখ্যক খ্রিস্টানগণও এক ডজন নামে বিভক্ত। প্রায় ১০ শতাংশ লোক আরবিভাষী নয়, যথা — কুর্দ, তুর্কমান ও কারকাসিয়ান। আরেক ১০ শতাংশ লোক বেদুঈন, যারা তাদের সংখ্যার চাইতেও অধিক বিভক্তি সৃষ্টি করে। কখনও কখনও দামেস্ক, হোমস, হ্যামা ও আলেপ্পো এই চারটি নগরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ কেন্দ্রীভূত হয়।

কোনো একটি বিশেষ সপ্তাহে একজন সিরিয়াবাসী সুন্নি হিসাবে অবশিষ্ট মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে; মুসলমান হিসাবে অ-মুসলিমদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে; একজন প্যান-আরব ধর্মনিরপেক্ষবাদী হিসাবে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে; একজন দামেস্কবাসী হিসাবে সিরিয়ার বাকি শ্রেণিগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে এবং একজন সিরীয় হিসাবে অন্যান্য আরব দেশসমূহের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। কিছুসংখ্যক সিরিয়াবাসী কোনোক্রমে এসব বাধাবিপত্তির ঊর্ধ্বে উঠতে পারলেও তাদের স্বাতন্ত্র্য তাদের সহযোগিতায় বাধা প্রদান করবে। সিরিয়া আরব জাহানের প্রতিকৃতি, যে সিরিয়া শাসন করতে পারে সে আরবদের একতাও আনয়ন করতে পারে।

১৯৪৬ সালে স্বাধীনতার দুই যুগ সময়ের মধ্যে সিরিয়ায় প্রায় দশটি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং সমসংখ্যক সংবিধান রচিত হয়। প্রত্যেক সরকার এর পূর্ববর্তী সরকারের কার্যাবলি রহিত করে। ১৯৪৯-১৯৫০ সালে সম্ভবত ফিলিস্তিন যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া হিসাবে পর পর তিনটি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। কর্নেল আদিব শিশাকলি কর্তৃক পরিচালিত শেষের অভ্যুত্থান বেশ কিছুকাল স্থায়ী হয়। তাদের দ্বারা একটি সংবিধান রচিত হয় এবং সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্বলিত একটি জনহিতকর রাষ্ট্রের (Welfare Sate) ভিত্তি স্থাপিত হয়। ভূস্বামী ঘটনা, পার্লামেন্ট বন্ধ করে দেন

www.pathagar.com

এবং রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ও ছাত্র সংগঠনসমূহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি একটি নতুন সংবিধান রচনা করেন, তাঁর নিজস্ব আরব মুক্তি দল (Arab Liberation Party) গঠন করেন এবং নিজেকে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেন। অবশ্য ১৯৫৪ সালে ফেব্রুয়ারিতে সমস্ত দলসমূহের একটি কোয়ালিশন দ্বারা শিশাকলি বহিষ্কৃত হন।

১৯৫৪ সালের অভ্যুত্থানের পর অনুষ্ঠিত তুলনামূলকভাবে স্বাধীন নির্বাচনে বা'থ (পুনরুত্থান) পার্টি ১৫টি আসন লাভ করে। ১৪২টি আসন বিশিষ্ট পার্লামেন্টে এটা খুব বেশি কিছু নয়, কিন্তু এই দল সিরিয়ায় যে ভূমিকা পালন করে তা উল্লেখযোগ্য। প্যান-আরব ও সমাজতন্ত্রী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ দুটি দলের সংমিশ্রণে ১৯৫৩ সালে বা'থ পার্টির জন্ম হয়। এটি শিল্প জাতীয়করণ, ভূমি বন্টন ও ব্যাপক সমাজ সংস্কারের উপর জোর দেয়। এই দলের নেতৃত্ব দান করেন মাইকেল আফলাক নামে একজন খ্রিস্টান এবং সালাহ্ আল বিতার নামক একজন মুসলমান। খাঁটি প্যান-আরব হিসাবে তাঁরা 'একটি স্থায়ী উদ্দেশ্যপূর্ণ এক আরব জাতিতে' বিশ্বাস করে। ১৯৫৪ ও ১৯৫৮ সালের মধ্যে বা'থপন্থীগণ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং লেবানন, জর্ডান ও ইরাকে তাদের শাখা প্রতিষ্ঠা করে। সংগঠন, মতবাদ ও প্রভাবের দিক হতে সিরিয়ায় বা'থ-এর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হল কমিউনিস্ট পার্টি।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (The United Arab Republic)

কর্নেল শিশাকলিকে বহিষ্কার করে একটি বেসামরিক কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায় আসবার পরও সিরিয়ার সমস্যার সমাধান হয়নি। বামপন্থী দলগুলো বাথ ও কমিউনিস্ট উভয়েই রক্ষণশীল ও মধ্যমপন্থী রাজনীতিবিদগণ কর্তৃক স্থিতিশীলতা আনয়নের প্রচেষ্টাকে তুচ্ছজ্ঞান করে। ১৯৫৬ সালে সিরিয়ার রক্ষণশীল ও মধ্যপন্থী রাজনীবিদগণ নাসেরের প্রভাবে আসেন এবং আশা করেন যে তিনি হয়তো তাদেরকে বামপন্থী আধিপত্য হতে রক্ষা করতে পারিবেন। বামপন্থী শিবিরেই মতবিরোধ দেখা দেয়, কমিউনিস্টগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে একাত্মতা চায়, কিন্তু বা'থপন্থিগণ স্বাধীন কর্মপন্থায় বিশ্বাস করে। কমিউনিস্টগণ সেনাবাহিনীর মধ্যে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করে এবং সিরীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক (Chief of Staff) জেনারেল আফিফ বিজরীকে সোভিয়েত সমর্থক দলে আনয়ন করে। কমিউনিস্টগণ যতই শক্তিশালী হয় ততই বা'থপন্থিগণ মিসরের সাথে সংযুক্ত হবার বিষয় চিন্তা করতে থাকে যা সিরিয়াকে

www.pathagar.com

কমিউনিজমের হাত হতে রক্ষা করবে এবং সমস্ত আরবদের ঐক্যের দিকে এক ধাপ এগিয়ে দেবে।

প্রথমে বা'থপন্থিগণ নাসেরকে একজন সামরিক একনায়ক বলে বিবেচনা করত এবং মিসরে রেভল্যুশনারি কমান্ড কাউন্সিলকে মতবাদবিহীন একটি দল বলে ঘৃণা করত। কিন্তু সুয়েজ কোম্পানি জাতীয়করণ ও সিনাই যুদ্ধের পর নাসের নিজেকে নতুন ভাবধারা নিয়ে পুনঃপ্রকাশ করেন। আর. সি. সি'র শ্লোগান—শৃঙ্খলা, একতা, কর্ম, অতঃপর গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সমবায় সমিতিতে পরিবর্তিত হয়। নাসের সমস্ত বিদেশি শিল্প ও সম্পত্তি 'মিসরীয়' করেন এবং তৎসঙ্গে অনেক মিসরীয় মালিকানাধীন ব্যক্তিগত শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করেন। এসব কার্যাবলির দ্বারা তিনি বা'থপন্থিদের চোখে অতি প্রিয় হয়ে ওঠেন। তারা নাসেরের দক্ষতার মধ্যে মতবাদ জাতীয় বিস্তৃতি যোগ করতে চায় এবং সমস্ত আরব জাহানের ঐক্য সাধন ও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠন করার ব্যাপারে তাঁর জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতা ব্যবহার করতে চায়।

১৯৫৮ সালের জানুয়ারিতে একটি কমিউনিস্ট সামরিক বিপ্লবে ভীত বা'থপন্থীগণ কায়রো গমন করে সংযুক্তির আবেদন জানায়। অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আরব রাষ্ট্রবর্গের সংযুক্তির ব্যাপারে হতাশ হয়ে এই দুই দেশ একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে—তা হল একটি সম্পূর্ণ এককেন্দ্রিক ঐক্য। এই ঐক্যকে সমস্ত আরবদের ঐক্যের পথে একটি পদক্ষেপ বলে অভিনন্দন জানানো হয়। ইউ. এ. আর. (U.A. R.)-এর প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে নাসের সমস্ত আরবদের প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। পাছে অতিক্রান্ত হয়ে যায় এ ভয়ে জর্ডান ও ইরাকের হাশেমীয় বাদশাহগণ একটি ফেডারেল ইউনিয়নের কথা ঘোষণা করেন, কিন্তু এটি এমনকি ঐ দেশের নাগরিকদের নিকটও গ্রহণযোগ্য হয়নি। ইউ. এ. আর, আরবদের ভবিষ্যৎ আশার স্থলে পরিণত হয়। কিন্তু এই আশা ছিল ক্ষণস্থায়ী।

লেবানন ও আরব ঐক্য

স্মরণ করা যেতে পারে যে লেবাননের লোকসংখ্যা খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে প্রায় অসমান বিভক্তির ফলে একে আরব জাহানে একটি অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে ফেলে। মেরোনাইটগণ সাধারণত ইউরোপীয় সমর্থক, আবার মুসলমানগণ অন্যান্য আরব দেশসমূহের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কামনাকারী। গোঁড়া ও অন্যান্য খ্রিস্টানগণ আরববাদের পক্ষে মতপ্রকাশ করে। এতদ্‌সত্ত্বেও খ্রিস্টান

www.pathagar.com

সংখ্যালঘুগণ একটি সংযুক্ত আরব মুসলিম দেশে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে শঙ্কিত বোধ করে। প্রথমে ১৯৪৩ সালে এবং সম্পূর্ণভাবে ১৯৪৬ সালে লেবানন স্বাধীনতা লাভ করলে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য প্রেসিডেন্ট বিশর আল-খুরী একটি জাতীয় চুক্তির প্রস্তাব করেন। কেরানি হতে ডিরেক্টর জেনারেল পর্যন্ত সমস্ত সরকারি পদসমূহ ১৯৩২ সালের আদমশুমারির উপর ভিত্তি করে একটি সুনির্দিষ্ট হারে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্টন করা হয়। চেম্বার অব ডেপুটিদের (Chamber of Deputies) আসনের সংখ্যা উঠানামা করলেও সর্বদা ১১ গুণিতকে থাকে—অর্থাৎ ছয়জন খ্রিস্টান ও পাঁচজন মুসলমানের হার।

বছরের পর বছর অতিক্রমের পর এই অলিখিত জাতীয় চুক্তি হাল্কা হয়ে ওঠে। মুসলমানগণ নিজেদেরকে 'দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে' পরিণত করছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে এবং একটি নতুন আদমশুমারির দাবি জানায়, যাতে তারা নিশ্চিত হয় যে, লেবাননে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রকাশ পাবে। ১৯৫৬ সাল নাগাদ নাসের একজন আরব জননায়ক হয়ে উঠলে লেবাননের মুসলমানগণ তাঁর অনুসারী হিসাবে পরিচয় দেয়। অপরদিকে মেরোনাইটগণ আরও ইউরোপীয় সমর্থক হয়ে ওঠে। মুসলমানগণ এবং কিছুসংখ্যক খ্রিস্টান লেবাননের প্রেসিডেন্ট চেমনকে অ-মেরোনাইটদের বিরুদ্ধে বৈষম্য সৃষ্টির অভিযোগে অভিযুক্ত করে। ইউ. এ. আর-এর প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে নাসের দামেস্ক সফরে আসলে লক্ষ লক্ষ লেবাননি তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য তথা গমন করে এবং এই ইউনিয়নে লেবাননের যোগদানের আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে। এই ঘটনার সাথে চেমন সরকারের সাধারণ অসন্তোষ এবং চেমন কর্তৃক সংবিধান পরিবর্তন করে আরেক মেয়াদ ক্ষমতায় থাকার গুজব যুক্ত হওয়ায় মুসলমানগণ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় লিপ্ত হয়।

সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহিগণ মিসর হতে সামরিক সরবরাহ লাভ করে বলে লেবাননি সরকার অভিযোগ করে এবং এই বিষয়টিকে আরব লীগে উত্থাপন করে। লীগ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় লেবানন বিষয়টি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করে। অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদের পর্যবেক্ষক দল এই অভিযোগের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ লাভে ব্যর্থ হয়। ১৯৫৮ সালে গ্রীষ্মের মাঝামাঝিতে লেবাননে বস্তুত গৃহযুদ্ধই আরম্ভ হয়ে যায়। অবশ্য তাহা খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে নহে। এই ক্ষেত্রে মেরোনাইট ধর্মীয় নেতারা চেমনের নীতির বিরুদ্ধে যান এবং আশংকা প্রকাশ

www.pathagar.com

করেন যে চেমনের নীতি আরব জাহানে সমস্ত খ্রিস্টানদের অবস্থা সঙ্গীন করে তুলবে।

১৯৫৮ সালের ১৪ই জুলাই ইরাকে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা সে দেশে হাশেমীয় বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। এটা নাসের সমর্থক বিদ্রোহ বলে সুনাম অর্জন করায় চেমন শঙ্কিত হয়ে উঠেন, পাছে লেবাননেও অনুরূপ অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং তাই আইসেন হাওয়ার মতবাদ (Eisenhower Doctrine) কার্যকরী করিবার জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানান। ১৯৫৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের অনুমোদিত এই বিতর্কিত মতবাদের উদ্দেশ্য হল বহিরাক্রমণ হইতে নিজদিগকে রক্ষা করার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে সাহায্য করা। প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার এই আবেদনে সাড়া দেন। অতঃপর লেবাননে মার্কিন সৈন্য অবতরণ করে।

ইরাকি বিপ্লব

স্মরণ করা যেতে পারে যে ইরাক সরকার ছিল যুবক বাদশাহ্ ফয়সালের নেতৃত্বে স্বল্প সংখ্যক ভূস্বামী, গোত্রীয় শেখ, সামরিক অফিসার ও বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদদের হাতে। তেল সেলামির মোটা অংক লাভ করা সত্ত্বেও জনসাধারণের দারিদ্র্য ছিল হৃদয়বিদারক। পারস্যের তেল শিল্প জাতীয়করণের ফলে ১৯৫১ সালে ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানি ইরাকি সরকারের সাথে মুনাফার ৫০-৫০ শেয়ারের বন্দোবস্ত করে। কিন্তু এই অংকের তেমন কিছু জনগণের নিকট যায়নি। বিভিন্ন বেসরকারি প্রকল্পে তেলের আয় ব্যবহার করার জন্য একটি উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয় কিন্তু এসব প্রকল্পের অধিকাংশই ছিল ভূস্বামীদের উপকারার্থে।

মিসরের ভূমি সংস্কারের ফলে ইরাকি চাষীদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং ১৯৫৬ সালে মিসরীয় যুদ্ধের দ্বারা নাসের ইরাকিদের চোখে পরমপ্রিয় জননায়কে পরিণত হন। বিপ্লবের ব্যাপারে ইরাকিগণ সিরিয়াবাসীদের সাথে টেক্কা দিতে পারে না, কিন্তু তাদেরকে দ্বিতীয় স্থান দেয়া যেতে পারে। ১৯৩৪ হতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ইরাকিগণ বিভিন্ন মাত্রার গোলযোগের মাধ্যমে আটটি বিপ্লব সংঘটিত করে। ১৯৫৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থান হলে জেনারেল আব্দ আল-করিম কাশেমের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সাথে অনেকগুলো জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী দলসমূহের সহযোগিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এটি মিসরীয় বিপ্লব হতে ভিন্ন প্রকৃতির, কারণ এতে সবাই সেনাবাহিনীর লোক ছিল না এবং দাঙ্গা-

www.pathagar.com

হাঙ্গামাও এতে অনেক বেশি সংঘটিত হয়। ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে হত্যা ও লুটতরাজকারী জনতাকে বাগদাদের রাস্তায় ছেড়ে দেয়া হয়। বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ বাদশাহ ফয়সল, যুবরাজ আবদুল ইলাহ ও প্রধানমন্ত্রী নূরী আল-সাঈদকে হত্যা করে। বিপ্লবের বেসামরিক পক্ষে থাকে বা'থপন্থী কমিউনিস্ট এবং আরও কয়েকটি দলের সদস্যবৃন্দ।

হাশেমীয় রাজত্বকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর জেনারেল কাশেমের নেতৃত্বে ইরাকি সরকার জর্ডানের সাথে স্বাক্ষরিত ফেডারেশন হতে বের হয়ে আসে। বাগদাদ চুক্তির সাথে সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও লাল চীন উভয়কে স্বীকৃতি প্রদান করে। নাসের তাঁর অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করেন এবং সিরীয় বা'থপন্থিগণ ইরাকে তাদের দলীয় সদস্যদেরকে ইউ. এ. আর. (U.A. R.)-এ যোগদান করার আহ্বান জানায়। এটি হল আরবদের সর্বকালের অতি ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণ। সিরিয়া ও মিসরের ঐক্য বাস্তব রূপ লাভ করে, দৃশ্যত নাসের সমর্থক একটি দল ইরাকে ক্ষমতায় আসে, লেবাননে একটি প্যান-আরব বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং এমনকি ইয়েমেনও ইউ.এ.আর-এর সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক করতে সক্ষম হয়।

জর্ডানের ভবিষ্যৎ

চতুর্দিকে বিপ্লবী বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ জর্ডানের যেন সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রে যোগদান করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশ হতে হাশেমীয় বাদশাহকে প্রথমে বহিষ্কার না করে জর্ডান ইউ. এ. আর-এ যোগদান করতে পারে না। জর্ডানে হাশেমীয় পরিবারের অবস্থাও শোচনীয়, কারণ একটি স্থানীয় বিশেষ সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত ব্রিটিশ সরকার কৃত্রিম উপায়ে জর্ডান রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। ফিলিস্তিনের কিয়দংশ জর্ডানের হাশেমীয় রাজত্বের সাথে অন্তর্ভুক্তির পর বাদশাহর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে।

জর্ডানের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ফিলিস্তিনি, যারা জর্ডান নদীর পূর্ব তীর অধ্যুষিত বেদুঈনদের তুলনায় অধিক শিক্ষিত এবং রাজনীতির দিক থেকে অধিক সজাগ। ইসরাইল রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং পরাজয়ে হতাশ এসব ফিলিস্তিনিগণ জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহকে তাদের দুর্দশার জন্য প্রধানত দায়ী বলে মনে করে। ১৯৪৮ সালে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আরবদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা নস্যাৎ করার জন্য তারা তাঁকেই দায়ী করে। ১৯৫১ সালে জুলাই মাসে তাদের একজন সদস্য জেরুজালেমের আক্সা মসজিদে বাদশাহ্ আবদুল্লাহকে হত্যা করে।

www.pathagar.com

আবদুল্লাহর পুত্র তালাল তাঁর উত্তরাধিকারী হন কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ১৯৫৩ সালে তাঁর ১৮ বছর বয়স্ক পুত্র হোসাইনের স্বপক্ষে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। দৃঢ়চিত্ত ও সাহসী বলে পরিচিত হোসাইন প্রবল বাধাবিপত্তির মুখে দেশের ফিলিস্তিনি ও বেদুঈন লোকদের মধ্যে একটি সমঝোতার সৃষ্টি করেন। নাসেরের উত্থান ফিলিস্তিনিদের মনে নব আশার সঞ্চার করে। তারা নাসেরের মাধ্যমে ইসরাইলকে পরাজিত করে তাদের মৃতদেহ পুনরুদ্ধার করার পথ খুঁজে পায়। হোসাইনের অবস্থা সঙ্গীন আকার ধারণ করে। তিনি ইউ. এ. আর-এ যোগদান করতে পারেন না বা সিংহাসন ত্যাগ না করে ইসরাইলের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতেও পারেননি। তিনি ইউ. এ. আর. কর্তৃক আক্রান্ত হলে 'প্রতিরক্ষামূলক' ব্যবস্থা হিসাবে ইসরাইল জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর দখল করে নিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র হতে তাঁর সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য লাভের ফলে ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদিগণ সন্তুষ্ট হয়নি, কিন্তু এটা তাঁর ক্ষমতায় থাকবার ব্যাপারে সহায়তা করে ১৯৫৮ সাল ইরাকি বিপ্লবের পর হোসাইন প্রকৃত হুমকির সম্মুখীন হন। তাই তিনি গ্রেট ব্রিটেনের নিকট আবেদন জানান এবং আরব প্রতিবেশীদের হাত হতে জর্ডানকে রক্ষা করার জন্য প্রায় ২০০০ ব্রিটিশ সৈন্য আনয়ন করেন।

কাশেম ও নাসের

ইরাকের কাশেম জনগণের আশানুযায়ী প্যান-আরব বিপ্লবী বলে প্রমাণিত হননি। আবার নাসের কর্তৃক অভিযুক্ত প্রতিক্রিয়াশীলও তিনি নন। কমিউনিস্ট ও প্যান-আরব বামপন্থীদের একটি কোয়ালিশনের পুরোধা হিসাবে তিনি ক্ষমতায় আগমন করেন। তবে তিনি একজন ইরাকি জাতীয়তাবাদী, যিনি ইরাকের অ-প্যান আরবপন্থীদের সাথে স্বদেশের সার্বভৌমত্ব ও সম্পদ নাসেরে সাথে ভাগাভাগি করতে রাজি হননি। ক্ষমতায় আরোহণের ব্যাপারে তিনি বা'থপন্থী ও কমিউনিস্টদের ব্যবহার করেন এবং অতঃপর বা'থপন্থীদের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য কমিউনিস্টদের ব্যবহার করেন। প্যান-আরব জাতীয়তাবাদীদের অন্যতম কর্নেল আবদ-আল সালাম আরিফ ১৯৫৮ সালের বিপ্লবের দুই দিন পর দামেস্কের নাসেরের সাথে জনগণের প্রশংসা কুড়ান। তিন মাস পর মৃত্যুদণ্ডাদেশ সহ তাঁকে বাগদাদ জেলে অবস্থান করতে হয়।

প্রায় তিন বছর যাবৎ কমিউনিস্টগণ ইরাকে স্বাধীন থাকে। তাদের বেশ উত্তম সংগঠন ও অনেক প্রকাশ্য দল থাকে। তারা একটি প্রকাশ্য 'গণআদালত' প্রতিষ্ঠা করে এবং এতে তারা প্রাক্তন সরকারের সদস্যদের বিচার করে। এসব

www.pathagar.com

বিচারে ইউ. এ. আর-এর প্রেসিডেন্ট নাসের সম্পর্কে অনেক বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করা হয়। ১৯৫৯ সালে মৌসুলে সংঘটিত একটি ইউ. এ. আর. সমর্থক কাশেম বিরোধী বিপ্লব নৃশংসভাবে দমন করা হয়। কয়েক মাস পর কাশেমের জীবনের উপর একটি আক্রমণের জন্য মিসরে নাসেরকে দায়ী করা হয়। এই দুইয়ের মধ্যে শত্রুতা দিন দিন বৃদ্ধি পায়। প্যান-আরব জাতীয়তাবাদিগণ তাঁদের ঐক্যের লক্ষ্যে পৌঁছবার উপক্রম হলে সাধু-দর্শন ও সাধু-জীবন নির্বাহকারী জেনারেল কাশেম কমিউনিস্টদের সহায়তায় 'ইরাক ইরাকিদের জন্য' এই ধুয়া উত্থাপন করে।

লেবাননে সমাধান

আরব ঐক্যের জন্য ১৯৫৮ সাল একটি সঙ্কটাকীর্ণ বছর। এই বছর প্যান-আরবপন্থিগণ ইউ. এ. আর প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বে আনন্দ উপভোগ করে, আবার এই ঐক্য ভেঙে পড়বার দুঃখও অনুভব করে। সর্বাগ্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায় লেবানন। মার্কিন সৈন্যগণ কোনো প্রকার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি কিন্তু তাঁদের উপস্থিতির ফলে গৃহযুদ্ধ বিরোধী পক্ষ চুপ হয়ে যায়। ১৯৫৮ সালের ৩১শে জুলাই পার্লামেন্ট চেমনের উত্তরাধিকারী হিসাবে জনপ্রিয় জেনারেল ফুয়াদ শেহাবকে নির্বাচিত করে। নতুন প্রেসিডেন্ট গৃহযুদ্ধে মুসলিম বিরোধী দলের নেতা রশীদ কারামীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। সমসংখ্যক খ্রিস্টান ও মুসলমান নিয়ে গঠিত একটি নতুন 'উদ্ধারকারী মন্ত্রিসভা' পুনর্গঠন ও শান্তি স্থাপনের কাজ আরম্ভ করে।

ঘটনা পরম্পরা সম্ভবত অধিকাংশ লেবাননিকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, আন্তঃআরব স্নায়ুযুদ্ধে তাদের দেশের পক্ষে 'নিরপেক্ষ' থাকাই শ্রেয়। মধ্যপ্রাচ্যের আরবদের জন্য একটি 'নিরপেক্ষ সুইজারল্যান্ড' প্রয়োজন এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জনগণের অন্তর্নিহিত স্বভাবের দরুন একমাত্র লেবাননই সেই ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রাচীন ফুনিসিয়ান (Phoenician) বলে গর্বিত লেবাননিগণ আন্তঃআরব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণকারী হবার চাইতে আরব জাহানের অর্থবিষয়ক পরিচালনাকারী হিসাবেই ভাল করতে পারে। লেবাননের অসংখ্য ব্যাংকে প্রায় সমস্ত আরব দেশেরই হিসাব (Account) রয়েছে এবং ব্যাংকগুলোও এইসব দেশের অনেক শিল্প উন্নয়নেও অর্থ প্রদান করে থাকে। লেবানন অনেক সুবিধাদি উপভোগ করে। ইউরোপের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো হতে এই দেশে সমুদ্র ও বিমান উভয় পথে প্রবেশ করা যায় এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্য

www.pathagar.com

দেশসমূহে প্রায়ই বিদ্যমান বাণিজ্যিক বা অর্থবিষয়ক কোনো জটিলতাও এখানে প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে ইসরাইল ব্যতীত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পুঁজি বিনিয়োগকারী প্রায় সমস্ত বিদেশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অফিস লেবাননেও বিদ্যমান।

আরব দেশসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিবিদদের জন্য একটি নিরপেক্ষ লেবানন প্রয়োজন। সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেন ও এমনকি সৌদি আরবে যতদিন বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব চলতে থাকে, ঘটনাদৃষ্টে যেরূপ মনে হয়, পরাজিত পক্ষের জন্য নিরাপদ স্থান প্রয়োজন এবং নিজেদের বিভেদ দূর করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রয়োজন একটি নিরপেক্ষ স্থান। পারস্য উপসাগর ও সৌদি আরবে তেল সমৃদ্ধ শেখগণ সুইজারল্যান্ডের চাইতে লেবাননকেই সুন্দর ও অধিক সুবিধাজনক মনে করেন। লেবাননের শীতল পর্বতে তাঁরা তাঁদের সুরম্য প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করেন এবং কোনো দোভাষী ছাড়াই তাঁরা ইউরোপের ভাল ও খারাপ জিনিসসমূহ উপভোগ করেন। বৈরুতের এক ডজনেরও অধিক দৈনিক পত্রিকাসমূহের প্রায় সবগুলোই কোনো না কোনো আরব দেশ কর্তৃক সাহায্যকৃত। লেবাননি পার্লামেন্টের আসন ও মন্ত্রিসভায় মুসমানদের সংখ্যা এইসব দলের নেতৃবৃন্দের সমান সুযোগেরই ইঙ্গিত বহন করে।

ইউ.এ আর-এর বিলুপ্তি

লেবানন একটি খাঁটি আরব দেশ নয় বলে এর স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া অন্যাদের জন্য অনুকরণযোগ্য আদর্শ হয়নি। ইরাকের জেনারেল কাশেম যেহেতু প্যান-আরব জাতীয়তাবাদী নন, তাই সিরিয়ার বা'থপন্থিগণ অসন্তুষ্ট ও হতবুদ্ধি হয়ে যায়। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক উভয় দিক হতে সিরিয়ার সাথে স্বাভাবিকভাবে ঐক্য স্থাপিত হতে পারে ইরাকের, মিসরের নহে। সিরিয়ার বা'থপন্থিগণ মিসরের নিকট ঐক্যের আবেদন জানায়, কারণ ইরাকের হাশেমীয় শাসকবৃন্দ নীতিগতভাবে তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। ইরাকি রাজতন্ত্রের পতনের ফলে ঐক্য আসেনি এবং সিরিয়াবাসিগণ সর্বদা নিজেদেরকে মিসরের হাতে নিষ্পেষিত দেখতে পায়। তাই তারা এই ঐক্যের উপকারিতা সম্পর্কে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে আরম্ভ করে।

সিরিয়ার অন্যান্য দলসমূহ যথা—মধ্যমপন্থিগণ, রক্ষণশীল দল, সামরিক ও ছোট ছোট ব্যবসায়িগণ ক্রমশ অনুধাবন করে যে ঐক্যের সমান অংশীদার হবার পরিবর্তে সিরিয়া মিসরের একটি প্রদেশে পরিণত হচ্ছে। মিসরীয় চাহিদার উপর

www.pathagar.com

ভিত্তি করে আরোপিত অর্থনৈতিক নিয়মকানুনে ব্যবসায়ী ও দোকানদারগণ দুর্ভোগে নিপতিত হয়। সেনাবাহিনী বিরক্ত হয়; কারণ এটা ইউ. এ. আর-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হাকিম আমেরের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। আমের সিরিয়ায় নাসেরের শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করেন। ঐক্যের অতি উৎসাহী উদ্যোক্তা বা'থপন্থিগণই সর্বাধিক দুর্ভোগে পড়ে। তারা তাদের নিজস্ব দলসহ সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত মেনে নেয় এবং বিশ্বস্ততার সাথে আশা করে যে ইউ. এ. আর-এর নতুন ন্যাশনাল ইউনিয়ন পার্টি গঠন করার বেলায় তাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হবে। কিন্তু নাসের তাদেরকে সেই সুযোগ দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। বস্তুত ১৯৫৯ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনে বা'থপন্থিগণ সম্পূর্ণভাবে সরকার হতে বহিষ্কৃত হয়। সম্ভবত কঠোরতম আঘাত আসে যখন নাসের জর্ডান ও সৌদি আরবের ন্যায় প্রাক্তন শত্রুদের সাথে সহযোগিতা আরম্ভ করেন, যাদের বিরুদ্ধে নাসের ও বা'থপন্থিগণ উভয়েই অনেক প্রতিহিংসামূলক কাজ করেছেন।

যে কারণেই হোক, নাসের সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে বর্তমান কৃষি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পার্থক্য বিবেচনা করেননি এবং সিরিয়ার ওপর তারা 'আরব সমাজবাদ' চাপায় দেন, যা মিসরীয় চাহিদা অনুযায়ী সৃষ্ট। অপরদিকে সিরিয়ার বা'থমতবাদিগণ নাসেরে মৌলিকতা অনুধাবন করে নাই। নাসের ক্ষেত্রভেদে মতবাদমূলক আদর্শ স্থাপন করেন বা পরিহার করেন। নাসের কোনো চ্যালেঞ্জ ছাড়াই ইরাকের নাসেরপন্থীদেরকে কাশেম কর্তৃক জেলে আবদ্ধ রাখতে দেন নি। আবার জর্ডান ও সৌদি আরবে সাহায্য ছাড়া তিনি কাশেমকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন না। ১৯৫৯ সালের গ্রীষ্মে নাসের জর্দানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং আরবের বাদশাহ্ সউদকে সম্মানিত অতিথি হিসাবে কায়রোয় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তদুপরি, অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন নাসেরের বিরুদ্ধে কাশেমের সহায়তা করে। ফলে নাসের যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে বাধ্য হন।

অবস্থা চরম আকার ধারণ করে ১৯৬১ সালের জুনে যখন কুয়েতের ওপর ১৮৯৯ সালে চাপানো ব্রিটিশ হুকুমনামা উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং তেলসমৃদ্ধ এই দেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হয়। এই উপলক্ষে কাশেম কুয়েতকে ইরাকের অংশ বলে ঘোষণা করেন এবং এটা অধিকার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কুয়েতের শাসক শেখ সঙ্গে সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের সাথে স্বাক্ষতির চুক্তি প্রয়োগের আহ্বান করেন এবং ব্রিটিশ সৈন্য দ্বারা ইরাকের বিরুদ্ধে তাঁর দেশ

www.pathagar.com

রক্ষার বন্দোবস্ত করেন। আদর্শগতভাবে একটি প্রকৃত আরব কর্তৃক একটি প্রতিক্রিয়াশীল শেখ শাসিত রাষ্ট্র করায়ত্ত করার প্রচেষ্টায় ইউ. এ. আর-এর সমর্থন দান করার কথা। কিন্ত কাশেম নাসেরের পরম শত্রু এবং তাই তাঁকে এ কাজ করতে দেয়া যায় না। ফলে কাশেমের হাত হতে কুয়েত রক্ষা করার ব্যাপারে নাসের কর্তৃক ব্রিটিশদের সহযোগিতা করার এই অসাধারণ ঘটনা আরবগণ অবলোকন করে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে ব্রিটিশ সৈন্যগণ কুয়েত ত্যাগ করে এবং মিসর, জর্ডান ও সৌদি আরবের সম্মিলিত সেনাবাহিনী অপর এক আরব দেশের হাত হতে কুয়েতের প্রতিরক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হয়।

মিসরবাসিগণ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। ১৯৬১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর সিরীয় অফিসারগণ একটি বিপ্লব সংঘটিত করেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট আমের ও অন্য মিসরীয় অফিসারবৃন্দকে সিরিয়া ত্যাগের আদেশ প্রদান করেন। নাসের এই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেননি এবং সিরিয়া ও মিসরের পৃথকীকরণ গ্রহণ করেন। বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ একটি নির্বাচনের বন্দোবস্ত করেন; প্রায় সমস্ত পুরাতন দলসমূহ আসন লাভ করে (যদিও বা'থপন্থিগণ শুধু ১৮টি আসন লাভ করে) এবং ইউ. এ. আর-এর প্রায় সমস্ত কার্যাবলি নাকচ করে। আরব ঐক্যের মনোভাব সিরিয়া তবুও ত্যাগ করেনি। এটি একটি জাতীয় ঐক্য দলিল (National Unity Charter) প্রণয়ন করে এবং একটি 'স্বেচ্ছামূলক' সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র গঠনের সুপারিশ করে। অভ্যন্তরীণ দিক হতেও এটি তেমন পরিবর্তিত হয়নি কারণ ১৯৬২ সালে মার্চ মাসে সেখানে আর একটি বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং এর নেতৃবৃন্দ ইউ. এ. আর-এর কিছু কিছু সংস্কার পুনর্বহাল করতে চেষ্টা করেন।

ইতোমধ্যে বা'থ দলের ইরাকি শাখা ১৯৬৩ সালের ৮ই মার্চ কাশেমের বিরুদ্ধে একটি বিপ্লব করে। বিপ্লবের নেতা আবদ আল-সালাম আরিফ, যার মৃত্যুদণ্ডাদেশ কাশেম রহিত করেন, কাশেম ও তাঁর বামপন্থী সমর্থকদের মৃত্যুদণ্ড দান করেন। নাসের আরিফের নিকট তাঁর অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করেন। বা'থ পার্টির সিরীয় মন্ত্রণাদাতা মাইকেল আফলাক তাঁর ইরাকি সহকর্মীদের সাথে দীর্ঘ সভায় মিলিত হন। ১৯৬৩ সালের ৮ই মার্চ সিরিয়ায় আরও একটি বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং বহুসংখ্যক সামরিক অফিসার ক্ষমতায় আসেন, যারা বা'থপন্থী না হলেও এর ভাবধারার প্রতি সহানুভূতিশীল। পুনরায় ইরাক, সিরিয়া ও মিসর এই তিনটি দেশ সংযুক্তির জন্য সভায় মিলিত হয় এবং প্রত্যেকটি সভা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের ভেতর শেষ হয়। এতকিছু সত্ত্বেও মিসরীয়, ইরাকি ও সিরীয় নেতৃবৃন্দ সংযুক্তির কথা বলেন এবং স্ব স্ব পতাকার নকশায় তিনটি তারকা অনুমোদন করেন।

www.pathagar.com

নাসের ও আরব সমাজবাদ

প্যান-আরববাদের জন্য নাসের তাঁর প্রচুর জীবনীশক্তি ব্যয় করেন এবং এর জন্য তিনি শুধু 'ইউ. এ. আর'. নামটি রেখে যেতে সক্ষম হন। এ নাম চালু রাখবার ওপর তিনি প্রবল জোর দেন, শুধুমাত্র লক্ষ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটা প্রতীক হিসাবে। তিনি অবশ্য স্বদেশের সংস্কার সাধন হতে বিরত হননি। তিনি ও তাঁর বন্ধুগণ কোনো সুনির্দিষ্ট মতবাদের কর্মসূচি ছাড়াই ক্ষমতায় আসেন। ফলে কোনো পূর্ব নির্ধারিত মতবাদের গণ্ডির ভেতর তিনি আবদ্ধ ছিলেন না, যদিও বিভিন্ন কর্মসূচি তিনি গ্রহণ করতে পারতেন ও দিন দিন অবস্থার বিবর্তন করতে পারেন। সম্ভবত ভারতের নেহরুর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ, যুগোশ্লাভিয়ার টিটোর সাথে তাঁর বন্ধুত্ব, তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর, সিরিয়ার বা'থপন্থীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক এবং সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের সাধারণ চাহিদার দরুন তিনি সমাজতন্ত্রের অনুরূপ একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে ভূমি সংস্কার দ্বারা তিনি এটা সূচনা করেন। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল কোম্পানি ও অন্যান্য অনেক বিদেশি ব্যবসা জাতীয়করণ করা হলে শিল্প সংস্থাসমূহ পরিচালনার জন্য সরকার একটি অর্থনৈতিক সংস্থা স্থাপন করে। অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক সংস্থা শিল্প, বাণিজ্যিক, অর্থবিষয়ক ও কৃষি প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করতে শুরু করে। বস্তুত বিদেশি ব্যবসাসমূহ হাতে নেবার ফলে অর্থনৈতিক সংস্থা গঠন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

জাতীয় আয়ের ৫০ শতাংশ যেহেতু মাত্র দেড় শতাংশ লোকের হাতে যায়, তাই নাসের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যথা—তুলা, সার, বীমা, লোহা, জনহিতকর কাজ, ইস্পাত ও কাপড় সমস্ত কিছু জাতীয়করণের আদেশ প্রদান করেন। শুধু ছোট শিল্পগুলো বেসরকারি লোকদের হাতে রেখে দেন। সমস্ত বেতন সীমাবদ্ধ করা হয় এবং ১০০০ মিসরীয় পাউন্ডের ঊর্ধ্বে সমস্ত আয়ের ওপর ৯০ শতাংশ কর ধার্য করা হয়। মাথাপিছু সর্বোচ্চ জমির মালিকানা নির্ধারিত হয় ২০০ হতে ১০০ ফেদ্দানে। শ্রমিকদের উপকারার্থে বিশেষ আইন রচনা করা হয়। প্রত্যেকের একটির বেশি চাকুরি নিষিদ্ধ করার ফলে অনেক শিক্ষিত বেকারদের চাকরির সংস্থান হয়।

বস্তুত নাসেরের আমলের প্রথম দশ বছরের গৃহনির্মাণ, স্কুল, হাসপাতাল ও পঙ্গুদের জন্য আবাসগৃহ, সমাজকল্যাণ কেন্দ্র ও কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

মিসর গর্ব করতে পারত যা আর. সি. সি. (R. C. C.) ক্ষমতারোহণের পূর্বে অর্ধ শতাব্দীতেও হয়নি। ১৯৫৯ সালে নীল নদ ব্যবহারের ব্যাপারে মিসর ও সুদানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং উচ্চ আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ৩০ কোটি ডলারের একটি ঋণ মঞ্জুর করে। মিসরে আর.সি. সি. প্রথম সরকার যে জনসংখ্যা সমস্যার ওপর গভীরভাবে চিন্তা করে এবং পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করে। নিরক্ষরতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য আরও অসুবিধাদি বিরাজ করলে সম্ভবত এসব সংস্কারাদি, এমনকি আসোয়ান বাঁধ নির্মাণ সমাপ্ত হলেও জীবনযাত্রার মানে কোনো পার্থক্য সূচিত হবে না। কিন্তু জনসাধারণের এসব সংস্কার মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রবলভাবে দেখা দেয় এবং মিসরীয়দের মিসর দেশ প্রগতির পথে যাত্রা শুরু করে।

ইয়ামেনের ঘটনা

আরব জাহানে এর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব এবং নাসেরের জনপ্রিয়তার দরুন মিসরকে সমগ্র আরব জাহানে সংঘটিত সমস্ত ঘটনাবলিতে জড়িত থাকতে হয়। ১৯৬২ সালে ইয়ামেনে সংঘটিত একটি সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে এক বিপ্লবী সরকার ক্ষমতায় আসে। নাসের এই বিপ্লবী সরকারকে সমর্থন দান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ইয়ামেনের ব্যাপারে নাসেরের "হস্তক্ষেপকে" তাঁর সাম্রাজ্যবাদী নীতির অংশবিশেষ বলা হয়ত ভুল হবে। সম্ভবত ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রদর্শন এতে ছিল, কিন্তু আরব ঐক্যের বিষয় চিন্তা করলে, যাকে অধিকাংশ শিক্ষিত আরব একটি অতি আকাঙ্ক্ষিত 'বিষয়' বলে বিবেচনা করে, সমগ্র আরব জাহানে যে কোন প্রগতিশীল আরব দেশের উচিত সর্বত্র সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের সহায়তা করা।

ইয়ামেন একটি নিভৃত দেশ। ১০০০ বছরেরও অধিককাল পর্যন্ত এটা বহিঃপ্রভাব হতে বঞ্চিত। জায়েদি শিয়া বংশানুক্রমিক ইমামগণ দ্বারা ধর্মতন্ত্র হিসাবে এ দেশ শাসিত হয়। ১৯৪৫ সালে ইয়ামেন আরব লীগে যোগদান করে এবং ১৯৪৭ সালে এটি জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৫৮ সালে ফেডারেল ব্যবস্থায় ইয়ামেন ইউ. এ. আর.-এ যোগদান করে। ১৯৬১ সালে ইউ.এ. আর. বিলুপ্ত হলে নাসের ইয়ামেনের সাথে ফেডারেল আকারে সংযুক্তি নাকচ করেন। এক বছর পর ইয়ামেনে একটি বিপ্লব হয় এবং নাসেরকে এতে উস্কানি প্রদানের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। ইয়ামেনে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। মিসর বিপ্লবী সরকারের পক্ষাবলম্বন করে এবং সৌদি আরব বহিষ্কৃত ইমামের সাহায্য করে। যুদ্ধ ছয় বছর স্থায়ী হয় এবং মিসর তার শক্তি এবং লক্ষ লক্ষ ডলার

www.pathagar.com

ইয়ামেনে খরচ করতে বাধ্য হয়। বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপিত হয় এবং মিসর ও সৌদি আরবকে গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ হতে বিরত রাখার জন্য জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ করে। কিন্তু ১৯৬৭ সালে ইসরাইল আরব দেশসমূহ আক্রমণ করার সময় শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হলেও এর পরিসমাপ্তি ঘটেনি।

আরব-ইসরাইল যুদ্ধ

১৯৬৩ সালে ঐক্যের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে মিসর ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের আরব দেশসমূহ তাদের চিরাচরিত পন্থায় ফিরে যায়। এর সাধারণ অর্থ হল সিরিয়া ও ইরাকে একটির পর একটি এবং আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ। শুধুমাত্র ইসরাইলের বিরুদ্ধেই তারা ঐকমত্যে পৌঁছেতে সমর্থ হয়। যথারীতি সিরিয়াই অগ্রণী থাকে। তারা খাঁটি আরব এবং যে কোনো দেশের চাইতে ইসরাইলের প্রবলতম বিরোধী বলে দাবি করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন মিসর ও সিরিয়াকে অস্ত্র প্রদান করে; ফ্রান্স ইসরাইলের নিকট অস্ত্রশস্ত্র ও বিমান বিক্রয় করে এবং যুক্তরাষ্ট্র জর্ডান ও সৌদি আরবকে কিছু সামরিক সাজসরঞ্জাম প্রদান করে।

ইতোমধ্যে ইসরাইল আকাবা উপসাগরের আইলাত বন্দরের উন্নয়ন সাধন করে। আইলাত হতে হাইফা পর্যন্ত সে একটি তেলের পাইপ লাইন নির্মাণ করে, যার মধ্য দিয়ে ইসরাইলের শিল্পসমূহে ব্যবহারের জন্য পারস্যের তেল প্রবাহিত হয়। ইসরাইলের নিকট তেল বিক্রয়ে সম্মতি প্রদানের দায়ে মিসর ইরানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ইসরাইল জাতিসংঘের একটি নিষেধাজ্ঞাও ভঙ্গ করে এবং নেগেভ অঞ্চলে কৃষিকার্যের জন্য জর্ডান নদীর পানির গতি পরিবর্তন করে।

এসব কারণে এবং ইসরাইল ও তার আরব প্রতিবেশীদের কিছু অমীমাংসিত সমস্যার দরুন মাঝে মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হয়। ইসরাইল ও মিসর সীমান্তে একটি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী নিয়োজিত থাকবার ফলে উভয়ের মধ্যে তেমন কোনো সংঘর্ষ হয়নি। জর্দানের নাজুক অবস্থার দরুন সে ইসরাইলের সাথে তেমন গোলমাল করতে পারে না। ইসরাইলি বসতি এবং জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত নিরপেক্ষ বা অসামরিক এলাকায় ইসরাইলি অনুপ্রবেশের ওপর হামলা চালাবার জন্য সিরিয়া খুবই সুবিধাজনক অবস্থার অধিকারী। ইসরাইল মাঝে মাঝে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, সিরিয়ার বিরুদ্ধে নয় বরং সীমান্তের নির্দোষ জর্ডানি গ্রামসমূহের বিরুদ্ধে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে জর্ডানের প্রতিশোধ গ্রহণের

www.pathagar.com

অসামর্থ্যকে মিসর ও সিরিয়া হুসাইনের 'ইসরাইল সমর্থক নীতি' বলে সমালোচনা করে।

ইসরাইল সিরিয়ার অপরাধের জন্য জর্ডানকে কেন শাস্তি দেয় তার নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে যেহেতু একটি পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি বিদ্যমান, তাই সম্ভবত ইসরাইল ভয় করে পাছে সিরিয়াকে আক্রমণ করলে মিসরও এতে জড়িয়ে পড়ে। তদুপরি ফিলিস্তিনি মোহাজেরগণ একটি নির্বাসিত সরকার এবং একটি 'ফিলিস্তিন মুক্তি ফৌজ' (Palestine Liberation Army) গঠন করেছে। সিরিয়া ও গাজা অঞ্চলে এই মুক্তি ফৌজের প্রশিক্ষণ শিবির। ইসরাইল কর্তৃক জর্ডান আক্রমণের ফলে এই ফৌজ জর্ডানে আসতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ইসরাইল একটি 'প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ' চালাবার এক ছুতায় জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর সে অধিকার করে নিতে পারে। এই ধরনের একটি লক্ষ্য হিরাত পার্টি সর্বদাই ব্যক্ত করে আসছে।

যাই হউক, অবস্থা উত্তরোত্তর ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৯৬৭ সালের ১৫ই মে ইসরাইল তার উনবিংশ স্বাধীনতা বার্ষিকী পালন করে। এ উপলক্ষে সে জাতিসংঘের আপত্তির বিরুদ্ধে অ-সামরিকী জেরুজালেমে সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করে। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এসকল্ ইসরাইলদের অবস্থার ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে বলেন যে, ইসরাইলের বিরুদ্ধে সিরিয়ার ক্রমবর্ধমান উস্কানির মোকাবিলা করার জন্য ইসরাইল 'প্রয়োজনীয় প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।' সিরিয়া ও গাজা অঞ্চলে প্রশিক্ষণরত বিভিন্ন কমান্ডো (গেরিলা) দলসমূহ ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার নির্দেশে তাদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা বৃদ্ধি করে। জাতিসংঘ বাহিনীর পেছনে লুক্কায়িত থাকার জন্য সিরীয়গণ নাসেরকে টিটকারি করে। ১৭ই মে ইউ.এ.আর. সমস্ত জাতিসংঘ বাহিনীকে মিসরীয় ভূমি ত্যাগ করার অনুরোধ জানায়, জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট এই অনুরোধ পালন করে মিসরীয় সৈন্যদেরকে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক বাহিনীর স্থলাভিষিক্ত হতে এবং আকাবা উপসাগর ও তিরান প্রণালীর প্রবেশদ্বার নিয়ন্ত্রণকারী শার্ম আল-শেক অধিকার করার অনুমতি দান করেন।

২২শে মে ইউ. এ. আর. ইসরাইলি জাহাজ ও ইসরাইলের জন্য সামরিক সাজসরঞ্জাম বহনকারী সমস্ত অ-ইসরাইলি জাহাজের জন্য আকাবা উপসাগর বন্ধ করে দেয়। একটি আন্তর্জাতিক পথ বন্ধ করাটাকে ইসরাইল যুদ্ধাবস্থা বিবেচনা করে এবং সৈন্য মোতায়েন আরম্ভ করে। ৩০শে মে মিসর ও জর্ডান এদের যে কোনো একটির ওপর যে কোনো হামলা প্রতিহত করার জন্য এক সামরিক চুক্তি

www.pathagar.com

স্বাক্ষর করে। ৩রা জুন লিবিয়া মিসরীয় বাহিনীর সাথে যোগদান করে এবং পরদিন ইরাক মিসরীয়-জর্ডানি আঁতাতে অংশ গ্রহণ করে।

বৃহৎ শক্তিবর্গ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ প্রত্যাশা করে না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন আরবদের প্রতি সহানুভূতিশীল; যুক্তরাষ্ট্র গ্রেট ব্রিটেন ইসরাইলের সাথে এ ব্যাপারে একমত হয় যে তিরান প্রণালী আন্তর্জাতিক; ফ্রান্স এই বিবাদে তার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে। এমনকি মিসরও যুদ্ধ প্রত্যাশা করে কিনা সন্দেহের বিষয়, কিন্তু ইসরাইল এর ওপর বাজি রাখতে পারে না।

১৯৬৭ সালের ৫ই জুন সোমবার সকালে ইসরাইলি বিমান ও স্থলবাহিনী আক্রমণ চালায় এবং সিনাই হতে সিরিয়া এবং সমগ্র জর্ডানি সীমান্তে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে ইসরাইলি বিমানসমূহ মিসরীয়, সিরীয় ও জর্ডানি বিমান বাহিনী ধ্বংস করে ফেলে। অতঃপর সম্পূর্ণ বিমান আধিপত্যের সহায়তায় ইসরাইলি স্থল বাহিনীসমূহ সর্বত্র অগ্রসর হয়। সংক্ষিপ্ত ছয় দিনের মধ্যে ইসরাইলি সৈন্যগণ দক্ষিণে সুয়েজ খাল বরাবর, পূর্বে জর্ডানি নদী এবং উত্তর-পূর্বে গ্যালিলি হ্রদের বিপরীতে সিরীয় উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হয়। তারা নয় জন মিসরীয় জেনারেল, তিন শতেরও অধিক অফিসার, হাজার হাজার যুদ্ধবন্দি এবং লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের রুশ নির্মিত সামরিক সাজসরঞ্জাম অধিকাংশ অক্ষত অবস্থায় আটক করে। 'ছয় দিনের যুদ্ধে' পুনরায় আরবদের অনৈক্য ও অক্ষমতা এবং ইসরাইলিদের 'ধৃষ্টতা ও একাত্মতা প্রকাশ করে'। মার্কিন অর্থ, ফরাসি বিমান এবং ইসরাইলি বিমানচালকদের সাহসিকতা ও দক্ষতার দ্বারা ইসরাইল আরবদেরকে এক মারাত্মক আঘাত হানে।

---

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

Agwain, M.S.ed. The Lebanese Crisis, 1958: A Documentary Study. New York : Asia Publishing House. 1965.

Avery, Peter, Modern Iran, New York : Frederick A. Pracger, 1965.

Banani, Amin, The Modernization of Iran, 1921-1941. Stanford, Calif: Stanford University Press 1961.

Ben-Gurion, David, Rebirth and Destiny of Israel. New York : Philosophical Library. 1953.

Binder, Leonard, Idealogical Revolution in the Middle East. New York : John Wiley & Sons, 1964.

Campbell, John C., Defense of the Middle East. New York : Frederick A. Praeger, 196.

Cottam, Richard W., Nationalism in Iran. Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 1964.

Davis, Helen Miller, Constitutions, Electoral Laws, Treaties of States in the Near and Middle East. Durham, N. C : Duke University Press, 1947.

Dickson. H. R. P., Kuwait and Her Neighbours. London : Geogre Allen & Unwin Ltd. 1956.

Frye, Richard N., Ed., Islam and the West, The Hague, Netherlands : Mouton, 1956.

Haim, Sylvia G., Ed., Arab Nationalism, Berkeley, Calif : University of California Press. 1962.

Harris, Christina Phelps. Nationalism and Revolution of Egypt. The Hague, Netherlands : Mouton, 1964.

Harris, George L, Iraq 1st People, Its Society, Its Culture. New Haven, Conn : Human Relations Area Files Press, 1958.

Hay, Sir Rupert, The Persian Gulf States. Washington, D. C. : Middle East Institute, 1959.

Hitti, Philip K., History of Syria. London : Macmillan. 1951.

Lebanon is History, London : Macmillan, 1962.

Hourani, Albert H. Syria and Lebanon : A Political Essay, London : Oxford University Press, 1946.

Hurewitz, J. C. the Struggle for Palestine, W. W. Norton, New York: 1950.

Diplomacy in the Near and Middle East, (Vol. II, 1914-1956,)

Princeton, J. J. : D. Van Nostrand, 1956.

Issawi, Charles, Egypt in Revolution : An Economic Analysis, NewYork : Oxford University Press, 1963.

Khadduri, Majid : Independent Iraq : A Study in Iraqi Politics Since 1932, London : Oxford University Press, 1951.

Kinross, Lord, Ataturk, New Yourk : William Morrow, 1965.

www.pathagar.com

Lacqueur, Walter Z, The Soviet Union and the Middle East, New York : Frederick A. Praeger, 1959.

Middle East in Transition. New York : Frederick A Praeger, 1958.

Lebkicher, Roy, George, Rentz, and Max Steincke. The Arabia of Ibn Saud. New York : Russell F. Moore. 1952.

Lewis, Bernard, The Emergence of Modern Turky, London : Oxford University Press, 1961.

Lewis, Geoffrey, Tureky, New York : Frederick A. Praeger, 1955.

Lilienthal, Alfred, What Price Israel. Chicago : Henry Regnery, 1953.

Marlowe, John, The Persian Gulf in the Twentieth Century, London: The Cresset Press, 1962.

Nasser, Gamal Abd al. Philosophy of the Revolution, Cairo, 1954.

Neguib, Mohammed Egypt's Destiny, London : Victor Golanez. 1955.

Pahlavi, Mohammed Reza Shah, My Mission for My Country New York : Mc Graw Hill, 1961.

Peretz, Don. Israel and the Palestine Arabs, Washington, D.C Middle East Institute, 1958.

Rivlin, Benjamin, and Joseph Szylowiez, Ed, The Contemporary Middle East. New York : Random House, 1956.

Sayegh, Fayez A. Ed., The Dynamics of Neutralism in the Arab World. San Francisco : Chandler Publishing Co, 1964.

Shwadron, Benjamin, The Middle East Oil and Great powers, New York : Frederick A. Praeger, 1956.

Smith Wilfred C. Islam in Modern History, Princeton, N. J. Princeton University Press, 1957.

Sparrow, Geald, Modern Jordan, London : George Allen & Unwin Ltd, 1961.

Upton, Joseph M. The History of Modern Iran, Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1948.

Wenner, Manfred W. Modern Yemen, Baltimore : John Hopkins University Press, 1967.

Weiker, Walter F. The Turkish Revolution, 1960-1961, Washington, D. C :Brookings Institution, 1964.

Weizmann, Chaim, Trial and Error. New York : Harper, 1949.

Winder, R. Bayly, Saudi Arabia in the Nineteenth Century, New York : St. Martins Press, 1956.

Zaideh, Nicola A. Syria and Lebanon, New York : Frederick, A. Praeger, 1957.

www.pathagar.com

বিংশ অধ্যায়
আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য

মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য আরব বসন্তের জন্য প্রায় প্রস্তুত হয়ে পড়ে। দিগ্বিজয়ী অভিযানের প্রাথমিক পর্যায়েও এ অভিযান উত্তর-পূর্বে ইরান এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মিসর পর্যন্ত অতিক্রম না করে ক্ষান্ত হয়নি। এ সময় আরবের বাইরে বিশ্বের বিভিন্ন অংশের লোকজন হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর আদর্শ সম্পর্কে মোটামুটি অজ্ঞ ছিল, তবে পুরোপুরি নয়। তারা তাদের নিজস্ব সমস্যাদি নিয়ে ব্যস্ত ছিল ।

সমসাময়িক বিশ্ব

ইউরোপ : ইউরোপ তখন সবেমাত্র মহাশক্তিশালী রোমের পতন এবং পশ্চিমাংশের ধ্বংসের আঘাত কেটে উঠতে আরম্ভ করে। বিভিন্ন গোত্র, যথা ফ্রাংক (Frank), মেরোভিঙ্গিয়ান (Merovengean), ভিসিগথ (Vesigoths), অস্ট্রগথ (Ostrogoths) ও অন্যরা একে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারের ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। বিরাট অংশ তখনও বর্বর থাকা সত্ত্বেও গিজিদি ছিল তাদের প্রধান প্রতিষ্ঠান যাকে সবাই মান্য করে। এটি ছিল মহান পোপ গ্রেগরিয় যুগ, যিনি ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে তার রাজত্ব আরম্ভ করেন। হজরত মুহাম্মদের (সাঃ) বয়স তখন ২০ বছর। এর ১৪ বছর পর মহামান্য পোপ মৃত্যুবরণ করেন। ইনি ছিলেন চারজন প্রসিদ্ধ বাতিল ধর্মযাজকদের (Latin Fathers) শেষ পুরুষ এবং মধ্যযুগীয় পোপদের প্রথম পুরুষ। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে পোপ করা হলে, তিনি অতঃপর বেশ কর্মঠ হয়ে ওঠেন এবং ধর্মের প্রচার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনিই ইংল্যান্ডবাসীদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি নিম্নে প্রভুর নফরদের নফর বলে উল্লেখ করেন। তবুও তিনি পোপ নির্বাচিত হবার পর দাবি করেন রোমের বিশপকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সকল গির্জার অধিনায়ক হিসাবে স্বীকার করা উচিৎ। কথিত আছে, পার্থিব বিষয়ে মনোযোগ দেয়া প্রতি মুহূর্তের জন্য তিনি শোক প্রকাশ করেন, কিন্তু তবুও তিনি রাজার ক্ষমতা গ্রহণ করা

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় মনে করেন। এ ব্যাপারে তিনি হজরত মুহাম্মদের (সাঃ) সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

ভারতবর্ষ : ভারতবর্ষে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় কৃতিত্বের অধিকারী গুপ্ত বংশের (৩২০-৫৫৪ আনুঃ খ্রিস্টাব্দ) সোনালি যুগ তখন শেষ। এক শতাব্দীকাল বিদেশাগত হুনদের হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারতে একটি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে শাসনকার্য পরিচালনা আরম্ভ করেন। তিনি মহানবীর (সাঃ) মৃত্যুর ১৫ বছর পর ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি সুশৃংখলভাবে দেশ পরিচালনা করেন এবং শিবের পূজার অনুসারী হয়েও তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং মহান রাজা অশোকের (খি. পূর্ব ২৭৪-২৩৬) সমকক্ষ হবার চেষ্টা করেন। কথিত আছে রাজা হর্ষবর্ধন প্রতি এক বছর পর একটি বিশাল ভোজের আয়োজন করেন এবং সর্বধর্মের লোকদের তিনি আমন্ত্রণ করেন। এই ব্যয়বহুল ভোজ তাঁর কোষাগারে বিরূপ প্রভাব ফেলে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর উপমহাদেশে পুনরায় গোলযোগ আরম্ভ হয় এবং তা মুসলমানদের আগমন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

চীন : হজরত মুহাম্মদের (সাঃ) জীবদ্দশায় চীনে একটি পুনর্জাগরণের সূচনা হয়। চীনে প্রাচীন তয়াং বংশ (Tang dynest) যাযাবর আক্রমণকারীদের প্রতিহত করে সোনালি যুগের সূচনা করেন। চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট তাই সুং (Tai Tsung) (৬২৭-৬৪৯) মহানবীর (সাঃ) হিজরতের পাঁচ বছর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৬৫০খ্রি. পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন, শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান করেন, খাল খনন ও যুদ্ধবন্দিদের পুনর্বাসন করে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান করেন। ঐতিহাসিকগণ ধারণা করে এই সময়েই চীনে 'ব্লক মুদনী' আবিস্কৃত হয়। হজরত মুহাম্মদের (সাঃ) সময় সারা বিশ্বে সম্ভবত চীনই ছিল সবচেয়ে বেশি সুশাসিত রাষ্ট্র। মহানবীর (সাঃ) বাণী "শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রয়োজন হলে (সুদূর) চীন দেশে যাও" থেকেও সুশাসিত রাষ্ট্রের সাক্ষ্য বহন করে।

জাপান : আরও পূর্বে জাপানে তখন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আলোড়ন চলছে। মহানবীর (সাঃ) সমসাময়িককালে জাপানে ছিলেন দেশের প্রথম সম্রাজ্ঞী সুইকু (৫৯২-৬২১ খ্রি.) তিনি জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন এবং বৌদ্ধ মন্দিরসমূহ নির্মাণ করেন। তাঁর প্রতিনিধি যুবরাজ শোতুকু তাইশী (Sholdku Taishi) একটি সংবিধান জারি করেন। এটি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কনফুসীয়দের নীতিশাস্ত্র, চীনা রাজনৈতিক আদর্শ ও বৌদ্ধ ধর্মীয় মতবাদের সংমিশ্রণ। একদিকে মহানবীর (সাঃ) অনুসারিগণ যখন আরবের মরুভূমি থেকে বের হয়ে

www.pathagar.com

গোত্রীয় সমর্থবাদের জীবন শেষ করে—জাপান তখন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের যুগে প্রবেশ করে।

বাইজান্টাইন ও সামানীর বা পারস্য সাম্রাজ্যদ্বয়

আরব উপদ্বীপের (জাজিরাতুল আরব) উত্তরে ভূখণ্ড তখন দুটো বৃহৎ ও গর্বিত শক্তির পদানত। পশ্চিমে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য যার আধিপত্য ছিল সমগ্র বলকান এলাকা ও এশিয়া মাইনর, ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীর, মিসর এবং উত্তর আফ্রিকার কিছু অংশ। এটি প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের (রাজধানী রোম) উত্তরাধিকারী এবং এর রাজধানী বাইজান্টাইন বা কন্সট্রান্টিনোপল এই সাম্রাজ্যের সরকারি ধর্ম ছিল প্রাচ্য সনাতন খ্রিস্টান ধর্ম (Eastern Orthadox Christianity)। এর ভাষা ছিল গ্রিক। আর পূর্বে ছিল প্রাচীন আজমানিয়ান সাম্রাজ্যের (Achamanean Eupire) উত্তরাধিকারী সাসানিয়ানগণ কর্তৃক শাসিত পারস্যবাসিগণ। কাস্পিয়ান সাগরের উভয় তীর ফটিছিল ক্রিসেনৌর পূর্ব অংশ, টাংগ্রিস ও সিন্ধু নদসমূহের মধ্যবর্তী সমগ্র এলাকা সাসামিদের আধিপত্যে ছিল। তাদের শীতকালীন রাজধানী ছিল টাইগ্রিস নদীর তীরে অবস্থিত চেসেফিনে (Chesiphon) এবং গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল একবাতানায় যা আধুনিক হামাদানে। তাদের ধর্ম ছিল জরথুস্ত্র এবং তাদের ভাষাকে বলা হত পাহ্লভী বা মধ্যযুগীয় ফার্সি। পারস্য ও বাইজান্টাইন উভয়ে ছিল স্বেচ্ছাচারী। ধর্মকে তারা রাষ্ট্রের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। তবে ভাষা ও সাংস্কৃতিকভাবে পারস্যবাসিগণের মধ্যে অধিক একাত্মতা ছিল বলে নিজেদের ঐতিহ্যের ব্যাপারে তারা গর্বিত ছিল। এ দুটো সাম্রাজ্য সর্বদাই যুদ্ধে লিপ্ত থাকে এবং কোন পক্ষই অপর পক্ষকে পদানত রাখার মত শক্তিশালী ছিল না।

৬১০ খ্রিস্টাব্দে হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসুল বা প্রেরিত পুরুষ হিসাবে প্রত্যাদিষ্ট হন। ঠিক সে বছর হেরাক্লিয়াস বাইজেন্টিয়ামের সম্রাট হন। বার বছর পর্যন্ত তিনি পারস্যবাসীদের হাতে পরাজিত হতে থাকেন এবং যুদ্ধ প্রস্তুতিতে সময় ব্যয় করেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সাঃ) মদিনায় রাসুল এবং রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে ক্ষমতা হাতে নেন। হেরাক্লিয়াস সে বছরই পারস্যবাসীদেরকে প্রতিঘাত করেন। তিনি গর্বিত, ক্লান্ত পারস্যবাসীর ওপর একের পর এক যুদ্ধে জয় লাভ করেন। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি চেসিফোনের সিংহদ্বারে উপনীত হন। খসরু পারভেজ তদীয় পুত্রের হাতে নিহত হন এবং হেরাক্লিয়াস আসল ক্রুশসদ তাঁর পুরনো সবকিছু উদ্ধার করেন। কিন্তু এটি ছিল একটি অর্থহীন বিজয়, কারণ

www.pathagar.com

ইরান ও বাইজেন্টিয়াম উভয়েই প্রচুর রক্তক্ষরণে তখন নিঃশেষিত। ধ্বংস তাদের দ্বারপ্রান্তে। তাদেরকে মরণাঘাত ছিল আরব উপদ্বীপের দক্ষিণের অধিবাসিগণ, যারা এককালে ছিল উভয় শক্তির বশ্য ও পদানত।

ইরান ও বাইজেন্টিয়ামের যুদ্ধ বিগ্রহ আরব পর্যন্ত পৌঁছেনি। উত্তরের সুসভ্য সাম্রাজ্যদ্বয় এটিকে অসভ্য এলাকা হিসাবে গণ্য করে। এ এলাকার মোট জনসংখ্যা ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ অধিবাসী ছিল যাযাবর বেদুইন। তারা সর্বদা অবাধ্যতার পরিচয় দেয়। মরুভূমি থেকে পরিচালিত আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য উভয় সাম্রাজ্য দু'টি শক্তিশালী গোত্রকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। পারস্যবাসিগণ গাস্‌সানী গোত্রকে বাইজেন্টাইনদের তত্ত্বাবধানে থাকতে অনুমতি প্রদান করে এবং বাইজেন্টাইনগণ প্রতিদানে হীরার নখিমি গোত্রের সঙ্গে পারস্যবাসীদের একই সম্পর্ক স্বীকার করে। তবে দক্ষিণ আরব এর অপেক্ষাকৃত কোমল জলবাস স্থায়ী সংস্কৃতি ও স্বল্প ব্যবধানের জন্য অধিকাংশ সময় ইরানের পদানত থাকে। পারস্যের (যদিও প্রস্তরে হামীর, এডেন, ইয়েমেন এবং দক্ষিণ আরবের অন্য স্থানগুলোর করদাতা অঞ্চল হিসাবে দেখা যায়। এ সমস্ত অঞ্চলের সাথে বাইজেন্টাইনদের সম্পর্ক ছিল ইথিওপিয়া ও লোহিত সাগরের মাধ্যমে।

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। উল্লেখ্য, মক্কা শরীফে তাঁর ইসলাম প্রচারকে কেন্দ্র করে মক্কাবাসী তাঁর স্বগোত্রীয় ও অন্যান্য কোরাইশ বংশের লোকদের সাথে তাঁর বিবাদ আরম্ভ হয়। অতঃপর নও মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে কোরাইশ নেতৃবৃন্দের আক্রান্ত বেড়ে যায়। তারা শেষপর্যন্ত তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করে কিন্তু তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। যাহা হোক, নওমুসলিম প্রায় সবাইকে নিয়ে ইসলাম গ্রহণকারী মদিনাবাসীদের আমন্ত্রণে তিনি ৬২২ খৃস্টাব্দ মদিনায় হিজরত বা দেশত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রাঃ) এ সন থেকে ১ম হিজরি সন গণনা আরম্ভ করেন। অতঃপর আক্রমণকারী কোরাইশদের সাথে তিনটি যুদ্ধ— বরদ, উহুদ এবং পরীক্ষার যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) তাদের পরাজিত করে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মক্কা জয় করেন। দলে দলে কোরাইশ বংশ এক উল্লেখযোগ্য আরবের প্রায় সব বংশ বা গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে মদিনাকে রাজধানী করে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হয়।

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সাঃ)-র ইন্তেকালের পর হজরত ওমরের প্রস্তাবে এবং নেতৃস্থানীয় এবং সাধারণ মুসলমানদের প্রত্যক্ষ সমর্থনে (ভোটে) হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। হজরত আবু বকর (রাঃ)

www.pathagar.com

নিজেকে শাসক না বলে মহানবীর (সাঃ)-র প্রতিনিধি (খলিফা) হিসাবে দেশ শাসন করেন। দু'বছর পর (৬৩২-৬৩৪) তাঁর ইন্তেকালের পর পূর্ব অনুসৃত নীতি অনুযায়ী হজরত ওমর (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি নিজেকে প্রথম খলিফার প্রতিনিধি বিবেচনা করেন (খলিফাতে খলিফাতে রাসুলিল্লাহ, মহানবী (সাঃ) প্রতিনিধি)। নামটি বেশ দীর্ঘ হওয়ায় তিনি নিজেকে আমির-উল-মোমেমিন (মোমেনদের সাফরি) ডাকতে বলে। ফলে পরবর্তী খলিফাগণ আমির-উল-মোমেমীন হিসেবেই সম্বোধিত হন (হজরত আবু বকরের সময় মুসলিম রাহিনা সমগ্র আরব বিজয় করে আরবের বাইরে পারস্য ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের (বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য) পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় ঢুকে পড়েন। অতঃপর দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের সময় সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য এবং রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল ও মিসর বিজিত হয়। ৬৬১ সালে উমাইয়া বংশ (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) ক্ষমতায় আসে। এ আমলে (রাজধানী দামেস্ক) মুসলিম সাম্রাজ্য পশ্চিম ভারতের সিন্ধু থেকে পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকা হয়ে পশ্চিম ভারতের সিন্ধু থেকে পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকা হয়ে স্পেন এবং ফ্রান্সের কিয়দংশ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এ আমলে এশিয়া মাইনর এবং মধ্য এশিয়া বিজিত হয়। অতঃপর আব্বাসীয় খেলাফত আমলে (রাজধানী বাগদাদ ৭৫০-১২৫৮) বিজিত এলাকাসমূহ সুসংহত করা হয় এবং নিয়মিত প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়। আব্বাসীয়দের পতনের পর মিসরের মামলুক বংশ (১২৫০-১৫১৭ খ্রি.) আব্বাসীয় বংশের এক যুবরাজকে মিসরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে খলিফা ঘোষণা করে নিজেরা সুলতান হিসাবে (রাজধানী কায়রো) খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন।

খেলাফতের পরবর্তী গন্তব্য ওসমানীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ইস্তাম্বুল (সাবেক Constantinople)।

সপ্তম শতাব্দীতে এ এলাকায় দুটো শক্তির আধিপত্য ছিল। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব (পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য) এশিয়া মাইনর। অধিকাংশ ছিল ক্রিসেন্ট, মিসর ও উত্তর আফ্রিকার ওপর এবং তারা শাসন করেন কন্সট্যান্টিনোপল (Constantinople) বা আধুনিক ইস্তাম্বুল থেকে। অপরদিকে ইরানের সাসানীয়গণ শাসন করেন টাইগ্রিস থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত এবং পারস্য উপসাগর (আরবরা এ নাম মানতে নারাজি; তাই তারা বলেন শুধু উপসাগর (Gulf) থেকে ককেসাস ও আরাল নদী পর্যন্ত এই সমগ্র এলাকা। এ দুটো সাম্রাজ্য একে অপরের সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে করতে নিজেদের এমন দুর্বল করে ফেলে যে শেষ পর্যন্ত তারা মরুভূমির আরবের মুসলমানদের সহজ শিকারে

www.pathagar.com

পরিণত হয়। অতঃপর এক হাজার বছর পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যকে পুনরায় পূর্বের ন্যায় দুটো শক্তির দ্বারা একই এলাকায় কর্তৃত্ব করতে দেখা যায়–এশিয়া মাইনরে ওসমানীয়গণ এবং ইরানে সাসানীয়দের। এই দুই সাম্রাজ্য তাদের পূর্বসূরিদের ন্যায় নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করতে করতে অচলাবস্থায় পতিত হয়। খুব স্বভাবতই সিদ্ধান্তে আসা যায়। যেমন কেউ কেউ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, বাইজেন্টাইন ও সাসানীয়গণ যেরূপ নিজেদেরকে দুর্বল করতে করতে আরবদের হাতে পতিত হয়, অনুরূপভাবে ওসমানীয় ও পারস্যবাসিগণও নিজেদেরকে দুর্বল করতে করতে ইউরোপীয়দের হাতে পতিত হয়। এ ধরনের সিদ্ধান্ত সঠিক কিনা তা নির্ণয় করতে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন তা এ আলোচনার আওতার বাইরে। তবে এ প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল।

ওসমানীয় সাম্রাজ্য

ওসমানীয়দের উৎপত্তি কিংবদন্তির সাথে মিশ্রিত। তারা মধ্য এশিয়ার ওঘুজ তুর্কি বংশোদ্ভূত। ১২৫১ সালে আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের যুগে ফোনিয়ার ক্ষুদ্র রাজ্যের সুলতানকে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সাহায্যদানের পুরস্কার হিসাবে জনৈক ইরতোগ্রিলকে উত্তর পশ্চিম আনাতোলিয়ায় একটি জায়গির প্রদান করা হয়। এশিয়া মাইনরের যাযাবর এসব তুর্কিরা অতঃপর গৃহী হয়। ইরতোগ্রিলের পুত্র ওসমান ইসলামের জন্য যুদ্ধকারী একজন গাজী নেতা (ইসলামের জন্য যুদ্ধকারী বিজয়ীদের 'গাজী' বলা হয়) পরবর্তীকালে ইউরোপের ভাগ্যের প্রতি হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় এই ঘটনাবলি যখন এশিয়া মাইনরে চলছিল তখন ১২৫০ খৃস্টাব্দে স্বয়ং ইউরোপে হলি রোমান সাম্রাজ্যের (Western Roman Empire, রাজধানী Rome) সম্রাট দ্বিতীয় ফেডরিক প্রাণ ত্যাগ করেন। মুসলমানদেরকে (মূর) স্পেন থেকে বহিষ্কার করা হয়। তৃতীয় হেনরি ইংলন্ডে রাজত্ব করেন, মস্কোর রাজন্যবর্গ মোঙ্গল আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করেন এবং জেরুজালেম থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করা হয়।

আনুমানিক ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে ওসমান তাঁর কার্যাবলি আরম্ভ করেন এবং এশিয়ার মাইনরের আধুনিক ইশ্‌কে শিহ্‌র অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে তোলেন। কালক্রমে তিনি এবং তাঁর বংশধরেরা ইস্তাম্বুলে (সাবেক Constantinople) রাজধানী স্থাপন করে বিশাল এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। ওসমানের নামানুসারে এটিকে আরবি ওসমান থেকে লাতিন অটোম্যান সাম্রাজ্য (১২৯৯-১৯২৪ খ্রি.) হিসাবে অভিহিত করা হয়। ওসমানের বংশের সাঁইত্রিশ

www.pathagar.com

জন সুলতান ৬২২ বছর পর্যন্ত বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যগুলোর অন্যতম একটি সাম্রাজ্যে রাজত্ব করেন এবং প্রত্যেক সুলতান সিংহাসনে আরোহণের পর ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে ওসমানের তরবারি স্বীয় বাটিতে ঝুলান।

ওসমানীয় আব্বাসীয় আমলের উজির পরিবার সেলাজুকগণ এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা দখল করে করে তারা সমৃদ্ধি লাভ করে। ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে তার সার্বিয়ার কৌশলগত এলাকাসমূহ, ১৩৯৩ সালে বুলগেরিয়ার কৌশলগত এলাকা এবং গ্রিসের এলাকাসমূহ তারা দখল করে নেয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তারা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে 'দিগ্বিজয়ী' মুহাম্মদের আমলে (১৪৫১-১৪৮১) ওসমানীয় তুর্কিরা ইউরোপ ও এশিয়ার আরও এলাকা পদানত করে। ১৪৫৩ সালে মুহাম্মদ কন্সটান্টিনোপল জয় করে 'দিগ্বিজয়ী' উপাধি লাভ করেন। সমগ্র গ্রিস অতঃপর ওসমানীয়দের হস্তগত হয়। ১৪৭৩ সাল নাগাদ তারা এশিয়া মাইনর জয় করেন। ওসমানীয়রা এভাবে সমগ্র আনাতোলিয়া এবং বলকান অঞ্চলের ওপর নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। আরব সাগরীয় অঞ্চলে তারা আজব এবং ক্রিমিয়া জয় করে ১৪৭৫ সাল নাগাদ। কৃষ্ণসাগর এভাবে তুর্কি হ্রদে (Turkish Lake) পরিণত হয়।

প্রথম সেলিমের সময় (১৫১২-১৫২০) ওসমানীয় তুর্কিরা মিসর আরব দেশ, সিরিয়া ও মেসোপোটেনিয়া জয় করে। মিসর বিজয়ের ফলে মামলুকদের নিয়ন্ত্রিত আব্বাসীয় খেলাফত শেষ হয়। প্রথম সোলায়মানের আমলে বেলগ্রেড বিজিত হয় (১৫২১)। হাঙ্গেরি এবং ট্রান্স্যালিভেনিয়া (Transalvania)র অধিকাংশ এলাকা ১৫৪৭ সাল নাগাদ ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর্মেনিয়া ও মেসোপোটেনিয়ার সঙ্গে বাগদাদ ও বসরা বিজিত হয়। বিশাল নৌশক্তি নিয়ে প্রথম সোলায়মান এডেন এবং আরবের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তিনি তার সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগরের ওপরও বিস্তৃত করেন। ১৫১৬ সালে আলজিয়ার্স ওসমানীয় বশ্যতা স্বীকার করে। প্রথম সোলায়মানের সময় ওসমানীয় সাম্রাজ্য দেশ-বিদেশে ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে এ সময় সাম্রাজ্যের সীমানা ইউক্রেনীয় পর্বতশ্রেণী থেকে মিসরের উচ্চভূমি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। অপরদিকে দানিয়ুব নদী থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। এ সময় ভূমধ্যসাগর কৃষ্ণসাগর, মোহিতসাগর এবং ভারতীয় মহাসাগরের বিশাল বাণিজ্য পথের ওপর সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতন : সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয় প্রধানত অভ্যন্তরীণ-কোন্দল থেকে। সুলতান সোলায়মানের মৃত্যুর পর অকর্মণ্য বেশকিছু শাসক উত্তরাধিকারী হন যারা সাম্রাজ্যের প্রকৃত চাহিদা পূরণে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। প্রশাসন এবং কর আদায় প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি প্রবেশ করে। সাম্রাজ্যের সামরিক প্রশাসন দক্ষতা হারায়। ১৬৮৩ সালে আলবেনীয় কপ্রুলো পরিবারের সুযোগ্য ও প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন প্রধান উজিরের পরামর্শে ওসমানীয়রা অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে ভিয়েনা দখলের প্রচেষ্টা চালান। হাঙ্গেরিতে হাবসবার্গের (Habsburg) বিরুদ্ধে উত্থিত বিদ্রোহে সমর্থন প্রদানস্বরূপ সুলতান ২ লক্ষ তুর্কি সৈন্যসম্বলিত একটি চৌকস সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। খ্রিস্টানধর্ম ধ্বংসের কবলে পতিত বলে সম্রাট নিউপোল্ড হৈচৈ শুরু করেন এবং সাহায্যের আবেদন করেন। খ্রিস্টান শক্তিবর্গ সম্মিলিতভাবে তুর্কিদের পরাজিত করে। হাবস্‌বার্গ এবং সুলতানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ আরও ১৫ বছর স্থায়ী হয়। ১৬৯৯ সালে কার্লোভিজের চুক্তির (Treaty of Carlovity) মাধ্যমে এ যুদ্ধ শেষ হয়। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তুরস্ক স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া, ট্রানসেলভেনিয়া, হাঙ্গেরি অধিকাংশ এলাকা, হাবসবার্গের নিকট এবং ইউক্রেন ও প্যাডোলিয়ার কিয়দংশ পোলান্ডের নিকট ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

অবস্থা অতঃপর প্রায় সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। খৃস্টান জগতকে হুমকি প্রদানকারী হিসাবে তুরস্কের অবস্থান আর থাকল না। অতঃপর ইউরোপই এখন ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে হুমকি প্রদানকারী শক্তিতে পরিণত হয়।

প্রাচ্য প্রশ্ন (Eastern Question) : সমগ্র অষ্টাদশ ও নবম শতাব্দীতে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বিশাল এলাকা অস্ট্রিয়ার হাবসবার্গ সাম্রাজ্য ও রাশিয়ার দখলে চলে যায়। ইউরোপে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অতি দ্রুত পতনের মুখে প্রণালীদ্বয় (বসফরাস ও দার্দানালিশ) এবং ভূমধ্যসাগরের ওপর আধিপত্য কোন ইউরোপীয় শক্তিধরের হাতে থাকবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই দ্বন্দ্ব 'প্রাচ্য প্রশ্ন' হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। প্রাচ্য প্রশ্ন বস্তুতপক্ষে ছিল একটি কূটনৈতিক চাল, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত ওসমানীয় সাম্রাজ্যের হঠাৎ এবং বিশৃংখল পতন রোধ করা এবং দ্বিতীয়ত পতন যদি অনিবার্য হয়ে পড়ে তাহলে এর ভাগ-বাটোয়ারায় এমন পন্থা অবলম্বন করা যদ্বারা কোন পক্ষ যাতে অধিক ভূস্বত্ব লাভ করার ফলে ইউরোপে ক্ষমতার ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। অন্য কথায় প্রাচ্য প্রশ্নের অর্থ হল রাশিয়া কর্তৃক বিভক্ত সাম্রাজ্যের অধিকতর ভূস্বত্ব লাভ করার প্রতিরোধে ইউরোপীয় ব্যক্তিবর্গের একটি

www.pathagar.com

কূটকৌশল মাত্র। ১৩ জুন ১৮৭৮ থেকে ১৩ জুলাই ১৮৭৮ এ অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অব বার্লিনে (Congrees of Berlin) তুরস্ক, ব্রিটেন, জার্মানি, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, ফ্রান্স ও ইতালির উপস্থিতিতে প্রাচ্য প্রশ্ন সরকারিভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৮৮১ সালে ফ্রান্স কর্তৃক তিউনিসিয়া অধিকার এবং ১৮৮২ সালে বৃটেন কর্তৃক মিসর অধিকার প্রমাণ করে যে, এসব ক্ষমতাধর ওসমানী সাম্রাজ্যের টুকরো টুকরো হওয়া রোধের নীতি প্রচারকালেও প্রকৃতপক্ষে তারা বরং এর উত্তরাধিকারী হবার প্রস্তুতিই নিচ্ছিল।

তুর্কি-রুশ সংঘাত এবং রাশিয়ার লাভ : ১৫৭৫ সালে অস্ট্রিয়ানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ওসমানীয় তুর্কিদের সাথে এক সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। প্রসিদ্ধ পিঠার বাল্টিক সাগরের পথ পরিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে থাকেন। ১৬৯৬ সালে তিনি আজভ দুর্গ দখল করেন। ভূমধ্যসাগরের 'উষ্ণ জলের' জানালা খোলার জন্য রাশিয়ার তুর্কিদের সাথে বিভিন্ন অজুহাতে সংঘর্ষ বাধায় এবং কিছু কিছু তুর্কি এলাকা দখলে নেয়। কিন্তু ১৭১১ সালের এক যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হলে বেশ কিছু এলাকা তারা তুর্কিদের নিকট ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। রাশিয়ার ওপর বেশ কিছু বিধি-নিষেধও চাপানো হয়। ১৭২৬ সালে ওসমানীয় ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে এক সমঝোতা চুক্তি হয়। কিন্তু রাশিয়া বার বার আক্রমণ করে আজভ পুনরুদ্ধার করে। প্রসিদ্ধ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন তুরস্কের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পরিকল্পনা করতে থাকেন। তিনি প্রাচীরপন্থী স্লাভ জনগণকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করেন তুরস্ক আক্রমণের জন্য। ১৭৬৮ সালে তিনি তুরস্ক আক্রমণ করে একাধিক এলাকা দখল করেন। ১৭৭৪ সালে স্বাক্ষরিত কুচুক কায়স্ত্ররাজির চুক্তির (Treaty of Kuchak Kairaridge) মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়ার কৃষ্ণসাগরে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে। এই কৃষ্ণসাগর থেকেই তুরস্কের বুক চিরে বসফরাস ও দার্দানালিক প্রণালী হয়ে জলপথ পড়ে ভূমধ্যসাগরে। ক্যাথারিনের সহায়তায় ক্রিমিয়ার তাতার খান বংশ নিজেদের ওসমানীয় শাসক থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। পরবর্তীকালে ১৭৮৩ সালে রাশিয়া এটিকে নিজদেশের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। রাশিয়া ওসমানীয় সাম্রাজ্যে অবাধ ব্যবসার সুযোগ লাভ করে এবং শান্তির সময় কৃষ্ণসাগর এবং প্রণালীদ্বয়ে নৌ-চলাচলের সুযোগ লাভ করে। রাশিয়া মোলদাভিয়া ও ওয়ালাভিয়ার খ্রিস্টানদের তত্ত্বতালাসের সুযোগ লাভ করে। এভাবে রাশিয়া যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা এবং বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর আধিপত্য লাভ করে।

www.pathagar.com

সে সময় থেকে রাশিয়া ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকারের চাপ সৃষ্টি করে। ১৭৯২ সালে জ্যাসির চুক্তি দ্বারা (Greaty of assy) রাশিয়া কৃষ্ণসাগরে বাড়তি কিছু ভূমিও লাভ করে। এভাবে রাশিয়া সমীহ করার মত একটি কৃষ্ণসাগরীয় শক্তিতে পরিণত হয়। তারা ওডেসা ও সেভাস্তোপোলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাঁটি নির্মাণ করে। ব্রিটিশ শক্তি ধীরে ধীরে কৃষ্ণসাগরে রুশ নৌশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে।

নেপোলিয়ন ও মধ্যপ্রাচ্য : ফ্রান্সে নেপোলিয়নের উত্থান ইউরোপীয় রাজনীতির ধরন এবং মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। তুরস্কের দুই শত্রু, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়াকে ফরাসি বিপ্লব ফ্রান্সের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য করে। এর অর্থ হল তুরস্কের জন্য কিংবা হাঁফ ছাড়া। কিন্তু পরবর্তীকালে নেপোলিয়নের সামরিক অভিযানগুলোর দ্বারা তিনি তুর্কিদের সংস্পর্শে আসেন।

১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন সমগ্র মিসর দখল করেন। অতঃপর তিনি ফিলিস্তিন সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হন। রাজনৈতিক ও সামরিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে নেপোলিয়নের অভিযানসমূহ ক্ষণস্থায়ী অভিযানে পরিণত হয়। ১৭৯৯ সালে তাঁর সৈন্যদের পেছনে মিসরে ফেলে তিনি ফ্রান্সে ফিরে আসেন। ১৮০২ সালে মিসর পুনরায় সুলতানের (ওসমানীয় সুলতান) অধিকারে এসে যায়। পরে নেপোলিয়ন মস্কোতে অভিযান পরিচালনা করেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। ১৮১২ সালের পর পুনরায় রাশিয়ার দক্ষিণমুখী অভিযানসমূহ আরম্ভ হয়। কিন্তু বর্তমানে এশিয়ায় রাশিয়ায় প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রিটেন তার দক্ষিণমুখী অভিযানে বাধা প্রদান করে। তাই ওসমানীর সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষা করা এখন ব্রিটেনের প্রধান বৈদেশিক নীতিতে পরিণত হয়। ১৮১৫ সালে ভিয়েনা কংগ্রেসে (Congres of Viena) ব্রিটেন মাল্টা অধিকার করে। এটি ভূমধ্য সাগরে ব্রিটিশ আগ্রহ বৃদ্ধি করে। ব্রিটিশ নীতির লক্ষ্য হল তার রাজকীয় চলাচলের পথ পরিষ্কার রাখা। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রধান নীতিতে পরিণত হয় রাশিয়ার দক্ষিণমুখী বিস্তৃতিতে বাধা প্রদান করা।

ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে বলকানদের* বিদ্রোহ : ফরাসি বিপ্লবের ফলে জাতীয় ও গণ অধিকারের মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ফরাসি বিপ্লবের দ্বারা সংক্রমিত জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অধীনস্ত-সম্প্রদায়কে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ, সে সঙ্গে ব্রিটেন ও রাশিয়া বলকান

---

* বলকান অঞ্চল বলতে প্রধানত রোমানরা বসনিয়া-হার্জিগোভিনা, গ্রিস, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, ক্রোনেশিয়া, স্লোভিনিয়া, বুলগেরীয় রোমানীয় ইত্যাদি দেশসমূহ।

www.pathagar.com

অঞ্চলের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সমর্থন দান করে। সংঘর্ষ আরম্ভ হয় সার্বীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে। বলকানের জনগণ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে একে একে ওসমানীয় জোয়াল থেকে মুক্ত হতে থাকে। ১৮৩২ সালে গ্রিস, ১৮৫৬-১৮৭৮ সালে রুমানিয়া, ১৮৩৪-১৮৭১ সালে সার্বিয়া, ১৮৭৮ সালে মন্টিনিগ্রো এবং ১৮৭৮-১৯০৮ সালে বুলগেরিয়া স্বাধীন হয়ে যায়। এরা সবাই স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। রাশিয়া বলকান জনগণকে তুরস্কের বিরুদ্ধে উৎসাহ জোগাতে যাচ্ছে। ১৯২৮ সালে গ্রিক স্বাধীনতা আন্দোলনে (১৮২১-১৮২৯) রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। রাজধানী ইস্তাম্বুল থেকে মাত্র ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত আদ্রিয়ানোপল রাশিয়া জয় করে নেয়। অতঃপর কৃষ্ণসাগরীয় এলাকায় রাশিয়া বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখল করে নেয়। আদ্রিয়ানোপল চুক্তি দ্বারা গ্রিসের সাথে যেকোন সমাধানের জন্য তুরস্ককে অনুমতি প্রদান করা হয়।

মিসরে মুহাম্মদ আলীর উত্থান

নেপোলিয়নের অভিযানের পর আলবেনিয়ার এক অভিযাত্রীর হাতে পড়ে মিসর। এই অভিযাত্রী মুহাম্মদ আলী ১৮০১ সালে মিসরে আগমন করেন এবং ১৮০৫ সাল নাগাদ তিনি মিসরে ওসমানীয় পাশা বা ভাইসরয় নিযুক্ত হন। ১৮১৮ সালে তিনি মক্কা, মদিনা ও আরবে ওসমানীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২২ সালে তিনি নুরিয়া জয় করেন। গ্রিক বিদ্রোহ দমন করে তিনি ওসমানীয়দের সাহায্য করেন। তাঁকে ক্রিটের পাশা পদ (গভর্নর পদ) দেয়া হয়, কিন্তু তিনি সিরিয়া দাবি করেন। কিন্তু তা না পেয়ে তিনি তার পুত্র ইব্রাহিমকে সিরিয়ার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সিরিয়ার মধ্য দিয়ে ইব্রাহিম মূল আনা-তোলিয়ায় প্রবেশ করেন এবং ১৮৩২ সালে তুর্কি বাহিনীকে পরাজিত করেন। কুতাইয়ার চুক্তির মাধ্যমে সুলতান* মুহাম্মদ আলীকে সিরিয়া ও অঙ্গানার পাশা পদ প্রদান করেন।

রাশিয়া এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং মুহাম্মদ আলীর ভবিষ্যৎ কর্মসূচির বিরুদ্ধে সুলতানকে সাহায্য করার প্রস্তাব প্রদান করে। মিসরীয় এই ভুঁইফোড়ের বিরুদ্ধে যে কোন প্রস্তাব সুলতান গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন, কারণ তার আচরণে তিনি প্রবল প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেন, ১৮৩৩ সালে স্বাক্ষরিত আকিয়ার

* তুরস্কের মালিকায়ে সুলতান বলা হয়, আবার মহামান্য দরবারও বলা হয়। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের মালিক হিসাবে সম্রাটও বলা হয়, মুসলিম জাহানের খলিফাও বলা হয়।

www.pathagar.com

ইসাকলেসীয় (Unkar Iskelessi) চুক্তির মাধ্যমে এই দু'দেশ একটি প্রতিরক্ষা-মূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। অতঃপর তুর্কি প্রায় সম্পূর্ণভাবে শক্তিশালী রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং এভাবে তুরস্কের ওপর রাশিয়ার একটি অঘোষিত অভিভাবকত্ব (Protictorats) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আফিয়ার ইসাকলেসীয় চুক্তির গোপনীয় ধারা মোতাবেক রাশিয়ার শান্তি ও যুদ্ধ সর্বদা প্রণালী ব্যবহারের এবং রাশিয়ার সাথে শত্রু ভাবাপন্ন যেকোন রাষ্ট্রের জন্য প্রণালীর পথ রুদ্ধ করার ক্ষমতা লাভ করে। এ চুক্তির দ্বারা ব্রিটেন বেশ শঙ্কিত হয়।

মিসরের মুহাম্মদ আলী পানরার পুত্র ইব্রাহিম ওসমানী দরবার ও মিসরের মধ্যে যুদ্ধ বাধান ১৮৩৯ সালে, তিনি তুর্কিদের নিমিরের (ইউফ্রোসি নদীর উজানে) যুদ্ধে পরাজিত করেন। এর ফলে মিসরীয় বাহিনীর জন্য ইস্তাম্বুলের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু ব্রিটেনের উৎসাহে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ এতে হস্তক্ষেপ করে। প্রথমত ইউরোপীয় শক্তিবর্গ (বিশেষত ব্রিটেন) তুরস্কের ওপর রাশিয়ার অতিরিক্ত প্রভাবে শঙ্কিত হয়। মুহাম্মদ আলীর পরবর্তী ধাক্কায় তুরস্ক আরও ঘনিষ্ঠভাবে রাশিয়ার সাথে জড়িয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত ব্রিটেন চায় না যে তুরস্ক পুরোপুরি মুহাম্মদ আলীর হাতে চলে যায়, সেক্ষেত্রে মুহাম্মদ আলীর অভিভাবকত্বে ওসমানী সাম্রাজ্য তার দীর্ণ-শীর্ণ অবস্থা থেকে প্রাণ ফিরে পাবে।

ব্রিটেন ও অস্ট্রিয়া সিরিয়ার উপকূল অবরোধ করে এবং ইব্রাহিমের সাথে তার কেন্দ্রের (মিসর) যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। একটি ইঙ্গ-অস্ট্রিয়ান চরম পত্রের দ্বারা ইব্রাহিমকে মিসরে ফিরে যাবার দাবি জানানো হয়। তাঁকে তাই করতে হয়। ১৮৪০ সালে ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও ফ্রান্সের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত লন্ডনের একটি সভায় স্থির করা হয় যে মুহাম্মদ আলী অবিলম্বে সিরিয়া সুলতানের নিকট ফেরৎ দিল। বিনিময়ে তাঁকে মিসরের বংশানুক্রমিক পালায় পদ দেখা হবে। এভাবে হয় ইউরোপীয় শক্তিবর্গ বস্তুতপক্ষ ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে দু'ভাগে ভাগ করে দেয়–এক ভাগ সুলতানের অধীনে এবং আরেক ভাগ মুহাম্মদ আলী পাশার নিয়ন্ত্রণে। এ ব্যবস্থার আরেক অংশ হল প্রণালী ব্যবস্থাপনা (Convention of the Strats 1841) যদ্বারা ইতিপূর্বে প্রণালী ব্যবহারে রাশিয়ার প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাদি পরিবর্তন করে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সুবিধানুযায়ী তা পরিবর্তন করা। এভাবে লন্ডন মীমাংসা বা London Settlement, যেটি প্রকৃতপক্ষে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে বহির্দেশীয় একটি প্রভাব বাস্তবিকপক্ষে তুরস্কের ওপর রাশিয়ার অভিভাবকসত্তার পরিবর্তে একটি সংযুক্ত ইউরোপীয় অভিভাবকত্ব সৃষ্টি করা।

www.pathagar.com

ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি (The Seekman of Europe) : লন্ডনের সমঝোতাকে পার লন্ডন ও মস্কোতে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ব্রিটেন মনে করে ওসমানীয়দের অখণ্ডতা রক্ষা করা হয়েছে, অপরদিকে মস্কো মনে করে তুর্কি ঘরোয়া সমস্যা সমাধানে সহযোগিতার দ্বারা রাশিয়া ও ব্রিটেন ওসমানীয় সাম্রাজ্যের আরও হস্তক্ষেপ এবং পরিণতিতে ওসমানীয় ভূমত্ব বিভক্ত করার পথ সুগম করা। জার প্রথম নিকোলাস ব্রিটিস রাজনীতিবিদ ও কূটনৈতিকদের পরামর্শ দেন "ইউরোপের এই রুগ্ন ব্যক্তি" তুরস্ককে সুশৃংখলভাবে ভাগাভাগি করে নেয়া উচিত। কিন্তু চরম আশ্চর্যের বিষয় রাশিয়া ১৮৫৪ সালে ব্রিটেন, ফ্রান্স, তুরস্ক ও সার্ডেনিয়ার এক সম্মিলিত বাহিনীর বিরোধিতার মুখে পড়ে। তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। প্রধান সামরিক ব্যবস্থাবলি সংঘটিত হয় ক্রিমিয়ায়। ১৮৫৫ সালে রাশিয়া এতে পরাজিত হয়।

১৮৫৬ সালে প্যারিস চুক্তি (Treaty of Paris) স্বাক্ষরিত হয়। কৃষ্ণসাগরকে অসামরিক করা হয়। রাশিয়ার নৌ প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। দানিউব নদীকে সমস্ত স্বাধীন নৌচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং রাশিয়ার ক্ষমতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। রুমানীয় ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর ওপর রাশিয়ার অভিভাবকত্ব রহিত করা হয়। ওসমানীয় সাম্রাজ্য রাশিয়ার থেকে দক্ষিণ বেসারাধিয়া লাভ করে। এটি রাশিয়াকে দানিউব উপ-সাগরীয় তীর থেকে পৃথক করে দেয়। রুশ পরাজয় তুরস্ককে নবজীবন দান করে। কৃষ্ণসাগরে রাশিয়া আর বিস্তৃতি ঘটায়নি।

সেনস্টেফানো চুক্তি এবং বার্লিন (Treaty of Sanstifans and Berlin) : ১৮৭৭ সালে রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সেনস্টেফানোতে রাশিয়া বিজয়ীর শান্তি স্থাপন করে। সেনস্টেফানোর চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া কিছু অংশ দখল করে। এ চুক্তির দ্বারা বিশাল বুলগেরিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়, যার পরিধি দাঁড়ায় কৃষ্ণসাগর থেকে আলবেনীয় পর্বতশ্রেণী এবং এজিয়ান সাগর থেকে দানিউব নদী পর্যন্ত। এই চুক্তি দ্বারা সার্বিয়া, রুমানিয়া ও মন্টিনিগ্রোর স্বাধীনতাকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। বুলগেরিয়া রুশ সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল একটি দেশ যার দায়িত্ব হল বলকান অঞ্চলে রুশ প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখা। সেনস্টেফানো চুক্তিতে রাশিয়ার দেয়া প্রবল সুযোগ-সুবিধা ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়াকে ভাবনায় ফেলে দেয়। তারা প্রতিবাদ করে। চুক্তিটি তাই বলবৎ হয়নি। বার্লিন চুক্তিকে Traty of Berlin) এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। ফলে রাশিয়া তার যুদ্ধলব্ধ অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলে এবং তার বলকান কূটনীতিতে

www.pathagar.com

ভীষণ মার খায়। তাদের মতে, বার্লিন চুক্তির দ্বারা তুর্কি-নিয়ন্ত্রিত একটি ক্ষুদ্র বুলগেরিয়া রাষ্ট্র গঠন করা হয় এবং সার্বিয়া, রুমানিয়া ও মন্টিনিগ্রোর স্বাধীনতার আইন অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়। দক্ষিণ-বেসারাবিয়া, কার্স (Kars), আরফাহান এবং বাটুম রাশিয়াকে দেয়া হয়। চুক্তিতে গ্রিক সীমান্ত বৃদ্ধির ওয়াদা সন্নিবেশিত করা হয়। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার দখল দেয়া হয় অস্ট্রিয়াকে, আর ব্রিটেন দখল করে সাইপ্রাস।

বার্লিন চুক্তির ফলাফল হল, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া নামক দুটো স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে পশ্চিম রাশিয়ার সঙ্গে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সরাসরি পথ বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর একমাত্র ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে তুর্কিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে রাশিয়া তার ভূখণ্ডগত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে। তুর্কি প্রদেশসমূহে আর্মেনীয় জনগণ বসবাস করে। রাশিয়া এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দ্বিধা করেনি। বার্লিন চুক্তি অতএব রুশ তুর্কি সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশনা। ইউরোপীয় শক্তিবর্গের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা রাশিয়ার দক্ষিণ মুখো বিস্তার রোধ করতে গিয়ে নিজেদের সুবিধা আদায়েও কার্পণ্য করেনি। অস্টিয়া বলকান অঞ্চলের একটি এলাকার দখল পায়, আর ব্রিটেন লাভ করে সাইপ্রাস–উভয়েই ওসমানীয় এলাকা। ফ্রান্স তিউনিসিয়া দখলের অনুরোধ জানায়, আর ইতালি আলবেনিয়া ও লিবিয়ার ওপর তার কুমতলব জাহির করে।

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ ও ওসমানিগণ : ১৮৬৪ থেকে ১৯১৪ সাল এই পঞ্চাশ বছরে সংঘটিত ঘটনাবলি ওসমানীয় সাম্রাজ্যে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবেশ অনুপ্রবেশের চিত্র তুলে ধরে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি ও জার্মানি এই চারটি দেশ যারা নানাভাবে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা এবং ভূখণ্ডগত সুবিধা আদায় করেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, পশ্চিমা শক্তিবর্গ ওসমানীয় তুর্কিদের বন্ধুত্বের আড়ালেই এসব কর্মকাণ্ড সমাধা করে। পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, রাশিয়ার স্বার্থ সীমাবদ্ধ থাকে প্রধানত ওসমানীয়া সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশে।

ফ্রান্স ওসমানীয় সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে আলজেরীয় (১৮৩০), তিউনিসিয়া (১৮৮৩) এবং মরক্কো (১৯০৬-১৯১২) দখল করে নেয়। এসব দেশ ওসমানীয়দের মামুলি নিয়ন্ত্রণে ছিল। মিসর এবং লেবানন ও ফ্রান্সের প্রভাবিত এলাকায় পতিত হয়। ফ্রান্স মিসরের মুহাম্মদ আলীকে সমর্থন করে। এটি মিসরে ফরাসি সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক প্রভাব বৃদ্ধি করে। ফলে ১৮৫৬ সালে ফার্ডিনান্ড তিলেসেপ্‌স নামের এক ফরাসি প্রকৌশলী সুয়েজ খাল খননের জন্য মুহাম্মদ আলী পাশার পুত্র ইসমাইল পাশার মাধ্যমে তুরস্কের অনুমতি লাভ

www.pathagar.com

করেন এবং ১৮৬৯ সালে এ খাল খনন করেন। এ খাল খননে ব্রিটেন প্রথমে বিরোধিতা করলেও পরে তারা মোর্দভ ইসমাইলের শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে এর মালিক হয়ে খালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লেবাননে ফ্রান্স ঐতিহ্যগতভাবে প্রবল প্রভাবের অধিকারী। সংখ্যাগুরু খৃস্টান অধ্যুষিত লেবানন প্রাচীনকাল থেকে ক্রুসেডের (খ্রিস্টান ধর্মযুদ্ধ) শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত। ১৮৬০ সালে ফরাসি নৌ ও সেনা অভিযান পরিচালিত হয় লেবাননে। ১৮৬৪ সালে লেবাননের স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য তারা ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সুলতানকে বাধ্য করে। একজন খ্রিস্টান গভর্নর দ্বারা এটি শাসিত হতে সুলতান সম্মত হন এবং ফ্রান্স লেবাননের স্বঘোষিত অভিভাবকে পরিণত হয়ে লেবাননে গেড়ে বসে।

ব্রিটেন : ওসমানীয়দের সঙ্গে বৃটেনের পূর্বাপর সম্পর্ক ভাল বলতে ছিল সর্বদা অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক, আর সবচেয়ে খারাপ বললে বলতে হয় অবিশ্বস্ত। উনবিংশ শতাব্দীতে এক কথায় বলা যায় তাদের নীতি ছিল ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখা। তবে এতে কিছু বাস্তব গোপনীয় বিষয়গুলো ছিল যথা: ব্রিটেন বলকান খ্রিস্টানদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতা করেনি। তবে ওসমানীয়দের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্কের মূলকথা হল ভারতের সঙ্গে তার জীবন পথ পরিষ্কার রাখা এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা সম্ভব ছিল ওসমানীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে। এ উদ্দেশ্যে সে কখনও রাশিয়াকে ওসমানীয়দের ওপর থেকে হাত গুটাবার দাবি করেছি, আবার কখনও এশিয়া ও আফ্রিকার ওসমানীয়দের দখলিকৃত ভূমিতে অনুপ্রবেশ করেছে। মেসোপোটেমিয়ার (বর্তমান ইরাক) মধ্য দিয়ে সে ভারতের সঙ্গে সহাবস্থানে উভয় পথে নিরঙ্কুশ আধিপত্য চেয়েছে, তৎসঙ্গে সে জিব্রাল্টায় ও সদ্য দখলিকৃত (১৮৩৯) এডেনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য মিসরের ওপর সর্বদা আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে। ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সে ১৮১৫ সালে মাল্টন এবং ১৮৭৮ সালে সাইপ্রাস দখল করে। মাল্টা ও এডেন দখলের ফলে জিব্রাল্টার হতে মিসর, মেসোপোটেমিয়া বা সুয়েজ ও এডেন হয়ে ব্রিটেনের ভারতের পথ পরিষ্কার হয়েছে। খাল খননের পর এতে ব্রিটেনের স্বার্থ বৃদ্ধি পায়। সে ঋণগ্রস্ত মেদিভ ইসমাইলের খালের শেয়ার ক্রয় করার ফলে তার বাণিজ্যিক স্বার্থ বেড়ে যায়। ব্রিটেন অতঃপর মিসরের ওপর অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির প্রভাব খর্ব করতে সচেষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত মিসরের একচ্ছত্র মালিক হয়। ১৮৮২ সালে মিসরীয় কর্নেল আরাবি পাশা মেদিভ ইসমাইল ও ফরাসি প্রভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

www.pathagar.com

করেন। কিন্তু ব্রিটেন তাৎক্ষণিকভাবে মেদিভের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং তেলআবিবের যুদ্ধে আরাবি পাশাকে পরাজিত করে মেদিভকে রক্ষা করে। ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনী অতঃপর মিসর দখল করে নেয় যা ১৯৫৪ সালে কর্নেল নাসেরের নেতৃত্বে মিসরীয় সামরিক বাহিনী কর্তৃক মিসর দখল পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

ইতিপূর্বে নীলনদের উৎসস্থল সুদান মিসরেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু ব্রিটেন তার স্বার্থে এটিকে মিসর থেকে পৃথক করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নামে শাসন করে। সুদানের ওপর ব্রিটেনের প্রবল আধিপত্য থাকার ফলে মিসরও তাদের আওতাভুক্ত হয়। যাহোক ১৯৫৬ সালে কর্নেল নাসের কর্তৃক সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করা হলে ইঙ্গ-ফরাসি- ইসরাইলি যৌথ বাহিনী সামরিক হামলা চালায়; তবে আন্তর্জাতিক শক্তিবর্গ, বিশেষত রাশিয়ার চাপে পড়ে ব্রিটেনকে মিসর ত্যাগ করতে হয়।

জার্মানি : ১৮৮০ সালের দিকে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি জার্মানির আগ্রহ দেখা দিতে থাকে। ১৮৮১ সালে ওসমানের সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের লক্ষ্যে একটি জার্মান সামরিক মিশন খোলা হয়। ১৮৮৯ সালে জার্মানির সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী তুরস্কে এক সরকারি ভ্রমণে আগমনের ফলে দু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। তুরস্ক অধিকতরভাবে জার্মানির প্রতি ঝুঁকে পড়ে! কারণ ১৮৮২ সালে ব্রিটেন মিসর দখল করে নিলে তাদের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। তাছাড়া ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন প্রকাশ্যে তুরস্কের বিরুদ্ধে কথা বলেন। ব্রিটেন সাইপ্রাস দখল করেছে এবং গ্রিসের স্বাধীনতার বিষয়ে সহায়তা করছে। তুরস্কে এক আর্মেনীয় হত্যাযজ্ঞে (১৮৯৭-১৮৯৮) ইউরোপীয় জাতি হস্তক্ষেপ করেছে। কিন্তু জার্মানি সতর্কতার সাথে এগুলো এড়িয়ে গেছে। এটি তুরস্কে জার্মানির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে। জার্মান সম্রাট তুরস্ক ও অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহ পরিদর্শন করে তাদের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করেন। জার্মান ব্যাংকিং ও ব্যবসায়িক স্বার্থ এ এলাকায় অনুপ্রবেশ করে। জার্মান শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে কাজ করার অনুমতি প্রদান করা হয়। ১৯২০ সালে আনাতোলিয়ান রেলপথের এক জার্মান কোম্পানিকে ইস্তাম্বুল-বাগদাদ রেলপথ নির্মাণের অনুমতি দেয়া হয়। রেলপথ নির্মিত হলে এটি বার্লিনের সাথে যুক্ত হবার কথা, কিন্তু ব্রিটেন এতে অনীহা প্রকাশ করে এবং এ পরিকল্পনা বানচালের জন্য উঠেপড়ে লাগে।

ইতালি : উত্তর আফ্রিকার মধ্যবর্তী এলাকায় ইতালীয় আগ্রহ বাড়াতে থাকে, কারণ এ এলাকাটি ইতালীয় উপকূলের বিপরীত দিকে অবস্থিত। ইতালীয়

রাজনীতিবিদগণ কৌশলগতভাবে এ এলাকা তাদের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করেন। ১৯০৯ সালে ইতালি ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং লিবিয়ার একটি অভিযাত্রীদল প্রেরণ করে। ১৯১২ সাল নাগাদ ইতালি লিবিয়া এবং এজিয়ান সাগরের বিক্ষিপ্ত দ্বীপসমূহের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। এর অর্থ হল উত্তর আফ্রিকায় ওসমানীয় সাম্রাজ্যে সর্বশেষ শক্ত ঘাঁটিটি হাতছাড়া হয়ে গেল।

বিদেশিদের নিকট ঋণগ্রস্ত ওসমানীয়গণ : উনবিংশ শতাব্দীতে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটে। এটি হরদম বিদেশি ঋণের জালে আবদ্ধ করে। সর্বপ্রথম ফ্রান্স ছিল অর্থধার-দানকারী। অতঃপর জার্মানি, ব্রিটেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিবর্গ তাদের অনুসরণ করে। ঋণের ওপর উচ্চ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ চাপানো হয়। বিদেশি ব্যবসায়িগণকে সরাসরি কর আওতার বাইরে রাখা হয়। সাম্রাজ্যের আয়ের উৎস এত নিম্নমুখী হয় যে, এর ফলে কোন কোন বিদেশি সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ডাক বিভাগ চালু করার সুযোগ পায়। অনেকগুলো আয়ের উৎস বিদেশি কোম্পানিদের নিকট বন্ধক রাখাও হয় যা তাদের নিজস্ব সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। ১৮৮১ সাল নাগাদ এসব বন্ধকির মালিকগণ সরকারি ঋণ প্রশাসনের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া-হাঙ্গেরি, ইতালি ও তুরস্ক প্রত্যেকের এক একজন প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হয় নাগরিক ঋণ-প্রশাসনের পরিষদ। কিছু কিছু উল্লিখিত সংরক্ষিত খাতের কর নির্ধারণ, আদায় এবং খরচের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। ১৯১৪ সাল নাগাদ সাম্রাজ্যের জাতীয় ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০০ মিলিয়ন (বিশ কোটি) পাউন্ডে। এই ঋণের বার্ষিক পরিশোধ দাঁড়ায় সাম্রাজ্যের মূল রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ। চমৎকৃত হবার বিষয় হল সাম্রাজ্যের মোট রাজস্বের পরিমাণ হল এর সমুদয় দায়বদ্ধ বিষয়ের এক-সপ্তমাংশেরও কম। যাহোক, সাম্রাজ্যের প্রধান প্রকল্পগুলো অতঃপর বিদেশি শক্তিগুলো দখল করে নেয়।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বিদেশি ঋণের অনেক ক্ষেত্রে এগুলো গ্রহীতার জন্য মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। কোন একটি দেশে বিদেশি অনুপ্রবেশের জন্য এটি একটি ফন্দিতে পরিণত হয়। এই বেনিয়া ব্যবসা যা ঋণ প্রদানের ব্যবসা বিদেশি শক্তিগুলো দ্বারা এখনও চালু রয়েছে।

যুব তুর্কিগণ : উনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্কের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থান দ্রুত অবনতিশীল হয়ে পড়ে। সংস্কারের জন্য কিছু সরকার নির্ধারিত মঞ্চের সৃষ্টি করা হয়। সাম্রাজ্যকে একটি ঝাঁকি দেবার জন্য এবং বিপ্লবের মাধ্যমে সরকারের

www.pathagar.com

অলসতা দূর করণার্থে যুব তুর্কি আন্দোলন গঠন করা হয়। যুব তুর্কিগণ (যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল তরুণ অধৈর্য যুবসমাজ) ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে একটি উদার সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে পরিবর্তনের চেষ্টা চালায়। এ আন্দোলন অনেক সামরিক কর্মকর্তাদেরকেও এর মধ্যে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। ১৯০৮ সালে যুব তুর্কিরা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে। সুলতান আবদুল সংবিধান চালু করেন। অতঃপর তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ হট্টগোলকে পশ্চিমারা তাদের দুর্বলতা মনে করে আরও ভূখণ্ডগত অধিকার লাভে অগ্রসর হয়। অস্ট্রিয়া বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল করে নেয়, অপরদিকে বুলগেরিয়া তার পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। যাহোক, অগ্রপশ্চাতে এসব ঘটনা ঘটতই। যুব তুর্কিরা সামরিক ক্ষেত্রে তাদের প্রতিশ্রুত সংস্কার সাধন করে ফলে সমগ্র বিশ্বে ওসমানীয় সেনাবাহিনী পুনরায় একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীতে পরিণত হয়।

সাফাভীয় সাম্রাজ্য (ইরান)

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা এবং মুমিনদের সেনাপতি–আমির-উল-মুমিনিন হজরত ওমরের (রাঃ) সময় পারস্য সাম্রাজ্য আরব মুসলমানদের হস্তগত হয়। অতঃপর সজ্ঞানে অধিকাংশ ইরানি ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে অধিকাংশ অগ্নি উপাসক (জরথুস্ত্রগণ) আশপাশের ভারতে পলায়ন করেন। ভারতে এখনও তাদের উপস্থিতি বোঝা যায়। যাহোক খোলাফায়ে রাশেদিন এবং উমাইয়া আমলেও ইরান নিজেদের সংযত রাখে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে আশ্রয়গ্রহণ করে ও মুসলিম হিসাবে তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখেন। কিন্তু ১২৫৮ সালে মোঙ্গলদের হাতে বাগদাদের পতনের পর পারস্যবাসিগণ রাজনৈতিক কার্যাবলি ত্যাগ করেন এবং নিজেদেরকে সুফিবাদে নিমজ্জিত করে অতীন্দ্রিয়বাদে তাঁদের সময় ব্যয় করেন। তাঁরা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি সজিব রাখেন।

১২৫৮ সালে মোঙ্গল আক্রমণের পর থেকে ১৫০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইরানে কোন একক ও শক্তিশালী সরকার ছিল না। মোঙ্গল ইসলামগণ অনেক ভাবনা-চিন্তার পর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আনাতোলিয়ার (এশিয়া মাইনর) তুর্কিদের ন্যায় নিজেদের সুফি ভাবধারার সঙ্গে সংযুক্ত করেন। মোঙ্গল গাজান মান মুসলমান হন এবং শেখ সাবেক জিলানী (খ্রি. ১৩৩৪) নামে একজন সুফির সংস্পর্শে আসেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে সাফের সুফি শামা শিয়া দলের সঙ্গে মিলিত হয়। এ শামার কেউ কেউ জোরপূর্বক শিয়া ধর্মে লোকদের দীক্ষিত করে।

এশিয়া মাইনরে বেশ কিছু সংখ্যক এ জাতীয় শিয়া তুর্কিদের দেহের কাটার ন্যায় বিরাজ করে। ফলে ক্রমশ ওসমানীয় সুন্নিদের সঙ্গে সাফি শাখায় শিয়াদের সাথে বিবাদ শুরু হয়। এই সাফির অনুসারীদের সাফাভী বলা হয়। এদের সামরিক অনুসারিগণ লাল শিরস্ত্রাণ-পরিধান করে বলে এদেরকে লাল মস্তক বা কিজিলবাস বলা হয়। সাফির সরাসরি বংশধর ইসমাইল ১৪৯০ সালে তাঁর পিতা শেখ হায়দার শিয়াধর্ম প্রচারকালে বিরুদ্ধ সঙ্গীদের হাতে নিহত হন। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ইসমাইল আরদাবিল গমন করেন ১৩ বছর বয়স্ক এই বালক সমগ্র শীরভান, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান জয় করেন এবং নিজেকে শাহ্ বলে ঘোষণা করেন। ইসমাইলের মাতৃভাষা ছিল তুর্কি এবং তিনি তুর্কি ভাষাতেই কবিতা লেখেন। ইসমাইল একজন তুর্ক হলেও এবং তার দরবারে তুর্কি ভাষা ব্যবহার হলেও অতিদ্রুত তাঁরা পারস্যবাসী হয়ে যান এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্যের নেতাদের ন্যায় পারস্যবাসীদের পদবি ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে বহির্বিশ্বের নিকট পারস্যবাসী হিসাবে পরিচিত হয়।

ওসমানীয় তুর্কিরা যেহেতু সুন্নি তাই ইসমাইল শিয়া ধর্ম অবলম্বন করেন বলে কথিত আছে। ইসমাইল প্রতিষ্ঠিত এই রাজ্যের নাম তিনি নিজের নামে না করে তাঁর পূর্ব পুরুষ শেখ সাফি জিলানীর নামে সাফাভী নাম গ্রহণ করেন, ফলে ইরানের এই বংশের নাম হয়ে যায় সাফাভী বংশ। সাদাভী বংশের প্রতিষ্ঠা কার্যত ইরানকে ওসমানীয়দের গ্রাস থেকে রক্ষা করে এবং ইরানের স্বাধীনতা আনয়ন করে।

সাফাভীয় নীতি ছিল ওসমানীয়দের প্রতি শত্রুতার ওপর। ইরানে জাতীয় চেতনা দুর্বল হয়ে পড়ে বিশেষত মোঙ্গলীয়দের ধ্বংসকার্য দ্বারা। তখন থেকে জনগণ ধর্মের প্রতি অধিক অনুরক্ত হয়ে পড়ে। সাফাভীয়গণ এই ভাবধারাকে ব্যবহার করে এবং শিয়া মতবাদকে নতুন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে। সাফাভীয়গণ ইরানকে বাকি মুসলিম বিশ্ব থেকে পৃথক করে ফেলে এবং ইউরোপীয়দের বন্ধুত্ব লাভ করে।

শাহ ইসমাইল প্রতিষ্ঠিত সাফাভীয় বংশের শেষ শাহ্ নাদের শাহ্ আফসার (১৭৩৬-১৭৪৭) ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে নাদির শাহের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে পারস্য সাম্রাজ্যের গৌরব অস্তমিত হলেও সংক্ষিপ্ত পরিসরের জান্দ বংশের সময় (১৭৫০-১৭৯৪) ইরান তবুও পশ্চিম এশিয়ায় গণ্য করার মত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় আগত কাজার বংশ ছিল সবচেয়ে অযোগ্য একটি বংশ যার প্রতিষ্ঠাতাদের ভেতর প্রাপ্ত সাধারণ উৎসাহ ও পৌরুষত্ব ছিল না।

www.pathagar.com

এদিকে শেখ সাফাভীয় শাহ্ নাদির শাহের একজন সুযোগ্য সেনাপতি আহম্মদ শাহ্ আবদালী বা দুররানী। নাদির শাহ্ নিহত হবার পর তিনি নিজেকে কান্দাহারের বাদশাহ্ বলে ঘোষণা করেন। তিনি কাবুল অধিকার করেন। ১৭৪৮ থেকে ১৭৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি সতেরো বার ভারতে সফল অভিযান পরিচালনা করেন। ১৭৬১ সালে ভারতের পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে তিনি মারাঠাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।

আধিপত্যের জন্য ইউরোপের ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্ব মধ্যপ্রাচ্যেও বিস্তার লাভ করে। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির নেতৃত্বে ফ্রান্স ভারতবর্ষে পদার্পণ করতে চায়, আর ইংল্যান্ড সেই উপমহাদেশে যাবার পথ নির্বিঘ্ন রাখতে উৎসুক। তবে ইরানে রাশিয়ার স্বার্থ ফ্রান্সের চাইতে আরও মৌলিক। ইরানের অযোগ্য শাসকদের কারণে ইউরোপীয় শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কেউ কেউ অর্থনৈতিক সাহায্য ও সংস্কার নিয়ে, কেউ প্রশাসনিক যোগ্যতা বৃদ্ধির দোহাই দিয়ে আবার কেউ ভারতের পথ পরিষ্কার রাখার স্বার্থে ইরানের অযোগ্য শাসকদের মাথায় লাঠি ঘোরাতে থাকে। এদিকে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা প্রশ্নে ব্রিটেন তার ভারতের রাস্তার নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হয়। বিদেশি তিন শক্তির কূটনৈতিক চালে শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ সালে প্যারিসে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি মোতাবেক ইরান আফগানিস্তান ত্যাগ করতঃ এর স্বাধীনতা স্বীকার করতে সম্মত হয়। ভবিষ্যতে আফগানিস্তানের সঙ্গে যেকোন বিবাদে ব্রিটেনের মধ্যস্থতা মানতেও ইরান রাজি হয়। এতে একদিকে আফগানিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে এবং ব্রিটেন তার ভারতের পথ পরিষ্কার পায়। অপরদিকে ১৮৭২ সালে ইরানে তেল আবিষ্কারের ফলে দেশটি পরাশক্তিবর্গের যুদ্ধস্থলে পরিণত হয়। তবে এর আরেক প্রতিক্রিয়া হল পারস্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুপ্রবেশ।

ইরানের শাসকবর্গের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও খুন-খারাবির (১৯০৭ সালের ৩১শে আগস্ট প্রধানমন্ত্রী আমিন আল-সুলতান মজলিশ (পার্লামেন্ট ত্যাগ করার সময় সন্ত্রাসীর গুলিতে নিহত হন) যুগে প্রধানমন্ত্রীর হত্যার দিন একটি ইঙ্গ-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি ইরানের আধুনিকায়নে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। এই চুক্তি প্রাচ্য প্রশ্নের (Eastern Quistion) ফলশ্রুতি, যা প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের একযোগে থাকার অক্ষমতা প্রকাশ করে। ইউরোপের আকাশে সংযুক্ত জার্মানির আবির্ভাব এবং মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যাবলিতে জার্মান চ্যান্সেলর ফাইজার উইলহেলমের একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করার ফলে রাশিয়া ও ব্রিটেন নবাগতের বিরুদ্ধে একটি "যুক্তফ্রন্ট" দেখাতে চায়। ইরান, আফগানিস্তান ও তিব্বতের ব্যাপারে তারা একটি সমঝোতায় উপনীত হয়। গ্রেট ব্রিটেন ও

www.pathagar.com

রাশিয়া উভয়ে যেহেতু ইরানের ব্যাপারে আগ্রহী, তাই তারা সেখানে প্রভাব প্রতিপত্তির এলাকা চিহ্নিত করে নেয়। উত্তরাঞ্চলে একটি রেখা ইয়াজিদ থেকে উত্তর-পূর্বে ইরান-আফগান সীমান্ত ও মাসহাদের পূর্ব পর্যন্ত এবং আরেকটি রেখা উত্তর-পশ্চিমে গিয়ে কেরমানশাহের পশ্চিমে ইরান-তুরস্ক সীমান্ত পর্যন্ত রাশিয়ার প্রভাব থাকে। রুশ এলাকার মধ্যে ইরানের অধিকাংশ বড় বড় শহরগুলো পড়ে। পক্ষান্তরে প্রভাব-প্রতিপত্তির এলাকা হিসাবে ব্রিটিশগণ শুধু ব্রিটিশ বেলুচিস্তানের নিকটবর্তী দক্ষিণ-পূর্ব কোণটুকু পায়। দেহের অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ অধিকাংশ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে নিরপেক্ষ এলাকা বলে চিহ্নিত করা হয়।

এভাবে এলাকা বন্টনের দ্বারা পারস্যের সংস্কারপন্থী নব্য বিপ্লবিগণ অনুভব করেন, যে আধুনিকতা ও বিপ্লবী চেতনার পশ্চিমা অনুকরণে তারা বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তা অংকুরেই বিনষ্ট করে পশ্চিমারা তাদের নিজের স্বার্থে তা নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। গণতান্ত্রিক ব্রিটেন থেকে অনেক কিছুর প্রত্যাশী পারস্য বিপ্লবিগণ বিশ্বাস করেন যে তাদের ঠকানো হয়েছে।

এভাবে পারস্য বিপ্লবের প্রথম অধ্যায় শেষ হয়। ওলামা ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিবাদ, জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একতার অভাব এবং সরকার ও প্রশাসনের অভিজ্ঞতার অভাব এটি ব্যর্থ হয়। রাশিয়া ও গ্রেটব্রিটেনের হস্তক্ষেপের ফলেও এটি ব্যর্থ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮) পারস্যবাসিগণ আশংকা করে, আঁতাতপক্ষ জয়লাভ করলে ইরানকে নিশ্চয়ই রাশিয়া ও ব্রিটেনের মধ্যে ভাগ করা হবে। যাহোক, আঁতাতপক্ষ বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করলেও রুশ বিপ্লবের দরুন রাশিয়া সরে দাঁড়ানোর ফলে আপাতত ইরান বিভক্তি থেকে রক্ষা পায়।

আরবিভাষী জনগণের জাগরণ

বিভিন্ন ভাবধারা ও ঘটনাবলি উনবিংশ শতাব্দীতে আরবিভাষী লোকদের উত্তেজিত করে তোলে। তারা মিসরের মাধ্যমে ও লেবাননের মার্কিন ও ফরাসি মিশনারিদের ধর্মীয় কার্যাবলির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে এবং নব্য-ওসমানীয় ও নব্য-তুর্কিদের আন্দোলনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হয়। তবে পাশ্চাত্য প্রভাবেরও পূর্বে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আরব উপদ্বীপে দেশীয় ওয়াহাবি আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়ার দিক থেকে এটিকে সপ্তম শতাব্দীতে মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শ প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখে কেউ কেউ এটিকে ইসলামীয় দ্বিতীয় আবির্ভাব বলে বিবেচনা করে।

www.pathagar.com

ওয়াহাবি আন্দোলন পর্যালোচনা না করে পাশ্চাত্যের ভাবধারার প্রতি ইসলামের প্রতিক্রিয়া বোঝা সম্ভব নয়। এ আদর্শ আরবের বাইরে বিস্তার লাভ না করলে, এস প্যান ইসলামী ভাবধারাকে প্রভাবান্বিত করে এবং এর মূল আরব প্রকৃতি বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উদীয়মান প্যান-আরব ভাবধারায় যথেষ্ট অবদান রাখে।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব (খ্রি. ১৭৯২) ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ইসলামের এক টলটলায়মান ও রুগ্ন সমাজ লক্ষ করেন। কয়েক বছর পর জিয়া পাশা নামে এক ওসমানীয় বুদ্ধিজীবী ও ইউরোপ এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্যে ভ্রমণ করেন। তিনি বলেন, কাফেরদের চেয়ে মুসলিম দেশসমূহে তিনি অনেক ধ্বংসযজ্ঞ দেখতে পান। পরবর্তী অনেক বুদ্ধিজীবী দেশভ্রমণ করে ইউরোপের মাপকাঠিতে মুসলিম দেশসমূহে অনেক ঘাটতি দেখতে পান। অথচ ইবনে ওয়াহাব কোরআনের আলোকে যাচাই করে মুসলিম দেশসমূহে অনেক ঘাটতি দেখতে পান। তিনি ইউরোপ সফর করেননি, কারণ তিনি নিশ্চিত যে ইসলামকে শেখাবার মত কোন কিছু কাফেরদের নেই। তৎপরবর্তীতে তিনি কোরআনে যদি ফিরে গিয়ে সামাজিক ও বুদ্ধিমত্তার কোরআনবহির্ভূত সব প্রভাব পরিত্যাগ করেন। তাঁর মতানুসারে এসব প্রভাবের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর অন্তর অবতরণ সম্পর্কীয় সুফি বিশ্বাস, বুদ্ধিজীবীদের যুক্তিবাদী এবং সাধারণ-লোকদের মাজার পরিদর্শন অতিভক্তি প্রদর্শন। একজন খাঁটি মুসলমান হিসাবে তিনি মনে করেন, দরবেশ, দরগাহ, মাজার তসবিহমালা ও জিনসমূহে বিশ্বাস করা ইসলাম বিরোধী। তিনি আরও মনে করেন আরবে অবতীর্ণ ইসলাম পারস্য ও তুর্কিদের সংস্পর্শে এসে কলুষিত হয়েছে। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি তুরস্কের সুলতান খলিফার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অনুসারিগণ নিজদেরকে মুজাহিদিন (একত্ববাদী) বলে আর অন্যদেরকে পৌত্তলিক ভাবে। তাঁরা মহানবী (সাঃ) এর যুগকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে হাম্বলি মজহাব অনুযায়ী আইনকানুন যথাযথ পালনের ঘোষণা করেন। তাঁরা অস্ত্রধারণ করেন এবং বিপথগামীদের সোজা পথে আনার পথ গ্রহণ করেন। ১৭৬৫ সালে মুহাম্মদ ইবনে সাউদ নামক এক গোত্রপতি এ ডাকে সাড়া দেন এবং নিজের বাহুবল একাজে নিয়োজিত করেন। ১৭৭৩ সাল নাগাদ তারা উদ্যত হয়। আরবদেরকে দ্বিতীয় জাহেলীয় যুগ থেকে পুনরুজ্জীবিত করতে তারা অগ্রসর হন বলে জানান।

তুরস্কের সুলতান খলিফা এহুমসিতে নীরব থাকতে পারেন না, আবার সাম্রাজ্যের সুন্দর কোণে সংঘটিত এ হুমকি দমনের সমর্থনও তার নেই। তাই

www.pathagar.com

তিনি মিসরের মেদিভ মুহাম্মদ আলীর নিকট ধর্ণা দেন, যিনি ১৮১১ সালে আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৮১৮ সাল নাগাদ তার পুত্র ইব্রাহিম পাশাকে দিয়ে ওহাবিদের দমন করে মক্কা-মদিনা পুনর্দখল করেন। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ওহাবিগণ সুলতানের প্রতিনিধিদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকেন। এ যুদ্ধ ১৮৯১ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে, অতঃপর মুহাম্মদ ইবনে রশীদ রিয়াদ অধিকার করেন এবং ইবনে সাউদের পরিবারকে কুয়েতে নির্বাসিত করেন। ১৯২০ সালে এখান থেকেই ওহাবিদের শেষ ২০ বছর বয়সী আবদ-আল-আজিজ ইবনে সাউদ গোপনে রিয়াদে অবস্থিত রাশিদী প্রাসাদে প্রবেশ করে তুর্কি গভর্নরকে হত্যা করেন এবং ক্রমশ সমগ্র আরব উপদ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করেন। মুজাহিদিন বা ওয়াহাবিদের সুস্পষ্ট ভাবধারা, তাদের একক উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা মিসর ও কার্টসিল ক্রিসেন্টের আরবিভাষী লোকদের মনে বিদ্যমান সংশয়ের সম্পূর্ণ বিরোধী। শেষোক্ত লোকদের মধ্যে অনেক পরস্পর বিরোধী আনুগত্য কাজ করে। ধর্মগত দিক থেকে সেখানে বিভিন্ন শ্রেণির খ্রিস্টান এবং হরেক রকম মতবাদের মুসলমান দ্রুজে ও একটি ছোট ইহুদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিদ্যমান। রাজনৈতিক দিক থেকে কেউ কেউ ওসমানকে সাম্রাজ্য চায়, কেউ কেউ স্বাধীনতা চায়, আবার কেউ কেউ ওসমানীয় অধীনে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী, তারা সবাই আরবিভাষায় কথা বললেও তাদের অনেকেই, বিশেষত মিসরীয়গণ নিজদিগকে আরবি বলে বিবেচনা করে না, কারণ, আরব জাতির মতবাদ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে রূপ পরিগ্রহ করেনি। ফলে কোন আন্দোলন প্রথম আসে, তা সঠিকভাবে বলাও যায় না এবং এটি তেমন গুরুত্বপূর্ণও নয়।

প্যান-ইসলামী আদর্শ

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, নব্য-ওসমানীয়দের কেউ কেউ যেমন নামিক কামাল প্রমুখ ওসমানীয় সাম্রাজ্যের আওতায় সীমিত আকারের প্যান-ইসলামী আদর্শের কথা চিন্তা করেন। তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ এই ভাবধারায় উৎসাহ প্রদান করেন অংশত নিজ সাম্রাজ্যের অতুর্কি লোকদের আনুগত্য লাভের জন্য এবং অংশত ইউরোপীয় শক্তিবর্গের লঘু করার জন্য—যে শক্তিবর্গের অধীনে অনেক মুসলমান প্রজাও বিদ্যমান। আরবিভাষী লোকজন যেহেতু ওসমানীয় সাম্রাজ্যে সর্ববৃহৎ মুসলিম জনশক্তি এবং তাদের ভাষার জন্য প্যান-ইসলামী আদর্শের পক্ষে অতি উত্তম তাই সুলতান তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক তাঁর স্বপক্ষে আনয়ন করেন।

www.pathagar.com

সুলতান আবদুল হামিদ কর্তৃক আমন্ত্রিত একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন ওয়াহাবি বিরোধী একজন প্যান-ইসলামী আদর্শবাদী আলেপ্পোর শেখ আবুল হুদা। তার বিশ্বাস খেলাফত আল্লাহর বিধিবিধান কার্যকরী করার প্রধান একটি হাতিয়ার তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। তবে মুসলমানদের মধ্যে প্যান-ইসলামী আদর্শ সীমিত হলেও তাঁর উদ্দেশ্য হল আবদুল হামিদের দাবি জোরদার করা।

জামাল-আল-দ্বীন আল-আফগানী

প্রসিদ্ধ প্যান-ইসলামী আদর্শবাদী নিঃসন্দেহে জামাল-আদ-দ্বীন আফগানী (১৮৩৯-১৮৯৭ খ্রি.)। তাঁর সীমারেখা ওসমানীয় সাম্রাজ্য অতিক্রম করা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। তাঁর জীবন এত ঘাতপ্রতিঘাতমূলক, তার রচনা এত অনলবর্ষী ও প্রখর এবং ইসলামের মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর পরিকল্পনা এত বিভিন্নমুখী আবার কোন কোন সময় এত পরস্পরবিরোধী যে তাঁর সম্পর্কে পণ্ডিতগণ এমনও শেষ কথা বলতে পারেননি, তিনি নিজেকে আফগানী দাবিকালেও তিনি বস্তুত একজন পারস্যবাসী। নিজেকে সুন্নি দাবি করলেও তিনি মূলত শিয়া। সারাজীবন তিনি একজন শক্তিশালী মুসলমান শাসক ছিলেন যার অধীনে থেকে তিনি ইসলামকে পুনর্জীবিত করতে পারেন।

আফগানী বা ইরানে পরিচিত আসাদাবাদী একজন যোগ্য কার্যকর ও অস্থির আন্দোলনকারী ছিলেন। তিনি ধর্মতত্ত্বের দর্শনশাস্ত্রে আবার আরো আগ্রহী রাজনীতিতে। তিনি কল্পনাবিদ নহেন, বরং কর্মাধিক, রাজনীতিতে নিজের মতামতকে অতি সহজে তুলে ধরার চমৎকার যোগ্যতা তার মধ্যে রয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়কে তুলে ধরার আকাঙ্ক্ষাও তার মধ্যে আছে। মোয়াহোসিনদের ন্যায় খোলাফায়ে রাশেদুনকে তিনি আদর্শ শাসনকারী মনে করেন। তিনি অলৌকিকতায়ও বিশ্বাস করেন। তবে তুলনামূলকভাবে আফগানী ইসলামকে যুক্তিবাদের উপর দাঁড় করাতে আগ্রহী। তাঁর মতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক অবিশ্বাসসমূহ, যথা বাষ্পীয় ইঞ্জিন এবং বিদ্যুতের ন্যায় আধুনিক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারে কোরআনে লুক্কায়িত উল্লেখ রয়েছে। মানুষের একমাত্র করণীয় হল আল্লাহর বাণী সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য নিজের যুক্তি প্রয়োগ করা।

আফগানী মনে করেন, ইসলামে মার্টিন লুথারের ন্যায় একজন সংস্কারকের প্রয়োজন এবং সম্ভবত তিনি মনে করেন তিনিই সেই (?) লুথার, তবে তিনি

www.pathagar.com

সংস্কারকের চাইতে ধর্মযোদ্ধার তরবারিকেই অধিক পছন্দ করেন। ইসলামের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আশা করেন, ইরানের শাহ্ ওসমানীয় সুলতানকে খলিফা হিসাবে স্বীকার করুন। বিনিময়ে সুলতান ইরানের স্বাধীনতা স্বীকার করুন এবং শিয়া পবিত্র নগরী কারবালা ও নাজাদ সে দেশের নিকট ফেরৎ দিন। এরপর তাঁর ইচ্ছা সব মুসলিম দেশ ইস্তাম্বুলে একত্রিত হয়ে ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুক। ইরানের শাহ শিগগিরই তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেন। অনতিবিলম্বে আফগানীর এক শিষ্যের হাতে শাহ নিহত হন।

একজন দক্ষ আন্দোলনকারী হিসাবে আফগানী তাঁর উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বনে আগ্রহী। তিনি মুসলিম জনগণের ঐক্য কামনা করেন, অন্য ধর্মের ওপর এর প্রাধান্য প্রচার করেন এবং তাঁর কর্মপন্থায় বিরোধিতাকারীদের হত্যা করার বৈধতাও স্বীকার করেন। কিছুকাল তিনি ব্রিটিশদের সাহায্য কামনা করেন, পরে আবার রুশদেরও। নিজেকে সুন্নি সপ্রমাণ করার জন্য তিনি আফগানিস্তানের শ্লোক বলে পরিবার (অধিকাংশ আফগান সুন্নি) দেন। ইসলামের পুনর্মিলনে সহায়তা লাভের জন্য তিনি প্যারিস, লন্ডন ও পিটার্সবার্গে গমন করেন। ইসলামে একতা আনয়নে সক্ষম একজন শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতার তিনি খোঁজ করেন। তিনি ইরানের শাহ্ মিসরের মেদিভ ও তুরস্কের সুলতানের নিকট গমন করেন। এরা তাঁকে কিছুকাল সহায়তা করেন। তিনি তুলনামূলকভাবে সুলতান আবদুল হামিদের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হন। তিনি পুনরায় ইস্তাম্বুল গমন করেন, কিন্তু তাঁর আনুগত্য যেহেতু ইসলামের প্রতি ওসমানীয়দের প্রতি নয় তাই সুলতান তাঁকে কৌশলে গৃহবন্দি করে রাখেন এবং এ অবস্থায় ১৮৯৭ সালে তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

মুহাম্মদ আবদুহু

প্যান-ইসলামী আন্দোলনের আরেক প্রভাবশালী ও সক্রিয় প্রবক্তা মুহাম্মদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫)। আফগানীর একজন শিষ্য হলেও তিনি আরও প্রাগ্রসর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। তিনি ভবঘুরে ছিলেন না বরং মিসরের জীবন ও সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একজন শিক্ষক ছিলেন। কিছুকাল আফগানীর সাথে অতিবাহিত করলেও তাঁর মন বসেনি, বরং তিনি শিক্ষা ও সংস্কারে তাঁর জীবন কাটান। ইসলাম যে হুমকির সম্মুখীন এ ব্যাপারে তিনি তাঁর শিক্ষকের সাথে একমত, কিন্তু এটি যে খ্রিস্টান ধর্মের দ্বারা তা তিনি মানতে নারাজ। বরং তিনি মনে করেন কোন কোন মুসলমানের কর্মকাণ্ডের দ্বারাই ইসলাম হুমকিতে রয়েছে।

www.pathagar.com

আবদুহু মনে করেন ইসলামকে পাশ্চাত্যের মোকাবিলা করতে হবে, কিন্তু তা যে ক্ষমতা লাভের দ্বারাই করতে হবে তা তিনি মানেন না, বরং তাঁর মতে মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ সংস্কার দ্বারাই তা সম্ভব। আবদুহু আধুনিক মুসলিম জগতে সামাজিক সেবা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে তার কর্মদক্ষতা শিক্ষা সংস্কারে ব্যয় করেন। আফগানী অনুসৃত নীতি অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন রাজধানী ঘুরে রাজনীতিনির্ভর কূটনীতি তিনি পরিহার করেন, বরং শাসকদিগকে শিক্ষামূলক সংস্কার উদ্ভাবনে তিনি তাঁর সময় ব্যয় করেন।

প্রারম্ভিক যুগের ইসলামের অনুশাসন অনুসরণের ব্যাপারে তিনি ওয়াহাবিদের সমর্থন করেন সে সঙ্গে তিনি আধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ কাজে লাগিয়ে ইসলাম প্রচারের একজন সমর্থক। তিনি তৎকালীন বা মযহাব মানার ব্যাপারে প্রাথমিক ইমামদের অনুসরণের বিপক্ষে। তিনি মনে করেন ইজতেহাদ বা কোরআনের ব্যাখ্যার পথ এখনও রুদ্ধ হয়নি, কিন্তু তকালীদ মানতে গেলে ব্যাখ্যার পথ রুদ্ধ হয়। তিনি কখনও শিক্ষার ইউরোপীয় আদর্শের পক্ষপাতী নন। তিনি ইসলামকে একটি বিশ্বজনীন ধর্ম বলে বিবেচনা করেন। কোরআনের ওপর তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা সহনশীল, নৈতিকতাপূর্ণ ও সুদক্ষ। এটি একজন স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মী উভয় নীতিজ্ঞানমুখী।

পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ঐতিহ্যের অধিকারীদের হাত থেকে তিনি নিজেকে সারাজীবন রক্ষা করার কাজে ব্যয় করতে হয়। তারা অভিযোগ করেন, ইনি কী ধরনের শেখ, যিনি ফরাসি ভাষায় কথা বলেন, ইউরোপ ভ্রমণ করেন, পাশ্চাত্য পুস্তকাদি অনুবাদ করেন, পাশ্চাত্য দার্শনিকদের উদ্ধৃতি দান করেন, তাদের পণ্ডিতদের সাথে আলোচনা করেন, এমন সব ফতওয়া জারি করেন যেগুলো প্রাচীনগণ কখনও জানেন না, জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং দরিদ্র ও দুর্ভাগাদের জন্য চাঁদা আদায় করেন। তিনি যদি একজন ধর্মবিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন তবে তাঁকে আপন গৃহ ও মসজিদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে দাও। তিনি যদি ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বের লোক হন তবে আমাদের মতানুসারে তিনি সে পথে থাকি মুসলমানদের চাইতে অধিক কর্মঠ।"[১]

আবদুহু একজন মিসরীয়। জাতীয়তাবাদী আরাবী পাশা পরিচালিত মেদিভ বিরোধী ও বিদেশি শক্তিবিরোধী বিদ্রোহে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীন মিসরীয় ঐতিহ্যে গর্ববোধ করেন, এর ফলে তাঁর ভাবধারা মুসলিম উম্মাহর ব্যাপক জাতীয়তাবাদ থেকে ঈষৎ পরিবর্তিত। কারও কারও মতে এটি তাঁর

---

[১]ইয়াহইয়া আরমাজানী, মধ্যপ্রাচ্যর অতীত ও বর্তমান, পৃ. ২৬৪।

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের বহিঃপ্রকাশ। তিনি একটি দেশের মুসলমানদের ঐক্যকে সমগ্র মুসলমানদের ঐক্য সূত্রের শক্তি সংযোজনী গ্রন্থি বলে মনে করেন। এটি আবার তাঁর মুসলিম জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ। এটি আবার প্রাচীন পল্লী প্যান-ইসলামী আদর্শ, কিন্তু আবদুহু কর্তৃক প্রবর্তিত পরিবর্তন হল, কোন জাতির মধ্যে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় ধর্মাবলম্বী থাকলে সেখানে ধর্ম (?) তাদের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করতে হবে। অপরদিকে তিনি মতবাদ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চিন্তার একজন সমালোচক।

পরে আগত অসংখ্য মুসলিম চিন্তাকারিদের ন্যায় তিনি দুটো বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন। তার একটি হল ইসলামের দাবি, অর্থাৎ একজন মুসলমান হিসাবে তার কর্তব্য হল আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী জীবননির্বাহ করা এবং অপরটি হল আধুনিক সভ্যতার দুর্নিবার দাবি, যা তাকে ভিন্নভাবে চলতে বাধ্য করে। এ দুটো অসঙ্গত নয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এগুলোর মধ্যে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হলে তাঁর বক্তব্য হল ইসলামের নৈতিক ও মতবাদমূলক দিকগুলোর সাথে আপস করা যায় না। তা সত্ত্বেও তাঁর অস্থিরতা বিচ্ছুরিত হয়নি এবং এক সময় তিনি প্রাচীন প্রার্থীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হন, কারণ তিনি সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছেন, আবার আধুনিকপন্থীদের দ্বারাও তিনি প্রত্যাখ্যাত হন, কারণ তিনি মোটেই অগ্রসর হননি।

প্যান-ইসলামী আদর্শ

নিমিত্ত বিশ্বজনীন ভাবধারা থাকা সত্ত্বেও ইসলামের সাথে আরাবীবাদের একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান, কারণ ইসলামের দোলনা-যুগ আরবে অতিবাহিত। ফলে অনারব মুসলমানদের একটু ভিন্নভাবেই উপস্থাপন করা হয় এবং আরবির বিপরীতে তাদেরকে আজমি বা বোবা বলা হয় ইসলামের আগমনের অনেক পূর্ব থেকেই। আরব মুসলমানদের এই উচ্চ মর্যাদাকে অনারব বা আজমি মুসলমানেরা অকপটচিত্তে ধর্মীয়ভাবে গ্রহণ করেন, কারণ মহানবী (সাঃ)-এর ভাষা আরবি এবং বেহেশতের ভাষা আরবি। তবে রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন কথা। যাহোক প্রথম চার খলিফার আমলে অনারব মুসলিমদের "বন্ধু" বা মাওলা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। উমাইয়া আমলে আরাবীকে আরও প্রাধান্য দেয়া হয় এবং খলিফা আবদুল মালিক (৬৮৫-৭০৫ খ্রি.) আরাবীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেন, যদিও ইরানিরা কখনও তা জেনে নেয়নি। যাহোক, আরবদের রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে যাবার পর রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে আরববাদ তিরোহিত হয়,

www.pathagar.com

কিন্তু ভাষার সাথে সম্পর্কযুক্ত আরববাদ থেকে যায়। খাঁটি মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন, যে ব্যক্তি মহানবীকে (সাঃ) ভালোবাসেন তিনি আরবদের ভালোবাসেন–যে ভাষায় অত্যুত্তম গ্রন্থাবলি অবতীর্ণ হয়। যাহোক উনবিংশ শতাব্দীতে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের পুনর্জাগরণ এবং প্যান আরবি আদর্শের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি হিসাবে এর ব্যবহার, যা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উন্নতি লাভ করে, প্রধানত ফার্টাইল ক্রিসেন্টের (প্রাচীন মেসোপটেমিয়া সিরিয়া জর্দান) খ্রিস্টানদের কার্যাবলি দ্বারা এবং আমেরিকার প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের উৎসাহ প্রদানের দ্বারা কার্যকরী হয় যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বার্থ পার্টি গঠনের মাধ্যমে।

মুসলিম প্রতিবেশীদের তুলনায় সিরিয়া-লেবাননের খ্রিস্টানগণ ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। প্যান-ইসলামী আদর্শের প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুলতান আবদুল হামিদ হেজাজ রেলপথ সমাপ্ত করেন, যাতে সহজে মক্কা-মদিনা ভ্রমণ করা যায়, পবিত্র নগরীদ্বয়ের ভবনসমূহ মেরামত করেন, আরবি দেহরক্ষী নিয়োগ দেন এবং আরবদেরকে উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। তবে, খ্রিস্টানদের এসব কাজ থেকে দূরে রাখা হয়। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তাদের আনুগত্যের অভাবে খ্রিস্টানগণ পাশ্চাত্য ভাবধারা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি আকৃষ্ট হয়। লেবাননের মেরোনাইট খ্রিস্টানদের ব্যাপারে ফরাসি ক্যাথলিকদের ধর্মীয় উৎসাহ এবং আমেরিকান প্রটেস্ট্যান্টদের ধর্মীয় আগ্রহ পাশ্চাত্য সভ্যতার সুফল বয়ে আনে। ধর্মীয় ব্যাপারে তেমন সফলতা পাওয়া না গেলেও তাদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও পরোক্ষ রাজনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

খ্রিস্টানদের ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে গোপনে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। উভয়ে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে, উভয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রকৌশল বিদ্যা ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় অনুষদ সম্বলিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। ফরাসি প্রভাব কিছুটা সীমিত কারণ রোমান ক্যাথলিকগণ শুধু মেরোনাইটদের শিক্ষা দিতে ও শক্তিশালী করতে অধিক আগ্রহী। তদুপরি ফরাসি সংস্কৃতি বিস্তারের আশায় তারা ফরাসি ভাষা শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। অপরদিকে আমেরিকার প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারিরা সমস্ত আরবদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করে। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে তারা বৈরুতে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে এবং বাইবেল গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করে। কর্নেলিয়াস ভ্যান ডাইশ (Cornulies Van Dyke), ক'জন আরবি ভাষা পণ্ডিত একাজের দায়িত্ব গ্রহণ

www.pathagar.com

করেন এবং লেবাননি–বাটরাস-আল-বুস্তামী (১৮১৯-১৮৮৩) (Butrus al-Bustern and Nasif al-Yasidi) এবং নাসিফ আল-ইয়াজিজি (১৮০০-১৮৭১) তাঁকে এ কাজে সাহায্য করেন। আল-ইয়াজিদ আরব ইতিহাস ও সাহিত্যের ওপর লেখেন এবং কবিতায় প্রাচীন আরাবীর প্রশংসা করেন। ইনিই ১৮৬৮ সালে সম্ভবত প্রথমত ঘোষণা করেন যে, ওসমানীয় শাসন থেকে মুক্তি লাভের জন্য তাঁদের কাজ করা উচিৎ। বাটরাস একজন স্কুল শিক্ষক ও অত্যন্ত উন্নতিশীল লেখকে পরিণত হন। ১৮৭০ সালে তিনি প্রথম আরবি সাময়িকী আল-জিনান প্রতিষ্ঠা করেন, যা ১৬ বছর ধরে আরবি ভাষী বিশ্বে আধুনিক চিন্তাধারার ওপর পাঠ্য হিসাবে কাজ করে।

সিরিয়ান প্রটেস্ট্যান্ট কলেজ, পরে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব বৈরুত-এর ছাত্রগণ নাহদা নামে একটি জাতীয় নবজাগরণের নেতৃত্ব দান করে। এটি আরবি ভাষায় বহুময়ী প্রতিভা পুনরাবিষ্কার করে এবং পাশ্চাত্যের ধর্মীয় সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাও প্রবর্তন করে। এসব অগ্রনায়কগণ বিভিন্ন সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সমিতিসমূহ চালু করেন এবং এসব সমিতিতে আরবি জাতীয় আন্দোলনের সূচনা করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রকাশিত দুটো প্রভাবশালী সাময়িকীর একটি হল আল-মুকতাতাফ্ (Al-Muqtataf)। ১৮৭৬ সালে সিরিয়ান প্রটেস্ট্যান্ট কলেজের দু'জন গ্রাজুয়েট, ইয়াকুব শরিফ ও ফারিস নিমব এটি প্রতিষ্ঠা করেন। অপর সাময়িকীর নাম আল হিলাল, যা ১৮৯২ সালে জুর্জী যায়েদান প্রতিষ্ঠা করেন। এই উভয় পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় এবং সংশ্লিষ্টরা সুলতানের গুপ্তচরদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মিসরে পলায়ন করেন। এসব ব্যক্তিবর্গ এবং আরও অনেকে, তন্মধ্যে শিবলী শুমাইল (১৮৫০-১৯১৭) এবং ফারাহ আনতুন (১৮৭৪-১৯২২) কিছু কিছু বিষয়ে একমত হন।

প্রথম বিষয় হল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান। এর একটি নিজস্ব বিশ্বজনীন মূল্য এবং এবং নিকট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় গোপন বিষয়ের চাবিকাঠি রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। এর ভিত্তি রয়েছে সমস্ত কিছুর ঐক্যের ভেতর, এটি প্রকাশ করার জন্য তাওহীদ শব্দ ব্যবহার করা হয়; এটি একই ভয়ানক শব্দ যদ্বারা ইসলামের ঐক্যকে বোঝানো হয়। তাঁদের অধিকাংশই ডারউইনের মতবাদে মুগ্ধ হন এবং তাদের নিকট প্রগতির বাস্তবতা ইউরোপীয় লেখকদের ন্যায়ই, যাঁদের কার্যাবলিতে তারা আরবিও অনুবাদ করেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত তার ধর্মনির্বিশেষে জাতির ঐক্য এবং এর সমস্ত নাগরিকদের সাম্যে বিশ্বাস করে। জাতি বলতে তারা কখনও ওয়াতান (পিতৃভূমি), কখনও কউম (গোষ্ঠী) বা কখনও উম্মা বলে, যদ্বারা বিংশ শতাব্দীতে এটি পরিষ্কার রূপ ধারণ করে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হল তখন মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদি ও ড্রজেস (দুর্জি) সবাই একই উম্মার সদস্যভুক্ত হয়। তৃতীয়ত তারা বিশ্বাস করে, নতুন বিজ্ঞান এর মধ্যে নতুন আইন ও নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি করে। অতীতের আইন- ইসলামের বা খ্রিস্টানদের বিধিবদ্ধ আইন হোক, তা পরিত্যজ্য। তদুপরি এটি জনগণকে বিভক্ত করে ফেলবে ও বৈষম্য সৃষ্টি করবে। চতুর্থত তারা পার্থিব ব্যাপারে ধর্মের পৃথকীকরণে বিশ্বাসী। তাদের মতে, এ দুটোর সংমিশ্রণে উভয়কে কলুষিত করে এবং ধর্মকে জাতীয়তার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করলে চিন্তার স্বকিয়তা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যাহত হবে। তাদের অধিকাংশ ধর্মীয় লোক এবং তাদের মধ্যে খ্রিস্টানরা মনে করে ঐতিহাসিক প্রদর্শনীয় বিষয় হিসেবে ইসলামকে সম্মানিত আসন দেয়া উচিৎ।

একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করার দাবি করত খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের সাথে সামাজিক রাজনৈতিক সারবিষয়ে সমানাধিকার দাবি করে। অপরদিকে মুসলমানদের পক্ষে এ দাবি সমর্থন করার অর্থ হল এযাবৎ ইসলাম এতদঞ্চলে যে প্রাধান্য লাভ করে আসছিল তা থেকে সরে আসা। প্যান-ইসলামীদের মতে, এমনকি আবদুহুর ন্যায় একজন উদার ও পরমতসহিষ্ণু ব্যক্তির মতে এযাবৎ ইসলাম এতদঞ্চলের সমস্ত ধর্মের ওপর যে প্রাধান্য লাভ করত তা অস্বীকার করা।

কিন্তু মুসলমানগণ যতই পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে ততই তারা ওসমানীয় সুলতানের নীতিসমূহের প্রতি অনাসক্ত হতে থাকে এবং এসব আধুনিক ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। ১৯০৮ সালের নব্য তুর্কি বিপ্লব এবং এর তুর্কি জাতীয় করার কর্মসূচি আরবি ভাষা মুসলিম যুবকদের খ্রিস্টানদের সংগঠনসমূহের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। কেউ কেউ তাদের সংগঠনে যোগ দেয় আবার কেউ কেউ আল-ফাতাহ জাতীয় মুসলিম দলসমূহ গঠন করে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে। আবার অনেকেই যারা অতদূর অগ্রসর হতে পারেননি তারা অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীয় ন্যায় আরব-তুর্কির দ্বৈতরাজতন্ত্র কায়েম করে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ব্রিটিশগণ তাদের সুবিধামত ব্যবহার করে।

www.pathagar.com

স্থানীয় জাতীয়তাবাদ : ওসমানীয়গণ লেবানন ও আরব উপবাসীদের কিছু অংশ ব্যতীত অধিকাংশ কার্টসিল ক্রিসেন্ট এক অঞ্চল হিসাবে পৃথক সরকারের অধীনে শাসন করে। ইতিপূর্বে লক্ষ করা গেছে মিসর ভৌগোলীয় রাজনৈতিক উভয় এটা থেকে পৃথক ছিল। মুহাম্মদ আলী পাশার আগমনে কার্টসিল ক্রিসেন্ট ও মিসরের জনগণের ব্যবধান আরও বিস্তৃত হয়। ফলে মিসরীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পৃথক জাতীয়তার চিন্তাচেতনা সহজতর হয়। মুহাম্মদ আলীর সংস্কারের ফলে মিসরীয়দের মধ্যে ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটে, তদ্বারা তাদের পক্ষে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করা সহজতর হয়। ১৮৮২ সালে মিসর মিসরীয়দের–এ শ্লোগান ওঠে, কিন্তু সে সময় ইরাক ইরাকিদের বা এ ধরনের কোন ধ্বনি কোথাও উত্থিত হয়নি।

অপরদিকে ইসলামী শিক্ষার সর্ববৃহৎ ও অতি প্রভাবশালী শিক্ষা কেন্দ্র আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আফগানী ও আবদুহুর ন্যায় শিক্ষকগণ তথায় ইসলামের দাবিসমূহ ঘোষণা করেন। তদুপরি অন্যান্য যেকোন স্থানের বাইরে মিসরে চিন্তার স্বাধীনতা অধিক তাই সিরিয়া-লেবাননের অনেক লেখক কায়রোতে চলে যান এবং তথায় তাঁদের পত্রিকা প্রকাশ করেন। ফলে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের যে কোন স্থানের আন্দোলন কায়রোতে সংগঠিত হতে থাকে। সেখানে প্যান-ইসলামীদের ন্যায় প্যান-আরবীয়গণও কাজ করার সুযোগ পান। সে সাথে মুসলিম ঐতিহ্যবাদিগণ এবং ধর্মনিরপেক্ষবাদিগণও কাজ করার সুযোগ পান। সেখানে এমন অনেকেও রয়েছেন যারা নিজেদের পৃথক জাতি বিবেচনা করেন এবং অন্যদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। মনে করেন, যদিও তারা আরবি ভাষায় কথা বলেন, অথবা মুসলমান অথবা উভয়টিই। বিষয়টি ঘোলাটে মনে হয় যখন দেখা যায় এদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান আবার ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিও অনুগত।

মিসরের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং পরবর্তী মহাজনদের দৌরাত্ম্য কিছুর ন্যায় হিজব-আল-আতানিয়া নামে জাতীয় দলও আনয়ন করে–যদ্বারা পরে আরবি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এর আদর্শের সাথে একমত না হয়ে আবদুহু এতে যোগ দেন। তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করা হয় ওসমানীয় বা আরব হিসাবে নয় বরং একজন মিসরীয় হিসাবে। একজন মুসলমান (আবদুল্লাহ নাদিম) একজন খ্রিস্টান (আদিব ইসহাক) ও একজন ইহুদি (ইয়াকুব সানু) জাতীয় বা মিসরীয় ঐক্যের ওপর জোর দেন।

পরবর্তীকালে মিসরে ব্রিটিশগণ জয়লাভকালে সবাই কাজে যোগ দেন এবং আবদুহুও শিক্ষা ও অন্যান্য সংস্কারে যোগ দেন। এক নতুন পুরুষের আগমন

www.pathagar.com

ঘটে যারা মিসরের পূর্ব অবস্থা সম্পর্কে অনবিহিত। তারা মনে করে ব্রিটিশরা মিসরকে দেউলিয়া থেকে উদ্ধার করেনি বরং এটি একটি বিদেশি শক্তি। ফলে ব্রিটিশ মনোভাব এদেরকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। লর্ড ক্রোমার মতামত ব্যক্ত করেন, মিসর জাতি নয়, তাই দেশপ্রেম বুঝবার ক্ষমতা তাদের নেই। তিনি আরও বলেন মিসরের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে একটি আত্মনিয়ন্ত্রণকারী সংস্থায় পরিণত করা সম্ভব এবং সে অবস্থায় আনয়নের জন্য ব্রিটিশদের কয়েক বছর বা যতদিন প্রয়োজন মিসরে অবস্থান করা জরুরি।

মুস্তফা কামিল (১৮৭৪-১৯০৮) প্রমাণ করেন মিসর একটি জাতি। তিনি একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। কারও মতে তিনি নেতা আবার কারও মতে তিনি প্রতারক। ৩৪ বছর বয়সে ইন্তেকালের ফলে তিনি একজন জাতীয় নেতায় পরিণত হন। তিনি মনে করেন মিসর একটি বহুমাতৃক জাতি যা একাধারে ওসমানীয় মুসলিম ও প্রাচ্যদেশীয়। আপাতত জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য মিসর একক জাতিসত্তা। ব্রিটিশদের মিসর থেকে বের করার জন্য তিনি ফরাসিদের সাহায্য চান, ফলে ফ্রান্স কর্তৃক আলজিরিয়া দখলকালে তিনি চুপ থাকেন। অনেকের ন্যায় তিনিও আরবিবাদের সমালোচনা করেন এবং সিরীয়দের অপছন্দ করে। তিনি বিশ্বাস করেন জাতীয়তার ভিত্তি ভাষা বা ধর্ম নয় বরং দেশ। মিসরীয়গণ যদি বলতে পারেন মিসর আমার দেশ তবেই মিসর একটি জাতি হতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিসরে তিনটি দল গঠিত হয়। প্রথম পিপলস (উম্মা) পার্টি যার সদস্য হন আবদুহু ও তার বন্ধুগণ যারা মনে করেন তারা প্রথমত মুসলমান, দ্বিতীয়ত মিসরীয় এবং তৃতীয়ত ওসমানীয় ও আরব। দ্বিতীয় দল কন্সটিটিউশনাল রিফর্ম পার্টি (Constitutional Refrom Party)। এটি ব্রিটিশ আশীর্বাদপূর্ণ মেদিভের দল যারা পূর্বেকার স্থিতাবস্থা প্রবক্তা। তৃতীয় দল ন্যাশনাল পার্টি। এদের মতে প্রথমত মিসরীয় এবং পরে ইসলাম ও ওসমানীয়। এদের আদর্শ শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে এবং বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত মিসরীয় জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র হিসাবে মিসরবাদই সক্রিয়ভাবে কাজ করে।

---

www.pathagar.com

গবেষক, প্রাবন্ধিক, আরবী সাহিত্যের অনুবাদক ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ ১৯৭৮ সালে বগুড়া জেলার পশ্চিম পালশা গ্রামের মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। পেশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। বাবাও ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। শিক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরে তিনি মেধার স্বাক্ষর রাখেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ হতে বি.এ. (অনার্স) এবং এম.এ উভয় পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিষয়ের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান লাভ করেন। ২০০৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে আধুনিক আরবী সাহিত্যে তিনি পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ২০০৯ সালে তিনি মরক্কোর রাবাতস্থ পঞ্চম মুহাম্মদ বিশ্ববিদ্যালয়-সুইসী হতে সাফল্যের সাথে আরবী ভাষা কোর্স সম্পন্ন করেন।

ড.ইফতিখার ২০০৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৭ একই বিভাগে তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০১২ সাল হতে উক্ত বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে তিনি কর্মরত আছেন। বিভিন্ন গবেষণা জার্ণালে তাঁর ৩০টির বেশী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আরবী ভাষায় রচিত তাঁর তিনটি গবেষণা গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক এবং সাময়িকীতে ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং অনুবাদ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত ৪০টির বেশী আন্তর্জাতিক সেমিনার/সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন।

জনাব ইফতিখার এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ও বাংলা একাডেমির জীবন সদস্য। এছাড়া তিনি ইউনিভার্সাল লীগ অব ইসলামিক লিটারেচার, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, ইনস্টিটিউট অব হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ-ইন্ডিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ-ভারত, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি), বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি প্রভৃতি গবেষণা এবং সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সক্রিয় সদস্য। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ও এক সন্তানের জনক। তিনি রাজশাহী শহরের বিনোদপুরের স্থায়ী বাসিন্দা।

মুঠোফোন ০১৭১৭৭৯৮৪৮০
ই-মেইল iftikhararabic09@gmail.com

www.pathagar.com

আরবি সাহিত্যে ইসলামি ভাবধারা

ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ

প্রচ্ছদ : ইয়াহিয়া সেলিম

মূল্য : ১৬০ টাকা

978-984-34-1954-5